দিনাজপুর—কান্তনগরের মঠ।

Engraved & Printed by
K. V. SEYNE & BROS.

সূচীপত্র।

ঐতিহাসিক চিত্র।

সিপাহী যুদ্ধের দুইটি চিত্র।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলার শ্যামল প্রান্তরে ব্রিটীশ পতাকা উড্ডান হইয়া যে লোক-বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল, তাহারই শত বৎসর পরে আবার সেই পতাকাকে রুধির-রঞ্জিত করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত করিবার জন্য আর একটি ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়। ইতিহাসে তাহা সিপাহী যুদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিজয়-লক্ষ্মী যে ইংরেজের মস্তকে চির-কল্যাণ বর্ষণ করিবার জন্য আপনার কর-পল্লব সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, তাঁহার অঞ্চল-বাতাসে ব্রিটীশ নিশান সে যুদ্ধেও হেলিয়া দুলিয়া নীলাকাশে নৃত্য করিয়াছিল। সিপাহীগণ ও তাহাদের অধীনেতাদিগের বহু চেষ্টা তাহাকে ভূতলশায়ী করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাতে যে রুধির-নদী প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে রঙ্গ-ভূমি হইতে সুদূর দিল্লী প্রদেশ পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। কামানের গভীর গর্জ্জন, বন্দুকের অবিরাম শব্দ, শাণিত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, উভয় পক্ষের সৈন্যের কোলাহল, এবং শ্বেত কৃষ্ণ উভয় জাতির নরনারী ও বালক বালিকাগণের আর্ত্তনাদে দিঙ্‌মণ্ডলী প্রতিধ্বনিত হইয়া চারিদিকে প্রলয়-ভীতির সঞ্চার করিতে ছিল। বাঙ্গলার শ্যামল প্রান্তর হইতে এই

প্রলয়াগ্নির স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া শেষে দিল্লী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে পলাশী-প্রান্তরে প্রথমে ইংরেজের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, তাহারই নিকটে বহরমপুরের শ্যামল প্রান্তরে সিপাহী-বিদ্বেষ-বহ্নির প্রথম স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। যদিও বঙ্গের জলসিক্ত ভূমিভাগে তাহা প্রদীপ্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু বিহারের শুষ্ক ভূমি স্পর্শ করিবা-মাত্র তাহা প্রজ্বলিত হইতে আরম্ভ হয়, ও ক্রমে ক্রমে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

এই প্রদীপ্ত অগ্নির আলোকে ভারতে অনেক গুলি চিত্র উজ্জ্বল ভাবে লোক-লোচনের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছিল। ইতিহাস সেই সেই চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া সেই প্রলয়াগ্নির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আমরা তন্মধ্য হইতে দুইটি চিত্রের ছায়া মাত্র পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিবার ইচ্ছায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির অবতারণা করিলাম।

প্রায় শত বৎসর হইল, কোম্পানীর রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। রাজত্বে ও বাণিজ্যে কোম্পানী দেশমধ্যে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিয়া তুলি-য়াছে। কোম্পানীর শাসন-কর্তৃগণ ছিদ্র পাইলেই দেশীয় রাজগণের রাজ্য ও জমিদারগণের জমীদারী খাস করিয়া লইতে তৎপর হইয়াছেন। নানা প্রকার কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিয়া সাধারণের মনে অশান্তির বীজ উপ্ত করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ লর্ড ডালহৌসীর বিশ্বগ্রাসিনী নীতির বলে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যেন একটা অসন্তোষের স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। আবার গো-শূকরের চর্ব্বি-মিশ্রিত টোটা কাটায় অসম্মত হইয়া সিপাহীগণও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

এই সময়ে বিহার প্রদেশে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়-সন্তান ইংরেজ শাসন-কর্তৃগণের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া শাণিত তরবারি নিষ্কা-ষিত করিয়া বসিলেন। সাহাবাদ জেলায় জগদীশপুর যাঁহার নামে চিরবিখ্যাত হইয়া আছে, আমরা সেই কুমার সিংহেরই কথা

বলিতেছি। বাল্যকালে দুর্ভেদ্য রোটাস দুর্গের পার্ব্বত্য প্রদেশে মৃগয়া করিয়া যিনি চিরজীবন তেজস্বিতাকে আপনার প্রিয়সঙ্গিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাঁহার প্রতিকার্য্যে বিরোচিত কর্ত্তব্য পালন ও উদারতা প্রকাশ পাইত, যিনি দীন দরিদ্রের কষ্ট নিবারণের জন্য অনেক ভূমি নিষ্কর প্রদান করিয়া শেষে নিজেই দরিদ্র-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন, আজিও বিহার প্রদেশে যাঁহার উদারতার কাহিনী গৃহে গৃহে কথিত হইয়া থাকে, এবং যিনি বরাবর ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত ছিলেন। ভারতের সেই অসন্তোষের স্রোত তাঁহাকেও ভাসাইয়া লইয়া যায়।

অত্যধিক উদারতার জন্য কুমার সিংহ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। সাহাবাদের কালেক্টরের নিকট তজ্জন্য অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। শেষে রেভিনিউ বোর্ড সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করিয়া কুমার সিংহকে বিপন্ন করিয়া তুলেন। কুমার সিংহ ঋণ পরিশোধের জন্য সময় প্রার্থনা করিলে রেভিনিউ বোর্ড তাহা অগ্রাহ্য করেন, এবং এক মাসের মধ্যে টাকা না দিলে তাঁহার জমিদারীর সহিত গবর্ণমেণ্টের কোনই সংস্রব থাকিবে না, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কুমার সিংহ মনে করিয়া ছিলেন যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের একজন অনুরক্ত প্রজা হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জমিদারী রক্ষা করিবেন। কিন্তু বোর্ডের উক্তরূপ আদেশে তাঁহার মস্তকে অশনি সম্পাত হইল। তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যে টাকা সংগ্রহ করিতে না পারায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন।

কুমার সিংহের অসন্তোষের কথা লইয়া লোকে নানারূপ করিয়া তুলিল। সিপাহী যুদ্ধের প্রাক্কালে তাহাকে রাজনৈতিক অসন্তোষ বলিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিক তখনও পর্য্যন্ত কুমার সিংহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়ার কল্পনাও হৃদয়ে আনয়ন করেন নাই। পাটনার কমিশনার এবং সাহাবাদ ও গয়ার

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত বলিয়াই প্রকাশ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহা কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত না হওয়ায়, এবং ক্রমে নানা লোক তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা প্রচার করায় পাটনার কমিশনার টেনার সাহেবকেও শেষে কুমার সিংহের প্রতি সন্দিহান হইতে হয়। তিনি কুমার সিংহকে পাটনায় আনয়ন করিবার জন্য কুমার সিংহের আবাসস্থান জগদীশপুরে একজন মুসলমান চর প্রেরণ করিলেন। চর কুমার সিংহকে পাটনায় উপস্থিত হইবার জন্য কমিশনারের আদেশ জ্ঞাপন করাইয়া, তাঁহার জমীদারীর মধ্যে কোনরূপ বিদ্রোহের চিহ্ন আছে কিনা তাহা পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহার কোনই চিহ্ন তাঁহার জ্ঞানগোচর হয় নাই। কুমার সিংহ অসুস্থতা প্রযুক্ত পাটনায় যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। চর পাটনায় ফিরিয়া গেলেন।

এইরূপ অহেতুক সন্দেহের জন্য তাঁহার জমিদারী মধ্যে একটি চর পাঠাইয়া প্রজাবর্গের মনে অভক্তি উৎপাদিত হওয়ায় কুমার সিংহ আপনাকে অত্যন্ত অবমানিত মনে করিলেন। ক্রমে তাঁহার সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। একটি ঘটনায় তাহা সীমা অতিক্রম করিয়া কুমার সিংহকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। তাঁহার কোন আত্মীয়ের বিবাহে কিছু অধিক সংখ্যক বরযাত্রী লইয়া যাওয়ার প্রার্থনা করিলে রাজকর্ম্মচারীরা ভীত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। রাজপুরুষেরা হয়ত শিবাজী-সায়েস্তা খাঁ ব্যাপার স্মরণ করিয়া কুমার সিংহের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক ইহাতে কুমার সিংহ যারপর নাই অবমানিত মনে করিয়া অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার যে শেষ ভক্তিটুকু ছিল, তাহা একেবারে অসন্তোষের স্রোতে ভাসাইয়া দেন। এই সময়ে পদচ্যুত সিপাহীরা আসিয়া তাঁহাকে তাহাদের নেতৃপদে বরণ করিল। তিনি তাহাদের নিকট হিন্দু মুসল-

মানের ধর্ম্মনাশের কথা শুনিয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাহাদের সহিত সেই অশীতিপর বৃদ্ধ নবযুবকের ন্যায় তেজস্বিতা সহকারে ইংরেজ দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। সিপাহীগণের সঙ্গে তিনি আরায় উপস্থিত হইলেন, অমনি দানাপুর হইতে সিপাহীরা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ তাঁহার ভ্রাতা অমরসিংহ সর্ব্বপ্রকার আয়োজনের জন্য ব্যগ্র হইলেন। আরার সাহেব মহলে ভীতির সঞ্চার হইল। কুমার সিংহের আদেশে আরার ধনাগার লুণ্ঠিত হইল। কয়েদিগণ নিষ্কৃতি পাইল। কালেক্টরীর জমি জমা কাগজ ব্যতীত আদালতের অনেক কাগজ নষ্ট করা হইল। রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার বিকার্স বয়েলের একটি ক্ষুদ্র দোতালা বাটী সাহেবদিগের দুর্গের স্থানীয় হইল। পঞ্চাশ জন শিখ সৈন্য তাহার রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইল। কুমার সিংহ তাহা অবরোধ করিয়া অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তাহাতে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা হইল। পরে সুড়ঙ্গে বারুদ পূর্ণ করিয়া তাহা উড়াইবার চেষ্টা করা হইল, কিন্তু ইংরেজেরা আবার প্রতিকূল কার্য্যের দ্বারা তাহা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। কুমার সিংহ দুইটি কামান আনিয়া তাহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। ইংরেজেরা কয়েকটি গুরু আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন এবং তাহাদের মধ্য দিয়া গুলি চালাইতে লাগিলেন। কুমার সিংহ দুর্গ অধিকার করিতে সক্ষম না হইলেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। সমস্ত আরা অধিকার করিয়া তিনি ইংরেজদিগের খাদ্য দ্রব্য বন্ধ করিয়া দিলেন। অনাহারে ইংরেজদিগের মধ্যে ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। আরার অবরোধ শুনিয়া দানাপুরের সেনাপতি লয়েড একদল ইউরোপীয় ও শিখ সৈন্য আরায় পাঠাইয়া দেন। কাপ্তেন ডানবার তাহাদিগকে লইয়া আরার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নিশীথ রাত্রিতে তাহারা আরার নিকটে উপস্থিত হইলে একটি আম্রকুঞ্জ হইতে ধূমাগ্নি উদগীরণ করিয়া শ্রাবণের ধারার ন্যায় গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সৈন্য সহ

ডানবার ভূতলশায়ী হইলেন। একজন শিখ কোন ক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া দুর্গস্থ ইংরেজদিগকে সংবাদ প্রদান করিল। তাহাদের সকল আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল, কিন্তু ভগবান্ অচিরে তাহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

ভিনসেণ্ট আয়ার নামে একজন সেনাপতি জলপথে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ যাইতেছিলেন। তিনি আরার ঘটনা ও কুমার সিংহের ব্যাপার শুনিয়া নিজের গতি ফিরাইলেন। তিনি গুজরাজগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইলে কুমার সিংহের সৈন্তের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আয়ার গোলা ও গুলি বর্ষণে কুমার সিংহের সৈন্যগণকে হটাইবার চেষ্টা করিলে তাহারা নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র নদীর সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া আয়ারের গমন পথ রোধ করিল। আয়ার গোলা চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু কুমার সিংহের সৈন্তেরা না হটিয়া ইংরেজ সৈন্তের সম্মুখীন হইল। নদীর পরপারে বিবিগঞ্জ নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। ইংরেজ সৈন্য আরার দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে কুমার সিংহের সৈন্তেরা বনমধ্য হইতে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরেজ সৈন্য তাহাতে বিচলিত হইয়া পড়িল। কুমার সিংহ প্রবল বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কামান-রক্ষী ইংরেজ পদাতিকগণ কামান ছাড়িয়া পলায়ন করিল। আয়ার সঙ্গীন চালাইবার আদেশ দিলেন। উভয়পক্ষে অনেকক্ষণ নিকট যুদ্ধ হইল। পরে ইংরেজেরা আপনাদের পথ পরিষ্কার করিয়া আরার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহারা আরায় উপস্থিত হইয়া দুর্গমধ্যস্থ সাহেবদিগের উদ্ধার সাধন করিলেন।

কুমার সিংহ বাসস্থান জগদীশপুরের দিকে গমন করেন। আয়ার তথায় গমন করিলে প্রথমে কুমার সিংহের সৈন্য কর্তৃক উত্ত্যক্ত হয়। পরে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া কুমার সিংহের আবাস বাটী ও দেবমন্দিরাদি

ধ্বংস করেন। কুমার সিংহ এই সংবাদ পাইয়া জগদীশপুরে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ইংরেজ সৈনিক পুরুষকে নিহত করেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকগুলি মহিলা ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সজ্জিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে জায়গা না থাকায় প্রায় দেড়শত রমণী আপনাদের কামানের মুখে মাথা রাখিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেন।

জগদীশপুর বিধ্বস্ত হওয়ার পর কুমার সিংহের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কথিত আছে যে, তিনি হস্তী পৃষ্ঠে গঙ্গা পার হইবার সময় ইংরেজের গুলির দ্বারা বাম হস্তে আহত হন। কুমার সিংহ সেই হস্ত কাটিয়া গঙ্গা মাতাকে উপহার প্রদান করেন। তাহার পর পবিত্র সলিলা জাহ্নবী তাঁহাকে নিজবক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথবা বসুন্ধরা তাঁহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিতে পারে না।

উপরে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, নিম্নে তদপেক্ষা আর একটি বিস্ময়কর চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে। এই রুধিরাপ্লুত চিত্রও কোম্পানীর শাসন কর্ত্তাদিগের ব্যবহারজনিত অসন্তোষের ফল। বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝাঁসি নামক ক্ষুদ্র রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিপতি পেশওয়ার আশ্রিত ও অনুগত এক ব্রাহ্মণ বংশের অধিকারে ছিল। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যগ্রাসিনী নীতিবলে পেশওয়া বাজারাওএর রাজ্য ব্রিটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে বাজীরাও লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া কানপুরের নিকট বিঠুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার সহোদর কিমাজি আপ্পার প্রিয় পাত্র মেরোপন্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণের কাশীবাস কালে মনুবাই নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মেরোপন্ত কাশী হইতে বিঠুরে উপস্থিত হইলে বাজীরাও-এর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ নানা সাহেবের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে মনুবাইএর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। মনুবাই পরে ঝাঁসির অধীশ্বর গঙ্গাধর রাওএর সহিত পরিণীতা হইয়া তথায় গমন করি

তাঁহার রূপলাবণ্য ও পবিত্র ভাব দর্শনে সকলে তাঁহাকে "মা লক্ষ্মী" বলিয়া সম্বোধন করায় মনুবাই তদবধি লক্ষ্মীবাই নামে অভিহিত হন, এবং সেই নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।

গঙ্গাধর রাওএর অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণের জন্য রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন। লর্ড ডালহৌসী অমত প্রকাশ করেন, এবং ঝাঁসিকে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করার জন্য আদেশ দেন। ইতিমধ্যে গঙ্গাধর রাও পরলোক গত হইলে লক্ষ্মীবাই পুনর্ব্বার দত্তক গ্রহণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুমতি চাহেন। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ব্রিটীশ এজেণ্ট তাঁহাকে ঝাঁসি ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীবাই উত্তর দিলেন, "মেরা ঝাঁসি নেহি দেঙ্গে"। কিন্তু ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট শেষে ঝাঁসি ব্রিটীশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লইলেন। লক্ষ্মীবাই অবমানিত হইয়া ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রণোন্মত্ত সিপাহীগণ বঙ্গভূমি হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত ধাবিত হইতে লাগিল। তাহাদের রণ-হুঙ্কার বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশেও প্রতিধ্বনিত হইল, কিন্তু লক্ষ্মীবাই অমুহুঙ্কার করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, এবং ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের নামে ঝাঁসি রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া লক্ষ্মীবাইকে আপনাদের বিপক্ষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া বসিলেন। লক্ষ্মীবাই তাহাতে আরও অবমানিত মনে করিলেন, এবং সহজে ঝাঁসি পরিত্যাগ করিব না বলিয়া কৃতসংকল্প হইলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার হস্ত হইতে ঝাঁসি লওয়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, লক্ষ্মীবাই সৈন্য সংগ্রহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দলে দলে সিপাহীগণ তাঁহার পতাকা মূলে আসিয়া সমবেত হইল। লক্ষ্মীবাই রমণীজনোচিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া

বীর-পুরুষের ব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি বর্ম্ম পরিহিতা হইয়া অশ্বারোহণে সৈন্যদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রিটীশ সেনাপতি স্যার হিউরোজ লক্ষ্মীবাইএর সম্মুখীন হইয়া তাঁহার অসীম সাহস ও রণকৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। কয়েক মাস ব্যাপিয়া লক্ষ্মীবাইএর সৈন্যের সহিত ব্রিটীশ সৈন্যের অবিরাম যুদ্ধ চলিয়াছিল। প্রথম সংঘর্ষে ব্রিটীশ সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। পরে তাহাদের অগ্নি-বর্ষণে লক্ষ্মীবাইএর সৈন্য সংখ্যা হ্রাস হইলে, লক্ষ্মীবাই কল্লি নগরে আবার ব্রিটীশ সৈন্য মথিত করিবার চেষ্টা করেন। কল্লি অবশেষে ইংরাজদিগেরই অধিকৃত হয়। কিন্তু লক্ষ্মীবাইয়ের যুদ্ধনীতি বৃটীশ সৈন্যের হৃদয়ে ত্রাস ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

ইহার পর গোয়ালিয়রের নিকটে শেষ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের ফলে লক্ষ্মীবাই আত্ম বিসর্জ্জন দিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। গোয়ালিয়রের নিকট উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ব্রিটীশ সৈন্যগণ বিচলিত হইয়া পড়ে, কিন্তু ব্রিটীশ সেনাপতি কৌশলসহকারে লক্ষ্মীবাইএর সৈন্যগণকে মথিত করিলে, লক্ষ্মীবাই বিপ-ক্ষের ব্যূহ ভেদ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হন। সেই সময়ে তাঁহার সহচরী জনৈক ইংরেজ সৈনিক কর্ত্তৃক আহত হইলে লক্ষ্মীবাই তরবারির আঘাতে তাহার মস্তকচ্ছেদ করেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটি খাল পথিমধ্যে পড়ায় লক্ষ্মীবাইএর গতিরোধ হয়। তাঁহার অশ্ব খাল পার হইতে অশক্ত হওয়ায় লক্ষ্মীবাই তাহাকে চালিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। এই সময়ে একজন ইংরেজ সৈনিক তথায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মীবাইকে আক্রমণের চেষ্টা করিলে, লক্ষ্মীবাই তাহার সহিত অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সৈনিকের আক্রমণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যর্থ করিলেও তাঁহার শেষ আঘাত লক্ষ্মীবাইএর মস্তকে পতিত হয়। বীর রমণী

তাহাতে উত্তেজিত হইয়া স্বীয় অসির আঘাতে সৈনিককে ভূতলশায়ী করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রুধিরক্ষরণে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার জনৈক বিশ্বস্ত অনুচর নিকটবর্ত্তী কোন পর্ণ-কুটীরে তাঁহাকে লইয়া গেলে, কুটীর স্বামী তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পবিত্র গঙ্গোদক প্রদান করেন। তাহাই পান করিয়া লক্ষ্মীবাই ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত করিলেন ও এ জগৎ হইতে চির বিদায় লইলেন। এই মহারাষ্ট্রীয় মহিলা যেরূপ তেজস্বিতা ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া ব্রিটীশ সেনাপতিকে চমৎকৃত করিয়া ছিলেন, ইতিহাসে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে। গুণগ্রাহী ব্রিটিশ সেনাপতি লক্ষ্মীবাইএর প্রশংসা করিতে বিস্মৃত হন নাই। আমরা উপরে যে দুইটি চিত্র প্রদর্শন করিলাম। তাহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, অসন্তোষের ফলেই শিপাহী যুদ্ধ ঘোরতর আকার ধারণ করিয়াছিল। এই অসন্তোষের চিত্র সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে অনেক স্থলে অঙ্কিত আছে।

প্রায়শ্চিত্ত।

গুরুমাতা গুন্দরী গুপ্তভাবে অবরুদ্ধ মুখওয়াল দুর্গ ত্যাগ করিবার * অনতিবিলম্বে শিখ সৈন্যদিগের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। গুরুগোবিন্দ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে বহ্নি নিবাইতে পারিলেন না। সৈন্যেরা রসদ অভাবে মৃত্যু অনিবার্য্য ভাবিয়া গুরুর সকল প্রস্তাব উপেক্ষা করতঃ দুর্গত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যাত্রাকালে তাহারা গুরুকে একটি নিদারুণ পত্র লিখিয়া যায়, তাহাতে তাহারা ঘোষণা করে যে, তাহারা আর অতঃপর গুরুগোবিন্দের শিষ্যত্ব স্বীকারে সম্মত নহে। গোবিন্দ সে পত্র পাইয়া প্রথমে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেও, স্বীয় উদারতা প্রভাবে শীঘ্রই তাঁহার সে ক্রোধ উপশমিত হইয়া যায় এবং তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সৈন্যদের ক্ষমা করেন।

গর্ব্বমুগ্ধ শিখ-সৈন্যেরা দুর্গ ত্যাগ করিবা মাত্র, অবরোধকারী মোগলেরা বীর বিক্রমে তাহাদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিল। সে যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াও বহু-সংখ্যক শিখ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে; অপর সকলে কোন ক্রমে পলাইয়া আত্মরক্ষা করে।

হতভাগ্য সৈন্যেরা বড় আশা করিয়া গৃহে ফিরিয়াছিল, কিন্তু যখন আত্মীয়বর্গ তাহাদের এই অকস্মাৎ গৃহাগমনের কারণ জানিতে পারিল, তখন ক্রোধে ও ঘৃণায় সকলেই তাহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। যে

* গুরুমাতার এই ভ্রমের পরিণাম ১৩১৪ সালের ঐতিহাসিক চিত্রে সিংহশিশু প্রবন্ধে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

গুরুর সামান্য পদধূলি পাইলে শিখ সমাজ আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিত শিখ হইয়া তাহারা কিরূপে এই অসময়ে গুরুকে ত্যাগ করিতে সাহস পাইল ? স্নেহময়ী মাতা পুত্রের কাপুরুষতায় অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত রহিত করিলেন। প্রেমময়ী ভার্য্যা স্বামীর মানসিক অধোগতিতে মর্ম্মাহত হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীরাও গুরুদ্রোহী জ্যেষ্ঠের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল, সকলেই তাহাদিগকে বংশের কলঙ্ক ও গৃহস্থের অমঙ্গলকারী বিবেচনায় ত্যাগ করিল।

গৃহে বাহিরে এইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়া শিখদিগের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা হইতে লাগিল। জীবনে তাহাদের ঘৃণা উপস্থিত হইল। আত্মহত্যা মহাপাপ জ্ঞানে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে আর সাহস পাইল না। সর্ব্বদাই নির্জ্জনে বাস করিয়া অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে হইতে তাহারা স্বেচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল।

নিতান্ত নীরবে কালযাপন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া সর্দ্দার মোহন সিংহের * চেষ্টায় তাহারা কয়েকজনে একটি ক্ষুদ্র দলে মিলিত হইয়া লোক সেবায় আপনাদিগকে সমাহিত করিল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সাধনায় কি সে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তাহারা যদি সে দিন গুরুকে না ত্যাগ করিত, তবে গুরুকে আজ চোরের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে হইত না। তাহাদেরই পাপের পরিণামে পরম পূজ্য গুরুবংশ আজ নির্ব্বংশ হইয়াছে। যখন এই সকল চিন্তা ও তৎসঙ্গে লোকাপমান তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ উদিত হইত, তখন আত্মগ্লানিতে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত।

* কাহারও কাহারও মতে ইঁহার নাম মহা সিংহ।

এইরূপে কয়েক বর্ষ অতিবাহিত হইলে, এক দিন তাহারা সংবাদ পাইল, গুরু বহুকষ্টে ও অদম্য অধ্যবসায়েরর ফলে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বরাজ্য অধিকারের উদ্যোগ করিতেছেন শুনিয়া সির-হিন্দের মোগল শাসনকর্ত্তা যুদ্ধনিপুণ সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে মালব প্রদেশাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন। এই সংবাদে তাহারা স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দ্রুত গুরুর পশ্চাদ্‌গামী হইল। মোগলসৈন্য নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, জানিতে পারিয়া গুরু 'ঢিলবাঁ' গ্রামের সন্নিকৃষ্ট এক স্থলে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক মোগলের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথাকালে মোগলেরা তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র, ক্ষুদ্র শিখ-সংহতি গুরুর আশ্চর্য্য বর্দ্ধন করত কোন এক গুপ্তস্থান হইতে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া অসংখ্য মোগল সৈন্যের উপর আপতিত হইল। মোগলেরা এই হঠাৎ আক্রমণে প্রথমে একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেও শীঘ্রই আত্মস্থ হইয়া সেই বীরকুলের গতি সংহৃত করিতে লাগিল। চল্লিশ জন, সপ্ত সহস্র সৈন্যের মধ্যে সমুদ্রের তুলনায় গোস্পদ মাত্র। কাজেই অচিরেই তাহারা সকলেই ধরাশায়ী হইতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহাদের প্রতাপে মোগল শক্তি কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

গুরুগোবিন্দ এই আত্মত্যাগী বীরদিগের পরিচয় জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াও অচিরে মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সহিত মোগলদের বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সে সংঘর্ষের পরিণামে তুর্কশক্তি শিখশক্তির নিকট মস্তক নত করিতে বাধ্য হইয়া রণক্ষেত্র হইতে দ্রুত পলায়নপর হইলে, গুরু ভূমিশায়ী মুমূর্ষু বীরদিগের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে করিতে এক ব্যক্তির নিকটে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেম। এ যে মোহন সিংহ। যে মোহন সিংহ কিছুকাল পূর্ব্বে গুরুর আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়াছিল, যাহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় গুরুপক্ষ যথেষ্ট দুর্ব্বল হইয়া

পড়িয়া ছিল, সেই মোহন সিংহ আজ গুরুর আজ্ঞাতে গুরু সেবার জন্য মরিতে বসিয়াছে! উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে গুরু ডাকিলেন—ভাই মোহন সিংহ! সে চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া মুমূর্ষ গুরু ধ্যানরত মোহন সিংহ চক্ষু চাহিল। তাহার চিরারাধ্য গুরুমূর্ত্তি আজ চক্ষের সমক্ষে দাঁড়াইয়া! আনন্দে মোহন গুরুকে কোনরূপ সম্ভাষণ করিতে পারিল না। নীরবে গুরুর পানে চাহিয়া রহিল। সে চাহনী যেমন আনন্দ-পূর্ণ, তেমনই কাতরতাব্যঞ্জক। গুরু কহিলেন—"কল্যাণ! এখনও যদি কোন বাঞ্ছা তোমার অপূর্ণ থাকে, বল, তাহাও অপূর্ণ থাকিবে না।' রুদ্ধকণ্ঠে মুমূর্ষ উত্তর করিল,,—"আমি গুরু-দর্শন পাইয়াছি, আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। তবে দেব! এই একমাত্র প্রার্থনা, আমার সহচরদিগকে ক্ষমা করুন—তাহাদের সকল অপরাধ বিস্মৃত হউন। নহিলে পরকালেও বুঝি তাহাদের মুক্তি নাই।" সে প্রার্থনা শুনিয়া গুরু তাহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে আবার মার্জ্জনা করিলেন ও তাহাদের পারলৌকিক কুশল প্রার্থনা করিলেন। গুরুর সে আশীর্ব্বাণী শুনিতে শুনিতে মোহন সিংহ মুক্তলোকে প্রস্থান করিল।

যে সকল শিখ, গুরুর জন্য অম্লান বদনে এই রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়াছিল, গুরু তাহাদের স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য তথায় একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার নাম দিলেন—মুক্তসর। সেই অবধি সে রণস্থল মুক্তসর নামে পরিচিত হইয়া সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতেছে।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* ১৭৬২ বিক্রম সম্বতের মাঘ মাসের প্রথম তারিখে (১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে) এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধসংঘটিত হয়।

নেপালের প্রাচীন পুঁথি।

(প্রথম প্রস্তাব।)

মহামতি সার উইলিয়ম জোন্স কোলব্রুক, বর্ণুফ, উইলসন, অয়েবর, হজ্‌শন, মেকেন্‌জি প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ বহু প্রতীচ্য পণ্ডিতবর্গের অসাধারণ অধ্যবসায়, প্রতিভা ও অনুসন্ধানে আসিয়া মহাদেশের নানাভাষায় লিখিত অনেক প্রাচীন ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উদ্ধার হইয়া গিয়াছে।* কিন্তু দুর্গম নেপাল রাজ্যে অতীব পুরাতনকাল হইতে বহু পুঁথি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও এই পার্ব্বতীয় ও অরণ্যসঙ্কুল দেশে সহসা কেহ যাইতে সাহসী হয় না, তদ্ধেতু সে দেশস্থিত অনেক পুরাতন পুঁথি সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত হইতে সহজে সমর্থ হই নাই। ইংরাজশাসনে নেপাল যাইবার পথের কিছু সুবিধা হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার দুর্গমতার হ্রাস হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি জ্ঞানানুরাগী ইউরোপীয় সদ্বিদ্বান বর্গের যত্নে তদ্দেশের কতকগুলি পুরাতন ও প্রয়োজনীয় পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে "অষ্টমী ব্রত বিধান" "নেপালীয় দেবতা কল্যাণ পঞ্চবিংশতিকা" এবং "সপ্ত বুদ্ধস্তোত্র" নামে তিনখানি প্রাচীন ও কৌতুক-কর পুঁথি বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এই গ্রন্থত্রয় সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত কিন্তু এই সংস্কৃতে

* এস্থলে উদ্ধার শব্দের অর্থ আবিষ্কার। অনেক পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য কিন্তু ইহাদের সামান্য সংখ্যা মুদ্রিত ও প্রকাশিত বা অভিজ্ঞাত হইয়াছে মাত্র।

তদ্দেশীয় নেওয়ারী ভাষা মিশ্রিত। নেপাল, ভোটান, সিকিম, তিব্বত, চীন, জাভা প্রভৃতি দেশে এই পুঁথি, ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গণ্য। অষ্টমী ব্রত বিধান” পুস্তকে অষ্টমী তিথিতে ভক্তের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে; “নেপালীয় দেবতা কল্যাণপঞ্চবিংশতিকা” পুস্তকে নেপালের দেব দেবীর ২৫টী স্তোত্র আছে এবং “সপ্তবুদ্ধ স্তোত্র” গ্রন্থে সপ্তজন বুদ্ধের প্রশংসা-বাদ দেখা যায়। গ্রন্থত্রয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় যাহা তাহার উল্লেখ করিলাম কিন্তু মূল বিষয়ের সঙ্গে অবান্তর ভাবে অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে। হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, তান্ত্রিক মত, নেপালের লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস, বুদ্ধদেবের ইতিবৃত্তি, হিন্দু ও বৌদ্ধের সঙ্গে কি বিষয়ে একতা এবং কি বিষয়ে অনৈক্য, বৌদ্ধেরা হিন্দুর দেবদেবী কেন মান্য করিত, এবং নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম কাহার দ্বারা কবে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হয়, ইত্যাদি বহু উপাদেয় বিষয় আমরা এই গ্রন্থত্রয় পাঠ করিয়া অবগত হইতে পারি। দুঃখের বিষয় বঙ্গভাষায় এই পুরাতন পুঁথি সমূহের অনুবাদ হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি গ্রন্থত্রয় হইতে অনেক প্রয়ো-জনীয় অংশ অনুবাদ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি; নেপালের ‘‘পার্ব্বতীয়” (অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ) এবং “নেওয়ারী” (বৌদ্ধবর্গ) এই উভয় সম্প্রদায়ের লোক এই তিনখানি পুঁথিকে শাস্ত্র বলিয়া এখনও মান্য করে এবং তথাকার বহুপ্রকার দেশাচার ও লোকাচার এই সকল পুঁথির নিয়মানুসারে যাজিত হইয়া থাকে। আমি সর্ব্বপ্রথমে “নেপা-লীয় দেবতা কল্যাণপঞ্চবিংশতিকা” নামক পুঁথি হইতে ২৫টি শ্লোকের অনুবাদ করিয়া ইহার মূল মর্ম্ম দেখাইতে ইচ্ছা করি।

অনুবাদ।

১। যিনি জাতদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম, যাঁহার নাম পবিত্র স্বয়ম্ভু, অমৃতরুচি, অমোঘ, অক্ষোভ্য, বৈরোচন, যিনি সাধুদিগের রাজা এবং

শুদ্ধাদপিশুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব, তিনি তোমাকে ভবসংসারে সাহায্য করুন। পবিত্র শ্রীপ্রজ্ঞা, বজ্রধত্বী এবং অন্নপূর্ণা তারা ও অপরাপর সমুদয় দেবদেবী তোমার উন্নতি বিধান করুন। আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। *

২। দেবী সম্পদপ্রদা, গণপতিহৃদয়া, বজ্রবিদ্রাবিনী, উষ্ণীসর্পণা, কীর্তিবরবদানী, গ্রহমাতৃকা, কোটিলক্ষ্মী এবং পঞ্চরাক্ষসী, † তোমার সহায় হউন; আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি।

৩। রত্নগর্ভা, দীপাঙ্কর, মণিকুসুম, বিপাশী, শিখি, বিশ্বভূ, ককুৎসু, কনক, মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ ও শাক্যমুনি, তোমার মঙ্গল বিধান করুন। ভূতকালের, বর্ত্তমান কালের ও ভবিষ্যযুগের বুদ্ধগণ তোমার কল্যাণ করুন। দশেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাদের গুণানুবাদ করা যায় না। আমি ইহঁাদের সকলকে প্রণাম করি। ‡

৪। সাধু ও সাধকগণের শ্রেষ্ঠতম এবং জীণ দেবের সুযোগ্য পুত্র শ্রীশ্রীঅবলোকেতেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। মৈত্রেয়, অনন্তগুঞ্জ, বজ্রপাণি, প্রখ্যাতরাজাধিরাজ মঞ্জুনাথ, সর্ব্বানীবর্ণ এবং সুপ্রসিদ্ধসামন্ত ভদ্র,

* এস্থলে অপরাপর দেবতা অর্থে আদি বুদ্ধ, পঞ্চজন ধ্যানী বুদ্ধ এবং অমিতাভঃ, অমোঘ সিদ্ধ ও রত্ন সম্ভব প্রভৃতি দেবগণকে বুঝিতে হইবে। দেবীগণ অর্থে স্বভাবিকা, ঐশ্বরিকা, শক্তিশিকা ও ভবানীকে বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের মতে যে দেবতার সঙ্গে যে দেবী (স্ত্রী) থাকে, তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

দেব	দেবী	দেব	দেবী
আদি বুদ্ধ	প্রজ্ঞা	অমিতাভঃ	পান্দারা
বিরোচন	বজ্রধত্বী	অমোঘ সিদ্ধ	তারা
অক্ষোভ্য	লোচনা	বজ্রসত্ত্ব	বজ্রশত্বৎমীকা
		রত্নসম্ভব	মামুখী

† পঞ্চরাক্ষসীর নাম—প্রতিসারা, মহাসহস্র প্রসাদিনী, মহাময়ূরী, মহাশ্বেতাবতী ও মহানন্ত্রানুসারিণী।

‡ এই পুস্তকের মতে বুদ্ধের সংখ্যা কুড়ি। ইহাদের মধ্যের দশ নশ্বর এবং দশটী অবিনশ্বর। শেষোক্ত বুদ্ধগণ যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান।

ক্ষিতিগর্ত্ত ও খগর্ত্ত তোমাদের কল্যান করুন। আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। *

৫। পঞ্চবুদ্ধদেব হইতে সমুৎপন্ন এক অদ্বিতীয় বুদ্ধ রহিয়াছেন, তিনি বিশ্বমণ্ডল রক্ষার জন্য সহস্রদল পদ্মে বাস করেন। ঐ পদ্মের নাম নাগবাস, এইলতা বিপাশী নামক মুনি দ্বারা প্রোথিত হইয়াছিল। ঐ পদ্মের উপরে অদ্বিতীয় বুদ্ধদেব জ্যোতিঃ স্বরূপে অবস্থান করেন। পদ্মের পঞ্চস্তর। আমি ইহাদিগকে প্রণাম করি। †

৬। গৃহেশ্বরী দেবীকে নমস্কার, ইনি প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূতা। ইহা ইচ্ছারূপিনী ও কামরূপিনী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহঁার প্রশংসা করেন। অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে নবমী তিথিতে ইনি আবির্ভূতা হয়েন। ইঁহার চরণে নমস্কার, ইনি তোমাদের কল্যাণ করুন। (১২)

* এই নয়জন, নয়টি বুদ্ধের পুত্র; ইহাতে পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইতেছে, বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে একজন বুদ্ধ নহে। অগণ্য বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অনেক গ্রন্থে অনেক বুদ্ধের নাম পাঠ করা যায়। এই নয় জন, কোন্ কোন্ বুদ্ধের সন্তান নিম্নে তাহার তালিকা দেখুন। এখন বুঝা গেল, বুদ্ধ একটা উপাধি মাত্র, ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে।

পিতার নাম		পুত্রের নাম
১। অমিতাভঃ	...	অবলোক
২। বিরোচন	...	মৈত্রেয়
৩। অক্ষোভ্য	...	অনন্ত গুপ্ত
৪। খগর্ত্ত	...	অমৃতবর্ষী
৫। বৈরীশরণ	...	সামন্তভদ্র
৬। অক্ষয়	...	বজ্রপাণি
৭। অকারক	...	মঞ্জুনাথ
৮। অমোঘ	...	সর্ব্বাণীবর্ণ
৯। রত্নজিৎ	...	ক্ষিতিগর্ভ

† জ্যোতিঃ স্বরূপে যিনি বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি আদি বুদ্ধ। শম্ভুনাথ নামক পর্ব্বতে অদ্যাপি এক বৌদ্ধ মূর্ত্তি অগ্নিশিখারূপে বর্ত্তমান আছে, ইহা কখন নির্ব্বাপিত হয় না। ইহাকে লোকে শম্ভুচৈত্য কহিয়া থাকে। ("Religious sects of the Hindoos. Vol. II. Page 14. edition of 1862-By H. H. Wilson).

১২। গুহেশ্বরী এক তান্ত্রিক দেবীর নাম। নেপালে পুরাকাল হইতে তান্ত্রিক মত প্রচলিত আছে।

৭। স্বয়ম্ভু দেবকে নমস্কার, ইঁহার অন্য নাম রত্নলিঙ্গেশ্বর, ইঁহার আকৃতি শ্রীবৎসস্বরূপ, ইনি অষ্ট বীতরাগের রাজা। ইঁহার চরণ কৃপায় ভবসংসার পার হওয়া যায়। মৈত্রেয় হইতে ইনি উৎপন্ন। রত্নচূড়া নামক বনময় পর্ব্বতে ইনি বিরাজ করেন। ইনি তোমাদের মঙ্গল করুন। আমি ইঁহাকে প্রণাম করি। (১৬)

৮। পদ্মাকৃতি খগন্ধের পুত্র গোকর্ণেশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বাঘমতী নদীকূলে ইনি লোকনাথের অনুরোধে তীব্র তপস্যায় ব্রতী হয়েন এবং এখনও তথায় নরলোকের কল্যাণার্থ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। আমি ইঁহাকে প্রণাম করি। ইনি তোমাদের কল্যাণ করুন। (২২)

৯। ১০। পতাকাকার মহেশ, শ্রীগিরিতে বাসকরেন, ইনি নাগগণের অধিপতি। মহাসর্প কুলীক ইঁহাকে ভয় করে। আমি ইঁহাকে নমস্কার করি। মহাজীণের পুত্র সর্ব্বেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমি ইঁহাদিগকে নমস্কার করি। (২৩)

(১৬) মুক্ত পুরুষের নাম বীতরাগ। ইহাদের অষ্ট প্রকার চিহ্ন আছে, যথা—শঙ্খ, ছত্র, মৎস্য, কলস, পতাকা, পদ্ম, শ্রীবৎস এবং বলয়। কৃষ্ণানদীর তীরে প্রাচীনা অমরাবতী নগরীতে ও গুজরাটের নাগোর নগরে বৈশ্বানর মূর্ত্তির শিব দেখা যায়। শ্রীবৎস, শ্রীকৃষ্ণের একটি মহামূল্য অলঙ্কার বিশেষ।

(২২) মালাবার উপকূলে গোকর্ণ তীর্থ অবস্থিত। বাঘমতী ও অমোঘাবতী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে আজিও এক পদ্মাকৃতি গোকর্ণেশ্বর দেবতা আছেন। এখানে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ হয়।

(২৩) শ্রীমহেশের অপর নাম কীলেশ্বর। শ্রীগিরির অন্য নাম চারুগিরি। কুলীকা, পাতালের অষ্ট নাগ মধ্যে এক। ঘাটেশ্বর পর্ব্বতে যে শিব লিঙ্গ আছে তাহা মহেশ নামে খ্যাত। ভোটানের এক শিবের নাম শ্রীমহেশ, ইঁহার মন্দিরের দ্বারে এই শ্লোক খোদিত আছে—"যখন সমস্ত বসুন্ধরা হর-পার্ব্বতীর একাধিপত্যে আসিবে তখন জানিও আবার সত্যযুগ আসিয়াছে। শৈবগণ রাজা না হইলে পুনরায় ধর্ম্ম স্থাপন হইবে না।

১১। যিনি মঞ্জুগর্ভ নামক মহা দুর্বৃত্ত পাষণ্ড ও মূর্খকে উদ্ধার করিয়া মহাসাধু, মহাপণ্ডিত ও মহাবক্তারূপে পরিণত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন। (৩১)

১২। পবিত্র সর্ব্বাণীবর্ণ ভিষকম্বী মৎস্যের আকার ধারণ করিয়াছিলেন, তদনন্তর সর্পাকার ধারণ করেন, তাহার পরে বীতরাগ হয়েন। ইনি তোমাদের কল্যাণ করুন। আমি ইঁহাকে প্রণাম কবি।

১৩। আচার্য্যপ্রধান শ্রীশ্রীগন্ধেশ তোমাদের কল্যাণ করুন। আমি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ হই।

১৪। উগ্রতপস্যা দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উদীয়নদেব বিক্রমেশ হইয়াছিলেন। তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।

১৫। "পুণ্য" নামক পবিত্র তীর্থে তারক্ষ হইতে নাগগণ শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। পবিত্র শান্ত নামক তীর্থে পার্ব্বতী তপ করিয়াছিলেন, শঙ্করতীর্থে রুদ্রদেব ধ্যান করিয়া ভগবতীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল বিশুদ্ধ তীর্থভূম তোমার মঙ্গল করন। আমি তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডবৎ হই।

১৬। ১৭। ১৮। রাজতীর্থে, বিরূপ নামক পুরুষ সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য পাইয়াছিলেন। কামতীর্থে, ব্যাধ ও মৃগ ইন্দ্র-সন্নিধানে গিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছিল। নির্ম্মলাকাখ্য তীর্থে বজ্রাচার্য্য শুদ্ধ হইয়া ছিলেন। অকার তীর্থে কুবেরের ভাণ্ডার আছে, জ্ঞানতীর্থে মূর্খের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়, চিন্তামণি তীর্থে সকল কামনা পূর্ণ হয়, প্রমদা তীর্থে মহানন্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সৎলক্ষণ তীর্থে কল্যাণ হয় এবং জয়তীর্থের জলে

(৩১) মঞ্জুগর্ভ, নদীয়ার জগাই মাধাইয়ের ন্যায় নেপাল প্রদেশের পাষণ্ড ছিল, কিন্তু কে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল তাহা জানা যায় না।

(*Vide* Burnouf's Lotus de la bonne loi. 500 F.) যিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি একজন ব্রাহ্মণ ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের লোক।

স্নান করিলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারা যায়। এই সকল তীর্থ তোমাদের কল্যাণ করুন। আমি ইঁহাদিগকে প্রণাম করি। (৪৪)

১৯। বিদ্যাধরী, আকাশযোগিনী, বজ্রযোগিনী, হারিতী, হনুমান, গণেশ, মহাকাল, চূড়াভিক্ষিণী, ব্রাহ্মণী, সিংহিনী, ব্যাঘ্রগৃহিণী এবং স্কন্ধ তোমাদের মঙ্গল করুন। আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। (গ)

২০। বাঘমতী ও অপরাপর নদীতীরের ছোট ছোট তীর্থ তোমাদের মঙ্গল করুন। সঙ্কোচগিরির কেশচৈত্য, যটোচা পর্ব্বতের ললিতচৈত্য, ফুল্লোচ্ছা গিরির দেবী এবং ধ্যানপ্রচ্ছা পর্ব্বতের ভগবতী দেবী তোমাদের মঙ্গল করুন। আমি ইহাদিগকে প্রণাম করি। (৯৯)

২১। শ্রীমঞ্জু পর্ব্বতের চৈত্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হউক, ইহা শিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশান্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পঞ্চনগরের দেবতাগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পুচ্ছাগ্র পর্ব্বত তোমার কল্যাণ

(৪৪) সম্ভবতঃ ঐ তীর্থগুলি কোথায় অবস্থিত নিম্নে যথাসাধ্য তাহা নির্ণীত হইতেছে।

শম্ভুপুরাণ নামক প্রাচীন শাস্ত্র হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল এবং হজ্‌শন সাহেবের গ্রন্থ হইতেও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। পুণ্যতীর্থ মালাবার উপকূলে; শান্ততীর্থ নেপালে; শঙ্করতীর্থ গুজরাটে; রাজতীর্থ বাঘমতী নদীকূলে; কামতীর্থ বিমলাবতী নদীতটে; নির্ম্মলাতীর্থ কেশবতী নদীকূলে; অকার তীর্থ সুবর্ণমতী নদীতটে; জ্ঞানতীর্থ কাশীধামে; (কেহ কেহ অনুমান করেন মুঙ্গেরে); চিন্তামণি তীর্থ নেপাল অঞ্চলে; প্রমদাতীর্থ রত্নাবতী নদীতটে (নেপালে); সৎলক্ষণতীর্থ নেপাল প্রদেশে এবং জয়তীর্থ হিমালয়ে।

(গ) এই সকল দেবদেবীর উল্লেখ প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রে দেখা যায়। চূড়াভিক্ষিণী একজন বৌদ্ধ ব্রহ্মচারিণী। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ শ্রাবক, চৈলক, ভিক্ষু এবং অরহৎ এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে শ্রাবকগণ শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিত।

(৯৯) অপরাপর তীর্থ অর্থে ভগদ্বার, তারা তীর্থ, অগস্ত্যতীর্থ, অপ্সরাতীর্থ ও অনন্ত-তীর্থ বুঝিতে হইবে। সঙ্কোচগিরির অপর নাম শিবপুরা অথবা শিপ্চু। কেশচৈত্য নামক স্থানে বুদ্ধদেব ১০০ শত ব্রাহ্মণের শিখা কাটিয়া দিয়াছিলেন। ললিতাচৈত্য পশ্চিমোত্তর প্রদেশে। ফুলোচ্ছা বা ফুলচক পর্ব্বত নেপালে স্থিত। দেবীর নাম বসুন্ধরা; ধ্যানপ্রচ্ছা পর্ব্বতের অন্য নাম চন্দ্রগিরি; দেবীর নাম গুহেশ্বরী।

করুন; এখানে শাক্য পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমি ইহাদিগকে প্রণাম করি। (৮৮)

২২। নাগাধিপতি আধার হ্রদে বাস করেন। তিনভুবনের লোকেশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। আমি ইহাদিগের সম্মুখে অবনত মস্তক হই। (৭৭)

২৩। হীবজ্র, সম্বর, চন্দবীর, ত্রিলোকবীর এবং যোগাম্বর প্রভৃতি দেবতাগণ ও যমরাজ তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। তোমরা মৃত্যুকে জয় কর। আমি ইহাদিগকে নমস্কার করি।

২৪। শীর্শা হইতে সশিষ্য আগমন করিয়া যিনি পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া ও হ্রদ শুকাইয়া নগর বসাইয়াছেন এবং পদ্মাসীনা দেবীকে ধ্যান করিয়াছেন তিনি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

২৫। হয়গ্রীব ও জটাধর সম্প্রদায়ের অধিপতি অজ্ঞাপাণি, পাতাল পর্ব্বত হইতে সৌখাবতী নগরীতে গিয়াছিলেন, তথা হইতে বঙ্গদেশে গমন করেন এবং তদনন্তর ললিতপুরে প্রবেশ করেন। এই মহাপুরুষ তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। (৬৭)

পঞ্চবিংশ শ্লোক ব্যতীত এই গ্রন্থে আরও অনেক শ্লোক আছে, কিন্তু

(৮৮) শম্ভু পর্ব্বতের পশ্চিমে শ্রীমঞ্জু পর্ব্বত আছে। শান্তশ্রী গৌড়ের রাজা ছিলেন। পঞ্চ নগরের নাম শান্তপুর, বাসুপুর, অগ্নিপুর, বায়ুপুর ও নাগপুর। নেপালীভাষায় আধার হ্রদের নাম তদাহং। (Hodgson's illustrations of Nepal frontier. page 25)

(৭৭) আধার হ্রদ এখনও বর্ত্তমান আছে।

(৬৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal. XII, 400—409 দৃষ্টে বোধ হয় এই শ্লোকোক্ত "বেঙ্গ" অর্থে বঙ্গদেশ বুঝায়।

এই ২৫টাই প্রধান। আমি আর অধিক অনুবাদ করিব না; অধিক অনুবাদ করিবার আবশ্যকতাও দেখিনা, কারণ গ্রন্থের প্রকৃত দেখাইবার জন্য যে সকল শ্লোক অনুবাদ করা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। এতদ্দ্বারা পুস্তকের ধরণ বেশ বুঝিতে পারা যায়। সমগ্র গ্রন্থ অনুবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তাহাতে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া যাইবে এবং মাসিক পত্রে এরূপ অনুবাদ সুসঙ্গত নহে। এই পুস্তকখানি আদ্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে একটা প্রয়োজনীয় ও গুরুতর প্রশ্ন পাঠকদিগের মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে; প্রশ্নটা এই—হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বেদনিন্দুককে, ব্রাহ্মণনিন্দুককে ও শাস্ত্রবিরোধিগণকে "নাস্তিক" নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং হিন্দুশাস্ত্রে বা সাহিত্যে এরূপ নাস্তিককে কখন উচ্চস্থান দেন নাই। বুদ্ধদেব বেদের বৈরিতা করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, শাস্ত্রকে খণ্ডন করিয়াছেন, কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়াছেন, জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, বিগ্রহসেবার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, নাস্তিকতায় দেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছেন এবং পরিণামে হিন্দু সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়া নূতন মত সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ হিন্দুর দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধ এক অবতার! ইহা কি কখন যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে? হিন্দু কি এতই কাপুরুষ ও নির্ব্বোধ যে, এ হেন বুদ্ধকে "দেব" ও "অবতার" বলিয়া শাস্ত্রে সম্মান করিবে? তবে এ বুদ্ধ কে? এই গ্রন্থে তাহার মীমাংসা আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বৌদ্ধগণ দুই দলে বিভক্ত; একদলের নাম বিনশ্বর, অপর দলের নাম অবিনাশী। হিন্দুর অবতার মধ্যে যে বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়, তাহা "অবিনাশী" বুদ্ধ; ইহাঁর জন্ম কপিলাবস্তুনগরে হয় নাই। ইনি অনাদি, অনন্ত, অজর, অমর এবং অব্যয়। এ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে অনেক কথা, অনেক তর্ক ও অনেক প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতে হয়। বর্ত্তমান প্রব-

দ্ধের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক রাখিয়া প্রবন্ধকে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিতে আকাঙ্ক্ষা করি না, সুতরাং সে তর্ক উত্থাপন করিতে বিরত হইলাম। মূল কথা এই, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের বুদ্ধ, হিন্দুর দশাবতার মধ্যে গণ্য নহে এবং বুদ্ধও একজন নহে। সমুদয় বুদ্ধের সংখ্যা ৩৮৭ হইতেও অধিক।

এই প্রাচীন শাস্ত্র-পাঠে আর একটা প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসা হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম কাহার দ্বারা প্রচারিত হয়? উত্তরে অনেকে বলিতে পারেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিবৃন্দ কর্ত্তৃক ইহা প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু এ কথা সত্য নয়। সর্ব্ব প্রথমে (আদিকালে) তাহা হয় নাই। কনষ্টান্ টাইন্ নামক রাজার সাহায্য না থাকিলে খৃষ্ট ধর্ম্মের পতাকা আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতে পারিত কিনা সন্দেহ এবং অশোক প্রভৃতি নরপতি না থাকিলে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইত কিনা তাহা সংশয়ের বিষয়। কিন্তু বৌদ্ধেরা যখন বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছিল অথবা অশোক প্রভৃতি রাজাগণ যখন বৌদ্ধ হইয়া ঐ নবীন মত প্রচার জন্য যথেষ্ট সহায় হইয়াছিল তখন বৌদ্ধধর্ম্ম অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কাহাদিগের দ্বারা এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়? ইহাই এক্ষণে আলোচ্য বিষয়। বিভীষণ বিরোধী না হইলে রাবণের ধ্বংস হইত না, আর মুসলমানেরা ঘরভেদী শত্রু না হইলে বাঙ্গালা দেশ হইতে মুসলমান রাজ্য নষ্ট হইত না; হতভাগ্য হিন্দুরাই বৌদ্ধ মত প্রচার করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বীজ বপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। এদেশের লোকে খৃষ্টান হইয়া যে পরিমাণে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে, বিদেশীয় পাদ্রী প্রভু দিগের দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও বিস্তৃত হয় নাই, কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মত্যাগী দেশীয় খৃষ্টানাপেক্ষা নিশাচরের ন্যায় গুপ্তভাবে যে সকল কপটাচারী হিন্দু-সন্তান হিন্দু-সমাজে অবস্থান করিয়া এবং "হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দিয়া খৃষ্টানের মত আচার ব্যবহার করে, তাহাদিগের কুব্যবহারে

খৃষ্টান ধর্ম্ম আরও প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। সে কালে হিন্দুসমাজে এরূপ কপটাচারী হিন্দু ছিল, তাহারা না—হিন্দু না—বৌদ্ধ। ইহাদিগের দ্বারাই বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ বপিত হয়। এই গ্রন্থপাঠে বুঝা যায়, হিন্দুর শত্রু হিন্দু এবং হিন্দুই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচারক। য়িহুদী জাতীয় খৃষ্ট য়িহুদী দেশীয় লোকের সাহায্যেই য়িহুদী ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম স্থাপন করেন; কোরীশ জাতীয় মহম্মদ, কোরীশ জাতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যে প্রাচীন কোরীশ ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া নবমতের প্রতিষ্ঠা করেন; এইরূপে বৌদ্ধগণও হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া, হিন্দুর অন্ন জল খাইয়া হিন্দুরই সাহায্যে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে নবীন মত (বৌদ্ধধর্ম্ম) প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রন্থ তাহার সাক্ষী।

কথাটা আর একদিক্ দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। যাহারা প্রকাশ্যভাবে হিন্দু-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গির্জ্জায় প্রবেশ পূর্ব্বক পাদ্রীদিগের দ্বারা বাপ্তিস্মা প্রাপ্ত হয় ও খৃষ্ট-সমাজে মিলিয়া মিশিয়া যায় তাহাদের দ্বারা হিন্দু সমাজের তত অনিষ্ট হয় না, কিন্তু যে সকল অকাল কুষ্মাণ্ড হিন্দু, হিন্দু-সমাজে থাকিয়া এবং হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া, গরু শূয়র খায়, সুরাপান করে, শাস্ত্র অমান্য করে, দেশাচার ও লোকাচারের শিরে পদাঘাত করে, বাঙ্গালী বা ব্রাহ্মণকে মানেনা, জাতি মানেনা, গাভীকে খাদ্য দ্রব্য বলিয়া ভাবে এবং সমাজটাকে একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন "দল" বলিয়া বিবেচনা করে, অথচ হিন্দু সন্তান বলিয়াই পরিচয় দেয় এবং অহিন্দু বলিয়া কথিত হইলে রাগে বিশ্বামিত্রবৎ হইয়া উঠে, এই সকল কপটাচারী—ষাঁড়ের গোবরবৎ অসার—লোক-গুলার দ্বারা হিন্দুসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাক্কালে এরূপ গুণধর হিন্দুর দ্বারাই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। এই গ্রন্থ তাহার সাক্ষী। (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

হকীকত রায়।

বীরশ্রেষ্ঠ মহতাব সিংহ যে দিন স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাইয়া মোগলের চক্রযন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন * সেইদিন আর একজন শাদীক বীর † তুচ্ছ কারণে মোগল কর্তৃক অন্যায় ভাবে নিহত হইয়া অমরধামে প্রস্থান করেন। তাঁহার নাম হকীকত রায়। হকীকত ১৭৩৪ খৃঃ কার্ত্তিকাব্দী দ্বাদশী তিথিতি স্যালকোট সহরে এক শিখ-ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতাপিতা উভয়েই অতীব ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; হিন্দু-দেব-দেবীতে ও শিখ-গুরুগণের প্রতি তাঁহাদের অসীম ভক্তি ছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সন্তান না হওয়ায়, তাঁহারা বড়ই ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষ জীবনের শেষ অঙ্কে দেবতা-গুরুর আশীর্ব্বাদে তাঁহারা এই পুত্ররত্নকে লাভ করেন। বার্দ্ধক্যের সন্তান বলিয়া হকীকতের স্নেহ যত্নের অবধি ছিল না। সেই স্নেহের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও হকীকত প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিতে ছিলেন। তাঁহার পিতা বাঘমল্ল স্থানীয় শাসনকর্ত্তা আমীরবেগের দপ্তরে কার্য্য করিতেন। বিদ্বান বলিয়া তাঁহার সামান্য খ্যাতিও ছিল। তিনি সন্তানকে বংশের গৌরবস্বরূপ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। যখনই তিনি অবসর পাইতেন, তখনি হকীকতকে নিকটে বসাইয়া পুরাণাদি হইতে নানা গল্প সংবর্দ্ধন করিয়া শুনাইতেন, দেশের বীরেন্দ্র-

* ১৩১৫ সালের চৈত্র মাসের ভারতীতে 'মহতাব সিংহ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† কোন ধর্ম্মমত রক্ষার জন্য যাঁহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন দান করেন, তাঁহারাই 'শাদীক' অর্থাৎ 'মার্টার'।

কুলের ইতিবৃত্ত সরস ভাষায় বর্ণনা করিতেন, ধর্ম্মার্থ আত্মত্যাগী শাদীক শিখদিগের চরিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়া সন্তানের উৎসুক নেত্রের সমক্ষে ধরিতেন। তাহাতে হকীকতের ক্ষুদ্র হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিত, বর্ণিত ব্যক্তিদিগের ন্যায় হইবার জন্য তাঁহার প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত। তিনি বাল-সুলভ ক্রীড়াদি ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মবীরগণের জীবনী আলোচনাদিতে সময়াতিবাহিত করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। এইরূপ আলোচনায় তাঁহার হৃদয়ে সামান্যমাত্রও দাম্ভিকতা বা ঔদ্ধত্য জন্মিতে পারে নাই। তিনি সকলের সহিতই মধুর ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সেই প্রীতি-মধুর ব্যবহারে ও শারীরিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহাকে স্নেহ ও যত্ন করিত।

অতি অল্প বয়সেই হকীকতের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল; তাঁহার ন্যায় তাঁহার স্ত্রীরও ভ্রাতাভগিনী কেহই ছিল না। তিনিও মাতাপিতার একমাত্র পুত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতৃকুল 'সদ্বাপাদ্‌শাহ্‌' গুরু গোবিন্দ সিংহের * প্রতি অতীব ভক্তিমান্ ছিলেন। পিতৃকুলের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব তাঁহার সেই বাল্য চরিত্রেই দৃষ্ট হইয়াছিল।

অধুনা ভারতে ইংরেজী ভাষা যে স্থান অধিকার করিয়াছে তুর্ক রাজন্যবর্গের শাসনকালে পারশীক ভাষা সেই স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। রাজকার্য্যোপলক্ষে এবং সম্মানের আশায় তখন দেশের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকলেই এই ভাষার চর্চ্চা করিতেন। এই ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে, জনসমাজে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হওয়া একরূপ কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিত। কাজেই বাঘমল্ল তৎকালীন রীতি অনুসারে হকীকতকে এক পারশীক পাঠশালায় প্রবিষ্ট করিয়া দেন।

* এই মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে ১৩১৪ ও ১৩১৫ সালের ঐতিহাসিক চিত্রে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। (যন্ত্রস্থ)

এই বিদ্যালয়ে বহুতর হিন্দু-মুসলমান ছাত্র পাঠ করিত। বিদ্যালয়টি একটি মসজীদের মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিল।

হকীকতের বয়ঃক্রম যখন সপ্তদশ বর্ষ, সেই সময় এক দিন মৌলবী কোন কার্য্য বশতঃ হঠাৎ অধ্যাপনা কার্য্য ক্ষণকালের জন্য স্থগিত রাখিয়া অন্যত্র গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। বালকেরা স্বভাবসুলভ চপলতাবশতঃ পাঠত্যাগপূর্ব্বক ক্রীড়াদিতে মনোনিবেশ করে। তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা অল্প বয়সেই বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা ক্রীড়াদিতে আমোদ না পাইয়া পরনিন্দা ও পরচর্চ্চায় আপনাদিগকে গভীরভাবে সমাহিত করে। তৎকালে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের যথেষ্ট নৈতিক অবনতি সংসাধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে আসিয়া ইসলাম ধর্ম্মিগণ প্রথম যুগে যথেষ্ট হিন্দু-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছিল বটে; কিন্তু মধ্যযুগে সুবুদ্ধির প্রভাবে তাহারা হিন্দুর মহত্ব উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মদ্বেষ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রজাপালনে রত হয়। দুঃখের বিষয় এই মহান্ ভাব তাহাদের হৃদয়ে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেবের আবির্ভাবের পর হইতে আবার চতুর্দ্দিকে, বিশেষতঃ পঞ্জাবে মুসলমানদিগের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ অতি মাত্র প্রবল হইয়া উঠে। তদবধি মুসলমান বালকেরা পর্য্যন্ত হিন্দুদের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব দেখাইতে ও হিন্দু দেব-দেবীকে লক্ষ্য করিয়া অসংযত বাক্য প্রয়োগ করিতে কিছু-মাত্র সংকোচ বোধ করিত না।

এইরূপ কুশিক্ষার প্রভাবে রহস্য করিতে করিতে একটি মুসলমান বালক হিন্দু বালকদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া ৺মাতা ভগবতী দেবীর সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তিজনক অন্যায় বাক্য প্রয়োগ করে। এইরূপ দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করা হিন্দু বালকদিগের কতকটা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম হইয়া-উঠিয়াছিল। তাহারা সহপাঠীদিগের এরূপ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেও নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিত। কিন্তু সকলের প্রকৃতিও সমান

নহে। হকীকত মুসলমান বালকের এরূপ বাক্য পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে ধৈর্য্যহীন্ হইয়া উঠিলেন। বালকবুদ্ধির প্রভাবে তিনি 'উলটা জবাব' দিবার অভিপ্রায়ে মহম্মদ-তনয়া ফতেমা বিবিকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি অন্যায় শব্দ প্রয়োগ করেন। তাঁহার সেই অসম সাহস সন্দর্শন করিয়া মুসলমান বালকেরা সহসা চমকিত হইয়া উঠে—কোন হিন্দুবালক যে মুসলমানদিগের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বাক্য কহিতে পারে, এ ধারণা তাহাদের আদৌ ছিল না। সুতরাং হকীকতের সাহসিকতায় তাহাদের বিস্ময় উৎপাদিত হওয়া অতীব স্বাভাবিক। কিন্তু সে বিস্ময় অধিক কাল স্থায়ী হইল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা ভীষণ ক্রোধে পরিণত হইল। তাহারা হকীকতের প্রতি নানা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সেই সময় মৌলবী সাহেব বিদ্যালয়ে পুনরাগত হওয়ায় তাহারা আর তাঁহাকে প্রহার করিতে সাহস করিল না; কিন্তু সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হকীকতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। শিক্ষক তখন তাহাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতঃ হকীকতের দোষটি সম্যক্‌রূপ অবগত হইয়া, হকীকতকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আদেশ করিলেন। হকীকত হঠাৎ উত্তেজনাবশে যে অন্যায়কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন, পরে তজ্জন্য যথেষ্ট মনঃক্লেশ অনুভব করিতেছিলেন। কাজেই শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই তিনি স্পষ্ট বাক্যে স্বীয় দোষ স্বীকারপূর্ব্বক বলিলেন—"পূর্ব্বে উহারা আমাদের দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া অন্যায় বলিলে আমি সহ্য করিতে না পারিয়া ঐরূপ বলিয়াছি। পরন্তু ইনলোগোঁকে পীছে কিয়া হৈ।"* তাঁহার এই উত্তরে শিক্ষক অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং

* ১৩১৫ সালের ভারতীতে স্ববেগসিংহ ও সবজসিংহ প্রবন্ধোক্ত চরিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখুন।

এই অপরাধের বিচার না করিয়া হকীকতকে ইসলামের নিন্দাকারী বলিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিলেন।

মুসলমান কাজীরা হকীকতকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আদেশ করিলেন যে, হকীকত ইসলামধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তবেই তাঁহাকে এই মহাপাপের জন্য ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু যদি তদ্ধর্ম্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হন, তবে তাঁহাকে 'কতল' (নিহত) করা হইবে। এই আদেশবাণী অচিরেই সমস্ত নগরময় ব্যাপ্ত হইয়া গেল। প্রতি হিন্দুর গৃহ হইতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়া চারিদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল; কিন্তু প্রতি মুসলমান গৃহে আনন্দের অপূর্ব্বস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

একমাত্র পুত্রের এবম্বিধ দশা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা মাতা শোকে উন্মাদিনীবৎ হইয়া উঠিলেন, তিনি স্বীয় অবস্থা বিস্মৃত হইয়া কাজীদিগের গৃহে যাইয়া তাহাদের পদে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক কাতর ভাবে সন্তানের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। লোভীদিগের পরিতোষের জন্য আপনার সমস্ত ধনসম্পত্তি দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পাষাণাদপি কঠোর-হৃদয় কাজীরা তাঁহার কোন কথাই শ্রবণ করিল না—দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাঁহাকে স্ব স্ব গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল।

তখন বৃদ্ধ মাতাপিতা শাসনকর্ত্তা (হাকিম) আমীর বেগের নিকট ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করিলে, শান্তিপ্রবণ আমীরবেগ সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বলিলেন—বালকেরা সাধারণতঃ এরূপ 'বাদবিবাদ' করিয়াই থাকে। উহাদের কথা লইয়া প্রবীণ ব্যক্তিদের বিচার করিতে বসা উচিত নহে। বালকের সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হওয়া বড়ই দুর্ঘট। এই সামান্য ঘটনা লইয়া কাজীদের এতদূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় নাই।" তাঁহার এই যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নগরের তাবৎ মুসলমান অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাহারা তখন সকলে একত্রিত হইয়া,

কাজীদিগের উপদেশ মত, হাকিমের নিকট পুনরায় বিচার প্রার্থনা করিল।

আমীরবেগ স্বভাবতঃ ন্যায়বান্ ও দয়ালু হইলেও, শাসনকর্ত্তার অনুরূপ মানসিক তেজঃ তাঁহাতে আদৌ দৃষ্ট হইত না। তিনি সকলকেই সন্তুষ্ট রাখিতে সর্ব্বদা যত্নপর হইতেন। এজন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে অনিচ্ছা সত্বেও বহু অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিতে হইত। তাঁহার হকীকত রায় সম্বন্ধীয় বিচারে মুসলমান অধিবাসিবৃন্দ অসন্তুষ্ট হইয়া পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিলে, তিনি একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। উভয় পক্ষকে তুষ্ট রাখিবার জন্য তিনি হকীকতকে স্বীয় সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য বহুবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ ও গঠিত চরিত্র সপ্তদশবর্ষীয় বালক হকীকত কোন ক্রমেই তাঁহার মতে মত দিলেন না। তাঁহার চিত্তপটে বহুতর আত্মত্যাগী মহাত্মার চিত্র অঙ্কিত ছিল; তিনি তাঁহাদের ন্যায় হইবার জন্য সর্ব্বদাই সোৎসুক ছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করান কোন মতেই সহজ সাধ্য নহে। আমীরবেগ হকীকতের দৃঢ়তায় বিচলিত হইয়া কহিলেন, 'ইহার বিচার এখানে সম্পন্ন হওয়া দুরূহ। এজন্য ইহাকে লাহোরে প্রেরণ করাই উচিত মনে করিতেছি।' তাঁহার এইরূপ আচরণে মুসলমানকুল সাদরে সম্মতি প্রদান করিলে, তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া অভিযুক্ত বালককে লাহোরে প্রেরণ করিলেন।

লাহোরপতি স্বয়ং এই বিচারের ভার না লইয়া কাজীদিগের উপর ন্যস্ত করিলেন। তাঁহারা বিচারান্তে স্যালকোটের কাজীদিগের 'ফৈসলা' (রায়) সমর্থন করিলেন, তখন হকীকতকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য রাজপক্ষ হইতে রীতিমত প্রয়াস চলিল, যতরূপ প্রলোভন ছিল, সমস্তই প্রদর্শন করা হইল। কিন্তু বালক স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলেন —"মেরে কো অপনা ধর্ম্ম ছোড়কর দুনিয়াকে কি সী পদার্থকী ইচ্ছা নহী

হৈ। ইসলিয়া মেরে কো মুসলমান হোনা মন্‌জুর নহী হৈ ; বাকী জো তুমলোগোঁকী ইচ্ছা হো করো।—স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া পার্থিব কোন পদার্থই আমি ভোগ করিতে চাহি না। এজন্যই ইসলাম গ্রহণেও আমার অভিলাষ নাই। তোমাদের যাহা ইচ্ছা আমার করিতে পার।" তখন সুবেদারও কাজাদিগের মতে মত দিয়া হকীকতকে নিহত করিবার জন্য আদেশ করিলেন।

যখন ঘাতকেরা সেই তরুণযুবক হকীকতকে লইয়া রাজপথ বাহিয়া সগর্ব্বে 'কতলখানায়' গমন করিতে লাগিল, তখন নগরের লোকসমূহ তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। উন্মাদিনী মাতা সন্তানকে দেখিতে পাইয়া ঘাতকের বাধা অবহেলা করিয়া, ছুটিয়া গিয়া, সন্তানের গললগ্ন হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ওরে! তুই এখনই মুসলমান হ। তুই মুসলমান হইলেও তোকে আমি চোখে দেখ্‌তে পেয়ে সুখী হব। তুই এখনই মুসলমান হ্।" হকীকত কিন্তু মাতার এই আদেশ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—'মা! আমাকে তুমি ধর্ম্মত্যাগ করিতে উপদেশ দিও না। তোমার সামান্য স্বার্থ রক্ষা করিতে যাইয়া তোমার আমার উভয়েরই কর্ত্তব্যপালনে ক্ষতি হইবে। ধর্ম্ম-বিমুখ পুরুষ কোন কালেই সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয় না। এই বিনশ্বর জীবনের জন্য ধর্ম্ম-বিমুখ হওয়া সৎ-পুরুষের কোন ক্রমেই উচিত নয়। আর ধর্ম্মত্যাগ করিয়া লালসাপূর্ণ এই 'দুর্মিল' জগতে বিচরণ করা অধম পুরুষেরই লক্ষণ। জগতে থাকিয়া অধম পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইতে আমার অভিলাষ নাই। মাগো! তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়, আমি যেন সেই বিশ্বাসবলে এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া সদ্‌গতি লাভ করিতে পারি।" সন্তানের এই ধর্ম্মজনক বাক্য শুনিয়া মাতা আর কিছু বলিতে পারিলেন না;

তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিল, মূর্চ্ছিত হইয়া সন্তানের দেহের উপর পড়িয়া গেলেন। তখন হকীকত মাতার স্নেহ বন্ধন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ঘাতকদিগের সহিত উদ্দিষ্ট স্থানে দ্রুত চলিয়া গেলেন। তথায় তাহারা নবাবের নির্দ্দেশ মত উপর্য্যুপরি নানা প্রকার ক্লেশ দিয়া শাদীক বীর বালককে ইহধাম হইতে অন্যত্র প্রেরণ করিল *

লাহোরের হিন্দু অধিবাসীরা যত্ন সহকারে বীরের শব সংগ্রহ পূর্ব্বক মহা সমারোহে দাহক্রিয়া সম্পন্ন করেন ও সেই শ্মশানের উপর একটি সুন্দর সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিগত-জীবন মহাত্মার সংবর্দ্ধনা করেন। আজও প্রতি বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে তথায় এক প্রকাণ্ড মেলা অধিবাসিত হয়। সেই মেলায় যোগদান করিবার জন্য পঞ্জাবের দিক্‌দেশ হইতে নানা লোক তথায় একত্র সমবেত হইয়া হকীকতের পুণ্য কীর্ত্তির মহিমা ঘোষণা করে।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বগুড়া জেলার ঐতিহাসিক উপকরণ।

(সেরপুরের মস্‌জিদাদি ও মুসলমান পর্ব্ব।)†

বগুড়া জেলার মেহমানসাহী পরগণায় সেরপুর গ্রাম। লোকসংখ্যা এবং শাসনকার্য্যের গুরুত্ব হিসাবে ইহা জেলার মধ্যে দ্বিতীয় টাউন হইলেও, প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব হিসাবে বস্তুতঃ ইহাই প্রথম। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরীতে ইহা একটী দুর্গের অবস্থিতি-স্থান বলিয়া, বর্ণিত হইয়াছে। এই দুর্গের নাম আকবরের পুত্র সেলি-

* ১৭৫১ খৃঃ এই ঘটনা ঘটে।

† লেখক প্রণীত অমুদ্রিত সেরপুরের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

মের সম্মানার্থ 'সেলিম নগর' নামে অভিহিত হয়। আবুলফজল এবং অন্যান্য মুসলমান লেখকগণ দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গ জয় করায় এবং ঢাকায় শাসন-কেন্দ্র সংস্থাপনের পূর্ব্বে এই নগর সীমান্ত প্রদেশের একটী প্রধান স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত "সেরপুর দশকাহনায়া" হইতে পৃথক করার নিমিত্ত, ইহা "সের পুর মুরচা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দিল্লীর সম্রাট-পুত্র সেরসার নাম হইতে এই নগরের নাম উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ কথিত হয়। পারস্য ভাষায় মুরচা অর্থ দুর্গের বক্র, বুরুজ (Battetry।) রাজা মানসিংহ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্রাট আকবরের বঙ্গদেশীয় সৈন্যাধ্যক্ষ থাকা কালীন সেরপুরে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা 'ভন্‌ড্যানক্রক' বঙ্গদেশের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তাহাতে বোয়ালিয়া হইতে পূর্ব্ব এবং উত্তর দিকে যে দীর্ঘপথ বর্ত্তমান রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া এবং রঙ্গপুর জেলা হইয়া আসাম সীমান্ত পর্য্যন্ত অঙ্কিত আছে, তাহাতে পার্শ্বস্থ তৎকালীন প্রধান তিনটী নগরের নাম দৃষ্ট হয়, তাহার অন্যতমটী এই সেরপুর। ইহা হইতে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য এই মানচিত্রে" (Seerpur mirro) এইরূপ লিখিত থাকায় ইহা সেরপুর বলিয়া চিনিয়া উঠা কঠিন।

গত শতাব্দীতে যৎকালে নাটোরের রাজগণ, তাঁহাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী সংস্থাপন করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের "বারদুয়ারী কাছারী" বলিয়া প্রসিদ্ধ একটী তহশীল কাছারীর সংস্থান এই সেরপুরে ছিল। এই কাছারী হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। সেরপুরের বৃহৎ হাটটী এখনও "বার দুয়ারীর হাট" বলিয়া পরিচিত।

এই সেরপুর এবং সেরপুরসংলগ্ন স্থানে নিম্নলিখিত মসজিদ্ ও থানা বা আস্তানাগুলি প্রসিদ্ধ এবং কোন কোনটী ইতিহাসের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

১। খেরুয়া মস্‌জিদ। ২। তুরকান সাহেবের শির মোকাম। ৩। তুরকান সাহেবের ধর মোকাম। ৪। মিঞা বা গাজি মিঞার থান। ৫। হটিলার থান। ৬। বুড়া বা সাবুদ্দি বা লেপা মাদারের থান। ৭। সা মাদারের থান।

১। খেরুয়া মস্‌জিদ।

মস্‌জিদটীর "খেরুয়া মস্‌জিদ" নাম কেন হইল জানা যায় না। আমি এবং সেরপুরের সবরেজেষ্টার মুন্সী শ্রীযুক্ত কোরবান উল্লা সাহেব দুইজনে মিলিয়া মস্‌জিদসংলগ্ন পারস্য ভাষায় লিখিত শিলালিপি দুইখানির ছাপ কাগজে তুলি। সেই ছাপের এক প্রস্থ সবরেজিষ্টার সাহেব কলিকাতায় ডাক্তার রস সাহেবের নিকট পাঠোদ্ধারার্থ পাঠান; ডাক্তার রস যথাসাধ্য পাঠোদ্ধার করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

সেরপুরের মস্‌জিদের শিলালিপি।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার জনৈক ভদ্রলোক আমাদিগকে দুইটী প্রস্তর লিপির ছাপ পাঠাইয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে আমাদিগের অভিমত জানিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার অনেকগুলি কথা অস্পষ্ট ও দুর্ভেদ্য। ইহার কারণ এই যে, সেইগুলি ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে তোলা হয় নাই। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা সেই মস্‌জিদের নির্ম্মাতার নাম এবং উহা নির্ম্মাণের তারিখ ও অনেকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

উক্ত ভদ্রলোক আমাদিগকে জানাইয়া ছিলেন যে, সেই প্রস্তর লিপি বগুড়া জেলার অন্তর্গত সেরপুরের নিকটে এক জঙ্গলে অবস্থিত ভগ্ন মস্‌জিদ হইতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই মস্‌জিদের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে কোন তথ্য আমাদিগকে জানান নাই। সেই নিমিত্ত আর্কিও-

লজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট' কর্ত্তৃক সেই মস্‌জিদ রক্ষিত হওয়া সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু বলিতে পারি না।

মস্‌জিদটী অত্যন্ত পুরাতন। সেই প্রস্তর লিপির প্রথম ছত্র হইতেই বুঝা যায় যে, ৯৮৯ হিজিরায় ২৬ জেলহজ সোমবারে উহার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ছত্রে নির্ম্মাতার নাম পাওয়া যায়, তাঁহার নাম মীর্জ্জা মুরাদ খাঁ। কয়েক ছত্র পরে পুনরায় তাঁহার নাম এবং তাঁহার পিতার নাম (জহর আলি খাঁ) কাকসাল পাওয়া যায়। কাকসাল কথাটীর প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ উহা তাঁহাদের জাতীয় নাম অথবা উহা তাঁহার পিতার উপাধি। 'আলিখান' এবং 'রফি' এই কথা দুইটীর অর্থ যথাক্রমে সামাজিক উচ্চ পদবী এবং গৌরবান্বিত।

প্রথম দুই লাইনের পরেই আমরা এক অদ্ভুত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রাপ্ত হই। এই ঘটনা মস্‌জিদের ভিত্তি-স্থাপনের ঠিক পরের দিনেই ঘটে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সেই প্রস্তর লিপির উপরে লিখিত কথাগুলি এই অদ্ভুত ঘটনা বিষয়ক। আবদুল সামাদ নামক এক ব্যক্তি (যিনি আপনাকে ফকির বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন) ঘটনার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁহার এই বিনীত পদবী হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনিই সেই প্রস্তর লিপির রচয়িতা। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে গল্পটী এই :—

মস্‌জিদ শেষ হওয়ায় অথবা আরম্ভ হওয়ার ঠিক্ পূর্ব্ব দিন (এ বিষয় আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কারণ কতকগুলি কথা অস্পষ্ট) দুইটী পারাবত উক্ত আবদুল সামাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহাকে অভিবাদন এবং তাঁহার গুণগান করিয়া তাহারা বলিল যে, তাহারা মক্কা হইতে আসিয়াছে এবং উক্ত মসজিদে বাসা নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করে। ফকির তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইতস্ততঃ করেন ; কারণ মস্‌জিদটী অত্যন্ত ছোট, তাহাতে বাসা নির্ম্মাণ করিলে

লোকে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে পারে। তাহাতে পারাবতেরা তাঁহাকে বুঝাইল যে, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে ইচ্ছাক্রমে নির্য্যাতন করিবে, ঈশ্বর তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। এইখানেই তাহাদের কথোপকথন শেষ হয়। কারণ পাখী দুইটী উড়িয়া চলিয়া যায়। কথিত আছে, মসজিদ তৈয়ারী হইয়া গেলে কপোত দুইটী সেখানে আসিয়া বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

প্রথম প্রস্তর লিপিতে গল্পটির এই পর্য্যন্তই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রস্তর লিপির শেষভাগে এই গল্পসংক্রান্ত প্রধান প্রধান বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত আছে ; তৎপরে আর একটী নূতন বাক্যে ফকির যাহাতে পারাবতগুলিকে অত্যাচার না করে, সে বিষয় সমস্ত লোককে অনুরোধ করেন ও বুঝাইয়া বলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তর লিপির প্রথম অংশে দুই ছত্র গদ্য লেখা আছে। আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, যে দুই একটী কথা বুঝা গেল, তাহা হইতেই দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত পদ্যগুলি যে বিষয় সম্বলিত, সেই গদ্যাংশও সেই বিষয় লইয়াই গঠিত।

পদ্যগুলির ভাবার্থ এই যে, যে ব্যক্তি চিরস্মরণীয় হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সাধারণের উপকারের নিমিত্ত মসজিদ এবং অন্যান্য ইমারত নির্ম্মাণ করা উচিত। তাহার পরে আমরা আরও তিনটী পদ্য পাই, যাহা কোন বিখ্যাত কবি কর্তৃক লিখিত বলিয়া বোধ হয়।

না মোর্ দাঁকে মানদ্ পছাস্ অয়ে বজায়।
পুল্ ও মস্জেদো হাউজো মেহেমা সারায়া।
হুর্‌রাঁকো নামানদ্ পছাস্ ইয়াদগার্।
দারাক্কে অজুদাস্ নিয়াওয়ার্দ বার্।
অগার্ রাফৎ ইছ্যার খায়রস্ নামান্দ
নাসায়েদ পাছে মুরগাস্ আলহান্দো খাঁন্দ।

এই পদ্যগুলির পরে আর এক ছত্রে নিম্নের কথা কয়টী লিখিত আছে যে, "নিম্নলিখিত গুণগুলি মৃত্যুর পরে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া বিবেচিত হয়।

(১) লোকের প্রার্থনা পূর্ণ করা। (২) শিক্ষা দেওয়া। (৩) কূপ খনন করা। (৪) মসজিদ নির্ম্মাণ করা। (৫) বৃক্ষরোপণ করা।

তৎপরে পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত গল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত আছে।

প্রস্তর লিপি আশীর্ব্বাদপূর্ণ বাক্যে শেষ করা হইয়াছে।

২। তুরকান সাহেবের শির-মোকাম।

৩। তুরকান সাহেবের ধর-মোকাম।

তুরকান সাহেব বা তুরকান সহীদের সহিত হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তুরকানের শির, যে স্থানে পড়িয়াছিল, সেখানে "শির-মোকাম" ও যেখানে ধড় পড়িয়াছিল সেখানে "ধর-মোকাম" নির্ম্মিত হইয়া—তত্তৎ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

এই বল্লাল সেন, সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বল্লাল সেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বল্লাল সেন ও তুরকান সহীদ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তুরকান সহীদের সহিত যুদ্ধযাত্রাকালে বল্লাল সেন নিজ পরিবার-গণকে বলিয়া যান "আমার সহিত যে কপোত চলিল, উহা আমার যুদ্ধ সম্বন্ধীয় নিদর্শন। যদি দেখ, কপোত এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে, তবে বুঝিবে আমার মৃত্যু হইয়াছে। তখন তোমরা সকলে অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করিও।" যুদ্ধে বল্লাল সেন জয়লাভ করেন; কিন্তু অসাব-ধানতা প্রযুক্ত কপোতটী উড়িবার সুযোগ পাইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আইসে। রাণীরা কপোতকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল চিত্তে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন। এদিকে বল্লাল সেন কপোতকে না দেখিতে পাইয়া বিপদ বুঝিয়া অতি সত্বর আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন

যে, তাঁহার প্রাণাধিকা রাণীবৃন্দ সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে দাহ হইতেছেন ; রাজা এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া এতদূর শোকবিহ্বল হন যে, সহসা তিনি সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রেয়সীগণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেহত্যাগ করতঃ নিজ অসাবধানতার প্রায়শ্চিত্ত করেন।

নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি রাজধানী ও রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, শেষ বয়সে নিজ পুত্রকে রাজত্ব দিয়া নির্জরপুরে চলিয়া যান।

"শাকেখনখেংদ্বব্দে আরেভহদ্ভুতসাগরং
গৌড়েংদ্রকুংজরালানস্তং ভবাহুর্মহীপতিঃ।
গ্রংথেহস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষা মহা-
দীক্ষাপর্ব্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতে নিস্পত্তিমভ্যর্থসঃ।
নানাদান চিত্তাংবুসংচলনতঃ সূর্য্যাত্মজা সংগমং
গংগায়াং বিরচর্য্য নির্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥"

Bhandarkar's R 1894, P IXXXV.

এখন দেখা প্রয়োজন এই "নির্জরপুর কোথায়?"

বগুড়া জেলার অন্তর্গত সেরপুর নামক স্থানের প্রায় ৩।৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 'রাজবাড়ী' নামক জঙ্গলাবৃত একটী স্থান আছে। প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ ও তত্তুল্য প্রশস্ত পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি-সমূহের বহু নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। কালে যে উহা বহু সমৃদ্ধিশালী একটী রাজপ্রাসাদ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্থানটীর চতুর্দ্দিক পরিখা বেষ্টিত। তন্মধ্যে আবার কোন কোন অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিখা দ্বারা বিভক্ত। ইহার মধ্যে আবার বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা, সরোবর ও পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে ; যথা, অন্দর পুকুর, চণ্ডীর পুকুর, কাঁজির পুকুর এবং তারাই ও

মেঘা। ইহা ব্যতীত আরও অনেক দীর্ঘিকাদি আছে। শেষোক্ত দীর্ঘিকা দুইটী তন্নাম্নী দাসীদ্বয় কর্ত্তৃক খনিত বলিয়া উক্তনামে অভিহিত। স্থানে স্থানে অনেকগুলি উচ্চ স্তূপ দেখা যায়, তাহার কোন কোনটী শিবালয়, চণ্ডীবাড়ী, অন্দর মহল ও বাগান বাড়ী—ইত্যাদি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অন্দরের প্রাঙ্গণটী কাচনির্ম্মিত। মৃত্তিকাপূরিত বলিয়া দেখিবার সুবিধা ঘটে নাই। ঠিক কোন্ স্থানে কি ছিল, নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। ইষ্টক গ্রথিত বহু রাস্তা ও ভগ্নভিত্তি প্রায় সকলস্থানেই দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনা যায়, পূর্ব্বে ঐ স্থান এরূপ বৃক্ষলতাদি বেষ্টিত ও ব্যাঘ্রসঙ্কুল ছিল যে, সেখানে প্রবেশ একরূপ অসম্ভব ছিল।

কদাচিৎ কোন সৌখীন শিকারী দুই একটী হস্তী ও বহু লোকজন এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গিয়া যে সকল ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আসিতেন, তাহাই সে সময়ে সকলে খুব উৎসাহভরে শুনিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইত, কিন্তু এক্ষণে তথায় 'বুনো'দিগের বসতি হওয়ায় জঙ্গল প্রায় পরিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে ও ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে।

এ অঞ্চলের সকলেই ঐ ভগ্নাবশেষকে বল্লাল সেনের রাজবাড়ী বলিয়া জানে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির শেষের দুইছত্রে "সূর্য্যাত্মজা সংগমং" "গংগায়াং বিরচর্য্য নির্জরপুরং" এই সূর্য্যাত্মা বোধ হয় যমুনা বা দাকোপাকে, আর গংগা বোধ হয় পদ্মা বা করতোয়াকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবে। আমাদের বর্ণিত রাজবাড়ী অঞ্চলে যে কালে দাকোপা ও পদ্মার সঙ্গম স্থান ছিল, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায়। আর এই রাজবাড়ী মুকুন্দের কিছুদুর দক্ষিণে এবং ভবানীপুরের পূর্ব্বাংশে করতোয়াতীরে নিঝুড়ি নামক একটী স্থান আছে। উহাকেই শ্লোকোক্ত শেষোক্ত

নির্জরপুর বলিয়া মনে হয়। এই স্থানের সহিত সেন রাজাদের সম্বন্ধ অনেক গ্রন্থেও দেখা যায়।

"আস্তে সেরপুরেঽস্থাপি সেনবংশ নিদর্শনং।
পুরাতন পুরীস্থান করতোয়া নদীতটে॥"

(লঘুভারত, কলীতিহাস ৩য় খণ্ড, গৌড়পর্ব্ব ১৩৫ পৃঃ।)

"রাজা বল্লাল সেন করতোয়া তটস্থ মহাপীঠ ক্ষেত্রের উত্তরাংশে বৃহৎ রাজপুরী সম্বলিত কমলাপুরী নামে একটী নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার দক্ষিণাংশের পূর্ব্বভাগে দুর্গ ও পশ্চিমাংশে অপর্ণা দেবীর গুল্‌কাপুরী মনোরম সৌধরাজিতে সুশোভিত করেন। বৌদ্ধাধিকার সময়ে ভারতের সকল তীর্থক্ষেত্রেরই বিশেষ অবনতি ঘটে; গৌড়পতি পাল রাজাদের সময়ে গুল্‌কাপুরী অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়। আর্য্যভূপতি বল্লাল সেন সনাতন ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইয়া গুল্‌কাপুরীর সংস্কার সাধন করেন। অপর্ণা দেবীর যথাযোগ্য সেবা নির্ব্বাহের জন্য ও পুরীর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য স্বপ্রতিষ্ঠিত কমলাপুরী নগরীতে একটী জ্ঞাতি পুত্রকে সামন্ত রাজারূপে স্থাপিত করিয়া,করতোয়া-তটবর্ত্তী রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করেন। পূর্ব্বদিকে করতোয়া, পশ্চিমে আত্রেয়ী নদী, ইহার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ কমলাপুরী অধিপতির রাজ্যভুক্ত ছিল। এই রাজ্য বল্লাল সেনের জ্ঞাতি বংশীয়দের দ্বারা দুই শত বৎসর শাসিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একশত বৎসর সেন বংশের অধীনে সামন্ত রাজ্যরূপে, আর একশত বৎসর মুসলমানদের অধীনে করদ রাজ্যরূপে ছিল। বল্লাল কর্ত্তৃক অভিষিক্ত ভূপতির কয়েক পুরুষ পরে অচ্যুত সেন রাজ্য আরম্ভ করেন।"

(ভবানীপুর কাহিনী। ১৬,১৭ পৃঃ)

The Dorgahs or shrines of Turkun Sayed are highly revered. He was a Ghazi slain in battle by the Hindu

King Ballal Sen. One shrine is called Sir Mukam, where his head fell and other Dhar Mukam, where his body now rests."

(Hunter's Statistical Account of Bogra District, Page 190 and Ancient Monuments in the Rajshahi division. Published by P. W. D. Bengal page 34. 35.)

বল্লাল সেন বাবা আদম বা বায়াতুম নামক লোকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উক্ত তুরকান সহীদই বোধ হয় বায়াতুম হইবেন; কারণ 'তুরকান' অর্থে তুরস্ক দেশীয়; ওটী উঁহার নাম নহে। আর সেরপুর ও ভবানীপুরের মধ্যস্থ নিঝুড়িই নির্জরপুর ও বল্লালের তিরোধান ভূমি।

৪। মিঞা বা গাজি মিঞা। ৫। হটিলা। ৬। বুড়া বা সাবুদ্দি। ৭। সামাদার।

"গাজি মিঞা মুসলমানদিগের উপাস্য দেবতা; ইনি পঞ্চপীরের মধ্যে একটী পীর। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা ইঁহাকে বিশেষ ভক্তি করে। কোথাও কোথাও ইঁহাকে গজনা দুল্‌হা ও সালার-চিহুলা বলে। অনেক স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসে ইঁহার উদ্দেশে নানাবিধ উৎসবাদি হইয়া থাকে। একটা লম্বা বাঁশের মাথায় কতকগুলি চামর বাঁধিয়া উৎসবকারীরা ইহা বহিয়া বেড়ায়, চামরগুলি গাজিয়া ছিন্ন মস্তক। কথিত আছে যে, বিবাহের দিবস ধর্ম্মের জন্য ইনি প্রাণত্যাগ করেন। সেই জন্য এই উৎসবকে "গাজি মিঞার সাদি" উৎসবও বলিয়া থাকে। অনেক নীচশ্রেণীর হিন্দুও এই উৎসবে যোগ দিয়া থাকে। গাজিমিঞা কোন্ সময়ের লোক, তাহা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যে, উনি গজনির মামুদের ভাগিনেয়; ৪৯৫ হিজিরায় আজমীরে ইঁহার জন্ম হয়। তিঃ ৪২৪ অব্দে ১৯ বৎসর বয়সে বরাইচ নগরে হিন্দুরাজ সাহর দেবের সহিত যুদ্ধে ইঁহার মৃত্যু হয়।"

ভারতবর্ষের নানা স্থানে অনেক পীর বা ফকিরের আস্তানা বা দরগা দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী পীরের মাহাত্ম্য সীমাবদ্ধ এবং যতদূর তাঁহার মহিমা জাহির হইয়াছে, ততদূর তিনি পূজিত। বাঙ্গালা বা চট্টগ্রামের পীর তত্তৎ স্থানেই বিশেষ সমাদরে পূজিত হন। কদাচ উত্তর-পশ্চিম বা বিহারবাসীরা তাহাতে যোগ দেয় না; কিন্তু পাঁচ পীরের কথা ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত আছে। কোন্ পাঁচজন পীর লইয়া এই পাঁচ পীরের নাম হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। সাধারণতঃ সকলে বরাইচ নগরের গাজি মিঞা, তদীয় ভাগিনেয় পীর হাথিলী বা হটিলা সাহেব, লক্ষ্ণৌবাসী পীর জহ্ন, জৌনপুরের পীর মহম্মদ ও অন্য একটী লইয়া পঞ্চ পীর কল্পনা করেন।

সেরপুরে গাজি মিঞার সাদি উৎসব।

জৈাষ্ঠের তৃতীয় বৃহস্পতিবারে মাদারগণকে থানে উঠান হয়, শুক্র-বারে মীরগঞ্জ নামক স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে রাত্রিবাসের পর, পরদিন কুপলাগাড়ী হইয়া কেল্লাকুশি মেলায় উপস্থিত করান হয়। এখানে রবিবার হইতে উৎসব হইয়া থাকে। মাদারগণের নিকট মুসল-মান ব্যতীত হিন্দুগণও "বদি" বা মালা বদল করিয়া থাকে এবং চেলাদের প্রাপ্য "চেরাগী" আদিও দিয়া থাকে।

জৈাষ্ঠের তৃতীয় রবিবারে কেল্লাকুসির মেলা আরম্ভ হয়। * এখানে পূর্ব্বে এক একটী বালিকার গাজিমিঞার সহিত বিবাহ হইত। দিল্লীর বাদসাহের পুত্র সের সা সেরপুর নগর এবং এই নগরের এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে কেল্লাকুসি মেলা স্থাপিত করেন। সের সার সময় হইতে জৈাষ্ঠ মাসের তৃতীয় রবিবারে পূর্ব্বাহ্ন বেলা চারি ঘটিকার সময় উৎসব আরম্ভ হইয়া কয়েক ঘণ্টা কাল থাকে। সন্তানের মাতাপিতা সাত দিন

* এই মেলায় এ অঞ্চলের সকলে বৎসরের সমস্ত মসলা আদি ক্রয় করিয়া রাখেন: মেলাটিতে প্রায় সাত হাজার লোকের সমান মহত্ব।

কাল দরগায় অবস্থান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত। কন্যাসন্তান হইলে গাজি মিঞার সহিত বিবাহ হইত এবং সে কন্যা পূত বলিয়া বিবেচিত হইত। এই উৎসবের নিমিত্ত সন্তান না পাওয়া গেলে, ফকিরগণ দরিদ্র মাতাপিতার নিকট বালিকা ক্রয় করিত; বংশদণ্ডের সহিত বালিকার বিবাহ হইলে তাহারা ঐ দরবেশের বধূ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং লোকে তাহাদিগকে বিবাহ করিলে পাপে নিমগ্ন হইবে বলিয়া তাহাদিগকে বিবাহ করিতে ভয় পাইত। শুনা যায়, এইরূপ বিবাহ হইলে বিবাহের কিছু পরেই হয় কন্যা নয় পুরুষ মারা যাইত। গাজি মিঞার সহিত বিবাহের পর কয়েকটী ক্ষেত্রে বালিকার স্বামী গ্রহণ করা দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ এই সকল হতভাগ্য বালিকাগণ ফকিরী লইয়া অথবা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মাতাপিতার অবিমৃষ্যকৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিত। নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমবেত হয় এবং বিভিন্ন বস্ত্রে সুশোভিত বিভিন্ন ব্যক্তি উদ্দিষ্ট বংশদণ্ড সমূহ বহন করিয়া এই উৎসব নির্ব্বাহ করে।

গাজি মিঞার বাঁশ—ইহা লাল সালু বস্ত্রের জামায় মণ্ডিত ও শ্বেতবর্ণ অল্প পরিসর কর্‌বা দ্বারা অনেকগুলি চামর দ্বারা স্থানে স্থানে জড়িত ও সুশোভিত।

তারপর হটিলার বাঁশ, ইহাও লাল জামা ও শ্বেত কর্‌বায় সুশোভিত।

তারপর বাঁচির বাঁশ। ইহা প্রথমোক্তের ন্যায়, তবে অপেক্ষাকৃত ছোট।

বুড়া, সাবুদ্ধি বা লেপা মাদার। ইহার জামা কাল এবং চামর দ্বারা একেবারে মণ্ডিত।

সা মাদার। ইহার জামা নীল রঙের। এই শেষোক্ত বংশদণ্ড দুইটার কোন বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। বোধ হয় ইহারা স্থানীয় পীর হইবেন।

সেরপুরে হিন্দু মুসলমানের পরস্পর প্রীতির পরিচয় দেখা যায়। সেরপুর হিন্দু প্রধান স্থান হইলেও মুসলমান মহাপুরুষদিগের আস্তানা বা থান ইহার সর্ব্বস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—তুরকান সহীদের দরগা, মিঞার থান, হটিলার থান, সাবুদ্দি মাদারের থান, এবং সা মাদারের থান। এই সকল ব্যতীত ছোট ছোট বহুসংখ্যক দরগা আছে; যেমন, লক্ষ্মীতলায় উত্তর চৌরাহার নিকট একটি, দক্ষিণপাড়ায় একটী, বেনেপাড়ায় একটী এইরূপ আরও অনেকস্থানে আছে। ইহার সকল গুলিই হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই সম্মান পাইয়া থাকেন। সেরপুরের সকল জমিদারই পুণ্যাহের সময় যেমন গোবিন্দ রায় প্রভৃতি হিন্দু দেবতাকে সন্দেশ বাতাসা ও প্রণামী আদি দিয়া ভক্তি করেন, সেইরূপ সেরপুরের প্রত্যেক জমিদারই এই তুরকান সহীদের দরগায় সিরনি দিয়া থাকেন। সেরপুরের হিন্দুগণ ছেলের অন্নপ্রাশনের চুল, সা মাদারের থানের নিকট দিয়া থাকেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে নিশানের পূর্ব্বে হিন্দুগণ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আজও হটিলা, মিঞা (গাজি মিঞা) প্রভৃতির নিকট "বদি" (মালাবদল) পরিয়া থাকেন ও সিরনি, ফলমূল এবং 'চেরাগী'—আদি দিয়া ভক্তি দেখাইয়া থাকেন। ফল কথা, নিশানের পর্ব্বকে হিন্দুরা যেন নিজ পর্ব্ব মনে করেন এবং যে মাঠে বা জঙ্গলে যেদিন নিশান লইয়া যাওয়া হয়, অধিকাংশ হিন্দুই বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, সেই সেই স্থানে গিয়া মহা উৎসাহ ভরে নিশান—নাচ ইত্যাদি অদ্যাপিও দেখিয়া থাকেন এবং মুঠা মুঠা সিরনি লইয়া হিন্দু স্ত্রী পুরুষে নিশানকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করেন। এমন কি ছোট ছোট দরগা গুলিও হিন্দুর ভক্তিতে বঞ্চিত হয়েন না। দীপান্বিত, বা অন্যান্য পর্ব্ব উপলক্ষে হিন্দুললনাগণ যেরূপ মল্লিকা সহিত দেবালয়ে দেবালয়ে দীপ দিয়া থাকেন, সেইরূপ এই দরগাগুলির সম্মুখেও মহা ভক্তিভরে সজ্জিত করিয়া রাখিয়া দেন। হিন্দুগণ ইমারতাদি প্রস্তুতের সময় যদি জানিতে পারেন যে,

এখানে অমুকের দরগা ছিল, তবে সসম্মানে সে স্থান ত্যাগ করিয়া, তবে ইমারতাদি দেন ও কেহ নিজ ব্যয়ে দরগা নির্ম্মাণ করাইয়াও দেন। আমি জানি আমারই একজন আত্মীয় লক্ষ্মীতলার দরগাটী নিজ ব্যয়ে সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কাহারও ব্যারাম হইলে বা ইপ্সিত কোন কার্য্যোদ্ধার কল্পে হটিলা, মিঞা প্রভৃতিকে চামর পোষাক ইত্যাদি মানসিক করিয়া থাকেন। আমি শুনিয়াছি, হটিলার অধিকাংশ চামরগুলি নাকি হিন্দু কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

আবার মুসলমানেরাও ভবানীপুর কৌশল্যা-তলা বুড়ীতলা প্রভৃতি স্থানের দেবীকে মানসিক করিয়া থাকেন এবং বুড়ীর পূজা, মাদল পূজা প্রভৃতি হিন্দুপর্ব্বও মুসলমানকে করিতে দেখা যায়। আবার দুর্গোৎ-সবের সময়ে নব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মুসলমানগণ প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়ান। ফল কথা হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীত চিরকালই ছিল; পূর্ব্বে ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই, কিন্তু ভেদনীতিপরায়ণ রাজপুরুষদের কল্যাণে আমাদিগকে অল্পদিন পূর্ব্বে সে দৃশ্য দেখিতে হইয়াছে। ইহাতে লাভ কাহার, আশা করি প্রতিবেশী মুসলমানগণ একটু বিবেচনা করিবেন।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু।

মহারাজ দলিপ সিংহের পরিণাম।

পঞ্চনদের স্বাধীন নরপতি অমিত-তেজা মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজ দলিপ সিংহের শোচনীয় পরিণামের বিষয় চিন্তা করিলে স্বতঃই মনে দুঃখ ও করুণার উদ্রেক হইয়া থাকে। একশত এক তোপের শ্রবণ-বিদারী গর্জ্জনে রণজিৎ রাজ্য প্রকম্পিত করিয়া ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের

৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে যাঁহার জন্মগ্রহণ বৃত্তান্ত দিগদিগন্তে বিঘোষিত হইয়াছিল, সেই সিংহশাবকতুল্য মহারাজ দলিপের শোচনায় পরিণামের-কাহিনী বড়ই হৃদয়গ্রাহী। এই জন্য আমরা এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশিত করিতে যত্নবান্ হইলাম।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের পর সদয় অভিভাবক লর্ড ড্যালহাউসী তাঁহার রক্ষণীয় বালক মহারাজ দলিপসিংহের রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ্চ তারিখে লাহোর রাজপ্রাসাদে শিখ-দরবারের শেষ অধিবেশন হইল। সেই দিবস ইংরাজমিত্র মহারাজ রণজিৎ সিংহের শিশু, অভিভাবক ইংরাজের রক্ষণীয় বালক, পৈতৃক সিংহাসনে শেষবার অধিরোহণ করিলেন। সেই ভয়াবহ দিবসে অভিভাবক লর্ড ড্যালহাউসী তাঁহার রক্ষণাধীন বালকের নিকট হইতে পঞ্জাব বাজেয়াপ্তের নিম্নলিখিত রূপ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। যথা :—

১ম প্রস্তাব।—মহারাজ দলিপসিংহ তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হইয়া পঞ্জাবে তাঁহার সমুদয় দাবি স্বত্বাধিকার এবং স্বাধীন ক্ষমতা পরিত্যাগ করিবেন।

২য় ধারা।—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট লাহোর দরবারের ঋণ পরিশোধ ও যুদ্ধের ব্যয় নিমিত্ত, দরবারের সম্পত্তি যেরূপ প্রকারের হউক না কেন এবং যে স্থানে পাওয়া যাইবে, সমুদয় মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইবে।

৩য় ধারা।—কোহিনুর হীরক লাহোররাজ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের রাণীকে প্রদত্ত হইবে। মহারাজ দলিপসিংহ নিজের, তাঁহার জ্ঞাতি ও অনুচরগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থ মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে বাৎসরিক অনধিক পঞ্চলক্ষ ও অন্যূন চারিলক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

৪র্থ ধারা।—মহারাজকে সম্মানের সহিত ব্যবহার করা যাইবে।

তাঁহার পদবী মহারাজ দলিপ সিংহ বাহাদুর থাকিবে এবং যদি তিনি ভবিষ্যতে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অনুগত থাকেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন উপরোক্ত বৃত্তির যে অংশ পাওয়া উচিত বিবেচিত হইবে তাহাই পাইবেন। তাঁহার নিমিত্ত গভর্ণর জেনারেল যে স্থল নির্ব্বাচিত করিবেন, সেই স্থানেই তাঁহাকে বাস করিতে হইবে।

এইরূপে দলিপসিংহ তাঁহার রাজ্য ও সমুদয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সামান্য বৃত্তির উপর জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি জনলেগিন্ নামক জনৈক ডাক্তারের শিক্ষাধীনে অর্পিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে মহারাজের বাসস্থান লাহোর রাজপ্রাসাদ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ফতেগড়ের একটী ক্ষুদ্র বাটীতে নির্দ্দিষ্ট হইল। এইস্থানে মহারাজ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার শিবদেবের সাহচর্য্যে ও লেগিনের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কিছুদিন শান্তিতে অতিবাহিত করিলেন। বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা এবং সদাসর্ব্বদা বিজাতীয়গণ কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকায় দলিপ এইখানেই স্বকীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন।

ইহার পর মহারাজ ইংলণ্ডে যাইতে সাতিশয় অভিলাষী হইয়া গভর্ণর জেনারেলের নিকট এ বিষয়ের এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। কিছুদিন পরে বিলাতের ভারত রাজসভা হইতে দলিপের বিলাত গমন সম্বন্ধে অনুমতি পত্র গভর্ণর জেনারেলের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে গভর্ণর জেনারেল দলিপকে সে বিষয়ে জ্ঞাত করাইলেন।

ক্রমশঃ

সুরেশচন্দ্র মজুমদার।

ঐতিহাসিক চিত্র।

মহারাজ দলিপ সিংহের পরিণাম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দলিপসিংহ ফতেগড় পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাইবার নিমিত্ত কলিকাতায় রওনা হইলেন। লেগিন, কুমার শিবদেবের মাতা রাণী দখ্‌লুর বিশেষ আপত্তি সত্বেও শিবদেবকে সঙ্গে লইলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে দলিপ কলিকাতায় পৌছিলেন এবং এপ্রেল মাসের উনবিংশ দিবসে তিনি ইংলণ্ডে যাইবার নিমিত্ত জাহাজে উঠিলেন। লেগিন মহারাজের সহযাত্রী হইলেন।

মহারাজ দলিপসিংহ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে রাণী দখ্‌লু বারাণসীধামে যাইয়া পুত্রবিচ্ছেদ হেতু মনের দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

জুন মাসে মহারাজ দলিপসিংহ নির্ব্বিঘ্নে ইংলণ্ডে যাইয়া পৌছিলেন। ভারতরাজসভা মহারাজের সম্মান নিমিত্ত তাঁহার ইংলণ্ডে অবস্থানের জন্য নিজব্যয়ে একখানি বাসস্থান সংগ্রহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার পতি সাদরে মহারাজকে অভ্যর্থনা করিলেন।

দলিপসিংহ ইংলণ্ডে জাতীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত থাকিতেন। কাশ্মীর-

বিনির্ম্মিত সুন্দর কারুকার্য্যের কুরতার উপর মখমলের এক বহুমূল্য সুবর্ণখচিত কোট, এবং পার্শ্বদেশ সুবর্ণকার্য্যে মণ্ডিত, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ছিল এবং জাতীয় উষ্ণীষোপরি রত্নখচিত শিরপেচ, কণ্ঠদেশে তিন-নলাবিশিষ্ট সুবৃহৎ মুক্তার এক মালা ও কর্ণযুগলে সুবৃহৎ পান্নার বারবৌল তাঁহার ভূষণ ছিল। যখন রাজসভায় আহূত হইতেন, তখন দলিপ সম্পূর্ণরূপে জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট দলিপকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। *

একদা দলিপ রাজপ্রাসাদে যখন অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া দলিপকে কোহিনুর হীরক দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি পূর্ব্বাপেক্ষা ইহা উত্তম হইয়াছে বিবেচনা করিতেছেন, আপনি কি ইহা স্বয়ং চিনিতে পারিতেছেন?" দলিপ সোৎসুকে ও সোৎ-কণ্ঠায় বহুকালের পর তাঁহার এই অমূল্যরত্ন দেখিয়া ইহা উত্তমরূপে দেখিবার নিমিত্ত গবাক্ষের নিকট আলোকে লইয়া গেলেন। কিছুকাল নিরীক্ষণ করিয়া দলিপ বলিলেন "পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত ও আয়তন ন্যূন হইয়াছে।" এবং মহারাণীকে অভিবাদন করতঃ নম্রভাবে তাঁহার করে উহা প্রত্যর্পণ করিলেন। দলিপের এই চিত্তসংযম অতিমাত্র প্রশংসনীয়।

মহারাজ দলিপসিংহ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে বিলাতস্থ ভারতীয় রাজসভার সভাপতিকে লিখিলেন "দশ বৎসর বয়ঃক্রমে অভি-ভাবক কর্ত্তৃক পঞ্চনদ রাজ্য ইংরাজকরে অর্পণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম এবং উক্ত অভিভাবক ও মন্ত্রীদিগের পরামর্শে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট-কৃত সন্ধিধারা উদার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি ভরসা করি যে ভবিষ্যতে যখন আমার সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করা

* Sir John Login and Maharaja Duleep Singh. Page 336.

হইবে, তখন যেন আমার অবস্থার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এবং আমার পূর্ব্বপদ ও বর্ত্তমান অবস্থার বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া যেন তদুপযোগী কোন ন্যায় বন্দোবস্ত করা হয়।" ইহার প্রত্যুত্তরে মহারাজ জ্ঞাত হইলেন যে, "ভারতীয় রাজসভা ভারতবর্ষ হইতে মহারাজের ও তাঁহার পরিবারগণের নিমিত্ত বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে সন্ধিধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি কিরূপভাবে বিভক্ত হইবে তাহা মহারাজকে জানাইয়া জ্ঞাত করাইবেন এবং সন্ধিধারানুসারে তাঁহার ইচ্ছামত বাসস্থান সম্বন্ধে যে প্রতিবন্ধক ছিল, তাহা হইতে তিনি মুক্ত হইলেন।" *

ভয়ঙ্কর সিপাহী-বিদ্রোহে ভারতরাজ্য বিপন্ন, এই কু-সমাচার ইংলণ্ডে পৌঁছিল। দলিপসিংহ সংবাদ পাইলেন যে, ফতেগড়স্থ তাঁহার বাসস্থান বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে অল্পকাল অবস্থান করিবেন বলিয়া মহারাজ তাঁহার যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী ফতেগড়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। নিষ্ঠুর সিপাহীগণ ইহার রক্ষকগণকে বিনষ্ট করিয়া সমুদয় সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে শুনিয়া, মহারাজ সাতিশয় দুঃখিত হইলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের উনবিংশ দিবসে মহারাজ দলিপ সিংহ লেগিনের শিক্ষাধীনতা হইতে মুক্ত হইলেন এবং তিনি ভারতীয় রাজসভা কর্ত্তৃক স্বীয় অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে আদিষ্ট হইলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ২০শে তারিখে লর্ড ষ্ট্যান্লি মহারাজকে জ্ঞাত করাইলেন যে, "ইংরাজ আইন অনুসারে তিনি সাবালক হইলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বৃত্তি বাৎসরিক ২৫০০০ পাউণ্ড বা সার্দ্ধ দুইলক্ষ টাকা হারে নির্দ্ধারিত করিবেন।" জুন মাসের ৩রা তারিখে মহারাজ ইহার প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই বৃত্তি কি তাঁহার জীবনকাল

* বরদাকান্ত মিত্র-প্রণীত শিখযুদ্ধের ইতিহাস।

পর্য্যন্ত, না উত্তরাধিকারী ও বংশাবলীক্রমে নির্দ্ধারিত হইল?" এতদ্‌-ব্যতীত ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির ধারানুসারে তাঁহার ও রণজিৎ পরিবারের ভরণপোষণের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তন্মধ্যে বৃত্তিধারিগণের মধ্যে কোন কোন লোকের মৃত্যু হওয়াতে যে মুদ্রা বাঁচিয়াছে, দলিপ তাহার এক তালিকা প্রার্থনা করিলেন। ২৪শে অক্টোবর তারিখে সার চার্ল্‌স্ উড মহারাজকে লিখিলেন "বাৎসরিক ২৫০০০ পাউণ্ড বৃত্তির মধ্যে ১৫০০০ পাউণ্ড তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে এবং বাকী ১০০০০ পাউণ্ড মধ্যে তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত বাৎসরিক অনধিক ৩০০০ পৌণ্ড রাখিয়া অবশিষ্ট ইংলণ্ডের আইন অনুসারে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারি-গণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু যদি মহারাজের কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে যে মুদ্রার সুদ হইতে এই বাৎসরিক ১০০০০ পাউণ্ড মহারাজকে দেওয়া হইবে, তৎসমুদয় গবর্ণ-মেণ্টের হইবে, এরূপ ঘটনায় মহারাজ তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত যে বন্দোবস্ত করিবেন তাহা এই মুদ্রা হইতে দেওয়া যাইবে।" *

এদিকে দলিপসিংহ অর্থের অনটনে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া একদা ভারতরাজসভায় সার চার্ল্‌স্ উডের সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহাকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। সার চার্ল্‌স্ উড এই সময় মহারাজের নিকট হইতে তাঁহার সমুদয় দাবীর পূরণার্থ নিম্নলিখিতরূপ এক স্বাক্ষরিত পত্র গ্রহণ করিলেন। যথা—

"মহারাজ জীবদ্দশা পর্য্যন্ত বাৎসরিক ২৫০০০ পাউণ্ড এবং এতদ্ব্যতীত স্বকীয় ব্যয় ও তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের নিমিত্ত ২০০০,০০০ পাউণ্ড প্রার্থনা করিতেছেন; উত্তরাধিকারী অভাবে এই মুদ্রা ভারতবর্ষে সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিতে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে।

* The official despatch 24th October 1856.

ইহাতে তাঁহার সমুদয় দাবী পরিশোধ হইবে।" ১৩শে জানুয়ারী ১৮৬০।

(স্বাক্ষর)—দলিপ সিংহ। *

ইহার প্রায় এক বৎসর পরে মহারাজকে কতকগুলি কার্য্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিতে হইল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মহারাজ দলিপসিংহ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি স্পেন্সেস্ হোটেলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ; এই স্থানেই কুমার শিবদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহারাজের আবেদনে তদীয় জননী ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতে আদিষ্টা হইলেন। কলিকাতায় আসিয়া মহারাণী দীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখ দেখিয়া বলিলেন, আর কখন তিনি পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। অতুল সৌন্দর্য্যশালিনী ঝিন্দনের সে পূর্ব্বসৌন্দর্য্য তিরোহিত হইয়াছে। এখন তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে।

যৎকালে মহারাজ দলিপ কলিকাতায় স্পেন্সেস্ হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় বহুসংখ্যক শিখসৈন্য চীন হইতে কলিকাতায় আইসে। দলিপ তথায় আছেন শুনিয়া তাহারা হোটেলের চারিদিক বেষ্টন করতঃ আনন্দ কোলাহল করিতে লাগিল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং দলিপের প্রতি শিখজাতির এইরূপ প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি অনতিবিলম্বে দলিপকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। দলিপ সাহ্লাদে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কেননা ভারতবর্ষ তখন তাঁহার নিকট ভাল লাগিতেছিল না। মহারাণী সন্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্লেশ সহ্য করিতে না পারায় তিনিও দলিপের সহিত ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। অনতিবিলম্বে দলিপ জননী-সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া জুলাই মাসে শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইলেন।

* বরদাকান্ত মিত্র-প্রণীত শিখযুদ্ধের ইতিহাস।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টমাসে, মহারাজ রণজিৎ সিংহের মহিষী মহারাণী ঝিন্দন ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরীতে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। দলিপ তাঁহার জননীর মৃত্যুতে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। যে অবধি মহারাণীর মৃতদেহ সৎকার নিমিত্ত ভারতবর্ষে আনীত না হয়, তদবধি উহা বোরাশালের সমাধিস্থলে রক্ষিত হইল। এই দুর্ঘটনার দুইমাস পরেই অক্টোবর মাসের ১৮ই তারিখে জন্ লেগিন প্রাণত্যাগ করিলেন। এই শোচনীয় ঘটনায় দলিপ যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তাঁহার জননীর মৃতদেহ লইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। নর্ম্মদাপুলিনে জননীর দেহ ভস্মীভূত করিয়া তাহার পবিত্র সলিলে মহারাণীর ভস্মাবশেষ বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে জননীর সৎকার করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার সময় দলিপ মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণ করিয়া বোম্বামুলার নাম্নী এক মার্কিণ রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। নবদম্পতি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া পরমসুখে নিভৃতে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুযায়ী মহারাজ সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্তই করিলেন না।

দলিপ অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া সহৃদয় ইংলণ্ডবাসীর নিকট সুবিচার প্রত্যাশায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ৩১শে তারিখে সুবিখ্যাত টাইমস্ পত্রে আপনার অধিকার ও দাবী সম্বন্ধে হৃদয়ের এইরূপ বিষম আবেগপূর্ণ এক খানি পত্র প্রকাশিত করিলেন ; যথা—

"ভইরওয়াল সন্ধির ধারা অনুসারে তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়সাবধি, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রক্ষা ও তাঁহার রাজ্য শাসনের ভার লইয়াছিলেন। মূলরাজ বিদ্রোহী হইল। এই বিদ্রোহদমনে তাঁহার অভি-

ভাবক বিলম্ব করায় পঞ্চনদে এই বিদ্রোহ পরিব্যাপ্ত হইল। এই বিলম্বের পর যখন বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশসৈন্য প্রেরিত হইল, তখন লর্ড ড্যালহাউসি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যাহারা এই বিদ্রোহে লিপ্ত নহে, তাহাদিগকে কোনরূপ শাস্তিভোগ করিতে হইবে না; কিন্তু এরূপ ঘোষণার পরও লর্ড ড্যালহাউসি শান্তি সংস্থাপন করিয়া এক অসহায় শিশুকে পাইয়া লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। পবিত্র ভইরওয়াল সন্ধির ধারানুসারে কার্য্য করিবার পরিবর্ত্তে তিনি পঞ্চনদ বাজেয়াপ্ত এবং আমার স্বকীয় অস্থাবর জহরৎ, সুবর্ণ ও কাঞ্চন তৈজসপত্র, এমন কি আমার পরিধেয় পরিচ্ছদেরও কতকাংশ এবং আমার প্রাসাদের আসবাব সমুদয় বিক্রয় করিলেন। এই সমুদয় বিক্রয় করিয়া ২৫০,০০০ পাউণ্ড উঠিল; যে বাহিনী আমার বিরুদ্ধে উত্থিত বিদ্রোহ দমন করিতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যেই এই বিপুল অর্থ বিতরণ করা হইল। আমি দির্দোষ—আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলি কখনও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হয় নাই। এদিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, অপরাধিগণের সহিত নির্দ্দোষিগণও শাস্তিভোগ করিবে, ইহা তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু যে প্রজাগণ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা উড়াইয়াছিল, তাহাদের সহিত আমাকেও শাস্তিভোগ করিতে হইল।

"আমি অতি অন্যায়রূপে আমার রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। উক্ত রাজ্যের আয় লর্ড ড্যালহাউসির মতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রায় পঞ্চাশলক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নিঃসন্দেহ, এক্ষণে উক্ত রাজ্যের আয় অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। আমার নাবালকত্বকালে অভিভাবক কর্ত্তৃক আমার রাজ্যচ্যুতির সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম বলিয়া আমি উক্ত সন্ধিপত্র আইন বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি; তন্নিমিত্ত আমি এখন পঞ্চনদের রাজা। সে যাহা হউক

সে কথার আর প্রয়োজন নাই। আমি আমার দয়াল অধিশ্বরীর প্রজা হইয়া থাকিতে সন্তুষ্ট আছি। কিরূপে এ অধীনতা স্বীকার করিতে হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমার প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরীর অনুকম্পা অসীম। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি-ধারানুযায়ী আমার স্বকীয় ভূসম্পত্তি সমুদয় বাজেয়াপ্ত হয় নাই, তথাপি আমি অতি অন্যায়রূপে এই রাজস্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। এই রাজস্ব ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের পর প্রায় বাৎসরিক ১৩০,০০০ পাউণ্ড হইয়াছে। আমার অস্থাবর সম্পত্তি সমুদায়ও আমার নিকট হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছিল—ইহার মধ্যে সার জন্ লেগিন বলেন, যে কেবল মাত্র ২০,০০০ পৌণ্ড মূল্যের সম্পত্তি, ফতেগড়ে আমার নির্ব্বাসন কালে আমায় লইয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। আর বক্রী সমুদায় ২৫০০০০০ পৌণ্ড মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছিল।

"আমার উপর ইহা আরও অন্যায় হইয়াছে যে, আমার অধিকাংশ বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের স্বকীয় ও অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ ও আমার প্রদত্ত জায়গীর হইতে রাজস্ব আদায় করিতে আদেশ দিয়াছেন; কিন্তু আমি তাঁহাদের প্রভু হইয়া এবং ইংরাজের বিরুদ্ধে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্তও উত্তোলন না করিয়া তাহাদের সহিত ও সমতুল্যরূপে ব্যবহৃত হইলাম না। ইহার কারণ, আমি অনুমান করি, খৃষ্টানরাজের রক্ষণাধীন নাবালক হওয়াই আমার পাপ হইয়াছে। আমার দয়ার-সাগর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র যাবজ্জীবন আমাকে ২৫০০০ পাউণ্ড :বৃত্তি দিয়াই সন্তুষ্ট আছেন এবং এই বৃত্তি প্রয়োজনীয় খরচাদি বাদে ১৩০০০ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বদান্যতার পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ইংরাজ আমার মৃত্যুর পর, আমার জমিদারী বিক্রয় করিবেন, এই দারুণপণে ভবিষ্যতে আরও ২০০০ পাউণ্ড বৃত্তি দিবেন বলিয়াছেন; এইরূপে আমার প্রিয় আবাসবাটীর উৎসন্নে আমার বংশ-

ধরগণকে অন্যত্র আশ্রয়ান্বেষণে বাধ্য করিয়াছেন। যদি জগতের দুইটী জনপূর্ণ নগরে একজনও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, এই সভ্য স্বাধীন খৃষ্টানস্থান হইতে অন্ততঃ যেন একজন সহায় ইংরাজ, পার্লিয়ামেণ্টে আমার পক্ষ সমর্থন করিতে অগ্রসর হয়েন; নতুবা আমার সুবিচার পাইবার আশা কোথায়? আমি দেখিতেছি যে, আমার সর্ব্বস্বাপহারক, অভিভাবক, বিচারপতি, উকীল এবং জুরি, একমাত্র ব্রিটিশজাতিতে সংগঠিত। হে খৃষ্টান ইংরাজ, তোমাদের জাতির সম্মানের জন্য আমার প্রতি ন্যায় ও বদান্যতা প্রদর্শন কর; কারণ, গ্রহণ অপেক্ষা দান করা অতি পবিত্র ও পুণ্যের কার্য্য।*

হতাশ হৃদয়ের এইরূপ বিষম আবেগ পূর্ণ কাতরোক্তিতে সভ্য ইংরাজের মন বিচলিত হইল না। এইরূপে দলিপ সিংহ নিতান্ত হতাশ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত ইংলণ্ড পরিত্যাগ করতঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; এবং এ সম্বন্ধে বিবি লেগিনের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। বিবি লেগিন তাঁহাকে ভারতবর্ষে যাইতে নিষেধ করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে বলিলেন।

মহারাজ তাঁহার সম্বন্ধে কোনও সুবন্দোবস্তের আশায় আরও প্রায় তিন বৎসরকাল ইংলণ্ডে অপেক্ষা করিলেন; কিন্তু সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এসময়ের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্তই করিলেন না। দলিপ নিতান্ত অসহ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে তাঁহার এলভেড জমিদারী সমর্পণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে উদ্যোগী হইলেন। ভারতরাজসভার সভ্যগণ দলিপের এইরূপ অপ্রত্যাশিত আচরণ দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং সার ওয়েল্ বর্ণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ওয়েল বর্ণ আসিয়া মহারাজকে বলিলেন যে,

* "The Times," 31st. August 1882.

তিনি যদি ইংলণ্ডে থাকেন তাহা হইলে, তাঁহার দাবীর নিমিত্ত ৫০,০০০ পাউণ্ড পাইবেন। মহারাজ ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া শ্বেতদ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন। অশেষ অনুনয়ের পর তিনি ভারতে আগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে পঞ্চনদে যাইতে দিতে গবর্ণমেণ্ট কোন মতেই সম্মত হইলেন না। দলিপ সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে নিম্নলিখিত রূপ এক পত্র লিখিলেন।

বিলাত, ২৫শে মার্চ্চ ১৮৮৬।

"আমার প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ—

কোনকালে ভারতে প্রত্যাগমন বা তথায় বাসকরা আমার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু অদৃষ্ট নিবন্ধন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতে সামান্য অবস্থায় কালাতিপাত করিবার জন্য আমাকে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহা সর্ব্বোত্তম তাহাই ঘটিবে। হে খালসাজী স্বকীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আমি আপনাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ কালে আমি অতি বালক ছিলাম। বোম্বাই পঁহুছিয়াই চাহল গ্রহণ করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা। এই পবিত্র ঘটনাকালীন আপনারা সত্যগুরুর আরাধনা করিবেন, ইহাই আমার অভিলাষ। * * * কেবলমাত্র এই পত্র লিখিয়াই ইহা আপনাদিগকে জানাইতে বাধ্য হইলাম; কেননা আপনাদিগের সহিত সাক্ষাতে আমি আদিষ্ট হই নাই। ওয়াঃ গুরুজীকি ফতে?

প্রিয় স্বদেশীয়গণ, আপনাদের একই
রক্তমাংসে গঠিত
দলিপ সিংহ।"

পঞ্জাবে মহারাজের পত্র সানন্দে পঠিত হইল। ইহার প্রত্যুত্তর দানে কালবিলম্ব হইল না। একজন পাঞ্জাবী লিখিলেন,—"প্রিয়তম মহারাজ, যদিও আমি আপনার স্বদেশীয়গণের মধ্যে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি, তথাপি আমি আপনাকে প্রাণের সহিত অভ্যর্থনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনার ইংলণ্ড পরিত্যাগ ও স্বকীয় ধর্ম্ম পরিগ্রহে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত হইয়া এরূপ আনন্দিত হইয়াছি যে, আমার আন্তরিক ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা একরূপ অসম্ভব। * *

প্রিয় মহারাজ, আপনার সুবিশ্বস্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

এবং স্বদেশীয়

এক বিনত পাঞ্জাবী।"

পঞ্জাববাসিগণের প্রতি মহারাজের পত্র এবং তাহাতে শিখদিগের মনোভাব দর্শনে ইংরাজ শঙ্কিত হইলেন এবং তাঁহারা দলিপকে ভারতবর্ষে আসিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। দলিপ শিখ-দিগকে উত্তেজিত করিতেছেন, এই অনুমান করিয়া তিনি এডেনে পৌঁছিবামাত্র ইংরাজ তাঁহাকে বন্দী করিলেন। এইরূপ ব্যবহারে দলিপ অতিশয় বিরক্ত হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরার নিকট তারযোগে ইহার এক প্রকাশ্য বিচারের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ইহাতেও হতাশ হইয়া ক্রোধান্ধ দলিপ প্রচার করিলেন যে "১১ বৎসর বয়সে তাঁহার অভিভাবক বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট পঞ্জাব বাজেয়াপ্তের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লওয়ায় তিনি উক্ত সন্ধি অগ্রাহ্য করিতেছেন।* এই অবিমৃষ্যকারিতার ফল দলিপকে অচিরাৎ ভোগ করিতে হইল। অনতিবিলম্বে তিনি বন্দীরূপে ইংলণ্ডে আনীত হইলেন।

এইরূপ অবস্থায় অধিক দিন ইংলণ্ডে থাকা দলিপের অসহ্য হইয়া

* বরদাকান্ত মিত্র-প্রণীত মহারাজ দলিপ সিংহ।

উঠিল; কিন্তু তাঁহার গতিবিধির উপর সতত দৃষ্টি থাকায় তিনি ইচ্ছামত কোথায়ও যাইতে পারিতেন না। ক্রোধে ও ক্ষোভে তিনি গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি আর গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে কিছুদিন কষ্টে অতিবাহিত করিয়া তিনি কোনক্রমে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে যাইতে সক্ষম হয়েন।

উপর্য্যুপরি তীব্র নিরাশার দংশনে দলিপের যে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া মহারাজ তথাকার শাসনকর্ত্তাকে সৈন্য সাহায্যে তাঁহাকে পঁদিচারীতে পৌঁছাইয়া দিতে লিখিলেন। সুবিজ্ঞ ফরাসী শাসনকর্ত্তা এই কাণ্ডজ্ঞান হীন ব্যক্তির পত্রের কোন উত্তর দিলেন না, তখন দলিপ নিতান্ত হতাশ হইয়া একমাত্র অনুচর অরোণাসিংহের সহিত ছদ্মবেশে ফ্রান্স পরিত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে তিনি কোনক্রমে রুষিয়ার অন্তর্গত মস্কৌ নগরে উপস্থিত হয়েন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মস্কোর শাসনকর্ত্তা প্রকাশ্যে দলিপের অভ্যর্থনা করিলেন। ইহার পর রুষসম্রাট্ আলেক্জান্দারের নিকট দলিপের এক আবেদনপত্র প্রেরিত হইল। দলিপ এই সময় আপনাকে ইংলণ্ডের শত্রু বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে দলিপ এক অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি সংবাদ পাইলেন যে, ১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার তাঁহার মহিষী ইংলণ্ডে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

নানা কারণে অস্থিরমতি দলিপ স্ত্রীর মৃত্যুতে আরও অস্থির হইলেন। "এইরূপ চিত্তবিকারের সময় অক্টোবর মাসের প্রথমে দলিপ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর ঘোষণাপত্র প্রেরণ করিলেন। দলিপ স্থিরচিত্তে থাকিলে বোধ হয় এরূপ গর্হিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার ঘোষণার সংক্ষিপ্ত

মর্ম্ম এই যে, একাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার অভিভাবক বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট পঞ্জাব বাজেয়াপ্তের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর লইয়াছিলেন বলিয়া তিনি উক্ত সন্ধি অগ্রাহ্য করিতেছেন। সে নিমিত্ত তিনি স্বাধীন নরপতির ন্যায় তাঁহার অভিভাবকের নিকট হইতে তাঁহার রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়া লইবার জন্য রুষিয়ার সাহায্যে শীঘ্রই সসৈন্যে ভারতবর্ষে আসিতেছেন।"*

এদিকে রুষিয়ার সম্রাট্ দলিপের আবেদনপত্র পাইয়াও তাঁহার সহিত বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না। এইরূপে হতাশ হইয়া দলিপ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এইস্থানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া তিনি এক সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়েন। তৎশ্রবণে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভিক্টর দলিপ পিতার নিকট আগমন করেন। এই সময়ে মহারাজ ইংলণ্ডেশ্বরীর বিরুদ্ধে যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার অতি গ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি তথা হইতে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীকে এক পত্র লিখেন। আগষ্ট মাসের ১লা তারিখ ভারতসচিব মিঃ ক্রস মহারাজকে জানাইলেন যে, "আপনার পত্রের বিষয় বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী আপনাকে ক্ষমা করিলেন।" দলিপ এই ক্ষমাপত্র পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তিনি স্বয়ং ইহার প্রাপ্তিস্বীকারে অক্ষম হইয়া তাঁহার পুত্রকে ইহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে অক্টোবর মাসের ৩রা তারিখ ভিক্টর দলিপ ইহার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া ভারত-সচিবকে পত্র লিখিলেন।

আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে মহারাজ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া মহারাণীর অসীম দয়ার উপর নির্ভর করিলেন। মহারাণী যে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, এ সমাচার আমরা গৌরবের সহিত ঘোষণা করিতেছি এইরূপ ক্ষমাশীলতাই প্রকৃত সদ্গুণ ও মহত্ত্বের পরিচায়ক।

* বরদাকান্ত মিত্র-প্রণীত "মহারাজা দলিপ সিংহ"।

"এডেনে আসিয়া দলিপ পাহল গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাণীর ক্ষমার পর হতভাগ্য দলিপের জীবনে আর কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই; কেবল মধ্যে একটি ফরাসী রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন। শেষ ঘটনা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর পারিনগরীর একটি হোটেলে সন্ন্যাসরোগে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। তিনি যে অযথারূপে পঞ্চনদরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, ইহা তিনি কখনই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ২৯শে তারিখে মহারাজের মৃতদেহ এল্‌ভেডন প্রাসাদে সমাহিত হইল। সমাধিকালে ইংলণ্ডেশ্বরী ও যুবরাজ, প্রতিনিধি ও সমাধিমাল্য পাঠাইয়াছিলেন।"

এইরূপে পঞ্চনদকেশরী অপ্রমেয়তেজা মহারাজ রণজিৎসিংহের সিংহাসনের অধিকারী মহারাজ দলিপের দুঃখময় জীবনের অবসান হয়। যিনি একদা অমিতপরাক্রম স্বাধীন মহারাজ রণজিৎসিংহের সুবর্ণসিংহাসন আলোকিত করিতেন, সেই পঞ্চনদ-গর্ব্ব শিখ নরপতি মহারাজ দলিপসিংহ অদৃষ্টচক্রের ঘোরতর আবর্ত্তনে পড়িয়া অতি হীনাবস্থায় জীবনযাপন করতঃ অবশেষে এইরূপে প্রাণত্যাগ করিলেন। অতীত সাক্ষী ইতিহাস যতদিন তাঁহার স্মৃতি বহন করিবে, ততদিনঃপর্য্যন্ত ভারতবাসী তাঁহার এই শোচনীয় পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া নিরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকিবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।

বর্দ্ধমান রাজবংশ।

খাস বাঙ্গলার জমিদারশ্রেণীর মধ্যে ধন ও ভূমিসম্পত্তিতে বর্দ্ধমান রাজবংশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। খ্রীষ্টীয় যোড়শশতাব্দীর শেষ ভাগে সঙ্গম রায় নামক একজন পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয় সপরিবারে জগন্নাথ

দর্শনোদ্দেশে ৺শ্রীক্ষেত্রধামে গমন করেন। সঙ্গম রায় জাতিতে ক্ষত্রিয় হইলেও ব্যবসায়ে বণিক্ ছিলেন। ৺শ্রীক্ষেত্রধাম হইতে ফিরিবার পথে তিনি বৰ্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী রাইপুর গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। রাইপুর তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্থানের সুবিধা দেখিয়া সঙ্গম রায় এখানে থাকিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে লাগিলেন,—ক্রমে ব্যবসায়ে তাঁহার বিলক্ষণ উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি রাইপুরেই স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

সঙ্গম রায়ের পর তাঁহার পুত্র বঙ্কুরায়ও পিতার ন্যায় রাইপুরে থাকিয়াই ব্যবসা করিতে লাগিলেন। তিনিও ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিয়া প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠেন।

বঙ্কুরায়ের পুত্র আবু রায় রাইপুর হইতে বাসস্থান উঠাইয়া লইয়া বৰ্দ্ধমানে বাস করিতে থাকেন। আবু রায় একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। এই সময় দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট্ সাজাহানের এক দল সৈন্য কোন বিদ্রোহদমন জন্য এদেশে আইসে। পূর্ব্বে বিশেষরূপ বন্দোবস্ত না থাকায় রসদ ও যানাভাবে সৈন্যদল বড়ই কষ্টে পতিত হইয়াছিল। রাজভক্ত, ধনী ব্যবসায়ী আবু রায় প্রভূত খাদ্য ও যান সংগ্রহ করিয়া দিয়া বিপন্ন সৈন্যদলের প্রাণরক্ষা করেন। প্রত্যুপকারস্বরূপ ঐ সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ আবুরায়কে বৰ্দ্ধমান ফৌজদারের অধীনে রেকাবি বাজার, ইব্রাহিমপুর ও মোগলটুলী নামক স্থানত্রয়ের কোতয়াল ও চৌধুরী পদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন,—ইহা ১৬৫৭ খৃঃ অব্দের কথা।

প্রাপ্তবয়সে আবুরায় মানবলীলা সংবরণ করিলে তৎপুত্র বাবুরায় পৈতৃক পদ ও সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। বাবু সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। তিনিও বৰ্দ্ধমান পরগণার অন্তর্গত আরও কয়েকটি সম্পত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাবুরায়ের পুত্রের নাম ঘনশ্যাম রায়,—ঘনশ্যাম নিজ পৈতৃক সম্পত্তির

বিশেষ কোন উন্নতিসাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার খনিত "শ্যাম সায়র"নামক সুবিশাল সরোবর বিদ্যমান থাকিয়া আজিও তাঁহার অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে।

ঘনশ্যামের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায় সেই প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তাহার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেব তখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। কৃষ্ণরাম তাঁহার নিতান্ত অনুগত ও বাধ্য ছিলেন,—তাই সম্রাট্ তাঁহাকে মহারাজা উপাধি-সহ চাক্‌লে বর্দ্ধমানের জমিদারীর সনন্দ প্রদান করিয়া তাঁহার গুণের পুরস্কার করেন। প্রকৃতপক্ষে সুবিশাল বর্দ্ধমানরাজ্যের ইহাই সূত্রপাত।

দিল্লীর সম্রাট্ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিনন্দিত হইয়া কৃষ্ণরাম চতুর্দ্দিকে আপন রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অত্যাচার, প্রভূত ঐশ্বর্য্য চতুঃপার্শ্বের জমিদারবর্গের অসহ্য হইয়া উঠিল। এই সময়ে চেতুয়া বরদার জমীদার শোভাসিংহ, বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহ এবং চন্দ্রকণার রঘুনাথসিংহ বিদ্রোহী হইয়া প্রবলপ্রতাপে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া দেশজয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণরাম মোগলসম্রাটের অধীন ও অনুগত ছিলেন, তাই তিনি সম্রাটের পক্ষ হইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন; শোভাসিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু দুর্ব্বল শোভাসিংহ প্রবল কৃষ্ণরামের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারায় তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে উড়িষ্যার পাঠান দলপতি রহিম খাঁর শরণাপন্ন হইলেন। পাঠানেরা চিরদিনই মোগলের শত্রু, সুতরাং রহিম খাঁ এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। হৃদয়ে মোগলরাজ্য ধ্বংস বাসনা গুপ্ত রাখিয়া তিনি শোভাসিংহের সাহায্যার্থে সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। সম্মিলিত সৈন্য ভীমবিক্রমে বর্দ্ধমান আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে কৃষ্ণরামকে নিহত করতঃ রাজপ্রাসাদ অধিকার করিয়া সমস্ত ধনরত্ন হস্তগত করিলেন। রাজকুমার জগতরায় রাজপ্রাসাদ হইতে

পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করেন, কিন্তু রাজকুমারী শোভাসিংহের হস্তে ধৃত হয়েন। রাজকুমারী অলোকসামান্য রূপবতী ছিলেন,—তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া পাপাচারী শোভাসিংহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে বীরবালা তদীয় অঙ্গ-বস্ত্র-মধ্য হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া শোভা-সিংহের উদরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহার পাপময় জীবনের অবসান করাইয়া দিলেন, এবং সেই ছুরিকাঘাতে নিজেও প্রাণত্যাগ করিলেন।

এদিকে রাজকুমার জগতরায় ঢাকার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ এই ঘটনা সামান্য মনে করিয়া যশোহরের ফৌজদার নূরউল্যা খাঁর উপর এক পরোয়াণা জারি করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু নূরউল্যা খাঁ এই বিদ্রোহীদিগের কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ স্বয়ং আসিয়া এই বিদ্রোহীদিগকে দূর করিয়া দিলেন। বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইলে জগতরাম পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজা জগতরাম ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে ৫০ মহাল জমিদারী ও মহারাজ উপাধিসহ এক ফরমান লাভ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সম্মান ও সম্পত্তি তিনি অধিক দিন ভোগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৭০২ খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতৃখনিত 'কৃষ্ণসায়র' নামক বিশাল সরোবরে স্নান করিবার সময় জনৈক বিশ্বাসঘাতক গুপ্ত হত্যাকারীর ছুরিকাঘাতে অকালে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

মহারাজ জগতরায়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ কীর্ত্তিচন্দ্র ও কনিষ্ঠ মিত্রসেন। পিতার মৃত্যুর পর কীর্ত্তিচন্দ্র পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির ও পদের উত্তরাধিকারী হইলেন। ইনিও ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হইতে পৈতৃক পদ ও সম্পত্তির ফরমান লাভ করেন। কীর্ত্তিচন্দ্রের অদ্ভুত সাহস ও বিপুল কার্য্যকুশলতা ছিল। রাজ-সনন্দ লাভ করিয়াই তিনি পিতা-

মহহন্তা ও বংশের শত্রু পাপাচারী শোভাসিংহের ভ্রাতা হিম্মৎসিংহকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহার জমিদারী চেতুয়া, বরোদা কাড়িয়া লইলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহও চন্দ্রকণার জমিদার রঘুনাথসিংহ, শোভাসিংহের সহিত মিলিত হইয়া বর্দ্ধমান আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র রঘুনাথ ও গোপাল উভয়কে পরাজয় করিয়া রঘুনাথের রাজ্য ও গোপালের তরবারী কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তারকেশ্বরের সন্নিহিত বেলঘরিয়া ও ভুরশুট প্রভৃতির জমিদারদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের ভূমি সম্পত্তিও কীর্ত্তিচন্দ্র স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। বর্দ্ধমানের সন্নিকটস্থ যে কাঞ্চননগর লৌহনির্ম্মিত ছুরীর জন্য দেশ-বিদেশ বিখ্যাত, কথিত আছে, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রই উহার স্থাপয়িতা। তাঁহার হস্তস্থিত 'কীর্ত্তিচন্দ্রকা তেগা' নামক প্রসিদ্ধ তরবারী আজিও বর্দ্ধমান রাজধনাগারে দেখিতে পাওয়া যায়।

কীর্ত্তিমান কীর্ত্তিচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তাঁহার একমাত্র পুত্র চিত্রসেন রায় বর্দ্ধমান রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। চিত্রসেনও অক্ষম নৃপতি ছিলেন না। তিনি স্বীয় বাহুবলে আশা, মঙ্গলঘাট ও ব্রাহ্মণভূমি প্রভৃতি কতকগুলি জমিদারী নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া বর্দ্ধমান রাজ্য অনেকটা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

মহারাজ চিত্রসেনের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না, তাই ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার খুল্লতাত মিত্রসেনের পুত্র তিলকচন্দ্র বর্দ্ধমান রাজ্যাদি লাভ করেন। তিলকচন্দ্র যখন রাজ্যাদি লাভ করেন, তখন তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন—তাঁহার মাতাই অভিভাবিকাস্বরূপ রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। এই সময় বাঙ্গলায় প্রসিদ্ধ 'বর্গীর হাঙ্গামা' উপস্থিত হয়। বর্গীগণ দেশের পর দেশ—নগরের পর নগর লুণ্ঠন করিয়া ও জ্বালাইয়া দিয়া ক্রমে বর্দ্ধমানাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ মহারাজ তিলকচন্দ্রের জননী মূলাযোড়ের পূর্ব্বদক্ষিণ 'কাউ-

গাছি' নামক গ্রামে পুত্রসহ বাস করিতে লাগিলেন। মূলাযোড় তখন বাণীবর পুত্র নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের সভাসদ্ কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের ইজারাভুক্ত ছিল। মহারাজ তিলকচন্দ্রের সঙ্গীয় হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি গ্রামে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করিতেছে দেখিয়া ব্রহ্মস্ব-হরণ-ভয়-ভীতা মহারাজ জননী মূলাযোড় গ্রাম পত্তনিলওয়া স্থির করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পত্র লিখিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ জননীর প্রার্থনামত তাঁহার কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে মূলাযোড় পত্তনি লিখিয়া দিলেন। বৰ্দ্ধমান রাজকর্ম্মচারী রামদেব নাগ পত্তনি গ্রহণ করিয়া সকল লোকের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করায় ভারতচন্দ্র ক্রোধবশতঃ বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় ৮টী শ্লোকে রামদেব নাগের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিয়া পত্রযোগে কৃষ্ণচন্দ্র সমীপে প্রেরণ করেন। এই নাগের অত্যাচার-কাহিনীই সাহিত্য-জগতে 'নাগাষ্টক' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

বর্গীর হাঙ্গামার অবসান হইলে জননীসহ মহারাজ তিলকচন্দ্র নিজ-রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তিলকচন্দ্র অতিশয় সাহসী, স্বাধীনচেতা ও রাজভক্ত ছিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার রাজলক্ষ্মী লইয়া যখন নবাব সিরাজদ্দৌলা ও ইংরাজের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন মহারাজ তিলকচন্দ্র ইংরাজদিগকে অর্থ দিয়া প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছিলেন, তাই ১৭৬০ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী মহারাজ তিলকচন্দ্র ও তদীয় দেওয়ান এবং অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে ১৭৫২৫৲ টাকা মূল্যের খেলাত দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্বার্থপর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী মহারাজকৃত উপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সহিত শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে সঙ্গতগোলা ও সেনপাহাড়ি প্রভৃতি স্থানে ইংরাজসৈন্য ও রাজসৈন্যগণের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তিলকচন্দ্র একজন দেবদ্বিজ ভক্ত নরপতি ছিলেন। কথিত

আছে, তাঁহার সময়ে দেবত্র ব্রহ্মত্বে প্রায় ৫ লক্ষ বিঘা ভূমি দান করা হইয়াছিল। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে মহারাজ তিলকচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

মহারাজ তিলকচন্দ্রের পুত্র তেজচন্দ্র পিতার মৃত্যুসময় মাত্র ৬ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। তাঁহার মাতা মহারাণী বিষণ কুমারীই মহারাজের নাবালক সময়েই রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সাবালক হইয়া তেজচন্দ্র অত্যন্ত বিলাসী হইয়া পড়েন। ফলে তাঁহার রাজকার্য্যে অমনোযোগ-হেতু তাঁহার অনেকগুলি জমিদারী বাকীখাজানায় বিক্রয় হইয়া যায়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দশসালা বন্দোবস্তের সময়েও তাঁহার অনেকগুলি জমিদারী হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে। ক্রমে জমিদারী কমিতে থাকায় কিছুকাল পরে তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়। তিনি নিজে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত রাজ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জমিদারী এবং নগদ সম্পত্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। মহারাজ তেজচন্দ্র অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার নিকট হইতে কোন প্রার্থী রিক্তহস্তে ফিরিত না। টাকাকে তিনি টাকা বলিয়াই গ্রাহ্য করিতেন না। রাজ্যের কোন কর্ম্মচারীর নিকটই তিনি হিসাব-নিকাশ চাহিতেন না। তাঁহার একমাত্র পুত্র মহারাজ প্রতাপ চন্দ্র ১১৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজার বড় ইচ্ছা ছিল শেষ বয়সে উপযুক্ত পুত্র হস্তে রাজ্যভার দিয়া তিনি শান্তিলাভ করিবেন, কিন্তু হায়! তাঁহার সে সাধ পূরিল না। ১২২৮ সালের পৌষ মাসে মহারাজ প্রতাপচন্দ্র পরলোকগমন করেন। এই প্রতাপচন্দ্র হইতেই জাল 'প্রতাপচন্দ্রের' সৃষ্টি। প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর মহারাজ তেজচন্দ্র মহাতাপ্ চন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। ১২৩৯ সালে মহারাজ তেজ-চন্দ্রের মৃত্যু হয়।

মহারাজ মহাতপ্‌চন্দ্রও অতীব বিনয়ী, রাজনীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড

উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সময় তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি খেলাত লাভ করেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় তাঁহার মাতা মহারাণী কমলকুমারী রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি বিপন্ন গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া ধন্যবাদ লাভ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ করেন। এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই উক্তপদ লাভ করিতে পারেন নাই। ভারত-সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অন্যতম পুত্র ডিউক অব এডিনবরা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদে শুভাগমন করিয়া মহারাজা মহাতাপ্‌কে সম্মানিত করিয়াছিলেন। মহারাজা নিজে বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ১২৬৫ সালে তিনি মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত মূল ও সরল ব্যাখ্যাসহ রামায়ণ এবং মহর্ষি বেদব্যাসকৃত মূল ও সরল ব্যাখ্যাসহ মহাভারত মুদ্রিত করিয়া সাধারণে বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আরব্ধকার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহারাজ মহাতপ্‌চন্দ্র মর্ত্ত্য-লীলা সংবরণ করিয়াছেন।

মহারাজ মহাতপ্‌চন্দ্রের কোন ঔরসপুত্র না থাকায় তিনি এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। ঐ দত্তকপুত্রের নাম আপ্‌তাপ্ মহাতাপ্ বাহাদুর। মহারাজ মহাতাপ্‌চন্দ্রের মৃত্যুর সময় আপ্‌তাপ্‌চন্দ্র ঊনবিংশ বর্ষীয় নাবালক ছিলেন। তিনি সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত রাজ-দেওয়ান রাজা বনবিহারী কাপুর রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আপ্‌তাপ্‌চন্দ্র সাবালক হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে খেলাতসহ রাজসনন্দ গ্রহণ করেন। তাঁহার ২৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়; কিন্তু অতি অল্পকাল রাজত্ব করিলেও তিনি তাঁহার পিতৃদেবের পুণ্যতমকীর্ত্তি রামায়ণ ও মহাভারত সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও উহা সাধারণে বিতরণ করিয়া

অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আপ্‌তাপচাঁদের অন্যতম কীর্ত্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বর্দ্ধমান রাজ-কলেজ।

মহারাজাধিরাজ আপ্‌তাপ্‌চাঁদের ঔরসপুত্র না থাকায় পোষ্যপুত্র লওয়া স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু এই পোষ্যপুত্র-নির্ব্বাচন লইয়া বর্দ্ধমান রাজবাটীতে এক বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। মহারাজ আপ্‌তাপের পত্নী মহারাণী অধিরাণী বেনদেয়ী স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হন। ক্রমে সেই বিষয়ের উদ্যোগ হইতে থাকে; কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মৃত্যু হয়, এবং ক্রমে ক্রমে আর দুইটী ভ্রাতারও সেই অবস্থা ঘটে। তখন মহারাণী অধিরাণী বেনদেয়ী দেবী রাজা বনবিহারী কাপুরের পুত্র বিজনবিহারীকে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে বঙ্গেশ্বরের আদেশানুসারে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু মহারাজাধিরাজ মহাতপ্‌চাঁদের পত্নী মহারাণী অধিরাণী শ্রীমতী নারায়ণকুমারী দেবী ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করেন। ক্রমে এবিষয় লইয়া উচ্চতম আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পকাল মধ্যেই আপোষে সে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। আপ্‌তাপ্‌ মহাতাপ্‌ বাহাদুরের মহিষী মহারাণী অধিরাণী বেনদেয়ী গৃহীত দত্তকপুত্র বিজনবিহারীই আমাদের বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ বাহাদুর। মহারাজ বাহাদুর সুশিক্ষিত এবং ধনী। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার ধন এবং শিক্ষা দেশের এবং দশের উপকার সাধন করতঃ ইতিহাসবিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশের অমরত্ব ঘোষণা করিয়া তাঁহার গৌরববর্দ্ধন করুক।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

ঢাকার ইতিহাস।

(২)

ঢাকার অতীত প্রাচীন ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। অতীতের কুহেলী-মাখা দুরধিগম্য গহ্বর হইতে তাহার উদ্ধার করা সুকঠিন। এই জেলার দক্ষিণভাগের আদিম ইতিহাসের সহিত খৃঃ পূঃ এক শতাব্দী পূর্ব্বে আবির্ভূত বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্যের নামের সংযোগ দেখা যায়। কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় যে, উক্ত নৃপতি ভারতের নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে পূর্ব্বাঞ্চলে আগমন করেন এবং তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেখানে কিয়ৎকাল রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য স্বীয় পাণ্ডিত্য জ্ঞান এবং রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য চিরদিন হিন্দু নরনারীর হৃদয়-সিংহাসনে সমাসীন থাকিয়া গৌরবের সহিত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার পূর্ব্বাঞ্চলের আগমনসম্পর্কিত এই বিবরণের মধ্যে কোনরূপ সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, বিক্রমপুর পরগণার উৎপত্তি তাঁহারই নামানুযায়ী হইয়াছে। অতঃপর আমরা যাহা জানিতে পারি তাহাতে বোধ হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভূঁইয়া নৃপতিগণ ভারতের পশ্চিমাংশ হইতে আগমন করিয়া গঙ্গার পূর্ব্বদিকস্থ দিনাজপুর, রঙ্গপুর এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জেলায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন তাহার ঠিক সময় নিরূপণ করা অসম্ভব; তবে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, তাঁহারাও রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় অতিশয় প্রাচীন সময়ে এ অঞ্চলে আগমন করেন। ভূঁইয়াদের পর আইন-আকবরী পাঠে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে পাল রাজবংশের আবির্ভাব হয়। ভূঁইয়াবংশের তিনজন নৃপতি এই জেলার উত্তরাংশে রাজত্ব

করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাল-বংশীয় নৃপতিগণ বঙ্গদেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব্বাঞ্চলের কোন্ কোন্ প্রদেশে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তাহার কোনও প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন, তালিপাবাদ পরগণার মাধবপুরে যশোপাল ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাশিয়ার শিশুপাল এবং সাভারের নিকটস্থ কাটিবাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। পালবংশীয় নৃপতিগণের নামের সহিত রঙ্গপুর অঞ্চলের ভূঁইয়া নৃপতিগণের নামের ঐক্যতা দৃষ্টে বোধ হয় যে, এই উভয় রাজবংশ মূলত একই বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, এক সময়ে রঙ্গপুরের ভূঁইয়া নৃপতিগণ সুদূর আসামের অন্তর্গত কামরূপ রাজ্য পর্য্যন্ত রাজত্ববিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবুল ফজল আইন-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, এক সময় কামরূপ রাজ্য বুড়িগঙ্গা এবং ধবলেশ্বরীর দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই কথা উপেক্ষণীয় নহে। কারণ অদ্যাপি ঐ অঞ্চলে রাজবংশী এবং কোচ প্রভৃতি আদিম অনার্য্য অধিবাসিগণের বাস আছে। এই সময়ে পাল-নৃপতিগণের রাজধানী বিক্রমপুরই ছিল। মহারাজা হরিশ্চন্দ্রপালের বংশে বৌদ্ধ-নৃপতি মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই উভয় ভ্রাতার নানাবিধ গুণাবলী অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গের যোগীজাতির মধ্যে গীত হইয়া থাকে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে গোবিন্দচন্দ্র গোপী পাল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। দশ শ এগার কি দশ শ বার খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র দাক্ষিণাত্যপতি দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হন। পালবংশীয় নরপতিগণের অধঃপতনের পরে বিক্রমপুরে বর্ম্মবংশের অভ্যুদয় হয়; উহারা এই অঞ্চলে বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারে নাই,

পাল ও বর্ম্মবংশের ক্রমিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিশূর বা বিজয়সেন বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া সমতট প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। আবার কাহারও কাহারও মতে পাল ও সেনবংশ উভয়েই সমসাময়িক এবং পরস্পরে বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে রাজ-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। আদিশূর প্রথমে শৈব ছিলেন। তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়া দেখিলেন যে, বৌদ্ধরাজগণের শাসনপ্রভাবে ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপে একান্ত অনভিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি এই জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন কায়স্থও ভৃত্যস্বরূপ আগমন করিয়াছিল। আদিশূরের রাজত্ব সম্পর্কে ইহার অধিক কিছুই জানা যায় না। রাজা বিক্রমাদিত্যের ও ভূঁইয়া ও পালবংশীয়গণের ন্যায় তাঁহার সম্পর্কিত প্রাচীন ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। আদিশূরের প্রপৌত্র বল্লাল সেনের সময় সেন-বংশীয়দিগের রাজত্ব বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এমন কি মদ্র, কলিঙ্গ এবং কামরূপও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। বিজয়সেনের পরে সেনবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে বল্লালসেন বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। বল্লালসেন তাহার শাসনাধীন বঙ্গদেশকে রাঢ়, বাগ্‌ড়ি, বারেন্দ্র, মিথিলা ও বঙ্গ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। বল্লালসেনের সময় বঙ্গদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন হয়। বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে নানারূপ জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই বল্লালকে আদিশূরের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রাচীন কুলজীগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বল্লাল আদিশূরবংশের কন্যাকুলসম্ভূত। বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, আমরা স্বরূপচন্দ্র রায়-প্রণীত সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস হইতে তাহার একটী গল্প উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তিনি লিখিয়াছেন :—

'মহারাজ বিজয়সেনের দুই স্ত্রী ছিলেন। মহারাজ, কনিষ্ঠা স্ত্রীতে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া জ্যেষ্ঠা মহিষী সর্ব্বদা দুঃখিতা থাকিতেন। বড় রাণী একদা চৈত্র মাসে লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্রবাসে আসিয়া কোনও এক তেজস্বী সন্ন্যাসী সন্দর্শন করেন এবং আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার নিকট নিবেদন করায় তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার হাতে একটী ঔষধি অর্পণ করিয়া বলেন "তুমি দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহা মহারাজকে খাওয়াইবে।" মহারাজ অশোকাষ্টমীতে তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রে স্নানার্থ আগমন করিলে, মহিষী সন্ন্যাসীর উপদেশ মতে ঔষধি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করেন, কিন্তু দুগ্ধ বিবর্ণ হইল দেখিয়া রাণী মনে মনে ভাবিলেন এই দুগ্ধ মহারাজের সম্মুখে ধরিলে জীবনদণ্ড হইবে, অতএব ইহা ফেলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ ব্রহ্মপুত্রে নিক্ষিপ্ত হইল। ঔষধের গুণে ব্রহ্মপুত্র ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া মহিষীর নিকট উপস্থিত হন। এইরূপে ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে বল্লালের জন্ম হয় বলিয়া এ অঞ্চলে জনশ্রুতি আছে।

দুর্ভাগিনী বড় রাণীর দুর্ভাগ্য আরও ঘনীভূত হইল। ঐরূপ ঔষধি প্রদানের চেষ্টা ও গর্ভের লক্ষণ উপচিত হইলে, মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া যে লাঙ্গল-বন্ধে এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহারই অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে রাণীকে নির্ব্বাসন করেন। কিন্তু রাজমন্ত্রী গোপনে গর্ভবতী রাণীর কষ্টে সৃষ্টে থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। যে স্থানে রাণী নির্ব্বাসনকাল অতি-বাহিত করেন, সেই স্থান রাণীঝি * নামে খ্যাত হয়। কালক্রমে বল্লাল ভূমিষ্ঠ হন। বনে লালিত হন বলিয়া ইঁহার বল্লাল নাম রাখা হয়।

* এ প্রদেশের জনসাধারণে বল্লালমাতাকে রাণীঝি বলিয়া সম্বোধন করিত। ইহাতে তিনি কি আদিশূরবংশীয় কন্যা বলিয়া প্রতীতি হন না? এই রাণীঝি নামক স্থানের অদূরে লক্ষ্মণখলায় স্বনামে লক্ষ্মণসেন প্রসিদ্ধ হট্ট বসাইয়া ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

বল্লালের আকৃতিতে রাজাধিরাজের লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট প্রতিভাত ছিল। বল্লালের শরীরে সপ্তরক্ততা † দেখিয়াই নাকি বিজয়সেন মন্ত্রীর নিকট আমূল শ্রবণ করিয়া সপুত্র মহিষীকে পুনরায় সাদরে গ্রহণ করেন। আর একটী গল্প এই যে, স্থানীয় সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুগণের প্রচলিত বিশ্বাস, এই যে, বল্লালসেন ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র। শৈশবে বুড়ীগঙ্গার তট-প্রদেশস্থ অরণ্য মধ্যে স্বীয় মাতার সহিত বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সে সময়ে দেবী ভগবতী তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বল্লাল অরণ্য মধ্য হইতে দেবীকে উদ্ধার করেন এবং একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবীমূর্ত্তির স্থাপনা করেন। দেবী ভগবতী লুক্কায়িত অর্থাৎ অরণ্যে ঢাকা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ঢাকেশ্বরী হয়। ক্রমে ক্রমে অরণ্যাংশ কর্ত্তিত হইয়া সুন্দর নগরে পরিণত হয়। সেই নগরই দেবী ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

বক্তিয়ার খিলিজী পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ জয় করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিতে পারেন নাই। প্রায় ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বল্লাল বা পোড়া রাজা প্রমুখ সেনরাজগণ বিক্রমের সহিত পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমান রাজগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া ইহার স্বাধীনতা-রক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১২৭৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা তুগ্রল খাঁ দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে দিল্লীশ্বর গায়সউদ্দিন বুলবন্ তুগ্রলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তুগ্রল পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। বুলবন্ শত্রুর অনুসরণ করিতে করিতে সোণার গাঁয়ে উপস্থিত হন। তখন দনুজরায় সোণার গাঁয়ের অধিপতি। ইনিও সেন-রাজবংশোদ্ভূত সুষেণ বা শূরসেনের পুত্র। দনুজ মাধব

† পাণিপাদতলে রক্তে নেত্রান্তর নখানি চ।
তালুকাধর জিহ্বাশ্চ প্রশস্তা সপ্তরক্ততা॥

দিল্লীশ্বরকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। গায়সউদ্দিনের সময়ই সুবর্ণগ্রাম অধিকৃত হয়। প্রচলিত প্রবাদ এবং গাজীর গীত হইতেও ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয়। সে গাজীর গীতটী এই :—

"পোড়া রাজা গয়েস্‌দি
"তাঁর বেটা সমস্‌দি
"তাঁর পুত্র সাই সেকেন্দর।
"তাঁর বেটা বরখান গাজী
"খোদাবন্দ্‌ মুলুকের রাজী
"কলিযুগে যাঁর অবতার॥
"বাদশাই ছাড়িল রঙ্গে
"কেবল ভাই কালু সঙ্গে
নিজ নামে হইল ফকির।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ। *

তৈমুরলঙ্গের যে অমানুষিক প্রচণ্ডতা পৃথিবীর বক্ষে উৎপাতের ও প্রণয়ের তাণ্ডবনৃত্য করিয়া, মানব-সমাজকে চকিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার ইতিহাস দুর্ব্বল মানবমণ্ডলীর বেদনা-জনিত অক্ষম অশ্রুপাতের ইতিহাস। ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানের অদ্ভুত বীরত্ব, অলৌকিক সহিষ্ণুতা, প্রগাঢ় রণনৈপুন্য ও প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা, আর বিপক্ষপক্ষের

* বৈদ্যবাটী "যুবক সমিতি" গৃহে পঠিত।

অত্যদ্ভুত সমরসজ্জা, অতিমাত্র দুর্ব্বলতা ও একান্ত নিস্তেজতা ইতিহাসের মধ্যে এমন বৈচিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে যে, তাহা উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য। সত্য বটে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের শোণিতে সে ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠা রঞ্জিত ; কিন্তু তথাপি তাহা ত্যাগ করা যাইতে পারে না। তাহা আমাদিগেরই শতাব্দী-অর্জ্জিত নীরব নিশ্চেষ্টতা ও অক্ষমতার নিদর্শন। সে দুর্ব্বলতার ন্যায্য কলঙ্কটুকু আমাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

তৈমুরলঙ্গের যে কয়েকখানি জীবনীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে মালফুজাট-ই-তাইমুরী ও জাফরনামাই প্রধান। প্রথমখানি তুর্কী ভাষায় লিখিত তৈমুরলঙ্গের একখানি ক্ষুদ্রজীবনী। তাঁহার জীবিত অবস্থায় সভাপণ্ডিতগণ সময়ে সময়ে তাঁহার বীরত্বকাহিনী অবলম্বনে নানা প্রকার রচনা লিপিবদ্ধ করিয়া, সম্রাট্ সমক্ষে পাঠ করিত। বর্ণিত ঘটনা সম্রাটের প্রীতিপ্রদ হইলে, রচনা গৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে এইরূপ অনুমিত হয়। পরে ভারত-সম্রাট্ সাহজাহানের রাজত্ব-কালে আবুতালিবের দ্বারা ইহা পার্শী ভাষায় অনুবাদিত হয়।

তৈমুরলঙ্গের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে দ্বিতীয় গ্রন্থ জাফরনামা রচিত হয়। তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী লোকসমাজে ঘোষণা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সুতরাং নরশোণিত-রঞ্জিত ঘটনা সমূহই ইহার উপাদান। গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে প্রায় বিরোধ নাই। তাহার একটী কারণ জাফরনামার লেখক মালফুজাট-ই-তাইমুরীতে বর্ণিত ঘটনা সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে তাহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের প্রামাণিকতার ইহাই একটী প্রধান প্রমাণ।

তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে যে সমুদয় প্রশ্ন স্বতঃই মন মধ্যে উদিত হয়, উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় পাঠে সে সমুদয় প্রশ্নের অধিকাংশই নিরাকৃত হয়। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত ঘটনা আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

ভারত আক্রমণের কারণ যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় কাফেরদিগের রক্তে আপন জীবন পবিত্র করিবার বাসনাই একমাত্র না হউক তৈমুরের ভারত আক্রমণের প্রধান কারণ। সমরক্ষেত্রে কাফের বিনাশ করা মুসলমানের পক্ষে বড়ই সম্মানের বিষয়। যে ব্যক্তি সমরপ্রাঙ্গণে অরাতি নিপাত করিয়া ফিরিয়া আসে, সে ব্যক্তি বাজী সম্মানিত ব্যক্তি; সুতরাং এই ধর্ম্মোন্মত্ততাই যে তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণের প্রাধান কারণ, ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মের আবরণে লুক্কায়িত না হইয়া, অধর্ম্ম কখনই প্রবলভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। য়ুরোপ সমাজ এককালে পৃথিবীপ্লাবী নরশোণিতে কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, শোণিতপাতের মধ্যে ধর্ম্মের নাম নিবদ্ধ ছিল। আর ধর্ম্মের নামেই সৈন্যগণ উৎসাহিত ও তৈমুরলঙ্গের এরূপ বীরত্ব শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, সে বীরত্ব সমুদয় আসিয়াবাসীর গৌরবের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সে বীরত্ব গাঢ়, উদার ও ব্যাপক নয়, তাহা অনুদার, তাহা বিরোধের কারণ। তাই আজ তাঁহার ইতিহাস বীরত্বের ইতিহাস, মহত্ত্বের ইতিহাসরূপে পূজিত নয়। কালান্তক যমের ন্যায় বিচিত্র হওয়াতে, আমরা বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকি। কিন্তু বিজয়ীর ন্যায় গ্রহণ করিয়া, দারিদ্র্য-মৌন হৃদয়ের পর্ণকুটীরের নিভৃত কোণে তাঁহাকে ভক্তি-পুষ্পে পূজা করিতে পারি না।

জাফারনামা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৈমুরের পুত্র পীর মহম্মদ জাহাঙ্গীর কাবুল, গজনী প্রভৃতি প্রদেশ সমূহের শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়া সুখ্যাতির সহিত শাসন পরিচালনের পর মুলতান আক্রমণের জন্য পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। রাজ্য বিস্তার ইচ্ছাই বোধ হয় মুলতান আক্রমণের প্রধান কারণ। পীর মহম্মদ মুলতান আক্রমণ করিলে মুলতানের শাসনকর্ত্তা সারঙ্গ আস হস্তে বীরপুরুষের ন্যায় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন। বীর সারঙ্গের সৈন্য চালনায় মহম্মদ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। পুত্রকে রক্ষা করিয়াও শত্রুদমন করিবার জন্য তৈমুরের ভারত আক্রমণের উদ্যোগ হওয়া অসম্ভব নয়। যাহা হউক বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইয়া বৃক্ষপত্রের ন্যায় ঘন-সন্নিবিষ্ট এক বিরাট সৈন্যদল গঠিত হইয়া উঠিল। তৈমুর এই বৃহতী সেনার নেতা। বরিষার বারিধারার ন্যায় নগর ও গ্রাম ভাসাইয়া এই সৈন্যদল অগ্রসর হইতে লাগিল। পতিতপাবনী জাহ্নবীর স্রোতে যেরূপ মত্তমাতঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছিল, সেইরূপ তৈমুরের কৃতসঙ্কল্প সাহসী সৈন্যদলের সম্মুখে সমুদয় প্রতিবন্ধকই অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

তরঙ্গায়িত সিন্ধুর তটে তৈমুরের সৈন্যদল পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ১৩৯৮ খৃঃ মার্চ্চমাসে সমরকান্দ ত্যাগ করিয়া এই সৈন্যদল তিনমাস অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত ও অনশনে যে লক্ষ্যের মধ্যে ছুটিয়াছে, আজ সেই ভারতের দ্বারদেশে উপনীত। সম্মুখে দুকূলপ্লাবী বিশালহৃদয়া, উত্তাল-তরঙ্গময়ী চঞ্চলা সিন্ধু। সে বারির বিরাম নাই ; দক্ষিণে, বামে সম্মুখে, গাঢ়, তীব্র উদ্বেলিত অম্বুরাশি ! অশ্বের হ্রেষারবে কর্ণ বধির হইয়া উঠিতেছে, বিজয়োন্মত্ত সৈনিকগণের পদোত্থিত ধূলিরাশিতে আকাশমণ্ডল অন্ধকার হইয়া উঠিল ; শান্তিপ্রিয় ভারতবাসী বিপদ গণনা করিয়া স্তম্ভিত ! কিন্তু কই সিন্ধু ত আপন স্ফীত দেহ সঙ্কুচিত করিল না ! ইহাতেও বীরহৃদয় টলিবার নহে। তৈমুর সিন্ধুর প্রতি ভ্রূকুটি দৃষ্টি করিলেন। উৎসাহ তাঁহার শিরায় শিরায় ছুটিতে লাগিল। সে উৎসাহের কাছে সমস্ত প্রতিবন্ধকই তুচ্ছ। সিন্ধুর বক্ষের উপর সেতুবন্ধনের আদেশ প্রচারিত হইল। দুই দিনের মধ্যে দুস্তার্য সিন্ধু সেতুবন্ধ হইয়া পড়িল। তৈমুর সগর্ব্বে সসৈন্যে সিন্ধু অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। হায়, সিন্ধু ! তোমার বক্ষের উপর দিয়া দুঃখিনী ভগিনী ভারতমাতার অঞ্চলমণি স্বাধীনতা-

ধন হরণ করিবার জন্য যে বীর চলিয়া গেল, তাহার শাণিত অসিমুখে ভারত শ্মশানে পরিণত হইবে! ইহা জানিয়াও কি তুমি কোন প্রতীকারে সমর্থ হইলে না?

বর্ষার প্রবল বন্যা পৃথিবী ধ্বংসের যে ইতিহাস রাখিয়া যায়, কাল স্বহস্তে তাহাকে স্নেহের আবরণে এমনি ঢাকিয়া ফেলে যে, কোনখানে কোন চিহ্ন থাকে না। তৈমুর ভারতে উপস্থিত হইয়া, গৃহে গৃহে যে গগনবিদারী ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছিলেন, আজ হয়ত ইতিহাসের জীর্ণ পত্রস্তূপ সরাইয়া আমরা সেই করুণ স্বরটী ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। অলঙ্কারের কথা ছাড়িয়া দিয়া, সরল কথায় বলিতে পারা যায় যে, শত শত গৃহ দগ্ধ হইয়াছে, শত শত নগর নগরী শ্মশানে পরিণত হইয়াছে ও লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি হত হইয়াছে *। অপর কোন দেশে এরূপ ঘটনা ঘটিলে, হত বন্ধু-বান্ধবের তপ্ত নিশ্বাসে বায়ুমণ্ডল এরূপ উষ্ণতা প্রাপ্ত হইত যে, যুগযুগান্তরে মানব-মণ্ডলীকে ইহাতে দগ্ধ হইতে হইত। কিন্তু হায়! ভারতবাসী মরিতেই জন্মিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের হত্যায় কেন খেদ করিবে?

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তৈমুরের যাবতীয় অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করা সম্ভবপর নয়। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, তিনি খোকার প্রভৃতি স্থানে যেরূপ পাশবিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী অসমর্থ। গৃহে অগ্নি সংযোগ করা তাহার একটী নিত্যক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাতনির দুর্গ-জয়ের পর দশ সহস্র হিন্দুকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। এরূপ পৈশাচিক-

* The soldiers entered the town on the pretext of seeking for grain and a great calamity fell upon it (Tulambir) they set fire to the houses and plundered whatever they could lay their hands on. The city was pillaged and no houses escapsed.........Elliot.

তার অভিনয় মিরাট প্রভৃতি স্থানেও সংঘটিত হইয়াছিল। এ স্থলে দুই একটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে অনুমান করি।

ওলানী নদীর নিভৃত সৈকতভূমে তৈমুরের শিবির স্থাপিত হইয়াছে। সামন্তগণ রণপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দণ্ডায়মান, তৈমুর স্বয়ং তাহাদিগেকে যুদ্ধের বিষয় শিক্ষা দিতেছেন। সকলেরই মুখ উৎসাহ-দীপ্ত। এই সময় আমির জাহান সা সম্রাট সমীপে নিবেদন করিলেন যে, সিন্ধু নদী পার হওয়ার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত লক্ষাধিক হিন্দু বন্দিভাবে শিবিরে অবস্থান করিতেছে।

এত লোককে শিবিরে রাখা সকল সময় নিরাপদ নহে। শত্রুর সহিত কোনরূপে সংযুক্ত হইতে পারিলে, তাহাদের দ্বারা শত্রুবল অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। তৈমুর স্থির ভাবে কথাগুলি শুনিলেন। তৎপরে তিনি তাহাদিগের হত্যার আদেশ দিয়া দরবার-কক্ষ ত্যাগ করিলেন। একলক্ষ নর নারী, সম্রাটের আদেশে, মুসলান অসিতে জীবন বিসর্জ্জন দিল! মানুষ যে এরূপ মেষের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

ইহার পর তৈমুর সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাফার নামা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে সিরি, পুরাতন দিল্লী এবং জাহানপানা এই তিন ভাগে দিল্লী বিভক্ত ছিল। সিরি ও পুরাতন দিল্লী গোলাকার প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সিরিতে সাতটী, পুরাতন দিল্লীতে দশটী এবং জাহানপানার তেরটী, মোট ত্রিশটী দ্বার সমগ্র দিল্লী নগরীতে বিদ্যমান্ ছিল। তৈমুর দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, নগর-দ্বার রুদ্ধ হয় এবং ১২,০০০০০ বার লক্ষ পদাতিক সৈন্য ও ৪০,০০০ অশ্বা-রোহী লইয়া দিল্লীর সুলতান মামুদ, মূলখাঁর অধীনে সৈন্যসমূহ স্থাপন করিয়া তৈমুরের সহিত রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন। তৈমুর এত সৈন্যের সমাবেশ আর কখন দেখেন নাই। সমুদ্রতটে বালু-

কণার ন্যায় এই অগণ্য সৈন্য সমাবেশ দর্শন করিয়া, তিনি আপনার সৈন্যগণকে পরিখা খনন করতঃ ক্ষণকাল অবস্থান করিতে বলিয়া, স্বয়ং অশ্বারোহণে দূর হইতে শত্রুগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, শত্রুপক্ষের দক্ষিণপার্শ্ব অরক্ষিত। ইহা দেখিয়া তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মামুদ তোমার বৃথা সৈন্য রচনা। ভারতের দুর্ভাগ্য দূর করিবার ক্ষমতা তোমার কোথায়? তাহা যে নিতান্তই ভবিতব্য।

তৈমুর আলি ভাওয়ালের অধীনে সামান্য সৈন্য দিয়া, তাহাকে শত্রু সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। ক্ষুধিত শার্দ্দূল যেরূপ মৃগযূথকে ছিন্নভিন্ন করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে, তিনি সেইরূপ অমিত তেজে শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন। শত্রুরা সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্র ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

কথিত আছে, সুলতান এই পরাজয়-সংবাদে ভীত হইয়া, পলায়ন করিলেন। কিন্তু তৈমুরের সৈন্যগণের দ্বারা অনুসৃত হইয়া তাঁহাকে নানা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

ইহার পর দিল্লীর শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা। নাগরিকগণের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, তৈমুরের সৈন্য-গণ দিল্লীকে আবার নর-শোণিতে কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিল। দিনরাত্রি রক্তস্রোত বহিয়া অমরাবতী দিল্লী নগরী, নরকঙ্কালে পরিপূর্ণ, প্রাণহীন শ্মশানে পরিণত হইল। কথিত আছে, নরনারীর মুণ্ড একত্রে সজ্জীভূত হইয়া, এক বিশাল সৌধে পরিণত হইয়াছিল। শত সহস্র ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া * তৈমুর ভারতের নানাস্থানে পর্য্যটন করতঃ প্রায় এগার মাস পরে, তিনি স্বদেশ

* কথিত আছে যে, স্বদেশে যে বিশাল মসজিদ নির্ম্মাণ করিবার তৈমুরের ইচ্ছা ছিল, তাহার জন্য ৩০ হাজার রাজমিস্ত্রিকে দিল্লী হইতে বন্দী করিয়া লইয়া যান।

অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া যে হত্যার অভিনয় অনবরত চলিতেছিল, আজ তাহার পরিসমাপ্তি হইল। তৈমুর এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আপনার নাম বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হত্যার বিষয় স্মরণ করিয়া, এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সুখ্যাতি করে নাই। তিনি বীর, সাহসী ও রণনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু হৃদয়ের যে মহত্ত্বগুণে, মানব দেবতারূপে পরিণত হয়, তাঁহার বিপুল যুদ্ধযাত্রার মধ্যে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

নন্দকুমার। *

—:*:—

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় নন্দকুমার সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বৈশাখের সুপ্রভাত পত্রে আমার প্রতি যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি নিম্নে যথাসাধ্য সেগুলির উত্তর প্রদান করিতেছি। উত্তর গুলি তাঁহার রুচিকর হইবে কি না বলিতে পারি না। কারণ, তিনি নন্দকুমারকে যেরূপ চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের উত্তরে যে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, সেরূপ ভরসা অল্প, তবে আমরা নন্দকুমারকে যেরূপ বুঝিয়াছি, তদনুযায়ী তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিতেছি, উহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা সাধারণে বিচার করিবেন।

* বৈশাখমাসের সুপ্রভাত পত্রে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় নন্দকুমার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তাহাতে আমাদের প্রতি কয়েকটি প্রশ্ন করায়, আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই উত্তর প্রদান করিয়াছি। আমাদের উত্তর সুপ্রভাতেও প্রকাশিত হইয়াছে।

যোগীন্দ্র বাবুর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি দুই চারিটি কথা বলিতে চাহি। যোগীন্দ্র বাবু আপনাকে অনেক স্থলে অনভিজ্ঞ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তাহা আমরা সহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে তিনি প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ন্যায় প্রশ্নগুলি করেন নাই। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রথমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। তাঁহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সন্দেহ নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যোগীন্দ্র বাবু সৈয়র মুতাক্ষরীণ পড়িয়া নন্দকুমার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়াই ফেলিয়াছেন; এবং সেই ধারণা-বলে আমাদের লিখিত নন্দকুমার সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু বলিতে পারি না। তাহা হইলেও তিনি যখন আপনাকে তাহাই বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, তখন আমরা তাহাই মানিয়া লইলাম। আশা করি, তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ন্যায় আমাদের কথা কয়টিই শুনিবেন, এবং সে বিষয়ে সন্দেহ হইলে সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য অন্যত্র চেষ্টা করিবেন। কেবল সৈয়র মুতাক্ষরীণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যেন নিশ্চিন্ত না হন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

এইখানে আমি একটি কথার অবতারণা করিতে চাহি। জগতের বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমরা সকলেই সেই বৈজ্ঞানিক যুগের লোক। কাজেই আমাদিগের সকল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সকলেই অবগত আছেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী inductive method এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, অথবা inductive method কেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলা যাইতে পারে। এই inductive method বিজ্ঞান শাস্ত্রের ন্যায় সকল শাস্ত্রেই প্রযোজ্য। ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব সে প্রণালী পরিত্যাগ করিলে বর্ত্তমান যুগে কদাচ আদৃত হইতে পারিবে না। সেই জন্য আমরা ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে inductive

method এর প্রয়োগ দেখিতে চাহি। তদনুসারে কেবল একটি মাত্র ঘটনা বা একখানি মাত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমরা সমীচীন মনে করি না। কারণ, তাহা বৈজ্ঞানিক রীতিবিরুদ্ধ। যোগীন্দ্র বাবু যদি সেই রীতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আমরা বিশেষরূপ আনন্দ লাভ করিতাম। তিনি যদি কেবল সৈয়র মুতাক্ষরীণের বর্ণনার উপর নির্ভর না করিয়া নন্দকুমার সম্বন্ধে যাবতীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন ও নিজে সমস্ত গুলির বিচার করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহা হইলে তাহা আমাদের মতবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতাম না। আমরা সিদ্ধান্ত অপেক্ষা প্রণালী অনুসরণের গুরুত্বেরই পক্ষপাতী। যোগীন্দ্র বাবু যদি সেই প্রণালী অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি যে, তিনি অন্ততঃ এটুকু স্বীকার করিতেন যে, নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন মত আছে, এবং উভয় মতেরই ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

এক্ষণে যোগীন্দ্র বাবুর জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতেছে। যোগীন্দ্র বাবু প্রথমে বলিতেছেন যে, নিখিল বাবু নন্দকুমারকে রাণা রাজসিংহ ও ছত্রপতি শিবাজীর সহিতই এক প্রকার তুলনা করিয়া গিয়াছেন। যোগীন্দ্র বাবুর এ উক্তি কি প্রকৃত? যোগীন্দ্র বাবু বোধ হয় আমাদের লিখিত প্রবন্ধটি একটু অন্য চক্ষে দেখিয়াছেন, অথবা তাহাতে বিশেষরূপ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। আমরা লিখিয়াছি—

"মহারাজ নন্দকুমারের জীবনের প্রত্যেক কার্য্য সমালোচনা করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে অনেক স্থান ও সময়ের আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব। তবে আমরা এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বাস্তবিক, মহারাজ নন্দকুমার তৎকালীন প্রবঞ্চক ইংরেজ কোম্পানীর হস্ত হইতে তাঁহার প্রভুর ও স্বদেশের স্বত্বরক্ষার জন্য আপনার জীবন বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, সে বিষয়ের কোন বিরুদ্ধ তর্ক আমাদের মনে স্থান পায় না। তবে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য যে একেবারে স্বার্থশূন্য ছিল, সে কথাও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না। শিবাজী বা রাজসিংহের ন্যায় তাঁহার উদ্দেশ্য মহত্তর বা নির্ম্মলতর না হইতে পারে, তথাপি সে উদ্দেশ্যেরও যে যথেষ্ট মূল্য আছে, ইহাও অনায়াসে স্বীকার করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে অন্যান্য বাঙ্গালীর ন্যায় বৈদেশিকের পদলেহন না করিয়া তিনি যে স্বদেশের স্বত্বস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে।" নন্দকুমার সম্বন্ধে উহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। উপরোক্ত বর্ণনায় আমরা তাঁহাকে রাজসিংহ বা শিবাজীর সহিত তুলনা করি নাই। তবে তিনি যে মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য জীবন বলি দিয়াছিলেন, তাহার প্রশংসা করিয়াছি মাত্র।

যোগীন্দ্র বাবুর প্রথম বক্তব্য মুতাক্ষরীণকারের বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য কি না? এই প্রশ্ন করিয়াই তিনি নিজেই আবার তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, আমরা তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে আমরা নন্দকুমারকে যে গৌরবে ভূষিত করিয়াছি, তাহার কিছুই থাকে না। অবশ্য আমরা মুতাক্ষরীণকারের সহিত এক মত হইতে পারি না। তাহা হইলেও তাঁহার বর্ণিত ব্যাপারগুলি বিশ্বাস্য কি অবিশ্বাস্য তাহার একটা উত্তর আমরা দিবার চেষ্টা করিতেছি। মুতাক্ষরীণকার নন্দকুমারকে বলিতেছেন, "a man of an intriguing spirit" সে কথা আমরা একেবারে অস্বীকার করি না। আমরাও বলিয়াছি, "তবে সুচতুর ইংরেজ জাতির কুট নীতির সহিত তাঁহার প্রতিভা ও বুদ্ধির সংঘর্ষণ ঘটায়, কখন কখন তাঁহাকে যে কুট বুদ্ধির পরিচয় দিতে হইয়াছে, ইহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতি বলে

তাঁহার যতদূর কৌশল ও চতুরতা প্রকাশ করার প্রয়োজন হইয়াছিল, ততদূর সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।” স্বীয় প্রভু ও স্বদেশের হিতের জন্য তিনি তৎকালীন প্রবঞ্চক ও শঠ ব্যক্তি দিগের বিরুদ্ধে শঠ নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে a man of an intriguing spirit বলিলে তাঁহার গৌরবের হানি হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। মুতাক্ষরীণকারের দ্বিতীয় কথা এই যে, নন্দকুমারকে ভয়ানক প্রকৃতির লোক জানিয়া তিনি যাহাতে অপরকে বিপদে ফেলিতে না পারেন, তজ্জন্য গবর্ণর হেনরী ভান্সিটার্ট একখানি পুস্তকে নন্দকুমারের আমূল বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা জর্জ্জ ভান্সিটার্টকে তাহা দিয়া যান। জর্জ্জ তাহা কাউন্সিলে পাঠ করেন, তাহাতে সদস্যগণ নন্দকুমারকে কলিকাতার বাহিরে যাইতে নিষেধ করেন। পরে ক্লাইব ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি উক্ত পুস্তক শ্রবণ করিয়া নন্দকুমারকে পদচ্যুত ও নজরবন্দী করেন।

হেনরী ভান্সিটার্ট তাঁহার সেই পুস্তকখানিতে কি লিখিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে নন্দকুমার সম্বন্ধে তাঁহার যে মন্তব্য ছিল তাহা তাঁহার লিখিত “A narrative of the transactions in Bengal” নামক মুদ্রিত পুস্তক হইতে আমরা যাহা জানিতে পারি তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি,—

“As to Nund Coomar, he had hither-to made himself remarkable for nothing but a seditious and treacherous disposition, which had led him to perpetrate the most atrocious acts against our government, having been detected and convicted by the voice of the whole Board, in encouraging and assisting our enemies in their designs against Bengal; taking the opportunity of the indulgence granted him, of living in Calcutta, under the Company's protection, to make himself the

channel for carrying on a correspondence between the Governor of Pondicherry, and the Shahzada then at war with us. During the Subahship of Jaffier Alee Cawn, he had distinguished himself by fomenting quarrels between him and the Presidency. After the promotion of Cossim Allee Cawn, he became as active, but with greater success, in inventing plots, and raising jealousies against him. This gave him an ascendency over some of the members of the Board, and made him a party object; by which,and an unparalleled perseverance, he was unable to set the whole community in a flame. Such was the man whom the Nabob chose for the administration of his affairs, and whole exaltation to this rank, he made a condition of his acceptance of the Subaship."

ইহা হইতে কি এরূপ বুঝা যায় না যে, নন্দকুমার তৎকালীন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নানা প্রকার চেষ্টা করায় কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন ? এবং সেই চেষ্টা যে তাঁহার স্বীয় প্রভুঃ ও স্বদেশের উদ্ধার সাধনের জন্য তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ভান্সিটার্টের উক্ত উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নন্দকুমার তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁহাদের ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন। তবে হেনরী ভান্‌সিটার্টের লিখিত সে পুস্তকে আর কিছু ছিল কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না।

ভান্সিটার্টের লিখিত উপরোক্ত বিবরণের সহিত মুতাক্ষরীণের বর্ণনা মিলাইলে আমাদের সিদ্ধান্ত যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহারই উপকরণ উভয় গ্রন্থ হইতে বাছিয়া লওয়া যায়। মুতাক্ষরীণের intrinsic worth আমরাও একেবারে অস্বীকার করি না। অবশ্য তাহা তাহার ঘটনা নির্দ্দেশের জন্য, কিন্তু তাহার মতামত আমরা শিরোধার্য্য করি না।

তাহার বলিয়া কেন, কোন গ্রন্থ বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের মত আমরা শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত নহি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা inductive method এর পক্ষপাতী। সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের বা গ্রন্থ বিশেষের মত, আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত ঐক্য হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাকে বিশিষ্ট প্রমাণ স্থলে উপস্থাপিত করিয়া থাকি। সেই জন্য আমরা অনেক স্থলে মুতাক্ষরীণকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তাহার মত আমরা সকল সময়ে গ্রহণ করিতে পারি নাই। মুতাক্ষরীণে সমসাময়িক ঘটনার বিবরণ থাকিলেও তাহার মতামত যে নিরপেক্ষ তাহা কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারিবেন না। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের সহিত মুতাক্ষরীণকারের যে ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল, তাহা তাঁহার গ্রন্থ অনুশীলন করিলে সুচারুরূপে বুঝা যায়। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই মূল গ্রন্থের অনুবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। রেমণ্ড বা হাজী মুস্তাফা তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া সেই অনুবাদ গ্রন্থ তাঁহারই নামে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, মুতাক্ষরীণকার পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি সমসাময়িক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিলেও তাঁহার মতামত যে নিরপেক্ষ ছিল, তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না; বর্ত্তমান সময়ে ইংলিশম্যান পত্রে বাঙ্গলার রাজনৈতিক ব্যাপারের ঘটনাবলী প্রকাশিত হইয়া যেরূপ মতামত প্রকাশিত হইতেছে, শত বৎসর পরে কোন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু এই সময়ের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে লিখিত বিবরণাদির সহিত ঐক্য করিয়া তাহার কিরূপ worth প্রদান করিতে পারেন, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মুতাক্ষরীণে অনেক পরিমাণে যে সেইরূপ মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অন্যান্য গ্রন্থের সহিত আলোচনা করিলে সুচারুরূপে বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য আমরা তাহাকে ইংলিশম্যানের সহিত তুলনা করিতে চাহি না। কিন্তু তাহা যে পক্ষ-

পাণ্ডিত্যদোষে অনেক পরিমাণে দুষ্ট তাহা অস্বীকার করা যায় না। এরূপ স্থলে মুতাক্ষরীণের মত যে সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই আমরা বিবেচনা করিয়া থাকি।

মুতাক্ষরীণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে তাহাতে লিখিত দুই একটি বিষয়ের কথা বলিয়া আমরা যোগীন্দ্র বাবুর অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দানে চেষ্টা করিব। মুতাক্ষরীণকার মহম্মদ রেজা খাঁর সহিত নন্দকুমারের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি রেজা খাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া নন্দকুমারের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। রেজা খাঁ কিরূপ ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, রেজা খাঁর চাউলের একচেটিয়া ব্যবসায় তাহার অন্যতম কারণ। তদ্ব্যতীত নিজা-মতের তহবিল তছরুপাত প্রভৃতি ব্যাপার যাঁহার দ্বারা ঘটিয়াছিল, তিনি যে কিরূপ ব্যবহার পাইতে পারেন তাহা সাধারণে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

মুতাক্ষরীণকার আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, নন্দকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার অগাধ সম্পত্তিসহ তাঁহার বাক্সে অনেকগুলি বড় বড় লোকের নামের জাল শীল মোহরও পাওয়া যায়। এইটি মুতাক্ষরীণকারের গ্রন্থ ব্যতীত আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য সমসাময়িক ব্যক্তি যাঁহারা নন্দকুমারকে অন্যভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ইহার উল্লেখ করেন নাই। অন্য কোন স্থানে ইহার বিন্দুমাত্র উল্লেখ না থাকায়, আমরা মুতাক্ষরীণকারের উপরোক্ত উক্তিকে স্বীকার করিতে পারি নাই।

তাহার পর যোগীন্দ্র বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, আমরা তৎসম্বন্ধে অনেক কথা খরচ করিয়াছি লিখিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবুর উক্তি সম্বন্ধে কেন আমাদিগকে অনেক কথা খরচ করিতে

হইয়াছে, তাহা বোধ হয় যোগীন্দ্র বাবু মুর্শিদাবাদকাহিনীর ২য় সংস্করণে পাঠ করিয়া থাকিবেন। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। বার্ক নন্দকুমারকে যে Great Rajah Nonda Comur বলিয়াছেন, যোগীন্দ্র বাবু এই Great Rajahকে মহারাজা অর্থ করিতে চাহেন। বার্ক মহারাজা কথাটির অনুবাদ যে Great Rajah করিয়াছেন, তাহা যোগীন্দ্র বাবু ব্যতীত আর কেহ স্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। বার্ক মহারাজা কথাটি ব্যবহারের ইচ্ছা করিলে Maharjahই বলিতেন। কারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি অনেক বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। তাহার নবাব, বাদসাহ, রাজা, মহারাজা এ সমস্ত কিছুই তাঁহার অবিদিত ছিল না।

আমার একজন বন্ধু বর্ত্তমান উপাধিধারী রাজা মহারাজাদিগকে রহস্য করিয়া King, Great King বলিয়া থাকেন। বার্ক যদি সেইরূপ Great King কথাটি ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলেও শোভা পাইত। কিন্তু তিনি মহারাজার স্থলে Great Rajah ব্যবহার করিয়াছেন ইহা আমাদের বুদ্ধিতে আসেনা। তাহার পর বার্ক যে Party feeling এর বশবর্ত্তী হইয়া নন্দকুমারকে Patriot বলিয়াছেন ইহাও যোগীন্দ্র বাবুর কল্পিত উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে নন্দকুমার যোগীন্দ্র বাবুর মতে পাষণ্ড ও নগেন্দ্র বাবুর মতে Villain, বার্কের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাকে অন্যরূপ না দেখিলে কেবল যে Party feeling এর বশে ঐরূপ চিত্রিত করিবেন, ইহা কাহারও মনে লয় না। তবে Party feeling এ অতিরঞ্জন হইতে পারে। অতিরঞ্জন অর্থে বর্ণান্তরীকরণ নহে। যাহার যে বর্ণ আছে তাহাকে গাঢ় করিয়া তোলার নাম অতিরঞ্জন। একটি প্রাচীন কথা আছে যে, "নহি নীলং শিল্পিসহস্রেনাপি শক্যং পীতং কর্ত্তুম্।" শিল্পিসহস্র কদাচ নীলকে পীত করিতে পারে না, সেইরূপ নন্দকুমারকে কৃষ্ণ জানিয়া বার্কের ন্যায় পুরুষ কখনও তাঁহাকে পীত করিতে চেষ্টা পাইতেন না।

চেষ্টা না করিয়া অনায়াসে ইংরেজদিগের সহিত যোগ দিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তিনি ঘোর বিপদ মস্তকে লইয়াও যথন মীরজাফরের ও বঙ্গদেশের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন চন্দননগর অর্পণ তাঁহার জীবনের ভ্রম ব্যতীত কদাচ তাঁহার চরিত্র-ধর্ম্ম বলা যায় না। তাহার পর নন্দকুমারের ইংরেজদিগের নিকট হইতে ১২ হাজার টাকা লওয়ার কথায় আমাদের যে আস্থা নাই সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এক্ষণেও তাহাই বলিতেছি। কারণ ১২ হাজার টাকা হুগলীর ফৌজদারের নিকট অতি সামান্য অর্থই ছিল। হুগলীর ফৌজদারের বেতন অনেক ছিল। তদ্ব্যতীত হুগলী প্রসিদ্ধ বন্দর হওয়ায় ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে ফৌজদারের অনেক টাকা প্রাপ্য ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস খাঁজেহান নামক এক ব্যক্তিকে বার্ষিক ৭২০০০ টাকায় হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে নিজে বৎসরে ৩৬ হাজার টাকা ও তাঁহার দেওয়ান কান্তবাবু হাজার টাকা উৎকোচ লইতেন। সেই পদের লোকের পক্ষে ১২ হাজার টাকা যে সামান্য তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। অর্মে বলিয়াছেন বলিয়াই যে মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ যুক্তির সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারি না। হুগলীর ফৌজদারী প্রাপ্তির পূর্ব্বে নন্দকুমার হুগলীর দেওয়ান হন, শুল্ক বিভাগ হইতে অনেক অর্থ তিনি উপার্জ্জন করেন, যদিও তৎপূর্ব্বে তিনি অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু হুগলীর দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া তিনি অনেক অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিকট ১২ হাজার টাকা যে সামান্য ইহা আমরা সাহসসহকারে বলিতে পারি। ১২ বার হাজার টাকার জন্য নন্দকুমার কদাচ এরূপ একটি গুরুতর পাপ করেন নাই।

যোগীন্দ্র বাবু আমাদের লিখিত নবকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় মাসিক ৬০ টাকা বেতনের মুন্সীর যে এরূপ রাজনৈতিক শক্তি ছিল, তাহা আমরা এই

প্রথম শুনিলাম। এইটুকু মাত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, নন্দকুমারও ক্লাইভ সাহেবের মুন্সী ছিলেন, তবে নন্দকুমারের ন্যায় নবকৃষ্ণে রাজনৈতিক শক্তি প্রযোজ্য হইতে পারে না কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাহি যে, যোগীন্দ্র বাবু আমাদের উক্তির পূর্ব্বে যদি নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের উক্তিটি উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে সাধারণে তাহার বিচার করিতেন। তিনি না করিলেও আমরাই তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"What learned historians have been able to observe after a long and careful observation, Nubkissen saw at once with the shrewd eye of a practical statesman. Nubkissen, so far as he helped the consummation, did so out of the same necessity which compelled Englishmen to invite William of Orange to occupy the throne rendered vacant by the constructive abdication of James II."

এ সময়ে নবকৃষ্ণ ৬০ টাকার মুন্সী, নন্দকুমার কেবল ক্লাইভের মুন্সী ছিলেন না, তবে তিনি সামান্য কার্য্য হইতে শেষে বাঙ্গলা, বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাতে নবকৃষ্ণ অপেক্ষা রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ হওয়ার সম্ভব ছিল। তবে ঘোষ মহাশয় নবকৃষ্ণকে যেরূপ রাজনৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, আমরা নন্দকুমারকে ততদূর করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমরা লিখিয়াছি, তাঁহাতে রাজনৈতিক শক্তির বীজ ছিল, কিন্তু অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই।

যোগীন্দ্র বাবুর শেষ কথা এই যে, নন্দকুমারের হত্যায় কলিকাতাবাসিগণের মত থাকায় তাহাদের মতের মূল্য যে নবাব নাজিমের মত অপেক্ষা অধিক তাহা সকলে স্বীকার করিবেন। আমরা তাহা স্বীকার করি না, এবং সকলেই যে তাহা স্বীকার করিবেন, এরূপও বোধ হয় না। কারণ নবাব নাজিমের মত অপেক্ষা কলিকাতাবাসিগণের মতের

মূল্য অধিক ইহা কখনই বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ কলিকাতাবাসী অর্থে কি ওয়ারেন হেষ্টিংসের পদলেহনকারী জনকয়েক চাটুকার? কলিকাতার সাধারণ লোক যে ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অনেকে এই হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়াছিল, অনেকে কলিকাতা হইতে বালি প্রদেশে গিয়া বাস করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের ত কথাই নাই। ফলতঃ যোগীন্দ্র বাবুর এরূপ উক্তি অত্যন্ত লজ্জাকর সন্দেহ নাই।

আমরা যোগীন্দ্র বাবুর প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য উত্তর দানে চেষ্টা করিয়াছি। কেবল দুই একখানি গ্রন্থের মতের উপর নির্ভর করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমরা সমীচান মনে করি না। সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচারের পর যেরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হয়, তাহাই সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। আমরা কোন গ্রন্থের দোহাই দিতেছি না। নন্দকুমারের যে সমস্ত সৎকীর্ত্তি আজিও তাঁহার জন্মভূমিকে অলঙ্কৃত ও মুখর করিয়া রাখিয়াছে, যিনি মৃত্যুকালে বীরপুরুষের ন্যায় আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, কেবলমাত্র সেইরূপ তাঁহার জীবনের দুই একটি ঘটনায় তাঁহাকে জনসাধারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিয়া যিনি উমিচাঁদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তিনি যদি Hero হন, এবং তাঁহার জন্য যদি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের চেষ্টা হয়, তাহা হইলে নন্দকুমারকে Hero বলিলে বোধ হয়, তত দোষের হইবে না। উপসংহার কালে যোগীন্দ্র বাবুকে একটি কথা বলিতে চাহি। তিনি যখন আপনাকে বারম্বার তত্ত্বজিজ্ঞাসু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তখন আমরা বোধ হয় তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিলে তত দোষের হইবে না। সে উপদেশ আর কিছুই নহে,—

"Read and you will know"

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

ঐতিহাসিক চিত্র।

"বেহুলার" ঐতিহাসিকতা।

——:*:——

বঙ্গনরনারীর চির-পরিচিতা বেহুলাকে বঙ্গীয় পাঠকের নিকট নূতন আকারে উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। দীনেশবাবু বেহুলা'র অনতিহ্রস্ব ভূমিকায় দুই একটী ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক দীনেশ বাবুর সঙ্কলিত সত্য অবলম্বন করিয়া, আমরা আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

'বেহুলা'র ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, (১) কাণা হরিদত্ত ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে, মনসার ভাসান-গান রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরও পূর্ব্ববর্ত্তী ; (২) মনসার ভাসান-গান এক সময়ে বঙ্গীয় জন-সাধারণের এত প্রিয় ছিল যে, এতদ্দেশের প্রত্যেক জেলার লোকেরা ভাসান-গানের নায়ক চন্দ্রধরের নিবাসভূমি স্বীয় জন্মস্থানের অদূরবর্ত্তী কল্পনা করিয়া সুখানুভব করিত। এইরূপে বর্দ্ধমান, ধুবড়ী, বগুড়া, দার্জ্জিলিং, দিনাজপুর, মালদহ, চট্টগ্রাম, বীরভূম ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের স্থলবিশেষে বেহুলা আখ্যায়িকার কোন কোন অংশ অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া, তত্তৎস্থল-বাসীদের বিশ্বাস।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 'বেহুলার' বর্ণিত আখ্যায়িকা বহু প্রাচীনকাল হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সম্প্রতীক এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সামান্য কিছু মূল সত্য থাকা নিতান্তই সম্ভব। সামান্য সত্য অবলম্বনে কবির লেখনী-মুখে চিত্তাকর্ষক বিস্তৃত কাব্য রচিত হওয়া অসম্ভব নয়। চাঁদ সদাগরের না হউক, চৌদ্দডিঙ্গা নাই বা হউক, পূর্ব্বে যে নৌবাণিজ্য-প্রথা প্রচলিত ছিল, তৎসম্বন্ধে আপত্তি হইবার কারণ দেখা যায় না।

আখ্যায়িকা অংশে দেখিতে পাই, গন্ধবণিক চাঁদসদাগরের সহিত মনসা-দেবীর বিবাদ, সতী বেহুলার দ্বারা সেই বিবাদভঞ্জন ও সৌখ্যস্থাপন এবং পরিণামে মনসার পূজা-প্রচার। দেবতার সহিত মানুষের বিবাদ অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মনসা আগন্তুক দেবী ; মনসা শিবভক্ত হিন্দু চাঁদের নিকট পূজা-প্রার্থিনী। কোনও নিরক্ষর হিন্দু যদি যীশুখৃষ্টের বিরুদ্ধে অথবা নূতন আমদানী করা অন্য কোনও দেবদেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে, তাহা হইলে তাহার এবম্বিধ আচরণ কি আমাদের বুদ্ধির নিতান্তই অগম্য হয় ?

কখন কখন দেখা যায়, মৃত্তিকার বিশেষত্ববশতঃ কোনও নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে রোপিত অনেকগুলি বৃক্ষ তুল্যরূপে কৃশ অথবা সবল হইয়া উঠে। সেই প্রকার একইরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইতে দেখা যায়। ইহা একটী সর্ব্ববিদিত ঐতিহাসিক রহস্য। ভারতের পুনঃ পুনঃ উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, অথবা শতবর্ষ পূর্ব্বের মিণ্টোর শাসনকালের বাঙ্গালার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালার তুলনা করিলে, এই রহস্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

অতি প্রাচীনকালের ভারতেতিহাসে পরস্পর বিবদমান দুইটী প্রবল জাতি দেখিতে পাই। ইহাদের কেহই অন্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে উৎসাদিত হয় নাই। কিন্তু উভয় জাতির বিবাদ বহু-বহুবার ঘোর সমরানলে

পরিণত হইয়াছে। বহু অনার্য্য আর্য্যদলভুক্ত হইয়া গিয়াছে, পবিত্র আর্য্যরক্ত অনার্য্যরক্তের সংমিশ্রণে গৌরবান্বিত হইয়াছে, এইরূপও দেখা যায়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি একবার আর্য্যনামের অধিকারী হইয়াছেন, তিনিই অনার্য্যের সহিত সর্ব্বসংশ্রব ত্যাগ করিতে ব্যগ্র। তাই সেই আদি কলহ কখনও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই।

মনে করিও না, অনার্য্যেরা আর্য্যদের দ্বারা পাহাড়জঙ্গলে বিতাড়িত অথবা আর্য্যদের ভৃত্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে স্থানে স্থানে অনার্য্যশাসিত রাজ্য ছিল। আর্য্যেরা ইহাদিগকে ঘৃণা করিলেও সময় সময় ইহাদের সহিত সৌখ্যস্থাপন করিতে বাধ্য হইতেন। ব্রাহ্মণ চাণক্য অনার্য্যরাজবংশ স্থাপনের সহায়তা করেন, অনার্য্য গুহক রামচন্দ্রের বনগমনকালে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। অতিপূর্ব্বে জাতি-ভেদ প্রচলিত ছিল না; জাতিভেদ প্রচলনের পরেও আন্তর্জাতিক বিবাহ একবারে বন্ধ ছিল না; পরন্তু এখনও দলিলপত্রে যাহাই থাকুক, বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ কোনও ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরেও ব্যবহারতঃ একবারে রহিত আছে কি না, সন্দেহের বিষয়। পুরাণ বর্ণিত কালে মানুষে রাক্ষসে বিবাহের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে, ব্রাহ্মণ ধীবর-কন্যায় বিবাহের দৃষ্টান্তও আছে। রাজপুতদিগের সহিত অনার্য্য ভীলদের যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। দক্ষিণদেশের দ্রাবিড়ী প্রভৃতি জাতি বহুকাল যাবৎ আর্য্য সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ আর্য্য অনার্য্য উভয়েরই। উভয়েই বর্ত্তমান ভারতবর্ষ গঠন পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন। অনার্য্যেরা বিদেশী শত্রুর আক্রমণে বাধা দিয়া ভারতের হিতসাধন করিয়াছেন। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে একদল অসভ্য জাতির বাস ছিল। ইহারা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ও আততায়ী বধে সিদ্ধহস্ত। সেকেন্দর সাহ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তিনি 'তক্ষক' নামে অনার্য্যদলকে দেখিতে পান। রাজপুতনা ও পঞ্চনদের

অনার্য্যদের দৌরাত্ম্যে গজনিপতি স্থলতান মামুদকেও অস্থবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। ভারতবিজয়ী মহম্মদ ঘোরী "গোক্ষুর"দের হাতে নিহত হন। প্রাচীনাদের গল্পশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, "পাতালে সর্পরাজ বাস্থকি পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।" পুরাণে অনেক সর্পকে মানুষের মত চলিতে বলিতেও দেখা যায়। সর্পেরা অবশ্যই হীনভাবে থাকিত। অনুমান হয়, আর্য্যেরা অনার্য্য শাখাবিশেষকে অবজ্ঞাসূচক সর্পনামে অভিহিত করিতেন, কিন্তু ইহাদের ক্ষমতা একবারে অস্বীকার করিবার জো ছিল না। পূর্ব্বোক্ত 'তক্ষক' 'গোক্ষুর' শব্দ সর্পবোধক। এই সর্পেরা যে ভারত-রূপা পৃথিবীর রক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিত, তাহা নিঃসন্দেহ। প্রাচীন ভূগোলে সিন্ধুনদের 'ব' দ্বীপ 'পাতাল' নামে উক্ত হইয়াছে। সর্পবংশের বাসস্থান এই পাতাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকা সম্ভব, অথবা এই পাতাল সর্পবংশের আদি বাসস্থান হওয়া অসম্ভব নয়। সেকেন্দর সাহ কিম্বা স্থলতান মামুদের বহুপূর্ব্বে প্রাচীন সময়েও অনার্য্যেরা ঐ স্থানে ছিল এবং বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিত। সম্ভবতঃ সেই সময় হইতেই বাস্থকির পৃথিবী-ধারণের প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহেও অনার্য্যেরা সময় সময় যোগদান করিতেন।

অনার্য্যেরা ভাস্কর্য্য বিদ্যার অন্ততঃ কোন কোন শাখায় আর্য্যদের শিক্ষা-গুরু ছিলেন বলিয়া, মনে হয়। মহাভারত-বর্ণিত ময়দানব নির্ম্মিত সভামণ্ডপ অতীব বিচিত্র ও বহুবিষয়ে অদৃষ্টপূর্ব্ব হইয়াছিল। উত্তর ভারতবর্ষ যখন মুসলমানরাজাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দক্ষিণ ভারতের অনার্য্যবংশসম্ভূত আর্য্যদের দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাতেও অনার্য্যদের দান নিতান্ত সামান্য নহে। যাঁহারা মনে করেন, প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে সংস্কৃতের অনুযায়ী করিতে পারিলেই, বিভিন্ন প্রদেশের

জনগণের মনোভাব আদানপ্রদানের সুবিধা হইবে, তাঁহারা ভারতীয় ভাষার উপর অনার্য্যজাতির প্রভাবের কথাটা সকল সময় মনে রাখেন কি না বলিতে পারি না।

উপরি-উক্ত বিষয় ব্যতীত, অনার্য্যদের নিকট আমরা আরও কতকগুলি বিষয় পাইয়াছি। অনার্য্যদেবদেবী পূজা তাহাদের অন্যতম। শুনা-যায়, আর্য্যেরা যখন যেখানে থাকুক, মহানঈশ্বরের অভিব্যক্তি ব্যতীত, খল, নৃশংস ও অত্যাচারী প্রকৃতির কোনও দেবদেবীর উপাসনা করিতেন না। নাগপূজা বা মনসাপূজা অনার্য্যদের আমদানী। অনার্য্যেরা পৃথিবীর অনেক স্থানে নাগপূজা করিতেন, হয়ত ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা এই জন্যই অনার্য্যজাতির শাখাবিশেষকে 'সর্প,' 'নাগ,' 'তক্ষক,' 'গোক্ষুর' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন।

আর্য্যানার্য্যের সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণ শুধু যে বৈদিক সময়েই ঘটিয়াছিল তাহা নহে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বেরেলী প্রদেশে অনার্য্যদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, একটী আর্য্যরাজ্য স্থাপিত হয়। এইরূপ বহুসংঘর্ষ ও সংমিশ্রণে আর্য্যানার্য্যের ভাবের আদানপ্রদান অনেকবার হইয়াছে। এইরূপ কোনও একস্থলে বা একাধিকস্থলে এরূপ হওয়া সম্ভব যে আর্য্যগণ্ডীর কেহ কেহ নির্ব্বিবাদে নাগপূজায় যোগদান করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ সহজে নূতনদেবীর পূজা করিতে রাজী হন নাই। চাঁদ সদাগরের আখ্যায়িকার মূলে এরূপ কোনও ঘটনা থাকা সম্ভব।

হিন্দু পুরাণে নাগবংশকে প্রথমতঃ নিতান্ত হীনাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের পরাক্রমবলেই হউক, অথবা আর্য্য সমাজের অন্তর্বিবাদের দরুণই হউক, অথবা একত্র সহবাস-জাত স্বাভাবিক সৌহার্দ্দ-বশতঃই হউক, উত্তরকালে আর্য্য-সন্তানেরা ইহাদের সহিত যোগ দিতেন। বাসুকির সাহায্যে সমুদ্র-মন্থন হইয়াছিল। বাসুকির ভগিনী

মনসাকে প্রথম অবস্থায় সামান্য অনার্য্যকন্যার বেশে দেখিতে পাওয়া যায়। জরৎকারু মুনি বিবাহের জন্য পাত্রী অন্বেষণ করিয়া কোথাও সফল-কাম হইতে পারিলেন না, অবশেষে পাতালে মনসাকে বিবাহ করেন। মনসার প্রতি জরৎকারুর ব্যবহার নিতান্তই অবজ্ঞাসূচক ছিল। মনসা আপনার হীনাবস্থা স্মরণ করিয়া সকল সহ্য করিতেন এবং স্বামীকে আর্য্য-রমণীর মত ভক্তি করিতেন। মনসার পুত্র আস্তিক আর্য্যের অনুষ্ঠেয় আচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আর্য্যদেরও প্রশংসা-ভাজন হন। মহারাজ জনমেজয় তাঁহার সচ্চরিত্রতা ও সুনীতির পরিচয় পাইয়া, তাঁহারই অনুরোধে সর্পরূপী অনার্য্য-বধে ক্ষান্ত হন। এই ঘটনাতে মনসার প্রতি সর্পবংশীয়দের সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। পরিণামে মনসা অনার্য্য-দেবীর আসনে উন্নীত হইয়াছিল। আর্য্যেরা অনার্য্যের নিকট হইতে বহুবিধ হিতকর ও অহিতকর জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে মনসাপূজাও প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে নূতন মত অনেকেই অবাধে গ্রহণ করিতে চায় না। আর্য্যেরা সকলেই যে আগ্রহের সহিত মনসাপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। আর্য্যসমাজে মনসাপূজা-প্রচার সম্বন্ধে অনেকবার অনেকস্থানে বিবাদ হইয়া থাকিবেক। এইরূপ একটী আখ্যায়িকা চাঁদের গল্পের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আর্য্যসমাজের নিম্নস্তর উচ্চস্তর হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিচ্ছিন্ন। আর্য্য-দের উচ্চভাব ও বীরত্ব অনেক সময় নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত পহুঁছিতে পায় না, আবার নিম্নশ্রেণীর আর্য্যদের স্বাভাবিক প্রতিভা আর্য্যসমাজের কোনও উপকারে না আসিয়া ক্ষুদ্রগণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া কালে নষ্ট হইয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর আর্য্যেরা অনেক সময় আর্য্য-সমাজ-বিগর্হিত আচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা

একটু স্বতন্ত্রভাবে চলে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা পূজাপার্ব্বণ সম্বন্ধেও কিয়ৎপরিমাণে মুসলমানদের অনুকরণ করিয়া থাকে, দেখা গিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর আর্য্যেরা অনার্য্যের দেবদেবী না মানিলেও, নিম্নশ্রেণীর আর্য্যেরা তাহা মানিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গন্ধ-বণিক চাঁদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব অনেকেই মনসাভক্ত ছিল। কিন্তু মানসিক তেজ, দর্প, উচ্চ-আদর্শের সম্মান উচ্চশ্রেণীতেই আবদ্ধ থাকে না। স্বদলস্থ অনেকে মনসাপূজা করিলেও চাঁদ তাহাতে রাজি হইলেন না। আমরা বলিতেছি না যে, চাঁদ চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্যে যান, তাহারই সহিত মনসার বিবাদ হয়, তিনিই অনার্য্যদেবীকে প্রত্যাখ্যান করেন। এক আখ্যায়িকা অন্য আখ্যায়িকার সহিত বিজড়িত বা কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু কল্পনারও বাস্তব মূল আছে। এখনও দেখা যায়, মনসা নিম্ন ও অশিক্ষিত শ্রেণীতে অধিক সম্মানিতা। কোন কোন স্থানে ভদ্রলোকেরাও সমারোহ করিয়া মনসাপূজা করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা প্রায়শঃ কালী, হরি প্রভৃতি অন্য দেবদেবীর পূজাতেও তৎপর, কিন্তু ইতরশ্রেণীতে এমন অনেককে দেখা যায়, যাহারা কালী, হরি প্রভৃতিকে মানিলেও ঘটস্থাপনাদিদ্বারা একমাত্র মনসারই পূজা করে। হইতে পারে যে, নিম্নশ্রেণীর আর্য্যেরা অনার্য্যদের নিকট হইতে মনসাপূজা গ্রহণ করিয়া, উচ্চস্তর পর্য্যন্ত প্রচার করিয়াছেন।

সমাজ যখন সজীব থাকে তখন অপরের নিকট হইতে গৃহীত ভাব-রাশি জীবনোপযোগী করিয়া লইতে পারে। হিন্দুসমাজ অনার্য্যের সর্প-পূজা গ্রহণ করিয়া তাহাকে স্বকীয় মহত্ত্বের সহিত অন্বিত করিয়া মহতী করিয়া ফেলিয়াছে। হিন্দুর অনন্তত্বের মহানুভাব নাগে আরোপিত হইয়াছে। অনন্ত-নাগ, শেষ-নাগ প্রভৃতি শব্দ কি উদার ভাবের পরি-চায়ক!

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অনার্য্যের নিকট হইতে কোন কোন

বিষয় আর্য্যসমাজে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া, আর্য্যদের কুণ্ঠিত হওয়া উচি‍ নয়। আর্য্যেরা অনেক বিষয়ে অনার্য্যের নিকট ঋণী। এই ঋ‍ স্বীকার করিলে এবং অনার্য্যের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে পারিলে আর্য্যদের উন্নতির পথ কথঞ্চিৎ পরিস্কৃত হইতে পারে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন বি, এ,।

[কোচবিহার প্রদেশস্থ মাথাভাঙ্গা ছাত্রসমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত। বাহুল্যভয়ে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের মতের প্রতিবাদ করা গেল না।]

বুদ্ধাস্থির পরিণাম কি হইবে ?

[বিষ্ণু-পঞ্জর দেশছাড়া হইয়া যায় !]

আজ প্রায় আড়াই হাজার (২৩৮৫) বৎসর অতীত হইতে চলিল,— পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান চারিটি ধর্ম্মের মধ্যে একতমের প্রতিষ্ঠাতা, জগতের জ্যোতিঃ-স্বরূপ, ভারতবর্ষের একজন প্রধান ধর্ম্মোপদেশক, একজন পরমযোগী, মহাতপস্বী, নির্ব্বাণ-মুক্তির উপদেষ্টা, আত্মদর্শী মহাপুরুষ, ভগবান গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। জগতের অন্য একটি বিশাল ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ যীশু খৃষ্টের আবির্ভাবের ৪৭৭ বৎসর পূর্ব্বে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন উত্তরভারতে শিশুনাগ বংশীয় মগধরাজ মহারাজ অজাতশত্রুই রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্। বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য, ভাগবত প্রভৃতি মহাপুরাণে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ইঁহারই রাজত্বকালের অষ্টমবর্ষে ভগবান বুদ্ধদেব দেহরক্ষা করেন।

গোরক্ষপুরের নিকট বর্ত্তমান কাশিয়া গ্রামে অর্থাৎ সেকালের কুশীনগরের উপকণ্ঠে হিরণ্যবতী নদীতীরে শালবনের মধ্যে এক

বৃহৎ শালবৃক্ষের তলায়, এক মঞ্চের উপর দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া, ভগবান বুদ্ধদেব শিষ্যগণকে উপদেশ দিতে দিতে সমাধিস্থ হইয়া মহা-পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। আনন্দপ্রমুখ শিষ্য ও সহচরবর্গ ভিক্ষু-সঙ্ঘ এবং কুশীনগরের মল্লগণ তাঁহার দেহ কার্পাসে আবৃত করিয়া ও পাঁচশত খণ্ড পবিত্র বস্ত্রে জড়াইয়া গন্ধতৈলপূর্ণ লৌহপাত্রে রাখিয়া সাত দিন পর্য্যন্ত রক্ষা করেন এবং প্রত্যহ নৃত্য, গীত, বাদ্যভাণ্ডসহ সেই দেহের পূজা করেন। ইতিমধ্যে ভগবানের শিষ্য ও অনুগৃহীত রাজন্যবর্গকে সংবাদ প্রেরণ করা হয়। সাত দিন পরে তাঁহারা সেই দেহ বন হইতে নগর মধ্যে 'মুকুট-বন্ধন' চৈত্য মধ্যে স্থানান্তরিত করেন এবং সৎকারের আয়োজন করেন। কেবল চন্দনাদি সুবাসিত ও পবিত্র কাষ্ঠের চিতায় ভগবানের দেহ দাহ করা হয়। মাংস, বসা, মেদ, রস, রক্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভস্মীভূত হইয়া গেল, অঙ্গারী-ভূত অস্থি সকল পড়িয়া আছে দেখা গেল। পবিত্র দেহের এই অবশেষের গতি কি করা যাইবে—বিবেচনা করিবার জন্য সকলে সেই চিতাপার্শ্বে সতর্ক হইয়া দিবা-রাত্র বসিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে মগধরাজ অজাতশত্রুর দূত, বৈশালীর লিচ্ছবি-ক্ষত্রিয়গণ, কপিলবাস্তুর শাক্য-ক্ষত্রিয়গণ অল্পকল্পের বুলয়গণ, রাম গ্রামের কোলিয়গণ, পাবাগ্রামের মল্লগণ, বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ সেই পবিত্র দেহাবশেষ লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন,—'আমরা এই পবিত্র দেহাবশেষের উপর স্তূপনির্ম্মাণ করিয়া ইহা চিরকাল রক্ষা করিব। এই সকল স্তূপ দর্শন করিয়া লোকে যুগ-যুগান্তরকাল প্রসন্নতালাভ করিবে।'—কুশীনগরের মল্লগণ কিন্তু বাধা দিয়া বলিলেন,—'ভগবান আমাদের গ্রামে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার দেহাবশেষ ক্ষেত্রান্তর হইতে দিব না,—কাহাকেও অংশ লইতে দিব না।'—তখন দ্রোণ নামে এক ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'ভগবান বুদ্ধদেব ক্ষান্তিবাদী ছিলেন। আমরা তাঁহার দেহা-

বশেষ লইয়া বিবাদ করি কেন? এস, আমরা সুপ্রণয়ে সকলেই ইহা বিভাগ করিয়া লই।'—অবশেষে এই প্রস্তাব স্বীকৃত হইল। দ্রোণ তখন একটি দ্রোণীতে অর্থাৎ কলসীতে করিয়া সমস্ত অস্থি সমান আট-ভাগ করিলেন এবং বলিলেন,—এই কলসীটি পবিত্র দেহাবশেষ স্পর্শে পরম পবিত্র হইয়াছে। আমায় এই কলসীটি দিন, আমি একা ইহারই উপর একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিব। ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ইহার পরেই পিপ্‌পলীবনের ক্ষত্রিয়গণ উপস্থিত হইয়া, ভগবানের দেহাবশেষ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তখন আর কিছুই অবশিষ্ট নাই দেখিয়া, তাঁহারা চিতার ভস্মরাশি সংগ্রহ করিয়া লইলেন এবং তাহারই উপর স্তূপ-নির্ম্মাণ করিতে স্বীকার করিলেন। যেখানে ভগবানের চিতা স্থাপিত হইয়াছিল, মহারাজ অজাতশত্রু সেই স্থানে চতুর্ম্মহাপথের উপর একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এইরূপে বুদ্ধদেহাবশেষের উপর আটটি অস্থিস্তূপ, একটি কুম্ভস্তূপ, একটি ভস্মস্তূপ, এই দশটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বুদ্ধদেবের দন্ত, কেশ, কন্থা, গাত্রাবরণ, কমণ্ডলু ইত্যাদি লইয়াও ভারতের নানাস্থানে নানা স্তূপ ও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বুদ্ধ-পরিনির্ব্বাণের কিঞ্চিদধিক ২৫০ বৎসর পরে যখন মৌর্য্যবংশীয় মগধরাজ অশোক উত্তর ভারতে সম্রাট্ হন, তখন এই সকল স্তূপের অনেকগুলি ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি সেই সকল স্তূপ হইতে বুদ্ধ-দেহাবশেষ সকল সংগ্রহ ও পুনরায় বিভাগ করিয়া বুদ্ধজীবনের প্রতি স্মরণীয় স্থানে রক্ষা করিয়া স্তূপ, বিহার ও স্তম্ভাদি প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ অশোকের পর প্রায় ১৫০ বৎসর পরে, শকবংশীয় মহারাজ কনিষ্ক গান্ধার প্রদেশে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হন এবং পুরুষপুর নগরে (বর্ত্তমান পেশোয়ার নগরে) রাজধানী স্থাপন করেন। এই কুষণ বংশীয় শক সম্রাট্ কনিষ্কও মহারাজ অশোকের ন্যায় ভগ্ন ও নষ্টপ্রায় স্তূপাদি হইতে

বৌদ্ধ চিহ্নাদি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নূতন নূতন স্তূপ ও বিহারাদি স্থাপন করেন। তাঁহার সময়ে গান্ধার রাজ্যে এবং তাহার উপকণ্ঠ প্রদেশে বহু বৌদ্ধ চিহ্নের স্তূপ-নির্ম্মিত হয়। তিনি রাজধানী পুরুষপুরে একটি উচ্চ স্তূপ ও এক অতি বৃহৎ বিহার নির্ম্মাণ করান। ইহাতে বহুবিধ বুদ্ধদেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছিল। তাহার পর যখন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক য়ুআন-চুআঙ্ এদেশে ভ্রমণে আসেন, তখন তিনি এই পুরুষপুরে এক অতি মহাকায় পুরাতন বিহারের ভগ্নাবশেষ দর্শন করেন, তখনও তাহাতে বহু শ্রমণের বাস ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি একটি অতি উচ্চ স্তূপও দেখিয়াছিলেন। সেটির তখন জীর্ণ-সংস্কার হইতেছিল। তিনি এদেশে আসিবার পূর্ব্বে উহা অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অনুসন্ধানে তিনি জানিয়াছিলেন যে, ঐ মহাকায় বিহারটিই সম্রাট্ কানষ্কের নির্ম্মিত ‘মহাবিহার’ ও স্তূপটিই তাঁহার ‘মহাস্তূপ’। য়ুআন্-চুআঙ্ এই স্তূপটিকে ৪০০ ফুট উচ্চ, পঁচিশ চূড়া বিশিষ্ট, পঞ্চতল দেখিয়াছিলেন। ইহার সর্ব্বনিম্নতলের উচ্চতা তিনি বলেন ১৫০ ফুট ছিল। পঁচিশটি চূড়ার মাথায় পঁচিশখানি স্বর্ণরঞ্জিত বৃহৎ তাম্রচক্র ছিল। তিনি ইহার মধ্যে বহুবিধ বুদ্ধাদেহাবশেষ, বুদ্ধব্যবহৃত দ্রব্য ও স্মৃতিচিহ্ন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত নানাবিধ দ্রব্যাদি সংরক্ষিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। এইস্থানে বুদ্ধদেবের একখানি ষোলফুট উচ্চ চিত্রিত ছবি ছিল। উহাতে বুদ্ধদেবের এক দেহে দ্বিমস্তকযুক্ত মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। এই স্তূপের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে শতপদমাত্র দূরে তিনি এক ১৮ ফুট উচ্চ শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত এক দণ্ডায়মান বুদ্ধ-প্রতিমা দর্শন করেন। উহা উত্তর মুখে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

চীন-পরিব্রাজকের এই বর্ণনার পর আর বহুকাল এই সকল স্তূপ-বিহারাদির কোন বিবরণ কোথাও লিখিত হইতে দেখা যায় নাই। য়ুআন-চুআঙের বিবরণ দেখিয়া অবধি আমাদের বর্ত্তমান ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বহু মনীষী কর্ম্মচারী এতদিন ইহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু কেহই সন্ধানে কৃতকার্য্য হন নাই। তাহাতে অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ভারতের সর্ব্বনাশকারী গিজনীর সুলতানই পুনঃ পুনঃ ভারত-প্রবেশকালে ইহার ধ্বংসসাধন করিয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রাচ্য-তত্ত্ববিৎ ফরাসী পণ্ডিত মুশে ফুশার ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন পেশোয়ারের অর্দ্ধমাইল দূরে মাঠের মধ্যে দুটি অদ্ভুত মৃত্তিকা ইষ্টক ও প্রস্তর মিশ্রিত স্তূপ দেখিতে পান। তিনি এ দুটিকে কোন প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান মাত্র করেন এবং আমাদের ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে উহার সংবাদ দিয়া চলিয়া যান। তৎপরে ঐ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ মার্শ্যাল ও তাঁহার সহকারী ডাঃ স্কুনার উহা উৎখাত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অধ্যবসায়ে, যত্নে, পরিশ্রমে ঐ দুই স্তূপের মধ্যে ছোটটি হইতে যে অমূল্য সামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এ জগতে একান্ত দুর্ল্লভ। ঐ স্তূপের মধ্যে ৩০ ফুট নিম্নে ভূগর্ভের মধ্যে প্রস্তরময় সমাধি কক্ষের অভ্যন্তর হইতে রাজা কনিষ্কের নামাঙ্কিত, তাঁহার মূর্ত্তিযুক্ত, পিত্তলের কৌটামধ্যে, রাজা কনিষ্কের শিলমোহর ও রাজচিহ্নাঙ্কিত স্ফটিকাধারে তিনখণ্ড বুদ্ধাস্থি পাওয়া গিয়াছে!

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে যখন নেপাল-সীমান্তে একটি বৌদ্ধস্তূপ উৎখাত করিয়া এইরূপ স্ফটিকাধারে রক্ষিত বুদ্ধের দেহভস্ম আবিষ্কৃত হয়, তখন আমাদের দয়ালু গভর্ণমেণ্ট এই অমূল্যরত্ন বর্ত্তমানকালের বৌদ্ধরাজ্যগুলির বিহারে অর্থাৎ জাপান, চীন, শ্যাম, ব্রহ্ম ও সিংহলের বিহারে ভাগ করিয়া দেন। সেদিন সিমলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে,—এবারেও নাকি এই পেশোয়ারে প্রাপ্ত এই পরম পবিত্র মহা-দুর্ল্লভ বস্তুও ঐ সকল দেশের বিহারগুলিতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে!

ভারত-গভর্ণমেণ্টের এই সঙ্কল্পে এবার আমরা হিন্দুবৌদ্ধ-নির্ব্বিশেষে

সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিবাদ করিতেছি। বৌদ্ধতীর্থ সমস্তই এই ভারতবর্ষেই বর্ত্তমান। তাহার কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ও কতকগুলি এখনও লুপ্ত রহিয়াছে। ভারতবাসীর ভাগ্যক্রমে যদি আজ আর একটি তীর্থস্থান —যেখানে ভগবানের দেহাবশেষ সুরক্ষিত ছিল—সেই স্থান যদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তবে গভর্ণমেণ্ট কেন তাহার পবিত্রতা লোপ করেন ? কেন তাহার পরমরত্ন অপহরণ করিয়া বিদেশে বিলাইয়া দেন ? যে রত্ন কক্ষে ধারণ করিয়া এই স্তূপটি দুই হাজার বৎসরকাল কালের সকল ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আজ গভর্ণমেণ্ট কেবল খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন বলিয়া তাহা বিলাইয়া দিবেন!—ইহার কোন যুক্তি আমরা দেখিতে পাই না। হইতে পারে, ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের সে প্রাবল্য নাই, বৌদ্ধতীর্থরক্ষার ক্ষমতা ভারতীয় বৌদ্ধের এখন নাই, কিন্তু ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন লোপ হয় নাই, এখনও যখন চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল হইতে বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কপিলবাস্তু, বৈশালী, কুশীনগর প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থ দর্শনে বহু তীর্থযাত্রী ভারতে আসিয়া থাকেন, তখন গভর্ণমেণ্ট কোন্ যুক্তিতে বুদ্ধদেহাবশেষ পাইলেই, অমনি ভারতের বাহিরে বিলাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন ? চট্টগ্রামে এখন বহু বৌদ্ধ আছেন, ভূটানে, সিকিমে, নেপালে বৌদ্ধের সংখ্যা বড় অল্প নয়। এই কলিকাতা নগরেই বৌদ্ধ বাস কি কম ? এখানেও 'বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর' নামে একটি বিহার আছে। সেখানে রীতিমত শাস্ত্রানুসারে ভিক্ষুরা বাস করেন। এই ভিক্ষুগণের পরিচালনায় বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা বা Bengal Buddhist Association নামে বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের মুখপাত্রস্বরূপ একসভা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়া এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধতীর্থগুলি সংরক্ষণকল্পে খুব পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। এই সভার সম্পাদক মহাশয় টেলিগ্রাম যোগে গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, বুদ্ধের অস্থি ভারতীয় কোন বৌদ্ধ-তীর্থে রাখা হউক। যদি গভর্ণমেণ্ট একান্ত রাখিতে না পারেন এবং ভাগ

করিয়া দিতে প্রস্তুত হন তবে বঙ্গীয় বৌদ্ধগণকে তাহার অংশ দেওয়া হউক। সিংহলের ভিক্ষু-সঙ্ঘের নেতা শ্রীসুমঙ্গল মহাস্থবির মহোদয়ও মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বুদ্ধের পবিত্র অস্থি ভাগ করিয়া বিদেশে না পাঠাইয়া ভারতের কোন তীর্থ স্থানে রাখাই ভাল। শুনা যায়, ভারতবাসী বৌদ্ধ সংখ্যায় ৭০ লক্ষ হইবে। গভর্ণমেণ্ট যদি এই পবিত্র বস্তু দান করিয়াই পুণ্য, প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিতে চাহেন, এই ৭০ লক্ষ লোকেরই হাতে উহা দিন না কেন?

বৌদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও গভর্ণমেণ্ট ৭২ কোটী ভারতবাসীকেই বা কেন বঞ্চিত করিতেছেন তাহাও বুঝিয়া পাই না। ভগবান বুদ্ধ ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতার—সমস্ত হিন্দুর নমস্য, সমস্ত হিন্দুর পূজ্য। যদিই ভাগ্যক্রমে প্রকৃত-প্রস্তাবে 'বিষ্ণুপঞ্জর' আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, কোন্ হিন্দু তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন? আমরা যে বিষ্ণুপঞ্জরের দোহাই দিয়া দারু-ব্রহ্ম জগন্নাথকে আজ কত শত বৎসর পূজা করিয়া আসিতেছি,—সেই বিষ্ণুপঞ্জর আজ প্রত্যক্ষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত,—আর আমরা অম্লানবদনে তাহা ত্যাগ করিব? প্রবাদ আছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরান্তে প্রভাসে যে নিম্ববৃক্ষে বসিয়া জরাব্যাধের বাণে আহত হইয়া দেহত্যাগ করেন, সেই নিম্ববৃক্ষেই তিনি আবির্ভূত হইয়া মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মুখে উপস্থিত হন। ইহা বিশ্বাস করিলেও তবু ইহাতে আধার-আধেয়ের যে পার্থক্য, তাহাতো আছেই, কিন্তু আজ যে বিষ্ণুপঞ্জর আমাদের সম্মুখে ভূগর্ভ হইতে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহা স্বয়ং ভগবানের নবম অবতারের দেহাবশেষ! যে গোবিন্দজী বিগ্রহকে আওরঙ্গজেবের ভয়ে বৃন্দাবন হইতে লইয়া গিয়া জয়পুরে রাখা হইয়াছে, তাঁহাকেই আমরা প্রকৃত 'বৃন্দাবন-চন্দ্র' বলিয়া জানি, কিন্তু তিনি বৃন্দাবনের উদ্ধারকর্ত্তা রূপসনাতনের আবিষ্কৃত এবং অনিরুদ্ধতনয় মহারাজ বজ্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নহেন। আজ যে অমূল্য রত্ন আমাদের সম্মুখে

উপস্থিত, তাহা কাহারও স্থাপিত কৃত্রিম প্রতিমা নহে, তাহা সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার-শরীরের অংশ-বিশেষ! ইহাতেও যদি আমাদের হিন্দুর অধিকার না থাকে, তবে কিসে আছে ?

হে স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ, হে সধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধগণ,—আজ ভগবানেরই পরম করুণায় তাঁহারই দেহাবশেষ ডাঃ স্পুনারকে উপলক্ষ করিয়া তোমাদের সম্মুখেই স্বপ্রকাশিত হইয়াছে। তোমাদের পবিত্র ভারতভূমি এইরূপ পরম পবিত্র বস্তু সকল ধারণ করে বলিয়াই এত পবিত্র। ভগবানের অবতার-শরীরের অবশেষ আর কোনও দেশে নাই। যদি আজ ভাগ্যক্রমে বিষ্ণুপঞ্জরের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে, এস, আর তাহা নষ্ট হইতে দিও না। একে আমাদের দেশের সকল রকমে দুর্দ্দশা, তাহার উপর আবার যদি দেশ হইতে প্রকৃত বিষ্ণুপঞ্জর বাহির হইয়া যায়, তবে কিসের বলে এদেশের ধর্ম্মরক্ষা করিবে, পবিত্রতা রক্ষা করিবে? বেদবিশ্বাসী হিন্দু যজ্ঞাদি-ক্রিয়াশীল হিন্দু, বুদ্ধদেবকে বেদ-নিন্দুক, যজ্ঞনিন্দাকারী জানিয়াও তোমারই শাস্ত্র তাঁহাকে ভগবানের নবম অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তোমায় পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছে। তোমায় তাঁহার সেই কর্ম্মগুলির উল্লেখ করিয়াই নিত্য দশাবতারকে নমস্কার, পূজা ও স্তব করিতে হয়, হিন্দু ও বৌদ্ধের ধর্ম্মমতে পার্থক্য থাকিলেও কোন্ হিন্দু তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিবে না? বুদ্ধ হিন্দুর যাগযজ্ঞাদি নাশের উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণনাশের, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা নাশের কোন চেষ্টা করেন নাই, বরং তাঁহার উপদেশের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণভক্তির উপদেশই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে হিন্দুর হিংসায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় লোপ, বৌদ্ধদেবতা হিন্দুর তেত্রিশকোটী দেবতার অন্তর্ভুক্ত এবং বৌদ্ধসম্প্রদায় হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া কোন্ বৌদ্ধ আজ বুদ্ধদেবকে হিন্দুর বিষ্ণুর অবতারত্ব হইতে নড়াইতে পারেন? বৌদ্ধেরা ভগবান বুদ্ধকে প্রবুদ্ধ আচার্য্য মাত্র জানেন

আর আমরা তাঁহাকে আমাদের ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করি। বুদ্ধের আদর—বোধ হয়, বৌদ্ধ অপেক্ষা চিরকাল হিন্দুরাই বেশী করিয়া আসিতেছেন। এহেন বুদ্ধাস্থি-রক্ষায় কোন্ হিন্দু না উদ্যোগী হইবেন —কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবেন ?

গোবিন্দজীর সেবক জয়পুরাধিপ আছেন, রণছোড়জীর সেবক গাইকোবার আছেন, শ্রীরঙ্গজীর সেবক মহীশূরের মহারাজ আছেন—কত বৈষ্ণব রাজা-মহারাজ ভারতের কতদিকে রহিয়াছেন—ইঁহারা থাকিতে প্রকৃত বিষ্ণুপঞ্জর দেশে রক্ষা করিতে কি সত্য সত্যই আমাদিগকে ভাবিতে হইবে ?

তাহার পর দয়ালু গভর্ণমেণ্টের সীমান্ত রক্ষার জন্য পেশোয়ারে দুর্গ আছে, যথেষ্ট সৈন্য সামন্ত আছে। প্রয়োজন হইলে আপনা হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু সিপাহী বিনা বেতনে এই তীর্থস্থান রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে। সীমান্ত রাজধানীর উপকণ্ঠে অর্দ্ধমাইল দূরে হিন্দু বৌদ্ধপ্রজার একটি তীর্থস্থান—যাহা আজ দুই হাজার বৎসর কাল দেশাধিপতিগণ কর্ত্তৃকই রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, আজ দেশাধিপতি ইংরাজ,—(Defender of Faith) ধর্ম্মের রক্ষক ইংরাজ সম্রাট কি তাহা রক্ষা করিবেন না ?—যিনি দয়া করিয়া প্রজার জাতিধর্ম্ম রক্ষার ভার লইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অভয় দিয়াছেন, তিনি কি এইস্থানের পবিত্রতা রক্ষা—যে কারণে পবিত্র, সেই কারণ রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন না ? বৌদ্ধদেব আমাদের ভগবান, বৌদ্ধদের পবিত্রতা, খৃষ্টানরাজের কেহ নহেন, কিন্তু যে খৃষ্টান আজ দুই হাজার বৎসরকাল সর্ব্বদেশের, সকল কালের ধর্ম্মোপদেশক মহাপুরুষগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন,—সেই খৃষ্টানরাজ—ভারত-সম্রাট্ এত কালের প্রাচীন মহাপুরুষের অস্থি-সমাধির প্রতিই বা আজ ভক্তি শ্রদ্ধা হারাইবেন কেন ? এই সমাধি-মন্দিরের পবিত্রতা যে জন্য, সেই মহাপুরুষের দেহাবশেষ এখান হইতে উঠাইয়া দেশদেশান্তরে বিলাইয়া

দিয়া, তাহার পবিত্রতা নষ্ট করিবেন কেন? আশা করিতেছি—সুবিবেচক ধার্ম্মিক ইংরাজরাজ তাহা কখনই করিবেন না। আসুন, আর কালবিলম্ব না করিয়াই আমরা হিন্দুবৌদ্ধনির্ব্বিশেষে গভর্ণমেণ্টকে এবিষয়ে নিষেধ করিয়া,—প্রতিবাদ করিয়া, আবেদন করি।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী—
সহকারী সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ।

শঙ্করের মুণ্ডকভাষ্য।

আচার্য্যগোষ্ঠীগরিষ্ঠ মহামতি শঙ্কর, দার্শনিক জগতের জ্বলন্ত ভাস্কর তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, উত্তাল তরঙ্গময়ী মনীষা, ভগবদ্ভক্তি, প্রেম ও প্রকৃতিসুন্দর কবিত্ব বিশ্বজনীন ও দিগন্তবিশ্রুত। কিন্তু তথাপি

"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্"।

ইহা স্তুতিবাদ ও ভক্তির কথা। শঙ্করের স্তোত্রমালা পাঠ করিতে করিতে হৃদয় ভক্তিরসে সমাপ্লুত ও আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠে সত্য, কিন্তু তা বলিয়া তাঁহারা যে মানুষ নন, তাহাও নহে, তাঁহাদিগের যে কোন ভুলভ্রান্তি ছিল না, ইহাও মনে করা প্রজ্ঞাব্যামোহবিশেষ। আটলান্টিকের পার নাই, ইলাবৃতবর্ষই পৃথিবীর শেষ সীমা, এই অপসিদ্ধান্ত শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিলে যেমন সভ্যজগতের ক্ষতি হইত, তেমনই যাস্ক, শঙ্কর, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, অভ্রান্ত ইঁহারা মুনি হইলেও, মতিভ্রমশূন্য, মানুষ হইলেও পূর্ণ, ইহাঁদের দোষ থাকিলে তাহা দেখাইতে নাই—ইহাঁদের দোষ দেখাইতে পারে, এমন লোকও "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি" এ ধারণা দোষসমাভ্রাত ও সমাবিল। এই অতি ও অসঙ্গত ভক্তিতেই স্বর্গের ভারত রসাতলে গেল। আমরা হিন্দেনে পরিণত হইলাম!

"দোষাবাচ্যা গুরোরপি"

মহাজনেরাই বলিয়া গিয়াছেন—গুরুরও দোষ থাকিলে তাহা দেখাইয়া দিবে। নতুবা তদনুকারী জগৎ বিনাশের দিকে অগ্রসর হইবে। যদি ভাষ্যকারগণের মতিভ্রমে আমাদিগের পিতৃপুরুষ ঋষিগণের পবিত্র গ্রন্থাবলীর যথার্থ মত অযথার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলেও সমুদায় সভ্যজগৎ তজ্জন্য ঋষিগণের নিকট দায়ী ও প্রত্যবায়ী। মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন :—

"ননু বক্তৃবিশেষনিস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ॥

ইহা শঙ্কর বলিয়াছেন, উহা ব্যাসের উক্তি, ইহা বাল্মীকির মাথার কিরা, কাহাকেই ইহা দেখিতে হইবে না, দেখিতে হইবে, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা অদোষসন্দুষ্ট কি দোষসমাঘ্রাত। তাঁহাদিগের কোন দোষ থাকিতে পারে না, তাঁহাদিগের দোষ থাকিলেও তাহা ধরে ও দেখাইয়া দেয়, একালে এমন কে আছে, ইহা বিবেক ও যুক্তির রাজ্যের কথা নহে। শঙ্কর যদি সাক্ষাৎ শঙ্করই হইবেন তাহা হইলে, অশঙ্কর রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য কেমন করিয়া তাঁহার ভাষ্যে দোষপ্রদর্শন করিলেন ?

"গ্রন্থস্য গ্রন্থান্তরমেব টীকা"

বেদের টীকা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ। শ্রুতির টীকা আবার স্মৃতিকদম্বক এবং ব্রাহ্মণাদির টীকা পুরাণনিবহ। যে কথা বেদে আছে, স্মৃতিতে আছে ও যাহা ব্রাহ্মণে এবং পুরাণাদিদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, আমরা তাহা না মানিয়া অর্ব্বাচীন যুগের যাস্ক, শঙ্কর, সায়ণ ও শ্রীধরাদিকে মানিব, ইহা হইতেই পারে না। শাস্ত্র, "নানার্থভাক্" যাঁহারা ইহা বলিয়া সকলের মতেরই সভাজনা ও সপর্য্যা করিতে অভিলাষী, আমরা তাঁহাদিগকে ন্যায়বান্ ও সমীক্ষ্যকারী বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমরা আশা করি, প্রবীণগণ আমাদিগের কথায় বিরক্ত না হইয়া সত্যের অনুসরণ করিবেন। মুণ্ডক তাঁহার উপনিষদের প্রারম্ভে বলিতেছেন—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব,
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা,
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। ১
অথর্ব্বণে বাং প্রবদেত ব্রহ্মা
অথর্ব্বা তাং পুরা উবাচ অঙ্গিরে
ব্রহ্মবিদ্যাং স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ।
ভরদ্বাজঃ অঙ্গিরসে পরাবরাম্। ২

তত্র শঙ্করভাষ্যম্......ব্রহ্মা পরিবৃদ্ধো মহান্ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ সর্ব্বান্ অন্যান্ অতিশয়েনেতি। দেবানাং দ্যোতনবতামিন্দ্রাদীনাং প্রথমো গুণৈঃ প্রধানঃ সন্ প্রথমঃ অগ্রেবা সংবভূব অভিব্যক্তঃ সম্যক্ স্বাতন্ত্র্যেণ ইত্যভিপ্রায়ঃ। ন তথা যথা ধর্ম্মাধর্ম্মবশাৎ সংসারিণঃ অন্যে জায়ন্তে। যঃ অসৌ অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ, ইত্যাদি স্মৃতেঃ। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতঃ কর্ত্তা উৎপাদয়িতা। ভুবনস্য উৎপন্নস্য গোপ্তা পালয়িতেতি বিশেষণং ব্রহ্মণো বিদ্যাস্তুতয়ে। স এবং প্রখ্যাতমহত্ত্বো ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যমিতি বিশেষণাৎ পরমাত্মবিষয়া হি সা। ব্রহ্মণা বা অগ্রজেন উক্তা ইতি ব্রহ্মবিদ্যা তাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং সর্ব্ববিদ্যাভিব্যক্তিহেতুত্বাৎ সর্ব্বাবিদ্যাশ্রয়া মিত্যর্থঃ। সর্ব্ববিদ্যাবেদ্যং বা বস্তু অনয়া এব বিজ্ঞায়ত ইতি যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভয়ার্ত্ত অমতং মত মবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি শ্রুতেঃ। সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা মিতি চ স্তৌতি। বিদ্যা-মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। জ্যেষ্ঠশ্চাসৌ পুত্রশ্চ। অনেকেষু ব্রহ্মণঃ সৃষ্টি প্রকারেষু অন্যতমস্য সৃষ্টিপ্রকারস্য প্রমুখে পূর্ব্বমথর্ব্বা সৃষ্ট ইতি জ্যেষ্ঠ স্তস্মৈ জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।

যামেত্ত মথর্ব্বাণং প্রবদেত অবদৎ ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মা তামেব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তা মথর্ব্বা পুরা পূর্ব্বমুবাচ উক্তবান্ অঙ্গিরে অঙ্গির্নাম্নে প্রাহ প্রোক্ত-

বান্ ভারদ্বাজঃ অঙ্গিরসে স্বশিষ্যায় পুত্রায় বা পরাবরং পরস্মাৎ পরস্মাৎ অবরেণ প্রাপ্তেতি পরাবরা পরাবরসর্ব্ববিদ্যাবিষয়ব্যাপ্তের্বা তাং পরাবরা মঙ্গিরসে প্রাহ ইত্যানুষঙ্গঃ ।

তত্র শ্রীযুক্ত অভিলাষসার্ব্বভৌমকৃত আংশিক অনুবাদ......যিনি সমস্ত জগতের উৎপাদয়িতা ও উৎপন্ন সমস্তের পালয়িতা, সেই ব্রহ্মা সকল দেবতার প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত বিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে বলিয়াছিলেন। ৯৯ পৃষ্ঠা ৪র্থ বর্ষ উপাসনা—৩য় সংখ্যা ।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পূর্ণহৃদয়ের সহিত এই ভাষ্য ও অনুবাদের পরিপন্থী ও প্রতিবাদী। কেন? তাহা একে একে প্রদর্শিত হইতেছে।

মূলে আছে, "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব"। ইহাতে বুঝা গেল এক সময়ে ব্রহ্মা ও কতকগুলি দেবতা সমসাময়িকভাবে বর্ত্তমান ছিলেন। এখানে দেবানাং পদে নির্দ্ধার রহিয়াছে। অতএব এই ব্রহ্ম ও এই দেবগণ সজাতীয় বস্তু। কেননা পূর্ব্বাচার্য্যেরাই বলিয়া গিয়াছেন

"জাতিগুণক্রিয়াণামুৎকর্ষেণ
অপকর্ষেণ বা সজাতীয়াৎ পৃথক্
করণং নির্দ্ধারঃ। যথা মনুষ্যাণাং
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ। গবাং কৃষ্ণা বহুক্ষীরা"।

যদি এ কথা নির্ব্যূঢ় সত্য হয়, তাহা হইলে শঙ্কর স্বভাষ্যে দেবানাং পদের অর্থব্যক্তি স্থলে যে ইন্দ্রাদির নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন, প্রস্তুত ব্রহ্মা তাঁহাদিগের একজাতীয় পদার্থ ছিলেন ইহা মানিয়া লইতে হইবে।

ইন্দ্রাদি দেবগণ কে? তাঁহারা জননমরণশীল মানব। কেননা, মনু বলিতেছেন—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র মরীচি। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিতেছেন—

মরীচেঃ কশ্যপো জাতঃ কশ্যপাত্ত্ব ইমাঃ প্রজাঃ।

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র মরীচি প্রভৃতি দশ প্রজাপতি। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের পুত্র—দিতিজ—দৈত্য, দনুজ—দানব, মনুজ—মানব; কদ্রুর—কাদ্রবেয় (নাগগণ); বিনতাজ—বৈনতেয়; অদিতিজ—আদিত্য।

আদিত্য কে কে? ইন্দ্র, বিষ্ণু, পূষা, ভগ অর্য্যমা, বরুণ, ধাতা, মিত্র, পর্জন্য, ত্বষ্টা, বিবস্বান্ ও সূর্য্য এই দ্বাদশ জন দ্বাদশ আদিত্য নামের বিষয়ীভূত কেন? ইঁহাদিগের সাধারণ মাতা দক্ষকন্যা অদিতি। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন—

দিবৌকসাং সর্গএষ প্রোচ্যতে মাতৃনামভিঃ।

অতএব এই দ্বাদশজন একই বস্তু হইতেছেন। কেননা ইঁহাদিগের পিতা, মাতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ একই। ইঁহারা, ঋভুগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ (বিশ্বার গর্ব্ভে ধর্ম্মের ঔরসে জাত) ও সাধ্যদেবগণ (সাধ্যার গর্ব্ভে ধর্ম্মের ঔরসে জাত) এবং তুষিত ও আভাস্বরাখ্যগণ দেবতা পদভাক্। দেবতা কাহাকে কহে? শতপথ বলিতেছেন—

বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ

স্বর্গবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা সমধিক কৃতবিদ্য ছিলেন, তাঁহারাই দেবতা বা দেবোপাধিক ছিলেন। দৈত্য ও দানবগণও দেবতা ছিলেন, তাই তাঁহারা "পূর্ব্বদেবাঃ" নামের বিষয়ীভূত। মাতা মনুর সন্তানেরা তত কৃতবিদ্য ছিলেন না, তাই তাঁহারা দেবদৈত্যগণের বৈমাত্রেয় বা মাতৃষস্রেয় ভ্রাতা হইয়াও দেবপদভাক্ ছিলেন না। ঋভু ও মরুদ্গণ মনুষ্য হইয়াও বিদ্যাবলে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক আমরা ইন্দ্রাদির সহিত ধাতাকেও দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি, ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য? অমরাদি কোষকারগণও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যে পদার্থ তাঁহাদিগের সহোদর ভ্রাতা ধাতাও সেই পদার্থই বটেন, এ ধাতা কে? অমর বলিতেছেন;—

ব্রহ্মাত্মভূঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ।
হিরণ্যগর্ভো লোকেশঃ স্বয়ম্ভু শ্চতুরাননঃ॥
ধাতাব্জযোনিদ্রুহিণো বিরিঞ্চিঃ কমলাসনঃ।
স্রষ্টা প্রজাপতির্বেধা বিধাতা বিশ্বসৃগ্ বিধিঃ॥

ব্রহ্মা, আত্মভূ, সুরজ্যেষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, পিতামহ, হিরণ্যগর্ভ, লোকেশ, স্বয়ম্ভু, চতুরানন, ধাতা, অব্জযোনি, দ্রুহিণ, বিরিঞ্চি, কমলাসন, স্রষ্টা, প্রজাপতি, বেধাঃ, বিধাতা, বিশ্বসৃক্ ও বিধি এই শব্দগুলি এক পর্য্যায়ভাক্ঃ।

কিন্তু অমরের এই পরিগণনা প্রকৃত নহে। অমরাদিই শঙ্করাদিকে কুপথগামী করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, ব্রহ্মা সমুদায়ে তিনজন। ১। আত্মভূ বা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা। ২। পিতামহ ব্রহ্মা। ৩। সুরজ্যেষ্ঠ বা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা।—

এই আত্মভূ ব্রহ্মাই স্রষ্টা, বিশ্বসৃক্, বিধি, বেধাঃ, বিধাতা ও লোকেশ বটেন, এবং তাঁহাকে প্রজাপতি ও ধাতা (জগতের পোষণকর্ত্তা) ও বলিতে পার। আর যিনি লোকপিতামহ ব্রহ্মা বা আদি মানব, তিনি প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ (কেন না স্বর্ণাণ্ডপ্রভব) অব্জযোনি (পৃথিবীর আদি উৎপত্তি স্থান ইলাবৃতবর্ষ নাভি বা উৎপত্তিস্থান, পুষ্কর নামেও বর্ণিত হইয়াছে তাই তাঁহার নাম নাভিপদ্মজ বা অব্জযোনি) অপি চ তিনি সকলের ঠাকুরদাদা বলিয়াও পিতামহ বটেন। এবং যিনি সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, তিনিই পরমেষ্ঠী (কেন না তিনি পরমস্থান পরমব্যোম বা উত্তর কুরুতে বাস করিতেছেন) চতুরানন, (কেননা চারিবেদে পারদৃশ্বা বলিয়া তাঁহার উপাধি চতুর্ম্মুখ ছিল) বিরিঞ্চি প্রজাপতি ও ধাতা বটেন। তাঁহাকে অব্জ যোনিও বলা যায়; কেননা তাঁহারও জন্মভূমি আদি ব্যোম ইলাবৃতবর্ষ।

ধাতা কেন? তাঁহার উহা মাতৃদত্ত নাম। তিনি দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই তাঁহার বিশেষণ সুরজ্যেষ্ঠ। তাই বায়ুপুরাণ বলিয়াছেন;—

তত্রাবসৎ চোর্দ্ধতলে দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
ব্রহ্মা বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো বর্ষিষ্ঠস্ত্রিদিবৌকসঃ ॥

ধাতা অদিতির বড় পুত্র তাঁহারই নামান্তর ব্রহ্মা। তিনি বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতায় ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেবগণের মধ্যে প্রথম বা প্রধান ছিলেন, তাই মুণ্ডক বলিয়াছেন—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব।

ইন্দ্রাদি মানুষ দেবতারা সৃষ্টিকর্ত্তা বা পরমেশ্বর ছিলেন না, সুতরাং তাহাদিগের সজাতীয় এই ব্রহ্মাতেও পরমেশ্বরত্ব বা স্রষ্টৃত্বের সমারোপ করা যাইতে পারে না। যেমন বঙ্কিমবাবু প্রথম বি এ তেমনই আদিত্য-গণের মধ্যে ধাতা বা ব্রহ্মা প্রথম দেবোপাধি লাভ করেন, তজ্জন্যও তাঁহাকে দেবগণের মধ্যে প্রথম বলা যাইতে পারে।

পাঠক দেখ শঙ্করও বলিতেছেন—"ব্রহ্মা-ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যৈশ্বর্যৈঃ ইন্দ্রা-দীনাং প্রথমঃ গুণৈঃ প্রধানঃ" সুতরাং ইহাদ্বারাও এই ব্রহ্মার পরমে-শ্বরত্ব ও জগদুৎপাদয়িতৃত্ব নিরাকৃত হইতেছে। কেন না ঈশ্বর, অমুক হইতে বিদ্বান্, অমুক হইতে ধার্ম্মিক, অমুক হইতে লম্বায় বড়, ইহা বলার রীতি জগতে নাই। প্রকৃতির অনুসরণ অবশ্যম্ভাবী, তাই শঙ্কর বাধ্য হইয়া এই সত্যকথা গুলি বলিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মানামে যে একজন মানুষ দেবতা ছিলেন, দেবতারাও যে মরণশীল মানুষ, এই সংস্কার না থাকাতেই শঙ্কর মানুষ ব্রহ্মাতে ঈশ্বরত্বের আরোপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতএব শঙ্কর যে "বিশ্বস্য কর্ত্তা" বাক্যের ব্যাখ্যা

বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতঃ কর্ত্তা উৎপাদয়িতা

করিয়াছেন তাহা অদোষসমাঘ্রাত হয় নাই। এই বিশ্বশব্দের অর্থ জগৎ নহে, পরন্তু সকল। যদাহ অমরঃ ;—

সমং সর্ব্বং বিশ্বমশেষং কৃৎস্নং সমস্তং
নিখিলানিখিলানি নিঃশেষং। বিশেষ্যনিঘ্নবর্গঃ।

তৎকালে দৈত্য, দানব, মানব, বৈনতেয়, আদিত্য, পিশাচ ও রাক্ষসাদি যত লোক ছিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগের সকলের কর্ত্তা বা প্রধানব্যক্তি ছিলেন। যিনি বিপন্ন হইতেন, তিনিই ব্রহ্মার শরণ লইতেন। এ কর্ত্তা অর্থ সৃষ্টিকর্ত্তা নহে। আমাদের প্রত্যেক গৃহেও এইরূপ কত কর্ত্তা রহিয়াছেন, তাঁহারা কেহই সৃষ্টির ধার ধারেন না। তৎপর শঙ্কর "ভুবনস্য গোপ্তা" কথাটীর ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিয়াছেন—

"ভুবনস্য উৎপন্নস্য গোপ্তা পালয়িতা"

ইহাও অপ্রকৃত সংবাদ। কেন না, এই ধাতা ব্রহ্মার উৎপত্তির বহুপূর্ব্বে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার পালন তিনি করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরও এই জগৎ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে ও রহিবে। তাহার পালনের সহিতও অদিতিনন্দন ধাতা ব্রহ্মার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। বায়ু বলিয়াছেন—

"তেষামপিহি দেবানাং নিধনোৎপত্তি উচ্যতে।"

সেই ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও যেমন জন্ম ছিল, তেমন মৃত্যুও আছে ও ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন—

দেবামৃত্যোর্বিভ্যতঃ বিদ্যাং ত্রয়ীং প্রাবিশন্

দেবতারা মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়ের পঠন পাঠনায় প্রবৃত্ত হয়েন। সুতরাং এই মানুষ ব্রহ্মা জগতের পালনকর্ত্তা ইহা বলা সঙ্গত হইতে পারে না। ফলতঃ উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোকবাসী মানুষ ব্রহ্মা, দেব, দৈত্য, দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ সকলকে বিপদ্, আপদ্ হইতে রক্ষা করিতেন, তাই তাঁহাকে ভুবন বা জনপদসমূহের রক্ষাকর্ত্তা বলা হইয়াছে। অপিচ এই ব্রহ্মা যে মানুষ ছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পদকদম্বও সমর্থন করিতেছে,—

"স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।"

তিনি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রকে ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, শ্রৌতসূত্র, কল্পসূত্র, গৃহ্য-সূত্র, স্মৃতি পুরাণ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও গণিতাদি সর্ব্বশাস্ত্র বা সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আদর্শস্থান ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদ শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

যিনি বেদের অধ্যাপক, যিনি অন্যান্য বেদবিৎ হইতে শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ, যিনি দেবতাগণের মধ্যে প্রধান বা অপ্রধান, যিনি মেরুপর্ব্বতের উর্দ্ধতলে বাস করেন, পরন্তু নিম্নতলে নহে। অর্থাৎ অসর্ব্বব্যাপী, যাঁহার বড় ছেলে, ছোট ছেলে ও মেঝো ছেলে আছে ও ছিল, সেই ব্রহ্মা আত্মভূ বা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বা পরমেশ্বর কিংবা জগদুৎপাদয়িতা কি পালয়িতা হইতে পারেন না। ইনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ? অতএব ইন্দ্রাদি দেবগণ যেমন এক একজন স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তেমনই তজ্জাতীয় এই ব্রহ্মা ও পরমেশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কথিত বা বিবেচিত হইতে পারেন না। অবশ্য স্বস্ব ধর্ম্মগ্রন্থের পবিত্রতাসম্পাদন জন্য ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, আমাদিগের বেদ বা বাইবেল বা ঐরূপ অন্যতর গ্রন্থ ঈশ্বর-প্রণীত ও ঈশ্বর-বাণী। কিন্তু উহা ভক্তির কথা ভিন্ন যুক্তির কথা নহে। কোন ধর্ম্মগ্রন্থ ঈশ্বর-প্রণীত বা তদুদিত হইতে পারে না ও নহে। সৃষ্টির বহুকাল পরে ভাষাসৃষ্টি ও ভাষাসৃষ্টির বহু যুগযুগান্তর পরে মানুষের মধ্যে কবিত্বের বিকাশ হইয়াছিল। ঐ সময় ভিন্ন ভিন্ন ঋষি আপন মনে স্বাধীনচিত্তে বেদমন্ত্রের প্রণয়ন করেন। কিন্তু উহাতে ঈশ্বরের কোন হাতই নাই। অতএব শঙ্কর যে বলিতেছেন—

ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিদ্যাং
ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণা বা অগ্রজেন
উক্তা ইতি বা ব্রহ্মবিদ্যা

ইহা—অমূলক বিবৃতি। বেদ কেবল পরমার্থতত্ত্ববিষয়ক পরমাত্মবিদ্যা নহে, উহাতে যুদ্ধ, বিগ্রহ, মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণ এবং হিংসাবিদ্বেষ ও নানা সংশয়বাদের কথা আছে। অনেক সাধারণ সাংসারিক কথাও

বেদে স্থান পাইয়াছে, সুতরাং ইহা কেবল পরমাত্মবিদ্যা ইহা বলা চলিতে পারে না। তাহা হইলে স্বয়ং মুণ্ডক কেন বেদচতুষ্টয়কে অপরা বিদ্যা বলিবেন ?—

তত্রাপরা ঋগ্‌ বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ
অথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা
যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। ১০ পৃষ্ঠা।

অপিচ যিনি অগ্রজ, সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মা বা বিরাট্‌ কিংবা হিরণ্যগর্ভ নিজে ভাষাহীন উলঙ্গ বর্ব্বর ছিলেন। তিনি কি প্রকারে বেদপ্রবক্তা হইতে পারেন ? তাহা হইলে মহর্ষি বায়ু কেন বলিবেন—"বেদা সপ্তর্ষিভিঃ প্রোক্তাঃ ?" ফলতঃ যিনিই বেদ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বলিবেন—বেদমন্ত্র সকল যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ও ঋষি-কন্যাগণদ্বারা প্রণীত হইয়াছে। দাসীপুত্র কক্ষীবান্‌ ও কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা পর্য্যন্ত বেদ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং শঙ্কর যে বলিতেছেন, বেদ অগ্রজ ব্রহ্মা কর্ত্তৃকপ্রণীত তাহা অলীক ও অমূলক।

তৎপরে স্বয়ং পরমেশ্বর বেদের অধ্যাপনা করিয়াছেন বা করিতেছেন কিংবা করিয়া থাকেন, ইহা অতীব হাস্যজনক ব্যাপার। তবে যে দেশের লোকেরা বিশ্বাস করিতে অবনতকন্ধর যে ভগবতী রামপ্রসাদসেনের বেড়া বান্ধিয়া দিতেন, সে দেশে এ শঙ্করভাষ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে। কিন্তু চক্ষুষ্মান রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য শঙ্করকে সাক্ষাৎ শঙ্কর বানাইতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অবশ্য আমরা অবনতকন্ধরে শঙ্করের গুণের পূজা করিব। কিন্তু তাঁহার প্রমাদ ও ভ্রান্তিরও সভাজনা করিতে হইবে ইহা যুক্তির কথা নহে। এই অন্ধভক্তিই আমাদের দেশের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়া আমাদিগকে হিদেনে পরিণত করিয়াছে। ছান্দোগ্যের দুইটি স্থানেও ব্রহ্মার বেদাধ্যাপনার কথা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, শঙ্কর

তথায়ও অধ্যাপক মানুষ ব্রহ্মাকে পরমেশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ বানাইয়া মূলমন্ত্রের শিরে লগুড়াঘাত করিয়াছেন।

অতঃপর আমরা শঙ্করের অথর্ব্বার ব্যাখ্যার কথা বলিব। শঙ্কর বলিতেছেন এই অধ্যাপক ব্রহ্মা পরমেশ্বর এবং সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বা নিশ্চয়ই কোন যুগের আদিমানব!!! কিন্তু আমরা অধীয়ান সামাজিকগণকে জিজ্ঞাসা করি, এ পর্য্যন্ত কোন হিন্দুসন্তান কেবল হিন্দুশাস্ত্রে অথর্ব্বা বলিয়া কোন আদি মানবের নাম দেখিতে পাইয়াছেন বটে কি না? কেহ শুনিয়াছেন, আমরা তাহাও মনে করি না। বেদাদির বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা, যজুর্ব্বেদ ও বৃহদারণ্যকে অতিরিক্তভাবে অগ্নি এবং পুরাণাদিতে স্বায়ম্ভুব মনু পর্য্যন্ত আদি মানব বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কিন্তু কেহ কোন দিন কোন যুগে অথর্বার নাম আদিমানব বলিয়া শ্রুত হইয়াছেন তাহা হিন্দুশাস্ত্রপাঠে জানা যায় না। ঈশ্বরের বড়ছেলে বা ছোটখোঁকা থাকিতে পারে তাহাও বিদ্বৎসংঘে আজ্ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব। ফলতঃ বেদে এক অথর্ব্বা আছেন, তিনি সর্ব্বাদৌ স্বর্গে অরণি সংঘর্ষ দ্বারা অগ্নির উদ্ভাবন করেন। যাগযজ্ঞের প্রথম অনুষ্ঠাতাও তিনিই খুব সম্ভব। তিনি উত্তর কুরুবাসী সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। মহর্ষি মুণ্ডক তাঁহারই কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সামাজিকগণ ইহাও ভাবিবেন যে, যিনি আদিমানব সেই অথর্ব্বার শিষ্য অবরজ যুগের অঙ্গির ও অনুশিষ্য ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবাহ বা অঙ্গিরা হইতে পারেন না। মনুষ্যসৃষ্টির লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে বেদের প্রণয়ন হয় ও বেদসৃষ্টির বহুপরে এই সকল কৃতনামা ব্যক্তিদিগের জন্ম মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তবে বাইবেলের যেমন আদি মানব আদমের পুত্র হাবিল কবিলের হাতে লাঙ্গল কোদাল কৃষিকার্য্য ও পশুপালনের ভার দিয়াছেন, মহাত্মা শঙ্করও সেইরূপ তাঁহার কল্পিত আদি মানব অথর্ব্বার হাতে বেদাধ্যয়নের বোঝা চাপাইয়া দিয়া

নিরুক্তিলাভ করিয়াছেন। প্রকৃত কথা যিনি আদি মানব,তিনি ভাষাহীন ও উলঙ্গ ছিলেন, তাঁহার সময়ে ভাষার সৃষ্টি হইয়া ছিল না, তখন বেদের সৃষ্টিও হইতে পারে না। বেদের পঠন পাঠনার কথাও সুদুরপরাহত।

এই গেল প্রথম মন্ত্রের পালা। অতঃপর আমরা দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যার কথা বলিব। বলা বাহুল্য এ মন্ত্রে ব্যাখ্যা করিতে হয় এমন একটী বর্ণও নাই। কিন্তু ভাষ্য ও টীকাকারদিগের রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া শঙ্কর এখানেও লেখনী সঞ্চালন করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। কিন্তু তিনি যে পরাবরাং কথাটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমরা তৎপাঠেও একবারে স্তম্ভিত হইয়াছি। পরাবরাং কি?

পরাবরাং পরস্মাৎ পরস্মাৎ

অবরেণ প্রাপ্তেতি পরাবরা

পরাবরসর্ব্ববিদ্যাবিষয়ব্যাপ্তের্বা তাং

বস্তুতই কি ইহা ঠিক? মুণ্ডক কি নিজেই ঋগ্‌বেদাদিকে অবরা-বিদ্যা ও উপনিষৎসমূহকে পরা বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই?

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে

এই ঋগ্‌ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ ও বেদাঙ্গ সকল অপরা বা অবরা বিদ্যা। তবে তাহাই পরা বিদ্যা যৎপাঠে সেই অক্ষর বা অবিনাশি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ জানিতে পারা যাইয়া থাকে। যাহা হউক আমরা যাহা ভাল বুঝিলাম, তাহাই বলিলাম। এইক্ষণ প্রবীণ-গণ ধীরমনে স্থিরচিত্তে শঙ্কর ও আমাদিগের উক্তির দোষগুণ বিচার করিয়া তথ্য নির্ণয় করেন এবং "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং" এই কবিবাক্য স্মরণপূর্ব্বক সত্যের সেবা করুন। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

মহারাণা উদয়সিংহ ও কমল বাই।

চিতোর দুর্গস্থ প্রাসাদ—নিশি।

[আকবর প্রথমবারে চিতোর আক্রমণ করিয়া মহারাণা উদয়সিংহকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। সর্দ্দারগণ তৎপ্রতি বিদ্বেষবশতঃ যুদ্ধে ক্ষান্ত হন। তখন উদয়সিংহের উপপত্নী অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সর্দ্দারগণকে উত্তেজিত করতঃ রাণাকে মোগল শিবির হইতে উদ্ধার করেন।]

কমল বাই।—মহারাণা! আমি বাজোয়ার ক্ষুদ্র কাট মাত্র। পবিত্র শিশোদীয় কুলের একমাত্র আশার স্থল মোগল শিবিরে আবদ্ধ থাকিলে, সমস্ত রাজপুতজাতির কলঙ্ক, তাই তাঁহারা চিতোরের কলঙ্ক কাহিনী লইয়া কাল রজনীকে আসিতে দেন নাই, মহারাণার তাঁদের কাছেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ, আমার কাছে নহে। আমি কে?—

উদয়সিংহ।—কমল, কমল! ঐ নিষ্কলঙ্ক দলরাজি এত বীর্য্যভরা? ঐ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে এত বীরত্ব-গৌরব, ঐ বিদ্যুল্লতা এত জ্বালাময়ী? ঐ মদীর নয়নে অভিমানের কোপকটাক্ষ দেখিয়াছি, কিন্তু অমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে দেখি নাই! ঐ মধুর কণ্ঠে বসন্তের অস্ফুট কাকলি শুনিয়াছি; কিন্তু অমন ভৈরব ঝঙ্কার তো শুনি নাই। ঐ স্ফূরিত অধর চুম্বন-আকাঙ্ক্ষায় কাঁপিতে দেখিয়াছি; কিন্তু অমন ক্ষোভে রোষে দন্তপৃষ্ট হইতে দেখি নাই। চিত্রিতা হরিণী! তোমার যদি অমন কেশরীর পরাক্রম জানিতাম, তবে প্রেমমুগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় পশ্চাতে ছুটিতাম না।

ক। *ছিঃ! চিতোরের মহারাণার মুখে ঐ কথা শোভা পায় না।

উ। কে মহারাণা? আমি তোমার পদাশ্রিত দাস মাত্র, তুমি আমার জীবনদাত্রী।

ক। তুমি আমায় পরিত্যাগ কর। রাজসিংহাসন বিলাসের সোপান নহে, রাজার অধর্ম্মে অধিকার নাই, ভগবান্ যেই দিন তোমাকে এই উচ্চ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেইদিন হইতে তোমার উপরে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন ; তা অবহেলা করিয়া সামান্যা বারনারীর মহে মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে।

উ। একি কথা কমল! অমন হৃদয়বিদারক বাক্য তো আর শুনি নাই! তোমারই এ পরাক্রমে আমি সিংহাসন ফিরিয়া পাইয়াছি। নতুবা এতক্ষণে বধ্যভূমে আমার শির লুণ্ঠিত হইত। আমার ন্যায় কাপুরুষ উচ্ছৃঙ্খল যুবকের শিরে রাজমুকুট শোভা না পাইতে পারে, কিন্তু তোমার হৃদয়-রাজ্যের অধিকারী হইয়াছি, ইহাই যথেষ্ট। সব ছাড়িতে পারিব, কিন্তু তোমাকে প্রাণ থাকিতে ছাড়িতে পারিব না।

ক। আমি বেশ্যা মাত্র।

উ। হয়, হউক ; তুমি আমার আরাধ্যা দেবী। ঐ কুসুম প্রতিমার পদতলে রাজমুকুট রাখিয়া গৌরবান্বিত হইব।

ক। তুমি আমার জন্য মনুষ্যত্ব বর্জ্জন কর, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। আপন সম্মান বিসর্জ্জন করিয়া এইরূপে জীবন অতিবাহিত করা কি তোমার উচিত? আমি তোমার কৃপার ভিখারিণী মাত্র।

উ। এই কথা পূর্ব্বে শুনি নাই কেন?

ক। পূর্ব্বে আমিও জানিতাম না। আমি তোমাকে ভালবাসি, এই কথা আমার কখনও মনে হয় নাই। আজ যখন শুনিলাম, তুমি যবন শিবিরে বন্দী, তখন সত্যই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দেখিলাম, রাজপুত প্রায় সকলেই তোমায় তাচ্ছিল্য করে, সে তাহাদের দোষ নহে, দোষ আমার—কেননা তুমি আমায় ভালবাস।

উ। কেন কমল? ইহাতে দোষ কি?

ক। কেন? এই কথা তুমি আমায় জিজ্ঞাসা কর? তোমার

কি মনে হয় না, কি করিয়া আমি তোমাকে পাপস্রোতে মগ্ন করিয়াছি! আপনার বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে চিতোরের সুখ শান্তি আহুতি দিয়াছি, যুবতী-সুলভ ভোগলালসায় বারাঙ্গনার স্বাভাবিক প্রমোদ পিপাসায় মগ্ন ছিলাম, তখন এইকথা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন আর তাহা পারি না। বুঝি আর সেই বারবিলাসিনী নহি। আমি পূর্ব্বে ভালবাসিতে জানিতাম না। কিন্তু তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভালবাসিতে শিখিয়াছি। তাই চিতোরের দারুণ অভিশাপ আমার শিরে পড়িয়াছে। তাহা না হইলে আজ একথা ভাবিতাম না।

উ। কাঁদিও না কমল! ঐ চোখের এক বিন্দু জল তপ্ত গৈরিকের ন্যায় হৃদয়স্তর দগ্ধ করিয়া যায়। না, না, আবার কাঁদ! আবার নীহার-স্নাত কমল দেখিয়া লই। ঐ চাঁদের আলো নলিনী পত্রে হাসিতেছে, আর নয়—হৃদয়ে এস! ঐ সজল নয়নদ্বয় চুম্বন করি—ঐ হাসি কি মধুর! বুঝি সোহাগে সমস্ত হৃদয় গলিয়া গিয়া তরল সুধার উৎস ছুটিতেছে। ঐ হাসি যেন প্রেম-জ্যোৎস্নার আলোক লেখা, মঙ্গলোৎসবের কনক-দীপ-রশ্মি!

ক। ইহাই যথেষ্ট, এই স্মৃতিই আমার জীবনে একমাত্র সুখের হইবে। এখনও আমায় ত্যাগ কর।

উ। কেন কমল, আমার উপর রাগ করিলে?

ক। তাহা নহে—আমি থাকিলে রাজ্যের অমঙ্গল ঘটিবে। বিশেষ তোমার নিত্য বিপদের আশঙ্কা।

উ। এত ভালবাস? এই কথা সকলের সমক্ষে বলিব।

ক। তবে মহারাণার কলঙ্ক আরও বাড়িবে, এবং দাসীরও বিপদ সম্ভাবনা। *

* সর্দ্দারগণের বিদ্বেষবশতঃ কমল বাই নিহত হন, রাজার প্রশংসা তাহার একটি মূল কারণ।

উ। অসম্ভব! তুমি আমায় ভালবাস, এই কথা সমগ্র চিতোর জানুক।

ক। (জানু পাতিয়া) এই হৃদয় উন্মুক্ত করিলাম, ঐ তরবারি প্রবেশ করাও।

উ। এ তুষারফলকে অস্ত্র পশিবে না। ঐ কুসুমস্তর ছিন্ন করিব কেন? এস! হৃদয়ে তুলিয়া লই! উদয়ের ভাগ্যে যাহা থাকে ঘটুক।

ক। আমার মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু তোমার হস্তে মরিলেই সুখে মরিতাম।

শ্রীমাখনলাল সেন বি, এ,।

ইংরেজ শাসনে বিক্রমপুর।

পলাশীর রণক্ষেত্রে ক্লাইভের বিজয় দুন্দুভির গভীর মন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই মোগল রাজ-কুল-লক্ষ্মী ইংরেজের অঙ্কশায়িনী হইতে আরম্ভ করিলেন। ১৭৬৪ খ্রীঃ অঃ বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসেমের শেষ চেষ্টা, শেষ যত্ন, শেষ ক্ষীণ আশার দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ইংরেজের অদম্য শক্তির নিকট নবাবের চেষ্টা যত্ন সকলি ফুরাইল। এই রণাবসানের পর হইতেই দেশের প্রকৃত অধিকার ও প্রকৃত ক্ষমতা বিধাতা আপন হস্তে সৌভাগ্যশালী ইংরেজের ললাটে অঙ্কিত করিয়া দিলেন। দেশের শাসন-কার্য্য সৌকর্য্যার্থ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণ।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে অযোধ্যা প্রদেশ ফিরাইয়া দিয়া সা আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর জন্য বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন। 'দেওয়ানী' অর্থে রাজস্ব

সংগ্রহের ক্ষমতা। এই দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতে কোম্পানী-কর্ত্তৃক ঢাকা প্রদেশের শাসন সংরক্ষণের কর্য্যাদি নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণও প্রথমে নবাবী আমলের ন্যায় রাজকর আদায়ের নিমিত্ত হুজুরি ও নিজামত এই দুইটি বিভাগ স্থাপন করিয়াছিলেন। হুজুরি বিভাগ প্রাদেশিক দেওয়ানের অধীন এবং দেওয়ানখানা মুর্শিদাবাদে স্থাপিত থাকে, এবং পূর্ব্বের ন্যায় ঢাকা নগরে ডেপুটি দেওয়ানের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজামতের সেরেস্তা ও এপ্রদেশের রাজস্বসংগ্রহ ভূমির বন্দোবস্ত প্রভৃতি আবশ্যকীয় গুরুতর কর্ম্মের ভারও ডেপুটি দেওয়ানের হাতে ছিল। ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারকার্য্যও নিজামতে ছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রেভেনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক একজন রাজস্ব পরিদর্শকের পদ সৃষ্ট হয়—হুজুরি ও নিজামত বিভাগের কার্য্য-প্রণালীর উপরও তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন বঙ্গদেশের গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিয়া আসেন, তখন তিনি রাজস্ব পরিদর্শকের পদগুলি উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করেন।

সেই বৎসরই দেওয়ানী আদালত সৃষ্টি হইয়া কালেক্টর তাহার সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। এ সময়েই পরম অত্যাচারী নির্দ্দয় প্রকৃতির রাজস্বকর্ম্মচারী রেজাখাঁ বিতাড়িত হইয়া তৎপদে মিডল্‌টন্ সাহেব নিযুক্ত হন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববিভাগের জন্য ঢাকায় এক মন্ত্রিসভার গঠন হয়। ইহার অধীনে স্থানে স্থানে নায়েব নিযুক্ত হয়; এ সকল নায়েবেরা ইজারাদারের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। সে সময়ে এই মন্ত্রিসভার শেষ আবেদন (appeal) শুনিবারও ক্ষমতা ছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রিসভা উঠিয়া যায় এবং ডে (Day) সাহেব ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের পদে ও মিঃ ডান্‌-

ঢাকার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার গঠন।

কেন্‌সন্ (Duncanson) জজ নিযুক্ত হন, ইঁহারাই ঢাকার প্রথম জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার।

ইংরেজকর্ত্তৃক ফরাসী ও পর্ত্তুগীজদিগের কুঠি অধিকার।

১৭৭৮ এবং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঢাকানগরীস্থ পর্ত্তুগীজ ও ফরাসীদিগের কুঠিগুলি অধিকার করিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য চালাইতে থাকেন। ওলন্দাজ ও ফরাসীবণিকগণ কর্ত্তৃক ঢাকার যথেষ্ট শিল্পোন্নতি হইয়াছিল, তাহারা ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে ও জাপানে বস্ত্র প্রেরণ করিত। ১৭৮১ সালে ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের কুঠি দখল করিয়া তাহাদের অধ্যক্ষকে বন্দী করেন। ফরাসীগণ ১৬৮৮ সালে বাঙ্গলাদেশে আসিয়া ১৭২৬ সাল

ঢাকার প্রাচীন শিল্প।

হইতে ঢাকায় ব্যবসায় আরম্ভ করে। ১৭৭৮ সালে ইংরেজ ইহাদের কুঠি অধিকার করিয়া ১৭৮৩ সালে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। আবার ১৭৯৩ সালে উহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ১৮০৩ সালে তৃতীয় বার ফরাসীকুঠি দখল করিয়া নানাপ্রকার অসুবিধায় বাধ্য হইয়া উহা ১৮১৫ সালে ফরাসীদিগকে ফিরাইয়া দেন। ১৮৩০ সালে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ঢাকা-বাসীদিগকে কুঠি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ঢাকায় প্রাচীন সময়ে মলমলখাস, ঝুনা, রং, আবা-রবান্ রহমান, সরকার আল, খাসা, শুব্‌নাম, আলবল্লী, তন্‌জেব, তরহ-উন্দাম, নয়নসুখ, বদন-খাস, শর-কন্দ, সরবতী, শর-বুটী, কামিজ, ডুরিয়া, চারখানা, জামদানি প্রভৃতি যে কত প্রকার নয়ন-মন-মোহ-কর শিল্প চাতুর্য্যময় বস্ত্রনিচয় নির্ম্মিত হইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না—সে সকল বস্ত্রের খ্যাতি দেশবিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু হায়! এখন সারা ঢাকা সহর ঘুরিয়া আসিলেও একখানা মস্‌লিন মেলা দুষ্কর। ঢাকার প্রাচীন সমৃদ্ধির সময় ঢাকানগরী পনের মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এখনও সে সকল

ধ্বংসাবশেষের প্রাচীন দৃশ্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ১৮১৭ সালে ইংরেজের কুঠি বন্ধ হইলে, ইউরোপে কাটতি বন্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ ঢাকার বস্ত্রশিল্পের অধঃপতন হইতে থাকে। ধীরে ধীরে ইউরোপের সস্তা মোটা কাপড় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া বস্ত্রশিল্প নষ্ট করিয়া ফেলিল। শিল্পগৌরব সম্পন্ন ঢাকার এই শিল্প অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার নাগরিক সমৃদ্ধিও বহু পরিমাণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ১৮০০ সালে ঢাকার জনসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ ছিল; বিশপ হিবার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯০,০০০ হাজার লোক দেখিয়া ছিলেন, ১৮৩৮ সালে ক্রমশঃ ব্যবসার প্রসারতা হ্রাস হওয়ায় উহা ৬৮ হাজারে পরিণত হয়। ১৭৯৩ সাল হইতেই ঢাকার বস্ত্র-ব্যবসায়ের অবনতি হইতে থাকে। ঢাকার এই বিনষ্টপ্রায় শিল্পসমৃদ্ধি পুনরায় কবে যে প্রাচীন গৌরবে মাথা তুলিয়া দাড়াইবে, তাহা নির্ণয় করা মানব বুদ্ধির অগোচর। ঢাকা এখন আবার প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে; ক্রমশঃ ইহার নাগরিক সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহার বিলুপ্ত শিল্প-গৌরব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে কি?

ঢাকার শাসন সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরের শাসন শৃঙ্খলার দিকেও কোম্পানীর মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে আবদুল্লাপুর প্রভৃতি স্থানের স্থানীয় কাজী এবং পরিশেষে বড় বড় মোকদ্দমা ইত্যাদি যেমন জাহাঙ্গীর নগরে আসিয়া নিষ্পত্তি করিতে হইত, তদ্রূপ ইংরেজের বাঙ্গালা অধিকার ও কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি ঢাকার নবপ্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে নিষ্পত্তি হইতে লাগিল। উহাতে বিক্রমপুরবাসিগণের যথেষ্ট অসুবিধা এবং যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। তখনকার সময়ে ঢাকায় আসাও নেহাত সুগম ছিলনা; পানের নৌকা ও গহণার নৌকাই মোকদ্দমাবাজ জনসাধারণকে বহন করিয়া আনিত।

বিক্রমপুরের সর্ব্বপ্রথম বিচারালয়ের এইরূপ দূরত্ব নিবন্ধন এবং নানা প্রকার অসুবিধার নিমিত্ত গ্রাম্য সামাজিক শক্তি বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। তখনকার দিনে বহু মামলা মোকদ্দমা পঞ্চায়েতী-প্রথানুযায়ীই নিষ্পন্ন হইত; গ্রাম্য নেতৃবৃন্দ যাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন, তাহাই সকলে নত মস্তকে গ্রহণ করিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সামাজিক শাসন দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া যাইত। তখনকার দিনে এত কোর্টফি, উকীলের বায়না ও মিথ্যা সাক্ষীর প্রাদুর্ভাব ছিল না এবং অর্থেরও অযথা শ্রাদ্ধ হইত না। পঞ্চায়েতী সভার নিকট কেহ কোনও রূপ মিথ্যা কথা বলিতে সাহসী হইত না, কারণ 'চালপড়া, 'ক্ষুরপড়া' ইত্যাদির ভয়ও যথেষ্ট ছিল। সমাজ যে অদম্য শক্তি প্রভাবে দেশের জনসাধারণকে একতা-শৃঙ্খলে বাঁধিতে সক্ষম হইয়াছিল, এ যুগে তাহা স্বপ্ন-কাহিনী বলিয়া মনে হয়। সত্য ও ধর্ম্মের নিকট সেকালে প্রত্যেকেই পরাজিত হইতে চাহিত, নবীন ইংরেজী বিদ্যার ছল-চাতুরী তাহারা জানিতও না, তাহা অবলম্বন করিতেও চাহিত না। ইংরেজের সুশাসন প্রভাবে ক্রমশঃ এ সকল পঞ্চায়েতী সভা ও সমাজশাসন লুপ্ত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ ডিসেম্বর মাসে সর্ব্বপ্রথমে বিক্রমপুরস্থ মুন্সীগঞ্জ গ্রামে মহকুমা স্থাপিত হয়, তখন সেখানে জন্ ফ্রেন্স (John French) নামক একজন ইংরেজ মহকুমার ভারপ্রাপ্তকর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। ইনিই মুন্সীগঞ্জের সর্ব্বপ্রথম বিচারক বা ভারপ্রাপ্ত-কর্ম্মচারী; ইহার কিয়ৎকাল পরে বিখ্যাত পোড়াগাছা গ্রামে একটী মুন্সেফী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৺গোবিন্দ চন্দ্র বসু মহাশয় তথাকার প্রথম মুন্সেফ নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে এই মুন্সেফী আদালত ঢাকা নগরীতে স্থানান্তরিত হয় এবং গোবিন্দ বাবু

বিচারালয় স্থাপন।

মুন্সীগঞ্জে মহকুমা স্থাপন।

পোড়াগাছা ও বহরের মুন্সেফী আদালত।

বিক্রমপুরের কার্য্য সুসম্পাদনার্থ এডিসনাল মুন্সেফের (Additional munsiff) পদে নিযুক্ত হন।

পুনরায় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইহা ঢাকা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া বহর গ্রামে আইসে—সেখানে ৺ নিত্যানন্দ গাঙ্গুলি সর্ব্বপ্রথম মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হন। ১১৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বহর গ্রামে ছোট আদালত (Small causes Court) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দৈগনসার গ্রামবাসী প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা অভয়কুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয় উহার প্রধান বিচারক বা জজের পদে নিযুক্ত হন। বিক্রমপুরে সর্ব্বপ্রথম মুন্সীগঞ্জ, শ্রীনগর, রাজাবাড়ী ও মুলফৎগঞ্জে থানা প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া দারোগা ও দুইজন করিয়া হেড কনেষ্টবল থাকিত। সে সময়ে কেদারপুরে ফাঁড়ি বা আউট পোষ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। লৌহজঙ্গে আবকারী বিভাগের একটী আফিস ছিল। পূর্ব্বে লোকে চোর ডাকাত ও বাটপাড়ের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত চিত্তে কালযাপন করিতেন, ধনসম্পত্তি মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া রাখিতেন; কিন্তু এখন আর সেরূপ ভীতচিত্তে কাহাকেও বাস করিতে হয় না। চারিদিকেই শান্তি বিরাজিত, প্রতি গ্রামে গ্রামে চৌকিদার দফাদার প্রভৃতি থাকায় সহজে কোনওরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে পারে না। ইংরেজ-শাসন-নীতির সাম্যতা প্রযুক্ত এখন ছোট বড় সকলই সমান।

থানা ও ফাঁড়ি।

যে মুন্সীগঞ্জে * পূর্ব্বে একটীমাত্র বিচারালয় ছিল, এখন সেই মুন্সীগঞ্জে পাঁচটী মুন্সেফী আদালত ও একটী স্মল কজ কোর্ট হইয়াছে

* ঢাকায় মোগল শাসন সুদৃঢ় হইলে মুন্সীগঞ্জে ফৌজদারী আদালতের সৃষ্টি হয়। মুন্সীগঞ্জের এই ফৌজদারী আদালত বহুদিন হইতেই প্রসিদ্ধ। মোগলদিগের সময়ে এস্থানে মুন্সীহায়দর হোসেন বলিয়া একজন ফৌজদার থাকিতেন, তাঁহারই নামানুযায়ী ইহার নাম মুন্সীগঞ্জ হইয়াছে।

(Small causes Court)। এই কোর্টে জজ সাহেব বৎসরে তিনবার আসিয়া বিচার কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। এখন ক্ষুদ্র মুন্সীগঞ্জ মহকুমা উকীল মোক্তারে পরিপূর্ণ ও মোকদ্দমাবাজ জনসাধারণের কল-কোলাহলে দিবানিশি মুখরিত। বিক্রমপুরে এখন সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি সব-রেজেষ্টরী আফিস হইয়াছে, পূর্ব্বে এক মুন্সীগঞ্জেই একটী ছিল, এখন রাজাবাড়ী, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গেও তিনটি রেজেষ্টরী আফিস অবস্থিত। থানাও এখন শ্রীনগর, রাজাবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ও লৌহজঙ্গ এই চারিস্থানে হইয়াছে, তন্মধ্যে লৌহজঙ্গের থানাটি এই এক বৎসর মাত্র হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, বিক্রমপুরস্থ জৈনসার, রাজাবাড়ী, মুলফৎগঞ্জ, কাঁচাদিয়া ও সোণারঙ্গ এই পাঁচটি মাত্র গ্রামে ডাকঘর ছিল, কিন্তু

ডাকঘর.

এখন শিক্ষা ও সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতি গ্রামেই এক একটী ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে।

ঢাকায় সিপাহী-বিদ্রোহ।

ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের গোলযোগ ব্যতীত, এ সময় পর্য্যন্ত ঢাকা জেলায় আর কোনও রাজকীয় বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। তৎকালীন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ব্রেনাণ্ড (Brenand) সাহেবের দৈনন্দিন লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, মিরাটের সিপাহীগণের বিদ্রোহের সংবাদ ঢাকার সৈনিকবৃন্দের কর্ণগোচর হইলে পর,তাহারা একটু উত্তেজনা-ভাব প্রকাশ করিয়াছিল ; সে সময়ে ঢাকা নগরে ৭৩ নং দেশীয় পদাতিক সৈন্য দুইদলে অবস্থান করিত। কর্তৃপক্ষ প্রথমতঃ উহাদের অসন্তুষ্টিতে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই, কিন্তু ক্রমশঃ ঐ উত্তেজনার ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ভাবী অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া নগর রক্ষার্থ একদল সৈন্য পাঠাইলেন। নগরের প্রায় ষাটজন ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়ান অধিবাসীও ভাবী বিপদাশঙ্কায় সখের সৈন্য বিভাগে নাম লিখাইয়া-ছিলেন। ২২শে নভেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটে

নাই। কিন্তু ঐ দিবসই সংবাদ পাওয়া গেল যে, চট্টগ্রামের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া প্রায় তিন লক্ষ টাকা লইয়া গিয়াছে। এ সংবাদে গবর্ণমেণ্ট ঢাকার সিপাহীগণকে নিরস্ত্র করিবার মন্তব্য স্থির করিলেন ও পরদিবস ভোর প্রায় পাঁচটার সময় সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার নিমিত্ত ইউরোপীয়গণ উপস্থিত হইলেন। কমিশনার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির উপস্থিতিতে নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুযায়ী প্রথমে ধনাগারের প্রহরী দিগের হস্ত হইতে অস্ত্র গ্রহণ করা হইল। সিপাহীগণ এ ব্যাপারে বিশেষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছিল, এমন কি কোন কোন সিপাহী এই গর্হিত কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে ভর্ৎসনা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। অতঃপর নৌসৈনিকগণ লালবাগের দিকে গমন করিল, প্রথম অবস্থা দেখিয়া আশা করা গিয়াছিল যে, কোনওরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইবে না, অতি সহজেই সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রসমূহ প্রত্যর্পণ করিবে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। সিপাহীগণ বাধা দিতে প্রস্তুত হইল, সুতরাং উভয় পক্ষে একটু সামান্য রূপ যুদ্ধ বাধিল, ঐ যুদ্ধে সিপাহীগণের পক্ষে চল্লিশজন হত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সিপাহীগণ মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্টের দিকে পলায়ন করিল, কিন্তু অবশেষে ইহাদের মধ্যে কতকজন ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। বোধ হয়, বিদ্রোহী সিপাহীগণের কেহ কেহ ভুটানে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। এই সামান্য লড়াইয়ে ইংরেজ পক্ষে একজন হত ও প্রায় ১৩ জন লোক আহত ব্যতীত আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

সিপাহী-বিদ্রোহের কোনওরূপ গোলযোগে বিক্রমপুরবাসীদিগকে বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছিল, এরূপ কোনও কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে জনপ্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে, পরাজিত

সিপাহীগণ পলায়ন কালে বিক্রমপুরের কোন কোন গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময় সামান্য পরিমাণে লুণ্ঠন ও অত্যাচারাদি করিতেও ছাড়ে নাই। এখনও পল্লীর বৃদ্ধগণ পাশার বৈঠকে ও দাবার চালের সঙ্গে সঙ্গে হুকার ধূমোদগীরণ করিতে করিতে ঢাকার এই সামান্য কালাগোরার লড়াইয়ের কথা অতিরঞ্জিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া পল্লীস্থ বালক,যুবক ও মহিলাগণের নিকট বাহাদুরি লইতে ছাড়েন না।

বিক্রমপুরের বিদ্রোহের কথা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস।

যুগযুগান্তর হইতে সোণার বাঙ্গলার নাম দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। জগতের আদিম সভ্যতার ইতিহাসের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। গ্রীক, রোম ও চীন প্রভৃতি প্রাচীন সাম্রাজ্যের বিবরণে বাঙ্গলার কথা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই সমস্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমি হইতে অঞ্চল পূরিয়া স্বর্ণ কুড়াইবার জন্য তত্তৎ দেশের বাণিজ্যলক্ষ্মী অনুকূল বায়ুভরে বাদাম উড়াইয়া নীল সমুদ্রের তরঙ্গ-লহরীর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে প্রতি-নিয়ত গতায়াত করিতেন। তাহার অপর্য্যাপ্ত শস্যরাশি জগতের অনেক স্থানের অধিবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য জাহাজ বোঝাই হইয়া চলিয়া যাইত। তাহার শিল্পজাত দ্রব্য অনেক সভ্য জাতির আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের বিবরণ আজিও রোমক ইতিহাসে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন বঙ্গের শিল্পজাত দ্রব্যের কাহিনী অনেক দেশের ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে।

ইহা সে কালের কথা। বর্ত্তমান যুগেও তাহার শ্যামল ক্ষেত্রে যাহারা সমাগত হইয়াছে, তাহারা আজিও তাহার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কোনও কোনও জাতির এদেশে নামশেষ হইলেও, তাহাদের চিহ্ন আজিও তাহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পর ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার উদ্দেশে পর্টুগালের অধিপতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তিনি ভাস্কোডিগামাকে একটি নূতন জলপথের আবিষ্কারের জন্য প্রেরণ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে গামা অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রমের পর ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলস্থ কালিকট নগরে উপস্থিত হন। মালাক্কা প্রভৃতি স্থানে পর্টুগীজগণ বাণিজ্যবিস্তারে সচেষ্ট হয়। মালাবার উপকূলবর্ত্তী গোয়া তাহাদের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। অদ্যাপি গোয়া পর্টুগীজদিগেরই অধীন আছে। দক্ষিণ প্রদেশে বাণিজ্য করিতে করিতে ক্রমে যখন সোণার বাঙ্গলার কথা তাহাদের কর্ণগোচর হইল, তখন তাহারা তথায় উপস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্টুগীজগণ বাঙ্গলায় বাণিজ্য-ব্যপদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়ে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার দুইটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। চট্টগ্রামে সকল প্রকার জাহাজের গতায়াতের সুবিধা ছিল, তাই পর্টুগীজেরা তাহার 'পোর্টো গ্রাণ্ডো' বা 'বৃহৎ স্বর্গ' ও সপ্তগ্রামের নাম 'পোর্টো পেকিনো' বা 'ক্ষুদ্র স্বর্গ' আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। চট্টগ্রাম প্রদেশেই সাধারণতঃ ইহারা উপনিবেশ সংস্থাপন করে; ক্রমে তাহারা আরাকান পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। বঙ্গোপসাগরে ইহাদের একরূপ একাধিপত্য ছিল। পর্টুগীজদিগের অনুসরণ করিয়া ক্রমে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিও বঙ্গদেশে বাণিজ্যের জন্য সমাগত হয়, এবং ইহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্টুগীজগণ বাণিজ্য ব্যাপারে অক্ষম হইয়া পড়ে। ক্রমে তাহারা বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া

দেশীয় রাজা জমীদারদিগের অধীনে সৈনিকের কার্য্যে ব্রতী হয়। কিন্তু তাহাতেও সুচারুরূপে জীবিকা-নির্ব্বাহ না হওয়ায়, ক্রমে তাহারা জলদস্যুর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমগ্র বঙ্গোপসাগর বিক্ষুব্ধ করিতে থাকে। সনদ্বীপ তাহাদের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গঞ্জালেস নামক এক জন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি তাহাদের সর্দ্দার হইয়া বঙ্গোপ-সাগরতীরস্থ কোনও কোনও স্থান অধিকার করিয়া, শেষে আরাকান অধিকার করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু আরাকানরাজ তাহাকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দেন। পর্টুগীজগণ চট্টগ্রামে আশ্রয় লইয়া কিছুকাল শান্তভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ক্রমে তাহারা আবার দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলে, সুবেদারগণ তাহাদিগকে দমন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যে সময়ে পর্টুগীজেরা বঙ্গদেশে উপস্থিত হয়, যে সময়ে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম প্রধান বন্দররূপে প্রসিদ্ধ ছিল; তন্মধ্যে চট্টগ্রামেই জাহাজাদির গতায়াতের বিশেষরূপ সুবিধা থাকায়, তথায় পর্টুগীজেরা আপনাদের প্রধান উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু সপ্ত-গ্রামেও তাহারা বাণিজ্যার্থ উপস্থিত হইত, এবং ক্রমে তাহার নিকটেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সপ্তগ্রামের নিম্নস্থ নদী ক্রমে ক্ষুদ্রায়তন হইয়া উঠায়, তথায় আর জাহাজাদি যাইতে পারিত না। সেই জন্য পর্টুগীজেরা সপ্তগ্রামের সন্নিহিত ভাগীরথীর তীরে আপনাদের একটি উপ-নিবেশ স্থাপিত করে। বর্ত্তমান ব্যাণ্ডেল ও হুগলী তাহাদের উপনিবেশ-স্থান। ব্যাণ্ডেল বন্দর শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া কথিত হয়, এবং পর্টুগীজেরা যাহাকে 'গলিন' বলিয়া অভিহিত করিত, তাহাই হুগলী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জা আজিও সেই উপনিবেশের চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

গঞ্জালেসের পতনের পর পর্টুগীজগণ, সনদ্বীপ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি তাহা-

দের পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান স্থান পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে অভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং তথায় কিছু কাল শান্তভাবে অবস্থিতি করিয়া বাণিজ্য-কার্য্যে মনোনিবেশ করে। পূর্ব্ব হইতে হুগলীর প্রাধান্য বর্দ্ধিত হওয়ায় সপ্তগ্রামের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। হুগলীর এক দিকে নদী ও অন্য তিন দিকে বিল থাকায় জাহাজাদির গতায়াতের বিলক্ষণ সুবিধা ছিল। পর্টুগীজেরা অল্প রাজস্বে নদীর উপকূলবর্ত্তী ভূভাগের অধিকারী হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া দক্ষিণ-বঙ্গের বাণিজ্য একরূপ একচেটিয়া করিয়া লয়। যে সমস্ত জাহাজ বা নৌকা হুগলী বন্দরের নিকট দিয়া যাইত, পর্টুগীজেরা তাহাদের নিকট কর আদায় করিয়া লইত; ক্রমে তাহাতে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। বাণিজ্যে এইরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাহারা অবশেষে অধিবাসিগণের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা বালক-বালিকাগণকে প্রলোভনে ও বলপ্রয়োগে বশীভূত করিয়া দাস্যবৃত্তির জন্য ইউরোপে প্রেরণ করিত। এই কুৎসিত ব্যবসায় অবলম্বন করায় বঙ্গবাসিগণ পর্টুগীজদিগকে ভীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাহাদের অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্যেরও ক্ষতি হইতে থাকে। তাহার পর তাহারা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জলপথে ও স্থলপথে লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া দেশমধ্যে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। কি পূর্ব্ব-বঙ্গ, কি দক্ষিণ-বঙ্গ, কি পশ্চিম-বঙ্গ, ক্রমে সর্ব্বত্রই তাহাদের দাস-ব্যবসায় ও দস্যুবৃত্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব-বঙ্গে মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা নানা প্রকারে দস্যু-বৃত্তি করিতে আরম্ভ করে। তথায় দস্যু-বৃত্তি কিছু অধিক পরিমাণে সম্পাদিত হইত। পশ্চিম-বঙ্গে দাস ব্যবসায়ই কিছু প্রবল ছিল। যদিও পর্টুগীজেরা পূর্ব্ব-বঙ্গে দস্যু-বৃত্তি ও পশ্চিম-বঙ্গে দাস ব্যবসায় করিত, তথাপি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এই দুই ভীষণ ব্যাপারের জন্য আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালেই গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। যদিও আরাকান-রাজের সহিত বিবাদের ফলে তাহাকে সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি তাহার অনুচরগণ কিছুকাল

বঙ্গোপসাগরে অবস্থিতি করিয়া, অবশেষে হুগলীর অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই সময়ে শাজাহান বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি স্বীয় পিতা জাহাঙ্গীর বাদশাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া বাঙ্গলার তদানীন্তন সুবেদার ইব্রাহিম খাঁকে নিহত করিয়া বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। তাহার পর বাদশাহী সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া বাদশাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বঙ্গরাজ্যের বর্দ্ধমান প্রদেশ অধিকারের সময় পর্টুগীজদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি সেই সময়ে পর্টুগীজদিগের প্রভুত্ব ও অত্যাচারের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গে অনেক দিন অবস্থিতি করায়, তাহাদের প্রাধান্যের কথা সর্ব্বদাই তাঁহার কর্ণগোচর হইত। কিন্তু সে সময়ে তিনি তাহাদিগকে দমন করিবার কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। বরং বাদসাহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য তিনি তাহাদের সাহায্যগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাহাদের কামান, বন্দুক ও গোলন্দাজ সৈন্যের সাহায্যে তিনি বাদসাহী সৈন্যকে পরাজিত করিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই। তিনি যৎকালে বর্দ্ধমান প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে হুগলীর পর্টুগীজ শাসনকর্ত্তা রোড-রিগেজ হুগলী আক্রমণের আশঙ্কায় শাজাহানকে সম্মান-প্রদর্শনের জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শাজাহান সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু রোডরিগেজ পরিণামে বাদসাহী সৈন্যের জয় হইবে বুঝিতে পারিয়া শাজাহানের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। তজ্জন্য শাজাহান আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধগ্রহণ ও পর্টুগীজদিগের অত্যাচারনিবারণের ইচ্ছা সর্ব্বদাই তাহার মনে জাগরূক ছিল। জাহাঙ্গীরের দেহত্যাগের পর যখন তিনি ভারত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তিনি ইহার প্রতীকারে অবাহত হইলেন। তাহার ফলে পর্টুগীজগণ হুগলী হইতে বিতাড়িত হইয়া একেবারে হীনবল হইয়া পড়িল। তাহার পরেও তাহাদের কিছু কিছু চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেই সময় হইতেই বঙ্গে পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস হয়।

বাদশাহী মসনদে উপবিষ্ট হইয়া শাজাহান কাশীম খাঁ জবানীকে বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কাশীম খাঁর নিয়োগের সময় তিনি তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, পর্টুগীজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে উৎখাত করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে জলে ও স্থলে, উভয় পথেই সৈন্য প্রেরণ করিবে। *

কাশীম খাঁ রাজধানী ঢাকায় উপস্থিত হইয়া পর্টুগীজদিগকে দলন করিবার জন্য আয়োজন আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র এনায়েৎ উল্লা ও আল্লাইয়ার খাঁকে হুগলী অধিকারের জন্য প্রেরণ করিলেন। বাহাদুর কুম্বু নামক আর এক জন সেনাপতি মুকসুদাবাদের (মুর্শিদাবাদ) খালসা ভূমি অধিকারের ছলে এনায়েৎ উল্লার সহিত যোগদানের জন্য প্রেরিত হইলেন। পাছে পর্টুগীজগণ এই আক্রমণের সন্ধান পায়, এই আশঙ্কায় বাদশাহী সৈন্যগণ হিজলী অধিকারের জন্য যাইতেছে, এই কথা প্রচারিত হইল। আল্লাইয়ার খাঁ হিজলীর পথিমধ্যস্থ বৰ্দ্ধমান নগরে অবস্থিতি করিয়া খাজা শের প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খাজা শের শ্রীপুর † হইতে রণতরীসমূহ লইয়া পর্টুগীজদিগের

* ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, কাশীম খাঁ বাদশাহ শাজাহান কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করিলে পর, তিনি পর্টুগীজদিগের অত্যাচারের বিষয় জ্ঞাত হন; এবং বাদশাহকে অবগত করাইলে বাদশাহ তাঁহার সহিত পর্টুগীজদিগের অসদ্ব্যবহার স্মরণ করিয়া কাশীম খাঁকে তাহাদের ধ্বংস করিবার আদেশ দেন। কিন্তু আবদুল হামিদ লাহোরীর বাদশাহ-নামাতে লিখিত আছে যে, বাদশাহই তাঁহাকে উপদেশ দিয়া পাঠান।

† শ্রীপুরকে ষ্টুয়ার্ট ও ইলিয়ট শ্রীরামপুর বলিতে চাহেন। কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। শ্রীরামপুরে বাদশাহী রণতরী থাকার উল্লেখ কোথাও নাই, এবং থাকার প্রয়োজনও ছিল না। রাজধানী ঢাকার নিকটেই রণতরী থাকিত। সেই জন্য শ্রীপুর, যাহা পদ্মার তীরবর্ত্তী ও সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী ছিল, তথায় রণতরীর বহর থাকিত। এই শ্রীপুর চাঁদ রায় কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। কেদার রায় তাঁহার রণতরীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কাশীম খাঁ যেমন স্থলপথে ঢাকা হইতে বাদশাহী সৈন্যকে যাত্রা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তেমনই জলপথে শ্রীপুর হইতে রণতরী-যাত্রার আদেশ দেন। খাজা শের তাঁহার রণতরীসমূহ লইয়া ভাগীরথীর মোহানায় উপস্থিত হন। শ্রীরামপুরে রণতরী পর্টুগীজদিগের পথরোধের জন্য মোহানাতে যাইবার কোনও প্রয়োজন হইত না, এবং তজ্জন্য আল্লাইয়ার খাঁকে অধিক দিন বৰ্দ্ধমানে অবস্থিতি করিতে হইত না। ফলতঃ শ্রীপুর ঢাকার নিকটস্থ শ্রীপুর, হুগলীর নিকটস্থ শ্রীরামপুর নহে।

পলায়নপথ রুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রণতরীর বহর মোহানাতে উপস্থিত হইলে, আল্লাইয়ার খাঁ হুগলীতে উপস্থিত হইয়া পর্টুগীজদিগকে আক্রমণ করিবেন, এইরূপ স্থির হয়। খাজা শের মোহানাতে উপস্থিত হইলে আল্লাইয়ার খাঁ বৰ্দ্ধমান হইতে যাত্রা করিয়া সপ্তগ্রাম ও হুগলীর মধ্যস্থ হলদীপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হন। খাজা শেরও মোহানা হইতে হুগলীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সময়ে বাহাদুর কুম্বু মুকসুদাবাদ হইতে পাঁচ শত অশ্বারোহী ও বহু সংখ্যক পদাতিক লইয়া আল্লাইয়ার খাঁর সহিত যোগদান করেন। তাঁহারা খাজা শের যথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তথায় গমন করিলে, হুগলী ও সমুদ্রের মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ স্থান * সেতু দ্বারা বদ্ধ করিয়া পর্টুগীজদিগের পলায়নপথ রুদ্ধ করা হইল। সুতরাং পর্টুগীজেরা আর কোনরূপে জাহাজে আরোহণ করিয়া সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করিতে পারিল না।

যদিও পর্টুগীজগণের গতিরোধ করিয়া বাদসাহী সৈন্য হুগলী অধিকারের জন্য বিশেষরূপ সচেষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তাহারা সহজে পর্টুগীজদিগকে দমন করিতে সক্ষম হয় নাই। হুগলী বন্দরের প্রতিষ্ঠা করিয়া পর্টুগীজেরা তাহাকে এরূপ দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিয়াছিল যে, সহসা তাহার মধ্যে প্রবেশ করা সহজ ছিল না। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ নদী, ঝিল ও পরীখা দ্বারা বেষ্টিত ও পর্টুগীজদিগের বুরুজে সুরক্ষিত ও অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। বাদশাহী সৈন্য জলে ও স্থলে হুগলী দুর্গ অবরোধ করিয়া প্রায় সাড়ে তিন মাস পৰ্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ের মধ্যে বাদশাহী সেনাপতিগণ দুর্গের বহির্ভাগস্থ নদীর উভয়তীরবর্ত্তী স্থানে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া খৃষ্টানদিগকে নিহত ও বন্দী করিয়া আনিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পর্টুগীজদিগের নিযুক্ত বহুসংখ্যক বাঙ্গালী নাবিককে ধৃত করিয়া আপনাদের পক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন।

বাদসাহী সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পর্টুগীজেরা সময়ে সময়ে আত্ম-

* ষ্টুয়াট এই সঙ্কীর্ণ স্থানটিকে Seerpore লিখিয়া তাহাকে শ্রীরামপুর বলিতে চাহেন। কিন্তু বাদশাহ নামায় তাহাকে হুগলীর ও সমুদ্রের মধ্যস্থ একটি সঙ্কীর্ণ স্থান বলা হইয়াছে। তাহার কোনও নাম নাই।—Elliot's History of India, vol. vii. P. 33.

রক্ষার জন্য সামান্য যুদ্ধ করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহারা সন্ধির প্রস্তাবও করিয়া পাঠায়। তাহারা লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু পর্টুগাল ও গোয়া হইতে সাহায্য পাইবে, এই আশায় তাহারা একেবারে আত্মসমর্পণ করে নাই। তাহাদের প্রায় সাত হাজার বন্দুক-ধারী সৈন্য মধ্যে মধ্যে গুলি বর্ষণ করিয়া বাদশাহী সৈন্যকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল। এইরূপে প্রায়ঃসাড়ে তিন মাস অতীত হইয়া গেল।

তাহার পর ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাদশাহী সেনাপতিগণ দুর্গ অধিকারের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা সুড়ঙ্গে বারুদ পূর্ণ করিয়া হুগলী দুর্গ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পর্টুগীজদিগের গির্জ্জার নিকট পরিখাটি সঙ্কীর্ণ ছিল। তাঁহারা তথায় সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তাহার জল বাহির করিয়া দিলেন, এবং তাহা বারুদে পূর্ণ করিলেন। পর্টুগীজেরা জানিতে পারিয়া দুইটি সুড়ঙ্গ অকর্ম্মণ্য করিয়া দিল। * মধ্যস্থলে যে সুড়ঙ্গটি নিখাত হইয়াছিল, তাহার উপরিস্থ একটি বৃহৎ অট্টালিকায় বহুসংখ্যক পর্টুগীজ অবস্থিতি করিত। বাদশাহী সৈন্যগণ সেই অট্টালিকার সম্মুখে সমবেত হইয়া পর্টুগীজদিগকে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। যেই পর্টুগীজেরা তথায় উপস্থিত হইল, অমনই বাদশাহী সৈন্য সুড়ঙ্গে অগ্নিপ্রদান করিল ;—অট্টালিকা শূন্যমার্গে উত্থিত হইল, এবং তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক পর্টুগীজ ভূমিসাৎ ও বিদ্ধস্ত হইয়া গেল। বাদশাহী সৈন্য অমনই সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ আরম্ভ করিল। কতকগুলি পর্টুগীজ পলায়নের সময় নদীগর্ভে সমাহিত হইল। অনেকে জাহাজে আরোহণ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু খাজাম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারাও নিহত হইল।

অনেকগুলি পর্টুগীজ একখানি জাহাজে আরোহণ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পলায়ন অসম্ভব বুঝিয়া, মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কায় তাহারা জাহাজের বারুদাগারে আগুন লাগাইয়া

* ষ্টুয়ার্ট পর্টুগীজদিগের দুইটি সুড়ঙ্গ বাদশাহী সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক নষ্ট করার কথা লিখিয়াছেন।

দিল। জাহাজখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, এবং পর্টুগীজগণও নিহত হইল। আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র নৌকা অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হইয়া যায়। ৬০ খানি বড় ডিঙ্গা, ৫৭ খানি ঘেরাব বা মাঝারি নৌকা ও ৩০০ খানি জেলিয়া ডিঙ্গির মধ্যে একখানি ঘেরাব ও দুইখানি জেলিয়া ডিঙ্গি পলাইয়া যায়। নৌসেতুর মধ্যস্থ দুই একখানি নৌকা পর্টুগীজদিগের নৌকার আগুনে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই রন্ধ্রপথে তাহাদের পলায়নের পথ হইয়াছিল। জলে স্থলে যাহারা পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল, সকলেই বন্দী হইয়াছিল। অবরোধের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পর্টুগীজদিগের প্রায় দশ সহস্র লোক নিহত হয়। * বাদশাহী সেনার প্রায় সহস্র সৈন্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। বাদশাহী সৈন্য ৪৪০০ শত পর্টুগীজ পুরুষ ও রমণীকে বন্দী করিয়াছিল। পর্টুগীজগণ কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দীকৃত প্রায় ১০০০০ হাজার লোক মুক্তিলাভ করিয়াছিল। পর্টুগীজ বন্দীদিগের মধ্যে প্রায় ৫০০ শত সুন্দর পুরুষ আগ্রায় প্রেরিত হয়। সুন্দরী বালিকারা বাদশাহ ও আমীর ওমরার অন্তঃপুরে স্থানলাভ করে। বালকেরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। জেসুইট ও অন্যান্য পাদরীদিগকে মুসলমান হইবার জন্য ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক মাস কারাবাসের পর তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া গোয়ার অভিমুখে পলায়ন করে। দুর্গে ও নৌকায় যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল, সৈন্যেরা সে সকল অধিকার করিয়া লয়। গির্জ্জার অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্র ছিন্ন ভিন্ন ও নষ্ট হইয়াছিল।

পর্টুগীজগণ বিতাড়িত হইলে, হুগলী বাদশাহী বন্দরে পরিণত হয়; তথায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত হন। সপ্তগ্রাম হইতে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী অতঃপর হুগলীতে আসিয়া বাস করিতে আদিষ্ট হন। তদবধি সপ্তগ্রামের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপে বাঙ্গলায় পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস হয়। পূর্ব্ব-বঙ্গে তাহারা আরও কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিল বটে, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে তাহাদের আর কোনও নিদর্শন ছিল না। পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম প্রদেশে যাহারা অবস্থিতি করিত, নবাব শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিলে, তাহারাও তথা হইতে বিতাড়িত হয়। এক্ষণে বঙ্গলায় তাহাদের বিশেষ কোনও নিদর্শন না থাকিলেও, চট্টগ্রাম প্রদেশে তাহাদের কিছু কিছু চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

* ষ্টুয়ার্টে এক হাজার আছে।

ঐতিহাসিক চিত্র

——:*:——

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সামগ্রী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতাংশের পর)

(উ) প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।—ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বহু প্রাচীন পুস্তকে কোথাও প্রসঙ্গবশতঃ, কোথাও উদাহরণার্থ কিছু কিছু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহু নাটক কোন না কোন একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত, এবং কোন কাব্য, কথা ইত্যাদি পুস্তকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের নাম ও তাঁহাদিগের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এইরূপ উপায়ে উপলভ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত এইরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকটিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে, তথাপি তাহাদিগের দ্বারা কিরূপ উপযোগী বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই দেখাইবার জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে,—অর্থের লালসা প্রযুক্ত মৌর্য্যদিগের দ্বারা প্রতিমা-নির্ম্মাণ ও সাকেত (অযোধ্যা) এবং মধ্যমিকার* প্রতি যবন-দিগের (ইউনানি) আক্রমণের সন্ধান পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের কাম্য-

* মধ্যমিকা নগরী মিবারের প্রসিদ্ধ চিতোর দুর্গের নিকট ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীক্‌নরপতিদিগের মধ্যে মিনণ্ডরের গুজরাত, রাজপুতানা প্রভৃতির বিজয়-কাহিনী, তথা হইতে প্রাপ্ত অনেক মুদ্রা (সিক্কা) হইতে অনুমান করা যায়। অতএব গ্রীক্‌রাজ মিনণ্ডরই মধ্যমিকার আক্রমণকারী হওয়া সম্ভাবিত।

সূত্রে কুণ্ডলদেশের রাজা শাতকর্ণি শাতবাহনের ক্রীড়াপ্রসঙ্গে তাঁহার মহিষী মলয়বতীর মৃত্যুঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রণেতা শূদ্রকরাজার শতবর্ষবয়ঃক্রমে অগ্নিতে উপবিষ্ট ও দগ্ধ হইয়া পরলোক-গমন-বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। যে সন্ধি পত্র ১২৮৮ বিং সংবতে (১১৩২ খৃঃ অঃ) দক্ষিণের যাদব নরপতি সিংহন (সিংঘন) এবং ধোলকার বাঘেল—সোলংকী রাণা লাবণ্য প্রসাদের (লবণ প্রসাদ) মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ লিখিত হয়, লেখ-পঞ্চাশিকাপ্রণেতা তাহার সম্পূর্ণ প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছেন। পিঙ্গলসূত্রবৃত্তিতে, হলায়ুধ পণ্ডিত মালবের প্রমার-রাজ মুঞ্জের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রমার-নরপতি অর্জ্জুনবর্ম্মা অমরুশতকের টীকায় জগদ্দেবকে (জগদেব প্রমার) স্বীয় পূর্ব্বপুরুষরূপে অভিহিত করিয়া, তাঁহার প্রশংসাব্যঞ্জক কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। জ্ঞানপ্রভসূরি-রচিত তীর্থকল্পের সত্যপুরকল্প (মাড়বারের সাচোর) হইতে ১৩৫৬ বিং সংবতে (১৩০০ খৃঃ অঃ) আলাউদ্দীন খিলজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উলগ খাঁ কর্ত্তৃক মিবার আক্রমণ এবং চিতোরের অধিপতি সমরসিংহ রাবল কর্ত্তৃক উক্ত প্রদেশের রক্ষা অবগত হওয়া যায়। প্রাকৃত পিঙ্গলসূত্রের টীকায় লক্ষ্মীনাথভট্ট কর্ত্তৃক চৌহান হাম্বীর, কর্ণাদি রাজাদিগের প্রশংসা-সূচক শ্লোক উদাহরণার্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অশোক-অবদান নামক পুস্তকে শিশুনাগবংশের রাজাদিগের নামাবলী এবং হেমচন্দ্র-(হেমাচার্য্য) রচিত ত্রিষষ্ঠীপুরুষশলাকা চরিতের পরিশিষ্টপর্ব্বে শিশুনাগ ও মৌর্য্য-বংশের কিছু কিছু বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মেরুতুঙ্গ-রচিত বিচারশ্রেণীতে গুজরাতের চাবড় এবং সোলংকীদিগের সম্পূর্ণ বংশাবলী, প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল, এবং অন্যান্য কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। প্রবচনপরীক্ষায় ধর্ম্মসাগর কর্ত্তৃক গুজরাতের চাবড় ও সোলংকীগণের পূর্ণ বংশাবলী ও রাজত্বকাল প্রদত্ত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস মাল-বিকাগ্নিমিত্র নাটকে শুঙ্গবংশের সংস্থাপক রাজা পুষ্যমিত্রের সময়ে তাঁহার

পুত্র অগ্নিমিত্রের বিদিশা (ভিলসা) শাসন, বিদর্ভ (বেরার) দেশের রাজত্বের জন্য যজ্ঞসেন এবং মাধবসেনের মধ্যে বিরোধ সংঘটন, মাধবসেনের বিদিশাগমনার্থ পলায়ন ও যজ্ঞসেনের সেনাপতি কর্তৃক বন্দিদশা-প্রাপ্তি, মাধবসেনের মুক্তিসম্পাদনার্থ যজ্ঞসেনের সহিত অগ্নিমিত্রের যুদ্ধ, এবং বিদর্ভকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া একাংশ উঁহাকে ও অপরাংশ মাধবসেনকে প্রদান, পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব রাজপুতানাস্থিত সিন্ধ (সিন্ধু) নদীর দক্ষিণ তটে যবনগণ (ইউনানি) কর্তৃক গ্রহণ, যবনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বসুমিত্র কর্তৃক অশ্বের পুনরুদ্ধারসাধন, এবং পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞের পূর্ণতা প্রাপ্তি প্রভৃতি বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। আজমীরের চৌহাননরপতি বিগ্রহরাজের (বীসলদেবের) রাজকবি সোমেশ্বর-রচিত ললিতবিগ্রহরাজ নাটকে বীসলদেব ও মুসলমানদিগের যুদ্ধের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। মালবের প্রমারনরপতি অর্জ্জুনবর্ম্মার রাজগুরু মদন-রচিত পারিজাতমঞ্জরী নাটিকায় অর্জ্জুনবর্ম্মা ও গুজরাতের সোলংকী নৃপতি জয় সিংহের (যিনি দ্বিতীয় ভীমদেবের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন) গুজরাতস্থিত পর্ব্বপর্ব্বতের (পাবাগড়) সমীপবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধসংঘটন ও তাহাতে পরাজিত জয়সিংহের পলায়ন-বৃত্তান্ত উল্লিখিত আছে। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয়-নাটক হইতে অবগত হওয়া যায়, চেদী দেশের হৈহয়বংশীয় (কলচুরি) রাজা কর্ণ কালিঞ্জরের বন্দেল নরপতি কীর্ত্তিবর্ম্মার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু কীর্ত্তিবর্ম্মার ব্রাহ্মণ সেনাপতি গোপাল কর্ণকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে পুনরায় রাজসিংহাসনে সংস্থাপন করেন। গুণাঢ্যের পৈশাচী ভাষার বৃহৎকথার সংস্কৃত অনুবাদ কথা-সরিৎসাগরে বররুচি, ব্যাড়ি, পাণিনি, নন্দ, শকটার, চাণক্য, সাতবাহন, বৎসরাজ, চণ্ডমহাসেন, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির কাহিনী লিখিত আছে। শিবসিংহের আশ্রিত বিদ্যাপতিপণ্ডিত রচিত পুরুষপরীক্ষায় মিথিলার কর্ণাটবংশীয় রাজা নান্যদেবের পুত্র মল্লদেব, গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেন

ধারানগরীর রাজা ভোজ এবং কাশীর রাজা জয়চন্দ্র প্রভৃতির কিছু কিছু বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।—এই প্রকারের সামগ্রী হইতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সংগ্রহ করিবার আধার লেখকের বহুশ্রুততার উপরই নির্ভর করে।

(উ) পুস্তকের আরম্ভ ও শেষভাগ।—খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণের কেহ কেহ বিশেষ করিয়া স্ব স্ব পুস্তকের আদি অথবা অন্তে নিজের অথবা স্বীয় আশ্রয়দাতা রাজার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। কেহ কেহ বা স্বীয় আশ্রয়দাতার বংশের বিবরণ বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে প্রাচীনকালের কোন কোন বিদ্বান্ অনুলিপি লেখক অনেক পুস্তকের শেষভাগে নকল করিবার সংবৎ এবং সেই সময়ের রাজার নামও দিয়াছেন। এই জাতীয় উপাদান হইতেও ইতিহাসের অনুকূলে কিছু কিছু সহায়তা লাভ করা যায়। তন্মধ্যে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ এস্থানে প্রদত্ত হইতেছে।

জহলন পণ্ডিত স্বীয় মুক্তি-মুক্তাবলীর প্রারম্ভে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের বৃত্তান্তে দেবগিরির (দৌলতাবাদের) কয়েকটি যাদব নরপতির পরিচয় দিয়াছেন। দেবগিরির যাদব নৃপতি মহাদেবের প্রধান মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ হেমাদ্রী পণ্ডিত স্বীয় চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণির ব্রতখণ্ডের শেষভাগের রাজ-প্রশস্তিতে পুরাণপ্রসিদ্ধ অনেক যদুবংশীয় রাজার নামাবলী ব্যতীত, দক্ষিণে রাজ্য-সংস্থাপক রাজা দৃঢ়প্রহার হইতে আরম্ভ করিয়া মহাদেব পর্য্যন্তের সম্পূর্ণ বংশাবলী ও কয়েকজন রাজার কিছু কিছু বিবরণও প্রদান করিয়াছেন। গুজরাতের সোলংকীদিগের পুরোহিত সোমেশ্বর স্বরচিত সুরথোৎসব কাব্যের পঞ্চদশ সর্গে স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে গুজরাতের সোলংকীদিগের কিছু কিছু বৃত্তান্ত দিয়াছেন। ধনপাল পণ্ডিত তিলকমঞ্জরির প্রারম্ভে প্রমারগণের উৎপত্তি এবং বৈরীসিংহ হইতে ভোজ পর্য্যন্তের বংশাবলী দিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত ৫৫০ শক সং (বিংসংবং ৬৮৫ =৬২৮ খৃঃ অঃ) যোধপুর রাজ্যে অবস্থিত ভীনমালে ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত

রচনা করেন। সে সময়ে চাপ (চাবড়) বংশীয় ব্যাঘ্রমুখ সেখানকার রাজা ছিলেন, ইহা তাঁহার লিপি হইতে অবগত হওয়া যায়। ভীনমাল নগরের অধিবাসী প্রসিদ্ধ মাঘকবি খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে শিশুপালবধ কাব্য রচনা করেন। ইহাতে স্বীয় পিতামহ সুপ্রভ দেবকে সেখানকার রাজা বর্ম্মলাতের সর্ব্বাধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জিনেশ্বর শক সং ৭০৫ (বিং সং ৮৪০=৭৮৩ খৃঃ অঃ) জৈন হরিবংশ পুরাণ লিপিবদ্ধ করেন। সেই সময়ে উত্তরে ইন্দ্রায়ুধ, দক্ষিণে বল্লভ, পূর্ব্বে বৎসরাজ এবং পশ্চিমে বেহারের (জয় বরাহ) রাজ্য বৃত্তান্ত উক্ত পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমিতগতি বিং সং ১০৫০ (৯৯৩ খৃঃ অঃ) সুভাষিত রত্নসন্দোহ নামক পুস্তক রচনা করেন। সেই সময়ে মুঞ্জপ্রমার মালবের রাজা ছিলেন। বজ্রটের পুত্র উবট উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিয়া শুক্ল যজুর্ব্বেদের ভাষ্য রচনা করেন। সে সময়ে সেখানে ভোজপ্রমার রাজা ছিলেন। প্রাগ্‌বাট (ওরবাড়) মহাজন ধবলের কন্যা বিং সং ১২৬১ (১২০৫ খৃঃ অঃ) আশ্বিন মাসে মুঞ্জাল পণ্ডিতের দ্বারা জয়ন্তী বৃত্তির অনুলিপি নির্ম্মাণ করাইয়া অজিতদেব সূরিকে উপহার প্রদান করেন। ঐ সময়ে ভীমদেব সোলংকী অনহিলওয়াড়ার রাজা ছিলেন। এবং ১২৮৪ বিং সং (১২২৮ খৃঃ অঃ) ফাল্গুন মাসে সেট হেমচন্দ্র উঘনির্যুক্তির নকল করান। সেই সময়ে আঘাটদুর্গে (মিবাড়ের প্রাচীন রাজধানী—অহাড়) জৈত্রসিংহ রাবল রাজত্ব করিতেন এবং মহামাত্য জগৎসিংহ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন;—এইরূপ উক্ত দুই পুস্তকের অনুলিপি লেখকের রচনা হইতে অবগত হওয়া যায়।

এই জাতীয় সামগ্রী হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যদি সেগুলি সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তুত হইয়া যায়। প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তকাবলীর কয়েকটি বিবরণ (রিপোর্ট) এবং কয়েকটি পুস্তকালয়ের তালিকা এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে

যে, বহু পুস্তকের আদ্যন্তের কিছু কিছু আবশ্যক অংশও উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে অল্প পরিশ্রমেই অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এইরূপ পুস্তকের মধ্যে ডাঃ কিলহর্ণ, বুলর্, ভাণ্ডারকর, পীটর্সন ও শেষ গিরিশাস্ত্রীর রিপোর্ট, ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও হর প্রসাদ শাস্ত্রী সংগৃহীত সংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপনী (নোটিসেস্ অব্ সংস্কৃত ম্যানস্ক্রিপ্টস্) এবং বেনারস কলেজ, কাশ্মীর, আলবর, বাকানির, নেপাল, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, ইণ্ডিয়া আফিস, ব্রিটিশ্ মিউজিয়ম, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহের তালিকাই প্রধান। ডাঃ অফ্রেটের সূচীর সূচী (ক্যাটালোগস্ ক্যাটালোগরম) * নামক তিন ভাগে মুদ্রিত গ্রন্থই এ বিষয়ের অপূর্ব্ব পুস্তক।

(খ) বংশাবলীর পুস্তক।—ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের রাজা ও ধর্ম্মাচার্য্যদিগের বংশ পরম্পরার পুস্তক পাওয়া যায়। এইরূপ পুস্তকাবলীর মধ্য হইতে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১) প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র-রচিত নৃপাবলী (রাজাবলী),—ইহাতে কাশ্মীরের রাজাদিগের যে বংশাবলী দেওয়া আছে, তাহা কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(২-৩) জৈনপণ্ডিত বিদ্যাধর-সংগৃহীত রাজতরঙ্গিণী ও রঘুনাথরচিত রাজাবলী,—এই পুস্তকদ্বয়ে জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা জয়সিংহের সময়ে মেজয়পুরে রচিত। ইহাতে ভারতযুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত রাজাদিগের নামাবলী সন্নিবেশিত করিবার যত্ন করা হইয়াছে। আমরা এই পুস্তক দুইখানি দেখি নাই; কিন্তু কর্ণেল টড্ রাজ-

* ১৯০৩ খৃঃ অঃ জুলাই পর্য্যন্ত হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তকের সংশোধন বিষয়ক যত রিপোর্ট ও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহের যাবতীয় তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদিগের সম্পূর্ণ সন্ধান এই অমূল্য পুস্তক হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্য হইতে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম উপরে প্রদত্ত হইয়াছে।

স্থান নামক পুস্তকে, ইহাদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এ স্থলে ইহাদিগের উল্লেখ করা হইল। কর্ণেল টড্ রাজাবলীর অনুসারে, পরীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপাল পর্য্যন্ত চারি বংশের বংশাবলী দিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্য হইতে প্রথম বংশের ২৮ জন রাজার নাম বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবত প্রদত্ত সেই বংশের রাজাদিগের নামের সহিত তুলনা করিলে, চারিটি রাজার নামের সহিতই পরস্পর মিল পাওয়া যায়। অতএব উহাদিগের দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের অনুকূলে সাহায্য পাইবার খুব কমই সম্ভাবনা।

(৪) নেপালের বংশাবলী,—নেপালে পার্ব্বতীয় বংশাবলী নামক এক পুস্তক পাওয়া যায়। ইহাতে কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উক্ত দেশের রাজ্যশাসক ভিন্ন ভিন্ন বংশের নামাবলী ও প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তথা হইতেই প্রাপ্ত শীলালিপি সমূহ ও হস্তলিখিত পুস্তকাবলীতে প্রদত্ত তত্রত্য রাজাদিগের নাম ও উক্ত বংশাবলীর তুলনা করিলে, উহা অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, ঠাকুরীবংশের রাজা অংশু-বর্ম্মার শীলালিপি হইতে খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে তাঁহার আবির্ভাব কাল উপলব্ধ হয়। চীন দেশীয় যাত্রী হুয়েন সাং প্রায় ৬৩৭ খৃঃ অঃ নেপালে উপস্থিত হন। উহার অল্পকাল পূর্ব্বেই অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হয়,—ইহা উক্ত যাত্রীর লিপি হইতেই অবগত হওয়া যায়। কিন্তু উক্ত বংশাবলী অনুসারে, তাঁহার আবির্ভাব খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেই স্বীকার করিতে হয়। এ অবস্থায় ঐ বংশাবলী প্রাচীন ইতিহাসের নিমিত্ত উপযোগী হইতে পারে না। প্রাচীন সময়ের রাজাদিগের নাম সমূহের মধ্য হইতে কতকগুলি ঠিক বটে, কিন্তু সবগুলি সেরূপ নহে। এই পুস্তক ইণ্ডিয়ান আণ্টিকোয়েরীর ১৩শ খণ্ডে (৪১০-৪২৮ পৃঃ) মুদ্রিত হইয়াছে।

(৫) উড়িষ্যার বংশাবলী,—নেপালের ন্যায় উড়িষ্যার রাজাদিগের বংশাবলী তালপত্রে লিখিত (খোদিত) অবস্থায় জগন্নাথপুরী হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাতে যুধিষ্ঠির হইতে আরম্ভ করিয়া আজ-পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজাদিগের নামাবলী ও প্রত্যেকের রাজ্যসময় প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহারও নেপালের বংশাবলীর ন্যায়ই অবস্থা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দির নির্ম্মাণের বিবরণ দেখুন। প্রাচীন তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায়, অধুনা বিদ্যমান জগন্নাথমন্দির গঙ্গাবংশীয় রাজা অনন্তবর্ম্ম চোলগঙ্গ প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাঁহা হইতে পঞ্চম রাজা অনঙ্গ-ভীমদেব উক্ত মন্দিরের নির্ম্মাতা বলিয়া উক্ত বংশাবলীতে লিখিত আছে। অনন্তবর্ম্ম চোল গঙ্গের রাজ্যাভিষেক ৯৯৯ শক সং (১১৩৪ বিং সংবৎ= ১০৭৮ খৃঃ অঃ) নিষ্পন্ন হয়, ইহা উক্ত তাম্রশাসন হইতেই অবগত হওয়া যায়। কিন্তু উক্ত বংশাবলীতে ১১৩২ খৃঃ অঃ উঁহার রাজ্যারম্ভ হয়, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের নামগুলিই অধিক ভ্রান্ত। এই বংশাবলী হণ্টার সাহেবের উড়িষ্যা নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৪—১৯১ পৃঃ) মুদ্রিত হইয়াছে।

(৬) ভাটদিগের বংশাবলী :—ভাটগণ প্রত্যেক রাজবংশের বংশ-পরম্পরা লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু শিলালিপি তাম্রশাসনাদির সহিত তাঁহাদিগের পুস্তকের তুল্য রাজবংশ সমূহের নামগুলি মিলাইলে, খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্তের নামসমূহের অতি অল্পই শুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়। আবার একই বংশের সম্বন্ধজ্ঞাপক দুই খানি ভাটগ্রন্থে পরস্পর মিল দেখা যায় না। সিরোহীর চৌহান ভূপতিদিগের ভাট পুস্তকে উক্ত বংশের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত ২২৭টি নাম আছে, এবং বংশভাস্কর অনুসারে বুন্দীর ভাটপুস্তকে ১৭৭টি নাম আছে, কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে ৭টি নামেরই কেবল পরস্পর মিল পাওয়া যায়। ভাটদিগের বংশাবলী খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্তের ইতিহাসের নিমিত্ত বিশেষ উপ-

যোগী নহে, কারণ উক্ত সময়ের পূর্ব্বের নাম সমূহ হইতে অধিকতর কৃত্রিম নামই উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(৭) পট্টাবলীসমূহ,—জৈনদিগের প্রত্যেক গচ্ছের আচার্য্যদিগের ক্রমপরাম্পরাজ্ঞাপক পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাদিগকে পট্টাবলী কহে। ঐ সমস্তে মহাবীর স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া উহাদিগের লিখিত হইবার সময় পর্য্যন্ত, প্রত্যেক গচ্ছের আচার্য্যদিগের নামাবলী, তাহাদিগের জন্মসংবৎ, জন্মস্থান, দীক্ষাসংবৎ, আচার্য্যপদ প্রাপ্তির সংবৎ ও ধর্ম্মপ্রচারক-দিগের বৃত্তান্ত থাকে। ইহা হইতেও কয়েকটি ঐতিহাসিক সন্ধান পাওয়া যায়। এই পট্টাবলী সমূহ খৃঃ দশম শতাব্দীর পরে লিখিতে আরম্ভ হই-বার সম্ভাবনা বলিয়া অনুমিত হয়।

(এ) প্রচলিত ভাষার ঐতিহাসিক পুস্তক সমূহ,—সংস্কৃত প্রাকৃত ব্যতিরিক্ত হিন্দী ও তামিলাদি ভাষায় লিখিত অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহা হইতেও কিছু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। এইরূপ পুস্তকাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :—

(১) রত্নমালা,—হিন্দিভাষার ঐতিহাসিক পুস্তকাবলীর মধ্যে রত্ন-মালাই সর্ব্বোত্তম। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সমাপবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণকবি ইহার রচনা করেন। ইহাতে ১০৮টি রত্ন বা অধ্যায় ছিল, কিন্তু ১৮টি মাত্র আজ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাতে গুজরাতের চাবড়বংশীয় রাজাদিগের নামাবলী এবং মূলরাজ হইতে দ্বিতীয় ভীমদেব পর্য্যন্ত সোলংকী রাজাদিগের কিছু কিছু বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে। ইহার ৮টি রত্ন গুজরাতী অনুবাদের সহিত আহমদাবাদে মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) পৃথ্বীরাজরাসা,—ইহাতে চৌহান বংশের প্রতাপান্বিত রাজা পৃথ্বীরাজের ইতিবৃত্তই প্রধানতঃ বর্ণিত। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, এই রাজস্থানী হিন্দীভাষার কাব্যখানি উক্ত পৃথ্বীরাজের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চাঁদবরদাই নামক ভাট রচনা করিয়াছিলেন

যদি এই পুস্তক সেই সময়ের রচিত হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বাভিহিত "পৃথ্বীরাজবিজয়ের" ন্যায় ইহাও ইতিহাসের চক্ষে অমূল্য গ্রন্থ হইত। কিন্তু চৌহানদিগের প্রাচীন শিলালিপি তাম্রশাসন, ও পৃথ্বীরাজবিজয়প্রমুখ ঐতিহাসিক পুস্তকের সহিত তুলনা করিলে, ইহাতে প্রদত্ত চৌহানদিগের বংশাবলী, ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এবং সালসংবতের অনেক কৃত্রিমতা উপলব্ধ হয়। অতএব খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর সমীপবর্ত্তী সময়ে, আমরা উহার রচনা অনুমান করিয়া লইতে পারি। প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে এই পুস্তক উপযোগী নহে। কাশীস্থ নাগরী-প্রচারিণী সভা ইহা মুদ্রিত করিতেছেন।

(৩) খুম্মানরাসা,—এই হিন্দী কাব্যখানি একজন জৈন সাধু কর্ত্তৃক খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উদয়পুরে রচিত। ইহাতে মিবারের প্রসিদ্ধ রাজা খুম্মানের ইতিবৃত্ত বিবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বহু অংশই কল্পিত। প্রাচীন ইতিহাসের নিমিত্ত এই পুস্তকের উপযোগিতা বড়ই কম। ইহা আজ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই।

উপরে কথিত হিন্দীপুস্তক ব্যতীত বীসলদেবরাসা, হাম্মীররাসা, রাণারাসা, রায়মলরাসা, রাজবিলাস প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তক পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের নিমিত্ত তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে না।

(৪) কলবলিনাডপটু,—ইহা তামিলভাষার একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর নিকট পোইকয়ার নামক কবি ইহা রচনা করেন। ইহা চোলদেশের রাজা চেঙ্কন এবং চেরের (মহীশূররাজ্যের গঙ্গবাড়ীর) রাজা কণেকাইরুপোড়ের পরস্পর যুদ্ধ বর্ণনা আছে, ইহাতে চেররাজ বন্দী হন। এই পুস্তক ইংরাজী অনুবাদ সহিত ইণ্ডিয়ান্ আন্টিকোয়েরীর ১৮শ খণ্ডে (২৫৮-২৬৫ পৃঃ) মুদ্রিত হইয়াছে।

(৫) কালঙ্গত্তু পরণী,—খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের নিকট-বর্ত্তী সময়ে জয়ং কোণ্ডান নামক কবি এই তামিল কাব্য রচনা করেন।

হাতে চোলদেশের সোলংকী রাজার প্রথম কুলোত্তুঙ্গ চোলদেবের কলিঙ্গদেশের বিজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। ইহার সারাংশ ইংরাজী অনুবাদ সহিত ইণ্ডিয়ান্ আণ্টিকোয়েরীর ১৯ শ খণ্ডে (৩২৯-৩৪৫ পৃঃ) মুদ্রিত হইয়াছে।

(৬) বিক্রমশোলনুলা,—খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধে রচিত এই তামিল কাব্যে চোলদেশের রাজ্যশাসক রাজা শোঙ্গত বা চেঙ্কন চোল হইতে বিক্রমচোল পর্য্যন্ত রাজাদিগের নামাবলী এবং বিক্রমচোলের যাত্রানুসঙ্গী যান বাহনের যথাতথ বর্ণনা আছে। ইহার সারাংশ ইংরাজী অনুবাদ সহিত ইণ্ডিয়ান্ আণ্টিকোয়েরীর ২২ শ খণ্ডে (১৪১-১৫০ পৃঃ) মুদ্রিত হইয়াছে।

(৭) রাজরাজনুলা,—ইহাতে উল্লিখিত বিক্রমশোলনুলার পদ্ধতিতে রচিত তামিলকাব্য। ইহাতে চোলদেশের সোলংকী নরপতি দ্বিতীয় রাজরাজের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই কাব্য খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত, আজ পর্য্যন্ত ইহা মুদ্রিত হয় নাই। উল্লিখিত চারিখানি তামিলকাব্য প্রাচীন ইতিহাসের নিমিত্ত উপযোগী।

(৮) কোঙ্গুদেশ রাজাক্কল,—ইহাও তামিল ভাষার পুস্তক। ইহাতে কোঙ্গুদেশের (মহীশূরস্থিত গঙ্গবাড়ীর) গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের বংশাবলী ও তাঁহাদিগের রাজত্বকাল প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বহুশঃ কল্পিত। তথাপি রাজাদিগের নামের মধ্যে অনেকগুলি নির্ভুল। প্রাচীন ইতিহাসের নিমিত্ত ইহা বিশেষ উপযোগী নহে।

উল্লিখিত সামগ্রী অর্থাৎ আমাদিগের এখানকার প্রাচীন পুস্তক সমূহ হইতে, খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া, মুসলমানদিগের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুরাজ্যের বিলয়সাধন পর্য্যন্ত, এদেশের ভিন্ন বিভাগের রাজ্যশাসক অনেক রাজবংশের মধ্যে কেবল অণহিলওয়াড়ার চাবড় ও সোলংকী ব্যতীত অন্য কোন বংশের সম্পূর্ণ বংশাবলী প্রস্তুত হইতে

পারে না। ইরাণী,(পারসিক), ইউনানি (গ্রীক্), শক, কুষণ (তুর্ক), হূণ, প্রভৃতি বিদেশীয় বিজেতৃবর্গের বংশাবলী বা তাহাদিগের বৃত্তান্ত কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহা সত্বেও ইহা হইতে অনেক রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলনে, অনেক সহায়তা পাওয়া যায়। অধিকন্তু জনসমূহের ধর্ম্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় অবস্থা, রীতি-নীতি, ব্যাপার, সাহিত্যাদি অনেক প্রয়োজনীয় তত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি

যেস্থানে একদিন ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের লীলাক্ষেত্র ছিল, যে স্থানে একদিন প্রব্রজ্যাগ্রহণান্তর ভিক্ষুগণ নীরবে ধ্যানপরায়ণভাবে সময় অতিবাহিত করিতেন,—এই সেই পবিত্র খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি। কত পুণ্যাত্মা-জ্ঞান সম্পন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পূত-পদ-চিহ্ন-রেখা এখানে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? ধন্য তাঁহারা, ধন্য সেই স্বার্থহীন দ্বেষহীন-ভিক্ষুর দল: যাঁহারা এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্পন্ন শ্যামল বনরাজি-পরিশোভিত সংসারের কোলাহলহীন নীরব ও বিজন এমন সুরম্যস্থানকে তপস্যার উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। কতদিন কতকাল চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও এই গিরিদ্বয় প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সাহিষ্ণুতা ও বৈরাগ্যের সহিত অপূর্ব্ব শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাঁহার অত্যাশ্চর্য্য বৈরাগ্যের মহত্ব সুদূর চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মধ্য এসিয়া ও পারস্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের

বজয় পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই আত্মত্যাগী কর্ম্মবীরকে জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর সহিত নমস্কার করি। গুণের আদর—আত্মত্যাগী রাজসন্ন্যাসীর প্রতি সম্মান, কবি ভিন্ন নির্ভয় চত্তে আর কে প্রদর্শন করিতে পারে? তাই কবি জয়দেব বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতাররূপে গাহিয়াছেন।

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহঃ শ্রুতিজাতম্।
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্॥
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর।
জয় জগদীশ হরে॥"

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির মধ্য দিয়া একটী অল্প প্রশস্ত রাজপথ বহিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে দুইটী গিরি। পাহাড়ের দুইদিকই নিবিড় অরণ্যানী দ্বারা আচ্ছাদিত—গাছের পর গাছ, তার পর গাছ, ক্রমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সুদূর সীমান্তে মিশিয়া গিয়াছে। রাস্তার পার্শ্বে একটী ডাকবাংলা আছে, ভ্রমণকারিগণ সেস্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন। খণ্ডগিরির পাদপ্রান্তে একটী নোটিস বোর্ডে লিখিত আছে—"You are requested not to write your names in the caves or the temples." অর্থাৎ এই গিরিগুহাতে বা মন্দিরে আপনাদের নাম লিখিবেন না এই প্রার্থনা; কিন্তু এই অনুরোধবাক্য অতি অল্পলোকেই পালন করিয়া থাকে। হায়! মানবগণ প্রত্যেকেই পৃথিবীতে নিজ নিজ স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার জন্য পাগল, কিন্তু পৃথিবী কি কাহাকেও মনে রাখিয়াছে? কত রাজা, কত সম্রাট্, কত কোটীশ্বর, কত প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিগণ জগতে পদাঙ্ক-রেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজ এই সর্ব্বগ্রাসিনী রাক্ষসী বসুমতীকে তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা কর, সে এক মুষ্টি ধূলিকণামাত্র দেখাইয়া দিবে। তবু অন্ধ আমরা জগতে স্মৃতি রাখিবার জন্য পাগল। অনেক হিন্দু এই বৌদ্ধ কীর্ত্তিরাশি সমলঙ্কৃত স্থান দেখিতে আইসেন না—পূর্ব্বেও ইহা

হিন্দুদিগের ত্যজ্য ছিল। এখনও ইহা হিন্দুতীর্থ নহে,—সাধারণ তীর্থযাত্রিগণের মধ্যে অনেকে ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অবগত নহেন, কাজেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অতি অল্পলোকেই এ সকল গুম্ফা ইত্যাদি দর্শন করিয়া থাকেন।

উদয়গিরির পাদদেশে একটী পর্ণকুটীর আছে, তাহা বৈরাগীর মঠ নামে পরিচিত। মঠধারী একটী বৃদ্ধ ব্যক্তি। গৃহাভ্যন্তরে দেওয়ালের গাত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত ও বহু খড়ম সাজান রহিয়াছে। মঠধারী বৃদ্ধ এই সমুদয় খড়মের মধ্য হইতে এক জোড়া খড়ম চৈতন্যদেবের খড়ম বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। একথা কতদূর সত্য তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই। এই পর্ব্বতদ্বয় লেটারাইট ও বালু প্রস্তর দ্বারা গঠিত। খণ্ডগিরিতে আরোহণ করিবার জন্য লতা পাতার মধ্য দিয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলী আছে, সোপানগুলির অধিকাংশ স্থলেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সময় সময় নানাজাতীয় বন্য কুসুমে পথের দুই পার্শ্ব সুন্দররূপে সুশোভিত করিয়া রাখে। ফুলের উগ্রগন্ধে বন-রাজীর পত্রান্দোলিত সর্ সর্ শব্দে শীতলতার সহিত সজীবতা আনিয়া দিয়া থাকে। সোপানের কিঞ্চিৎ উপরেই চারিটী গুম্ফা বিরাজিত; একটী ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পতিত হইয়াছে তাহার পার্শ্বের একটী গুম্ফায় হিন্দুদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; সময় সময় এস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পঠিত হইয়া থাকে। এই পার্শ্বের গুম্ফায় বহু ভাস্কর কার্য্যের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে—এ স্থানে দশভূজা ও সপ্তমঙ্গলা মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন—কেহ কেহ বলেন যে, এ সকল হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক এইস্থান পরিত্যক্ত হইলে, হিন্দুগণ অঙ্কিত করিয়াছিলেন; আবার কেহ কেহ বলেন, মহাযান বৌদ্ধগণ-কর্ত্তৃকই এ সকল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা কেহই কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি এই উভয় পর্ব্বতেই বহু গুম্ফা আছে, তবে খণ্ডগিরি হইতে উদয়গিরিতেই গুম্ফার সংখ্যা বেশী।

আমাদের লিখিত চারিটী গুম্ফার একটু দূরেই একটা সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং একটী সিংহমূর্ত্তি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কথিত আছে যে, এই সিংহদ্বার কেশরীরাজ ললাটেন্দু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকে, গভীর রাত্রে এ স্থানে তোপ-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজা অশোকের রাজত্বের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধভিক্ষুগণ খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুম্ফার মধ্যে বাস করিতেন। খণ্ডগিরির গুম্ফা অপেক্ষা উদয়গিরির গুম্ফাগুলিই অধিকতর সুন্দর ও বিস্তৃত। খণ্ডগিরিতে দুইটী শিলালিপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এ অঞ্চলে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, খণ্ডগিরি পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতের একটী অংশবিশেষ ছিল এবং উহার গুহাভ্যন্তরে ধ্যানপরায়ণ মহাতপস্বিগণ বাস করিতেন, পরে সেতুবন্ধনের সময় হনুমান এই পর্ব্বত-খণ্ড হিমালয় হইতে উৎপাটন করিয়া এ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া যান। এই গল্পের মধ্যে যে কতটুকু সত্য নিহিত আছে তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন—তিলকে তাল করা কিংবা কোনওরূপ অস্বাভাবিক গল্পের অবতারণা করিতে আমাদের দেশের লোক বিশেষ দক্ষ।

খণ্ডগিরির শিখরদেশের জৈন মন্দিরাভ্যন্তরে মহাবীরের নগ্নমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে কত ব্যক্তি যে পেন্সিল ও অঙ্গার দ্বারা নিজ নিজ নাম, ধাম ও তারিখ লিখিয়া গিয়াছে, তাহার শেষ নাই। মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে স্বভাবের শোভা দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। আহা! কি সুন্দর! দূরে সুনীল গগনপটে চিত্রের ন্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির; নিম্নে পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ শির তরুরাজীর দিগন্ত-বিস্তৃত-নর্ত্তন-লীলা—কোথায় কতদূরে কোন্ নীল শৈলমালার পাদমূলে যে ইহারা নিঃশেষ হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। সহস্র সহস্র নানাজাতীয় তরুশ্রেণী নয়নানন্দদায়ক হরিৎ ক্ষেত্র মৃদুমন্দ সমীরণে আন্দোলিত হইয়া, পৃথিবী-সুন্দরীর নব-যৌবন-সুষমা

প্রকটিত করিয়া থাকে। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা,—চারিদিকে সৌম্যা স্নিগ্ধা শান্তিরাণী বিরাজিতা। গাছের শাখায় বসিয়া কত অজানা দেশের অজানিত বিহঙ্গম সকল স্বর-লহরীতে চিত্তমুগ্ধ করিয়া থাকে। এরূপ শান্তি-পূর্ণ স্থান অতি অল্পই দেখা যায়। প্রখরসূর্য্যকিরণোদ্ভাসিতা জননী বসু-মতী শিশুর ন্যায় যেন এই গিরিদ্বয়কে শ্যামল সুন্দর অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত করিয়া, মৃদুল বিজনে ঘুম পাড়াইতেছেন। প্রকৃতিদেবী যে কত মনো-মোহিনী—আমাদের মাতা বসুমতী যে কত স্নেহময়ী, কত ঐশ্বর্য্যময়ী—তাহা যিনি কখনও পর্ব্বতারোহণ করিয়া নৈসর্গের প্রাণারাম শোভাসম্পদ দর্শন ও চিত্তে অনুভব করিয়াছেন, তিনিই তাহা অবগত আছেন। পাহাড়ের শীর্ষস্থ এই মন্দির দুইটীর জীর্ণসংস্কার হইয়াছে। উহাদের মধ্যে বৌদ্ধদেবের বিবিধ প্রকারের মূর্ত্তিও বিরাজিত আছে। মন্দিরদ্বয়ের নিকটে সমতল ভূমিতে কতকগুলি বৌদ্ধস্তূপ রহিয়াছে, ইহাদের নাম দেবসভা। এগুলি যে কি উদ্দেশে নির্ম্মিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কেহই কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপ-নীত হইতে পারেন নাই। কাহারও কাহারও মতে এইগুলি মহাযান বৌদ্ধ-গণ কর্ত্তৃক পুণ্যার্থ স্থাপিত হইয়াছিল,কাহারও কাহারও মতে এই স্তম্ভগুলি কোনও কোনও বৌদ্ধভিক্ষুগণের সমাধি-চিহ্ন; আবার কেহ কেহ বলেন যে, সন্ধ্যার সময়ে সমুদয় ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া এস্থানে ধর্ম্মালোচনা করি-তেন বলিয়া ইহার নাম দেবসভা হইয়াছে। এই শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না। সুন্দর সমতল ভূমি চারিদিকে প্রকৃতির সৌম্য নিরবতা, উর্দ্ধে মণিরঞ্জিত অনন্ত নীলগগনরূপ চন্দ্রাতপ অনন্তের মহিমা জ্ঞাপন করিতেছে, ইহা কি ধর্ম্মালোচনার উপযুক্ত স্থান নহে? হায়! যে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি একসময়ে বৌদ্ধ যতিগণের পুণ্যময় চরণধূলিতে পবিত্র ছিল, বর্ত্তমান সময়ে সেস্থানে বৌদ্ধভিক্ষুক বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন গৃহী দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্তম্ভগুলি ঝোপে ঝাপে ও কণ্টকবনে সমাচ্ছন্ন। মন্দিরদ্বয়ের কিঞ্চিৎ

নিম্নে সমতল ভূমিতে এই দেবসভা বহুদূর বিস্তৃত। মধ্যস্থলের স্তম্ভ দুইটি অপর অপর স্তম্ভ হইতে কথঞ্চিৎ উচ্চ ও উহার দিকে দুইটি বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তিও রহিয়াছে। দেবসভার পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূরে গমন করিলে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনটি কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়; একটীর নাম শ্যামকুণ্ড একটীর নাম রাধাকুণ্ড ও অপরটির নাম আকাশগঙ্গা। এই জলাশয় কয়টির আকৃতিই চতুষ্কোণ ও প্রস্তরগ্রথিত; অবতরণের নিমিত্ত সোপানাবলীও রহিয়াছে, ইহাদের সহিত একটি প্রস্রবণের সংযোগ আছে, তাহা না হইলে এইরূপ উচ্চ পর্ব্বতোপরি জল থাকা সম্ভবপর হইত না। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের জল অতি সুন্দর ও স্বচ্ছ, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য সলিল মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতেছে। আকাশগঙ্গার জল বিবর্ণ, অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট; কে জানে কতকাল হইতে ইহারা এইরূপ অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এককালে ইহাদের সুস্নিগ্ধ শীতল ও নির্ম্মল সলিল রাশিই বোধ হয় গুম্ফাবাসীদিগের তৃষ্ণা নিবারণ করিত। বৌদ্ধযুগের ও বৌদ্ধভিক্ষুগণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত এসকল কুণ্ডের নাম 'শ্যামকুণ্ড' ও 'রাধাকুণ্ড' শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বোধ হয়, ইহা হিন্দুদের কর্ত্তৃক আধুনিক এইরূপ নূতন নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ও আকাশগঙ্গা।

খণ্ডগিরি দর্শনান্তে আমরা উদয়গিরি দর্শন করিতে গমন করিলাম, এখনও যাহা কিছু দেখিবার তাহা উদয়গিরিতেই আছে। ইহার অপর নাম ললিতগিরি। অমরকবি বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্ব্বতের ক্ষোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি সমূহ দর্শন করিয়া লেখনিমুখে যাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য এবং শিল্পনিপুণতার অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এস্থানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উদয়গিরির প্রতি গুম্ফার নিকট যখন যাইতেছিলাম ও বিমুগ্ধ চিত্তে দর্শন করিতেছিলাম—তখনই তাঁহার সেই অমর বর্ণনা-কাহিনী

উদয়গিরি।

হৃদয়ে জাগিতেছিল ;—তিনি লিখিয়াছেন "সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র,—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু-যোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী, তাহার উপর মাতার অলঙ্কারস্বরূপ, তালবৃক্ষশ্রেণী সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র তালবৃক্ষ ; সরল, সুপত্র, শোভাময়, মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা, নীল, পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর যেন কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিত চেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য,সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গঠন ; পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সংমিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি, যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিত রত্নহারা পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।

মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ—

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমার সম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।" আমরা ধীরে ধীরে বৈষ্ণবের মঠের নিকটস্থ পথ দিয়া উদয়গিরিতে আরোহণ করিলাম। উদয়গিরির গুম্ফাগুলিকে দুই শ্রেণীর বলা যাইতে পারে। প্রত্যেকগুলিই পর্ব্বতের কঠিন গাত্র ভেদ করিয়া পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর বা আদিযুগের গুম্ফাগুলি দেখিলে মনে হয়,

যেন কঠোর বৈরাগ্য ব্রতধারী সংসারে সম্পূর্ণরূপ বীতস্পৃহ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ কোনও রূপে বাতাতপের আক্রমণ হইতে দেহ রক্ষা করিবার জন্য এই গুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এ সকল গুম্ফার মধ্যে একজন মানুষের হাত পা ছড়াইয়া শয়ন করা দূরে থাকুক বরং বসিলেই মাথার সহিত গুম্ফার ছাদের বিশেষ কোনও ব্যবধান থাকে না, এ সব গুম্ফার ভিতরে কোনও শিল্পনৈপুণ্য নাই। কোনওরূপ শিল্পচাতুর্য্য বিহীন দুরারোহ গিরিগাত্রস্থিত এ সকল গুম্ফাগুলি কালের নিষ্পেষণ হইতে এখনও জীর্ণদেহ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আদিকালে ভারতবর্ষে মানবের বাসগৃহ কিরূপ ছিল, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। উদয়গিরির এসকল গুম্ফার ন্যায় প্রাচীন গুহা ভারতবর্ষের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। হান্টার সাহেব এই গুম্ফাগুলিকে খৃঃ পূঃ ২০০ বৎসরের বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে, এই গুলি খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল,* ইহাদিগকে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না। হান্টার সাহেব এই গুম্ফা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "They are holes rather than habitations, and do not even exhibit those traces of primitive carpentry architecture which the earliest of the western specimens disclose. Some of them are so old that the face of the rock has fallen down, and left the caves in ruins. The men who, year after year, cronched in these holes, and cramped their limbs within their narrow limits, must

বৌদ্ধযুগের প্রথমাবস্থার গুম্ফা।

* Hunter's Statistical Account of Puri p. 73.

have been supported by a great religious earnestness, little known to the Buddhist priests of latter times." (Hunter's Statistical Account of Puri p. 73-74) বোধ হয় শরীর এবং মনকে সংযত রাখিবার জন্য এবং সবং সর্ব্বপ্রকার শারীরিক কষ্ট সহিবার উপযোগী করিয়াই এই গুম্ফাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুম্ফাগুলির পরে আমরা বৃহদায়তনের ও শিল্প-কার্য্য-সমন্বিত গুম্ফাগুলির দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম, যদিও এখন ইহাদের ছাদ পতিত, স্তম্ভ ভগ্ন, প্রস্তর খোদিত নরমূর্ত্তি সকল বিকলাঙ্গ, কোন কোন স্থলে সর্ব্বস্বই একেবারে লোপপ্রাপ্ত তবুও প্রাচীনত্বের এক মহিমাময় গৌরব-সৌন্দর্য্য ইহাদের প্রতি অণুতে পরমাণুতে বিজড়িত থাকিয়া, হৃদয়ে এক ঔদাস্যের ভাব আনয়ন করিয়া দেয়। পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র গুম্ফাগুলির সহিত ইহাদের তুলনাই হইতে পারে না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী বলেন যে, এই বৃহদায়তনের ও বহু কক্ষ শোভিত গুম্ফা-গুলি বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যখন ভারতের নানাদেশে ধর্ম্মশীল ভিক্ষুগণের মণ্ডলী গঠিত হইতে লাগিল, যখন নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও শাস্ত্র সম্পর্কিত কুট বিষয় সমূহের আলোচনার প্রয়োজন হইতে লাগিল এবং নানাদেশদেশান্তর হইতে সন্ন্যাসিগণ শাস্ত্রালোচনা এবং দূর দেশান্তরে প্রচারকার্য্যের প্রণালী উদ্ভাবনার নিমিত্ত সন্ন্যাসিগণ দলে দলে আসিতে লাগিল, তখন বহুজনের একত্রবাসের জন্য সচ্ছন্দতানিবন্ধন এই গুম্ফা-গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।*

* These appear to have been intended for the religious meetings of the brotherhood. Some of them are very roomy, and have apartments at either end, probably for the spiritual heads of the community; small, indeed, when compared with the temple chambers, but greatly more commodious than the primitive single cells. (p. 74).

এই গুম্ফাগুলি উচ্চতায় পূর্ব্ব গুম্ফাগুলির অপেক্ষা অনেক বেশী, ভিতরে দাঁড়াইলেও ছাদের সহিত মাথা ঠেকে না এবং এ সকলের মধ্যে অনায়াসে নয় দশ জন লোক একত্র বাস করিতে পারে, কোনও অসুবিধা হয় না। এই গুম্ফাগুলির সম্মুখে এক একটি করিয়া দালান বিরাজিত—এবং ২।৩টি করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার দ্বার আছে। দরজার চৌকাঠগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত, কিন্তু তাহাতে কবাট নাই, পূর্ব্বে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নির্ণয় করা এখন অসম্ভব। আমরা প্রত্যেক গুম্ফার মধ্যেই প্রবেশ করিয়া উত্তমরূপে দর্শন করিয়াছিলাম; এখন অধিকাংশ স্থলেই উহার রং জ্বলিয়া গিয়াছে—ভিতরাংশ যদিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবুও কেমন একটা দুর্গন্ধ বোধ হইতেছিল। আমাদের প্রদর্শক বলিল 'বাবু আজকাল রাত্রিতে এখানে বাঘ ভালুক থাকে'—এইরূপ অরণ্য সঙ্কুল অথচ নির্জ্জন স্থানে তাহাদের বাস করা অসম্ভব বোধ হইল না।

খণ্ডগিরিতে মাত্র দুইটি শিলালিপি আছে, কিন্তু উদয়গিরিতে বহু শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। উদয়গিরিতে রাণীনুর গুম্ফা বা রাণী-গুম্ফা, হস্তিগুম্ফা, স্বর্গপুরী গুম্ফা, জয়াবিজয়া গুম্ফা, বৈকুণ্ঠ ও যমপুর-গুম্ফা, সর্পগুম্ফা, ব্যাঘ্রগুম্ফা প্রভৃতি গুহাগুলি প্রধান।

এ সকল গুম্ফার মধ্যে রাণীগুম্ফাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। এই গুম্ফাটি দ্বিতল। নিম্নতলে প্রায় দ্বাদশটি এবং উপরের তলায় প্রায় একাদশটি প্রকোষ্ঠ আছে। গৃহটি দ্বিতল হইলেও, ইহা রীতিমত একতলের উপর অপর তল অবস্থিত নহে, নিম্নতলের গৃহগুলি হইতে উচ্চতলের গৃহগুলি পশ্চাতে পর্ব্বতের উচ্চ অংশে অবস্থিত বলিয়া দ্বিতলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; এ নিমিত্তই প্রত্যেক পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ ও ভ্রমণকারিগণ ইহাকে দ্বিতল বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই গুম্ফার নাম রাণীগুম্ফা কেন হইল,

রাণীগুম্ফা।

এসম্বন্ধে একটী জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, একজন রাণী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া সমুদয় রাজ্যসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক এসকল গুম্ফা নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা রাণীগুম্ফা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। একটী পর্ব্বতগাত্র-খোদিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণের তিন দিকে এই গৃহগুলি অবস্থিত। গৃহের সম্মুখে বারাণ্ডা, কতকগুলি স্তম্ভের উপর বিরাজ করিতেছে, গৃহের ছাদ অপেক্ষা বারাণ্ডার ছাদ অনেক উচ্চ। দক্ষিণদিকের ও বামদিকের কক্ষগুলি পাকের কার্য্যের জন্য, সকলের ভোজনের জন্য ব্যবহৃত বলিয়া মনে হয়।

উপরের তলের গুম্ফাগুলির মধ্যে চারিটি গুম্ফার দৈর্ঘ্য ১৪ ফিট ও প্রস্থ ৭ ফিট এবং উচ্চতা তিন ফিট নয় ইঞ্চি। বাহিরের বারেন্দা ৬০ × ১০ ফিট এবং ৭ ফিট উচ্চ। প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য দুইটি করিয়া দ্বার আছে—দরজার চৌকাঠগুলি প্রস্তর হইতে সুকৌশলে খোদিত করিয়া বাহির করা হইয়াছে। প্রবেশদ্বারের উর্দ্ধাংশ গোল খিলান দ্বারা শোভিত এবং তাহাতে নানাপ্রকারের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। নিম্ন-তলের দ্বারদেশে দুইটি বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রহরীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের উভয়েরই হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত বর্ম্মাবৃত, একজনের পায়ে বুট জুতার মত একপ্রকার পদরক্ষিণী, অপরের কেবল পদের নিম্নাংশ অর্থাৎ পায়ের পাতা খালি, কিন্তু উপরাংশে সাঁজোয়া দ্বারা সুশোভিত। দুঃখের বিষয় এই যে, দুইটি মূর্ত্তির মধ্যে একটী প্রায় ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে, অপরটির অবস্থা ভালই আছে। এই দুইটির অনতিদূরে একটী বৃহৎ সিংহের উপরে একটী নারীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে। চৌকাঠের উপরে ও গোলানের মাথায় একটী ধারাবাহিক ঘটনার চিত্র এবং একটী শিকারের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। এই ঘটনাটির সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও হাণ্টার সাহেব প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—ইহার যে কোন্‌টি ঠিক্‌, কোন্‌টি অঠিক, তাহা নির্ণয়

করা দুঃসাধ্য। পশু, পক্ষী, নর, নারী প্রভৃতি প্রত্যেক গুলির মূর্ত্তিই সুন্দর এবং স্বাভাবিক; এমন মানুষ অতি কম, যাঁহার এসকল মূর্ত্তি এবং ঘটনার চিত্র দেখিয়া একটা কল্পনা-চিত্র আসিয়া না উদয় হয়। সিংহ ও ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, যাহারা এ সকল মূর্ত্তিগুলি খোদিত করিয়াছে, তাহারা বিশেষরূপে এই সকল জানোয়ারকে লক্ষ্য করিয়াছিল।

গণেশগুম্ফা বা হস্তিগুম্ফা।

আমরা রাণীগুম্ফা দর্শনান্তে হস্তিগুম্ফা দর্শনের জন্য গমন করিলাম। তখন বেলা প্রায় এগারটা হইবে; সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ ঢালিয়া দিতেছিলেন,—কিন্তু পার্ব্বতীয় মৃদুমন্দ সমীরণ সঞ্চালনহেতু আমাদের কোনও কষ্ট হয় নাই, বিশেষ প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নসমূহ দর্শন করিতে গেলে, এমনই একটা অমৃতময় মাদকতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই মনে থাকে না। উদয়গিরি অতিশয় মনোরম স্থান। আম, কাঁটাল, আমলকী ও অন্যান্য নানাজাতীয় বৃক্ষরাজিদ্বারা ইহা শ্যামলবরণে সমলঙ্কৃত। কত জাতীয় বন্য পুষ্প যে, সেই নীরব বিজন প্রদেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া আপনার মনে ঝরিয়া যায়, তাহার খোঁজ কে লইয়া থাকে? কবি সত্যই গাহিয়াছেন, "Full many a flower is born to blush unseen." যদি আমরা রত্ন চিনিতাম—যদি বুঝিতে পারিতাম যে, নিবিড় অরণ্যানীর প্রচ্ছন্ন ছায়ায় যে সুরভি কুসুম-দাম ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা অমূল্য। তাহা হইলে আর আমাদিগকে বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। যখন দেখিতে পাই যে, আমাদের ঘরের গুপ্ত কাহিনীটুকুও ইংরেজ ঐতিহাসিকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির নিকট হইতে মুক্তি পায় নাই; তখন ভাবি, ধন্য ইহাঁরা, ধন্য ইহাঁদের চেষ্টা, ধন্য ইহাঁদের যত্ন ও অধ্যবসায়। এমন জাতির যদি উন্নতি না হয়, তবে কি তোমার আমার মত পরিশ্রমকাতর বিলাসী বাঙ্গালী বাবুর হইবে? যাহারা নিজের দেশকে ভালরূপ জানিতে পারিল না, নিজের মায়ের

পবিত্রতম সুমিষ্ট দুগ্ধধারা পান করিতে পারিল না ; তাহারা সত্য সত্যই "নিজবাসভূমে পরবাসী।" সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, আজ কাল অনেকে পুরাতত্ত্বের অমৃতময় রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষার কলেবর পুষ্ট করিতেছেন।

হস্তিগুম্ফা বা গণেশগুম্ফা।

উদয়গিরির উচ্চতম শিখর প্রদেশের এবং রাণীনুরগুম্ফার উত্তর-পূর্ব দিকে গণেশগুম্ফা অবস্থিত। এই গুম্ফার নাম গণেশগুম্ফা কেন হইল বুঝিতে পারা যায় না। ইহার নাম হস্তিগুম্ফা হওয়াই অধিকতর সঙ্গত ছিল, কারণ গুম্ফাভ্যন্তরে গণেশমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কতকগুলি প্রস্তরময় হস্তিমূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে হস্তিমূর্ত্তি থাকায়ই ইহার নাম গণেশগুম্ফা হইয়াছে। গণেশগুম্ফার সম্মুখে একটী বারাণ্ডা আছে, বারাণ্ডার ছাদ পাঁচটী স্তম্ভের উপর স্থাপিত, স্তম্ভগুলি প্রায়ই ভগ্ন ; ইহাদের শীর্ষদেশে কতিপয় রমণীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এই গুম্ফায় আরোহণ করিবার সিঁড়ির দুই ধারে দুইটি প্রকাণ্ড হস্তীর মূর্ত্তি ; উভয়েরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভগ্ন, ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শুণ্ড দ্বারা এক একটি নাল-সমেত বিকশিত শতদল ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই গুম্ফার শীর্ষদেশে একটী রমণী-হরণের ধারাবাহিক চিত্র অতিশয় সুন্দররূপে খোদিত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। রাণীগুম্ফার চিত্রের সহিত ইহার বহু সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। স্থানীয় জনসাধারণে ইহা রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ বলিয়া বিশ্বাস করে ; কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন ; অস্বীকার করিবার যথেষ্ট কারণও আছে, রামায়ণের বর্ণিত সীতাহরণের সহিত ইহার কোনও সৌসাদৃশ্যই বিদ্যমান নাই। কোথায় বা জটায়ু, কোথায় বা দশস্কন্ধ রাবণ, কোথায় বা পুষ্পক রথ। মূল ঘটনা সম্বন্ধে কেহই কোনওরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তবে কল্পনার অবাধ গতিতে অপূর্ব্ব কাহিনীর ছবি অনেকেই আঁকিয়াছেন,

কিন্তু ইতিহাসের কঠোর সত্যের সম্মুখে সে সকল জলবিম্বের ন্যায় মিলাইয়া গিয়াছে। এই চিত্রসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও বোধ হয়, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, তৎকালীন কোনও বিশেষ সামাজিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এই চিত্রগুলি খোদিত হইয়াছিল।

স্বর্গপুরী গুম্ফা।

এই দ্বিতল গুম্ফাটি রাণীগুম্ফার পশ্চিমদিকে অবস্থিত; ইহা দ্বিতল হইলেও, সর্ব্ববিষয়ে পূর্ব্বোক্ত গুম্ফা হইতে নিকৃষ্ট। এখানে কয়েকটি হস্তীর মূর্ত্তি অতি সুন্দরভাবে গুম্ফাভ্যন্তরে খোদিত রহিয়াছে; ইহার উপরে ও নীচের তলে দুইটি করিয়া মোট চারিটি গৃহ ও সম্মুখভাগে একটি বারাণ্ডা আছে, বারাণ্ডার স্তম্ভগুলি একটিও ভাল অবস্থায় নাই। এই গুম্ফার চতুর্দ্দিকে ধ্যানমগ্নপর্ব্বতগাত্রে প্রসারিত রাস্তার মধ্যে বড় বড় গাছগুলি হইতে পতিত রাশি রাশি শুষ্কপত্রগুলি আমাদের পদতলে পতিত হওয়ায় মর্ মর্ ধ্বনি হইতেছিল। বিহগকল-কাকলীমুখরিত-নিবিড়চ্ছায়া এই গুম্ফাগুলির পার্শ্বে এমনি একটী নিস্তব্ধ নীরবতা বিরাজমান যে, প্রাণে এক মুহূর্তের মধ্যে অতীতের সমগ্র ইতিহাস তোলপাড় করিতে থাকে। যে সমুদায় ধর্ম্মপ্রাণ অর্হিতগণ প্রাণপণে অতুল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে কারুকার্য্যসম্পন্ন-গুম্ফাগুলিকে নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাদের মনে তখন একদিনের জন্যও এ ভাবের উদয় হয় নাই যে, এই গুম্ফাগুলি একদিন ব্যাঘ্রভল্লুকের আশ্রয় হইবে। আমরা গুম্ফার পার্শ্বে বসিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম; ধীরে স্নেহময়ী প্রকৃতি জননী তাঁহার শ্যামাঞ্চল আন্দোলিত করিয়া ব্যজন করিতেছিলেন। এখানে বসিয়া আমি আপনাকে কোন সুদূর অতীতের এক গৌরবান্বিত মানব বলিয়া অনুভব করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, সিদ্ধার্থের মহৎ জীবনী,—মনে হইতেছিল, সেই ত্যাগী রাজসন্ন্যাসীর ধনৈশ্বর্য্য-স্নেহ-মায়া-প্রেমের অমানুষিক বন্ধন ছেদন। পতি-

প্রাণা অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী গোপার প্রেম তুচ্ছ করিয়া নিদ্রিতাসুর-সুন্দরীর অর্দ্ধবিকশিত শতদলের মত প্রফুল্ল ও বিমল হাস্য রেখা বিভাসিত কমনীয় বদনের শোভা দর্শনেও প্রীতি ও প্রেমের আকর্ষণ কেমন করিয়া ছেদন করিলে সন্ন্যাসী? সে যে আর তোমা বই জানিত না। সে যে শয়নে স্বপনে তোমাকেই ধ্রুবতারা জ্ঞান করিত। হায়! কঠোরহৃদয় সন্ন্যাসী ভুলিলে? ঐ দেখ সোণার শিশু হাসিমুখে নিদ্রামগ্ন, একবার কি এই স্বর্গীয় কুসুমটিকে বক্ষে তুলিয়া লইতেও হৃদয় কাঁপিল না? কেমন করিয়া পদদ্বয় অগ্রসর হইল? বৃদ্ধ পিতা শুদ্ধোদন,—পুত্রগত প্রাণ শুদ্ধোদন—একমাত্র আশা—একমাত্র অবলম্বন তুমি, বড় আশায় সে যে দিন কাটাইতেছিল, এই কি তাঁহার অগাধ স্নেহের প্রতিদান? হায়! স্নেহ-শালিনী জননী—তাঁহাকেও ভুলিলে? ধন্য তুমি, ধন্য ভারত-মাতা, তাই এমন ত্যাগী রাজসন্ন্যাসীকে বক্ষে ধারণ করিতে পারিয়াছিলে!

পাঠক! অই দেখ, নীরব নিশীথে ত্যাগী সন্ন্যাসী জগতের মায়ার বন্ধন ছেদন করিয়া, মানবের হিতার্থ আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিলেন। আমি ভাবিতেছিলাম, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, মনের মধ্যে কেবল জাগিতেছিল, ত্যাগী পুরুষের অলৌকিক জীবনের সার্থকতা।

জয়া-বিজয়া গুম্ফা।

স্বর্গপুরী গুম্ফার পার্শ্বেই এই ক্ষুদ্র গুম্ফা দুইটি অবস্থিত; বিশেষত্ব কিছুই নাই, তবে এই গুম্ফার মধ্যে একটী বোধিবৃক্ষ ও তাহার দুইদিকে দুইটি ধ্যানপরায়ণ মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। স্বর্গপুর গুম্ফার ও জয়াবিজয়া গুম্ফার নিকটে মাণিকপুর, বৈকুণ্ঠ, পাতালপুর, যমপুর, মর্ত্ত্যলোক, দ্বারকাপুর প্রভৃতি বহুতর গুম্ফা বিরাজিত রহিয়াছে। এ সমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

বৈকুণ্ঠপুর গুম্ফা।

ইহাদের মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর-গুম্ফা ও যমপুর-গুম্ফার নাম উল্লেখ-যোগ্য বিবেচনা করি। রাণীনূর গুম্ফার মত বৈকুণ্ঠ-পুর-গুম্ফাও দ্বিতল, ইহার উপরাংশের নাম

বৈকুণ্ঠ ও নিম্নাংশের নাম পাতালপুর, পাতালপুরের সন্নিকটে যমপুর-গুম্ফার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। বৈকুণ্ঠপুর-গুম্ফার উপরে পালি-ভাষায় লিখিত খোদিতলিপির অর্থ প্রিন্সেপ (Princep) সাহেব এইরূপ করিয়াছেন, "ভিক্ষুগণের মঙ্গলাশীর্ব্বাদে কলিঙ্গ-নৃপতিবৃন্দ এই গুম্ফা সকল প্রস্তুত করিয়াছেন।"

হস্তিগুম্ফা ও তাহার খোদিত লিপি।

পর্ব্বতের উচ্চতম প্রদেশে হস্তিগুম্ফা নামক একটী বড় রকমের গুম্ফা আছে, ইহা পর্ব্বতের একটী স্বাভাবিক গুহাকে কাটিয়া বড় করা হইয়াছে; একটি অতি প্রাচীন শিলালিপির নিমিত্তই এই গুম্ফা বিশেষ বিখ্যাত। এই গুম্ফায় কোনরূপ শিল্পচাতুর্য্য বিদ্যমান নাই, কেবল তিনটি কক্ষ এবং গৃহের সমক্ষে একটী বারাণ্ডা আছে। এই গুম্ফার নিকট হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে—অতি দূরে দূরে দুই একটা অনুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, আর কেবল সুবিস্তৃত বনরাজিলীলা কাননকুন্তলা ধরণী সুন্দরীর উচ্ছৃঙ্খল স্তরে স্তরে বিভক্ত সুষমাসম্পদ। বর্ত্তমান সময়ে শিলালিপির অক্ষরগুলি অধিকাংশ স্থলেই অস্পষ্ট এবং কোন কোন স্থান একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ কিটো সাহেব ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার একটী প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেজন্য ইহার প্রাচীনত্ব ইতিহাসজ্ঞ পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। এই লিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে, কলিঙ্গদেশে ক্ষমতাবান্‌ ঐর নামক একজন নরপতি ছিলেন; তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন; বারাণসীতে তিনি বহু স্বর্ণ বিতরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সৈন্য, অশ্ব, গো, মেষ মহিষাদি অসংখ্য ছিল এবং সর্ব্বদা তাহা-দিগের দ্বারাই বেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার বাহন এক অতি বৃহদাকারের হস্তীর নাম ছিল "মহামেঘ।" ইনি কলিঙ্গরাজ্য জয় করিয়া, নূতন রাজ-ধানী স্থাপনান্তর রাজত্বের ত্রয়োদশবর্ষ সময়ে, পর্ব্বত নামক জনৈক নৃপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি মগধের নরপতি নন্দরাজকে রণে

পরাজিত করিয়া, সেখানে নূতন রাজবংশ স্থাপন করেন ও ধর্ম্মমণ্ডলী নির্ম্মিত ভূমধ্যে স্তম্ভশোভিত চৈত্য ও সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করেন। এই মহানুভব নরপতি কর্ত্তৃকই হস্তিগুম্ফা প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই খোদিত লিপি হইতে অনুমান করিয়াছেন যে, এই হস্তিগুম্ফা খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩১৬ হইতে ২১৬ বৎসরের মধ্যে ঐর নৃপতি রাজত্ব করেন এবং তাঁহার সময়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন গুম্ফা পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

ব্যাঘ্রগুম্ফা ও সর্পগুম্ফা।

এই গুম্ফার পার্শ্বে ব্যাঘ্রগুম্ফা ও সর্পগুম্ফা নামক দুইটি ক্ষুদ্র গুম্ফা, দেখিতে বেশ সুন্দর। ব্যাঘ্রগুম্ফাটি দেখিলে মনে হয়, যেন একটি ব্যাঘ্র মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। এই বৃহৎ ব্যাঘ্রমুণ্ডের নাসিকা, দন্তপাটি, চক্ষু অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে খোদিত। সর্পগুম্ফার মাথায় একটি ত্রিশির অজগর সর্পের মস্তক খোদিত। ইহা ব্যতীত পাবনগুম্ফা, ভজনগুম্ফা, অলকপুরগুম্ফা প্রভৃতি আরও কয়েকটি গুম্ফা আছে।

যে ভারতবর্ষে এই ত্যাগী মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল, নিতান্ত আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে যে, সেখানে তাঁহার ধর্ম্মের প্রখরজ্যোতি নির্ব্বাপিত প্রায়। সুদূরের চীন, জাপান ও তিব্বত তাঁহার আদর করিল, কিন্তু ভারতে তাঁহার আদর হইল না, শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ই বোধ হয় ইহার মূল কারণ।

আমরা গুম্ফাগুলি দর্শনান্তর পুনরায় ভুবনেশ্বরাভিমুখে রওনা হইলাম। ধীরে ধীরে গিরিদ্বয় আমাদের পশ্চাতে সরিয়া যাইতে লাগিল। পথিমধ্যে দুইপাশে বনশূন্য বৃক্ষশূন্য বালুকাপ্রস্তরময় ভূমি, স্থানে স্থানে বেতের ঝোপে ও বেনুবনের ঝোপে খস্ খস্ ফিস্ ফিস্ শব্দ হইতেছিল। যখন আমরা ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া আসিলাম, তখন চারিদিকে অপরাহ্নের মৃদুভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল; আম্রবনে ভ্রমরের

গুঞ্জনধ্বনি বাঁশীর মত বাজিতেছিল। মনের সুখে পাখিগুলি শাখায় শাখায় গান গাইয়া, মন প্রাণ মাতাইয়া তুলিতেছিল।

শ্রীধরনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

বিদ্রোহের পর বঙ্গের অবস্থা।

বর্দ্ধমান-রাজপুত্র জগৎরায়—যিনি বিদ্রোহী রহিম খাঁর হস্তে পিতৃ-নিধনান্তর জাহাঙ্গীর নগরে পলায়নপর হইয়াছিলেন, এক্ষণে যুবরাজ আজিম ওস্মানের নিকট আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করায় বর্দ্ধমানের জমিদারী পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তৎপর আর যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহীর ভ্রুকুটী-ভঙ্গিতে স্ব স্ব গৃহসম্পত্তি ত্যাগকরতঃ অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছিল, তাহারা এবং যাহারা সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করিতে, বিপক্ষ হস্তে সমরক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়, তাহাদের বংশধরগণও পৈতৃক সম্পত্তি পুনরধিকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইল।

এই সময় আজিম ওস্মান রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করেন এবং যে সকল জায়গীর, আয়মা এবং আলতাম্‌গা (১) বিদ্রোহীরা হস্তগত করে, তাহার পুনরুদ্ধার সাধিত হয়।

হামিদ খাঁ কোরেশিও স্বীয় বীরত্বের উপযোগী পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ আলমগীর তাহার মনসবের সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ "সমসের খাঁ" উপাধিভূষিত করিয়া শ্রীহট্টের ফৌজদারপদে অভিষিক্ত করিলেন।

(১) আয়মা—ধর্ম্মোদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভূমিখণ্ড। আলতাম্‌গা—ঐরূপ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যে ভূমির দানপত্রে রাজকীয় লোহিত মোহর (Red seal) অঙ্কিত থাকিত।

আজিম ওস্মান বৰ্দ্ধমানে স্বীয় আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রাসাদমালা ও মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করান। সম্রাটের দেখাদেখি তিনিও মৌলবী প্রভৃতি শাস্ত্রবেত্তাদিগের সভায় উপস্থিত থাকিয়া, তাহাদের তর্কবিতর্ক শ্রবণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে মস্‌নবি (১) ও অপরাপর ইতিহাস-পাঠ শ্রবণ করিতে কৌতুক অনুভব করিতেন। কিন্তু এই ভাবে ধর্ম্মের অভিব্যক্তি থাকিলেও, তাঁহার ধন-রত্নের প্রতি ঐকান্তিক লোভ ছিল, অথচ প্রাপ্তধনরাশি সঞ্চিত করিয়া রাখিতেও জানিতেন না।

প্রজাবর্গ যে সকল জিনিষের সায়ার (Syer) কর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল, যুবরাজ এক্ষণে তাহার পুনঃপ্রবর্ত্তন এবং বাজ্‌বাণ্ডার পরগণার সৃষ্টি করিয়া নির্দ্দেশ করেন যে, মোসলমানদিগকে শতকরা আড়াই টাকা এবং হিন্দু ও ফিরিঙ্গিগণকে পাঁচ টাকা হিসাবে কর দিতে হইবে।

হুগলী জেলায় একটী নূতন নগর স্থাপিত হইয়া নাজিমের নামানুসারে আজিমগঞ্জ (২) নামে অভিহিত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় স্থান—যাহা বিদ্রোহীদিগের অত্যাচারে শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, তাহার উন্নতি সাধন করেন।

দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি ওস্মানের লোলুপদৃষ্টি সর্ব্বদাই নিবদ্ধ থাকিত এবং তদধিকারের সহায়তার নিমিত্ত তিনি দরবেশ, ফকীর প্রভৃতি সাধুগণের প্রতি সমধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কোন আধুনিক ক্ষমতাশালী সাধুর সংবাদ অবগত হইলেই, তাহাকে প্রাসাদে আনাইয়া পরিচর্য্যা করতঃ, স্বীয় অভীষ্টপূরণের আশায় বর প্রার্থনা করিতেন। এই সময় বৰ্দ্ধমানে সুফি বৈজিদ্ নামে এক প্রসিদ্ধ সাধু ছিলেন। তাঁহাকে স্বীয়

(১) একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য; ইহাতে ধর্ম্ম, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে।

(২) রিয়াজে আজিমগঞ্জ বা সাহাগঞ্জ লিখিত হইয়াছে। ইহা হুগলী ও বাঁশবেড়িয়ার মধ্যবর্ত্তী।

প্রাসাদে আনয়নার্থ নিজ পুত্রদ্বয় সুলতান কেরামুদ্দীন ও সুলতান ফেরুকৃশেরকে প্রেরণ করেন। সাধুর আশ্রমে উপনীত হইলে, সাধু দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করতঃ মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করেন। সুলতান কেরামুদ্দীন স্বীয় বংশগৌরবে অতিশয় গর্ব্বিত ছিলেন; কাযেই অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সাধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান কারলেন, কিন্তু সুলতান ফেরুকৃশের বিধিমতে ফকীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে, ফকীর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া পাল্কীতে তুলিয়া দেন এবং আশীর্ব্বাদ করেন,—"তুমিই সম্রাট্, উপবেশন কর; সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।" তৎপর উভয়ে একত্রে এক পাল্কীতে যুবরাজ-প্রাসাদে গমন করেন।

যুবরাজ মহাসমাদরে সুফীকে অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় গুপ্তকক্ষে উপবিষ্ট করাইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। যুবরাজ প্রকাশ করেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অধিক আকাঙ্ক্ষার বিষয়—দিল্লীর সিংহাসন; তাহা যেন তাঁহার হস্তগত হয়, ইহাই সাধুর নিকট তাঁহার প্রার্থনা। যুবরাজের বাক্য শেষ হইলে সুফী বলিলেন,—"তোমার যাহা প্রার্থনা বা প্রয়োজন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই আমি ফেরুকৃশেরকে প্রদান করেছি। ধনুক হ'তে তীর ছুটলে যেমন তাহা আর ফিরে আসে না। আমার আশীর্ব্বাদ-বাণীও তেমনি প্রত্যাহার করা যায় না।" সুফীর কথা শুনিয়া যুবরাজ বড়ই দুঃখিত এবং চিন্তিত হইলেন। এক্ষণে সাধুকে আর অনুনয় বিনয় করাও বৃথা বিবেচনা করিয়া সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়া রায়গঞ্জের আবদল কাদের নামক সাধুর শরণাপন্ন হন।

হুগলী, হিজলী, মেদিনীপুর এবং বর্দ্ধমান প্রদেশের বন্দোবস্ত শেষ করিয়া আজিম ওস্মান জাহাঙ্গীর নগরে যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। চট্টগ্রামের জলদস্যুগণের দমনের নিমিত্ত সাহ সুজা কর্ত্তৃক যে সকল নৌয়ারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সজ্জিত হইয়া যুবরাজকে বঙ্গে ধারণ

করতঃ জাহাঙ্গীর নগরের তীরে সংলগ্ন হইল। তথায় উপনীত হইয়া যুবরাজ বহু আয়াসে তৎপ্রদেশ পরিষ্কার এবং ভূমি সমতল করেন।

ইতিপূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলা অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। তথাকার জলবায়ু খারাপ হওয়ায় মোগল বা অপর কোন বৈদেশিক জাতির বাসের অনুপযোগী বিবেচিত হইত। এই কারণে যে সকল রাজ-কর্ম্মচারী সম্রাটের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইত, তাহারাই কেবল বাংলা দেশে স্থানান্তরিত হইত। কাজেই এই উর্ব্বরা শস্য শ্যামলা প্রদেশ— নিরানন্দ-জনক বন্দিখানা, ভূতপ্রেতের অধিষ্ঠানভূমি, আধিব্যাধির কেন্দ্র-স্থান বা মৃত্যুর লীলানিকেতনরূপে প্রতিভাত হইত। মোগল-সাম্রাজ্যের মন্ত্রী বা দেওয়ানবর্গ এই প্রদেশে মনসবদারদিগের জায়গীর প্রদান করিতেন, সুতরাং নিজামতের সৈন্য সংরক্ষণের উপযোগী অর্থ তথাকার খালসার আয়ে সংকুলান হইত না,—বাকী টাকা দিল্লীর রাজ-কোষ বা অপর সুবার তংথা হইতে লইতে হইত।

সম্রাট্ নানাকারণে আজিম ওস্মানের প্রতি বীতরাগ হন। কতিপয় পণ্যদ্রব্য (১) একচেটিয়া করিয়া লওয়ায় এবং বাসন্তী সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হিন্দুদিগের হুলিখেলায় যোগদান করায় এবং অন্য দুই একটী হিন্দু উৎসব অনুষ্ঠিত করায় যুবরাজ বিশেষ করিয়া সম্রাট্ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন। দূতমুখে নাজিমের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যবহারের সংবাদ পাইয়া সম্রাট রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া স্বহস্তে ওস্মানকে এইরূপ পত্র লিখেন,—

"ষট্চত্বারিংশ বর্ষ বয়সে লোহিত তারবান্ এবং বাসন্তী বর্ণের পরি-চ্ছদে ভূষিত হইয়া তুমি তোমার শ্মশ্রুর উপযুক্ত ব্যববারই করিতেছ।" তৎপর গুরুতর অসন্তোষের ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে যুবরাজের মনসব হইতে পাঁচশত অশ্বের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দেন।

(১) সন্দা-ই খাস এবং সন্দা-ই আম।

মীর্জা মোহাম্মদ হাদি নামক এক ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারী দাক্ষিণাত্য প্রদেশের নানা উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে, স্বীয় ন্যায়পরায়ণতায় সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন। হাদি ধর্ম্ম ও নীতি এমনি কঠোরতার সহিত অনুসরণ করিতেন যে, স্বীয় পুত্রের কোনও গুরুতর অপরাধ দর্শনে তাহাকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করেন। (১) এই মীর্জা হাদি সর্ব্বশেষে উড়িষ্যার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু যুবরাজ উস্মান সম্রাটের বিরাগভাজন হওয়ায়, হাদি এক্ষণে কারতলব খাঁ উপাধি ভূষিত হইয়া, বাংলা দেশের দেওয়ানী পদে নিয়োজিত হইলেন। বাংলার দেওয়ানী ও নিজামতের মধ্যে তৎকালে প্রভূত পার্থক্য ছিল। দেশের রাজস্ব বিষয়ে দেওয়ানের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব; পক্ষান্তরে বিচার ও সৈন্যবিভাগে নাজিমের অপ্রতিহত ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল। কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত একটী বিষয়ে নাজিমের কর্ত্তৃত্ব ছিল,—নিজামতের ও নাজিমের নিজের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে জাগীর মুস্রুট্ ও মন্সিব্জাত নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা, এবং কর্ম্মচারী প্রভৃতিগণকে যে রাজকীয় বৃত্তি প্রদত্ত হইত সেই ভূমির রাজস্ব-সংগ্রহ ক্ষমতা, নাজিমের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। সম্রাটের খাস দরবার হইতে প্রতি বৎসর যে দস্তুর-উল আমিল বা সাধারণ নিয়মাবলী প্রচারিত হইত, তাহার বিধান প্রতিপালন করিতে প্রত্যেক সুবার নাজিম ও দেওয়ান উভয়েই তুল্যরূপে বাধ্য ছিলেন।

কারতলব খাঁ যৎকালে বঙ্গদেশের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন, তৎকালে তিনি সম্রাটের সাক্ষাৎমানসে দিল্লীতে উপনীত ছিলেন। তিনি যথা সত্বর জাহাঙ্গীর নগরে উপনীত হইয়া, সম্রাটের আদেশানুসারে রাজস্ব বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং সুবার আয় ব্যয়ের সহিত যুবরাজের সর্ব্বপ্রকার সংস্রবের মূলোচ্ছেদ করেন। যুবরাজ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

(১) মোসলমান বিচারপতির এইরূপ ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় আমীর আলি প্রণীত সারাসানদিগের ইতিহাসেও পাওয়া যায়।

হন ও অপমানিত জ্ঞান করেন, কিন্তু দেওয়ানের প্রতি সম্রাটের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া কোন প্রকার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন না।

নব-নিয়োজিত দেওয়ানের কার্য্যক্ষমতার গুণে শীঘ্রই বঙ্গদেশের অবস্থা উন্নত হয়। দেওয়ান উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ-ব্যপদেশে এমনি সতর্কতাবলম্বন করিতেন যে, একমাত্র তাহাদেরই সাহায্যে তিনি অচির কাল মধ্যে বঙ্গদেশের সমস্ত ভূমির ও তাহার রাজস্বের পরিমাণ অবগত হইয়া, তদ্বিষয়ে সম্রাটের নিকট এক বিস্তৃত বিবরণী প্রেরণ করেন। মনসব্‌দারগণের জায়গীর বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত হইলে সম্রাটের সুবিধা হইবে, তাহা তিনি সম্রাট্‌কে বুঝাইয়া দেন। কারণ উড়িষ্যায় ভূমির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম, অথচ তথাকার রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয়ভার বঙ্গদেশ অপেক্ষা অধিকতর বহু আয়াস সাধ্য। এই প্রস্তাব সম্রাট্‌ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইবামাত্র, দেওয়ান বাংলার সমস্ত জায়গীর জব্দ করিয়া লইয়া, তৎপরিবর্ত্তে উড়িষ্যায় ভূমি বিভাগ করিয়া দেন। তৎকালে উড়িষ্যাবাসিগণ ভূমি আবাদের প্রতি একবারেই উদাসীন ছিল। বাংলার দেওয়ানী ও নিজামতের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাই কেবল বঙ্গদেশে থাকিল, তদতিরিক্ত সমস্তই সরকারে জব্দ হয়। দেওয়ান স্বয়ং রাজস্ব সংগ্রহকার্য্য হস্তে লইয়া, জমীদার ও জায়গীরদারগণের আত্মসাৎ করার পন্থা রোধ করেন। ইহাতে সত্বরেই রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়া উঠে। সম্রাট্‌ দেওয়ানের এবম্প্রকার কার্য্যদক্ষতায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হন।

আজিমওস্মান দেওয়ানের প্রত্যেক কার্য্যই ঈর্ষার চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সম্রাটের ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেন না। পরিশেষে অতি গোপনে দেওয়ানকে নিহত করিবার সংকল্প করতঃ আবদুলওয়াহিদ নামক এক রিসালাদারকে (১) প্রলোভনে

(১) রিয়াজে লিখিত হইয়াছে যে, আবদুলওয়াহিদ নগদী সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিল

সম্মত করেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, বেতন দেওয়া হয় নাই—এই কারণ দেখাইয়া আবদুলের অধীনস্থ সৈন্যদলকে বিদ্রোহী করিয়া তৎসাহায্যে দেওয়ানকে নিধন করা হইবে। সমস্ত যুক্তি স্থির করতঃ আবদুল কেবল উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কারতলব খাঁ ও যুবরাজের ব্যবহারে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন এবং পাছে তাঁহার প্রাণের কোনও হানি হয়, এই আশঙ্কায় গৃহ হইতে বহির্গত হইতে হইলেই, তিনি বস্ত্রের নিম্নে বর্ম্মপরিধান করিতেন এবং উপযুক্ত সংখ্যক বিশ্বস্ত ও সশস্ত্র অনুচর সঙ্গে রাখিতেন। একদা এক সাধারণ উৎসব উপলক্ষে দেওয়ান পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সজ্জিত হইয়া, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নাজিমকে সম্মান প্রদর্শন নিমিত্ত তৎপ্রাসাদে যাইতে-ছিলেন, পথিমধ্যে আবদুল ওয়াহিদ ও তদীয় সৈন্যদল তাঁহাকে পরি-বেষ্টন করিয়া তদ্দণ্ডেই তাহাদের প্রাপ্য বেতন প্রদান করিবার জন্য মহাকোলাহল উপস্থিত করিল। দেওয়ান ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, তাহাদিগকে লইয়া নাজিমের প্রাসাদে গমন করিলেন। তারপর নাজিমের প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করিয়া তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অতি দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সহিত নিষ্কাসিত অসি হস্তে বলিলেন,—"এই যে হাঙ্গামা, ইহার মূল কারণ একমাত্র আপনি স্বয়ং; যদি আপনি আমার প্রাণসংহার করিতে মনস্থ ক'রে থাকেন, তবে আমিও তার মূল্য-স্বরূপ আপনার প্রাণ লইতে কৃতসংকল্প। অপিচ আমার বিশ্বাস সম্রাটও আমার বধের প্রতিশোধ লইতে কখনই বিলম্ব করিবেন না।" এইরূপ মন্ত্রণা বিফল হওয়ায় এবং দেওয়ানের তেজস্বিতা ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া ওস্মান্ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং পাছে সম্রাট এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহার দণ্ডবিধান করেন, এই আশঙ্কায়, তিনি মৌখিক নানারূপ স্বীয় নির্দ্দোষিতার ভাব দেখাইয়া,

দেওয়ানের সহিত মিত্রতা করেন এবং গুরুতর দণ্ডের ভয় দেখাইয়া আবদুলওয়াহিদ ও তাহার সৈন্যদলকে বিদায় করিয়া দেন।

দেওয়ান অনতিবিলম্বে দেওয়ানী-আমে গমন করতঃ উচ্চ কর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া বিদ্রোহীদিগের স্বভাবের বিষয় রাজকীয় দপ্তরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া, তাহাদিগকে সৈন্যদল হইতে বিতাড়িত করিতে আদেশ করেন। তৎসহ বকেয়া সমস্ত বাকী পরিশোধ করিবার নিমিত্ত জমিদারবর্গের প্রতিও তংখা প্রদত্ত হয়।

দেওয়ান আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা সম্রাটের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়া চিন্তা করিলেন যে, যুবরাজ হয় তো ইহার পরেও তাঁহার প্রাণসংহারের চেষ্টা করিবেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে তৎস্থান পরিত্যাগই শ্রেয় স্থির করতঃ জমিদারবর্গ ও কর্ম্মচারিগণের সহিত কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হইবার উপযোগী একটী স্থান নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই চূণাখালি পরগণায় মুকস্থদাবাদে দেওয়ানী স্থানান্তরিত করিবার পরামর্শ দিলেন। উহার উত্তর ও পশ্চিম অংশে আকবর নগর এবং বঙ্গ-প্রবেশের দ্বারস্বরূপ শাকরিগলি এবং তেলিয়াঘরি অবস্থিত ;—দক্ষিণ ও পশ্চিমে বীরভূম, পাচিট্, বিষ্ণুপুর এবং ডেকান ও হিন্দুস্থান হইতে আগমন-পথ ঝারখণ্ডের বনরাজিলীলা ;—দক্ষিণ পূর্ব্বে বৰ্দ্ধমান, এবং উড়িষ্যা যাইবার পন্থা, হুগলী, হিজলী, ইয়ুরোপীয় ও অপরাপর বৈদেশিক বণিকবৃন্দের অর্ণবপোত সমূহের সঙ্গম-স্থল বন্দরসমূহ এবং যশহর ও ভূষণা ;—উত্তর-পূর্ব্বে বঙ্গস্থবার রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর এবং ইস্লামাবাদ, শ্রীহট্ট, রঙ্গমাটী, ঘোড়াঘাট, রংপুর ও কুচবেহার প্রভৃতি সিমান্তদুর্গ।

কারতলব খাঁ যুবরাজের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই জমিদারী সেরেস্তার আমলাগণ, কাননগু এবং খালসার অন্যান্য দেওয়ানী কর্ম্মচারী সমূহ সমভিব্যাহারে মুকস্থদাবাদে প্রস্থান করিলেন। দেওয়ান কুলুরিয়া

মৌজা নামক (১) এক জনশূন্য বিজন স্থানে প্রাসাদ এবং খালসা কার্য্যালয় নির্ম্মাণ করতঃ রাজস্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। সম্রাট্ এই সময় দাক্ষিণাত্যে ছিলেন; তিনি যবরাজের এবম্প্রকার কার্য্যের সংবাদ পাইয়া, অতিশয় রাগান্বিত হইয়া আজিমওস্মানকে বেহারে প্রস্থান করিতে পত্র লিখেন।

সরবুলেন্দ খাঁর সহায়তায় জাহাঙ্গীর নগরে নায়েব-সুবেদারস্বরূপ কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে পুত্র ফরেক্‌সেরকে রাখিয়া যুবরাজ অপর পুত্র সুলতান কেরামুদ্দীন ও পরিজনবর্গ এবং অদ্ধেক সৈন্যদল সহ মুঙ্গের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় শা সুজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ভগ্নপ্রায় একটী মার্ব্বেল ও কৃষ্ণপ্রস্তরময় প্রাসাদ ছিল কিন্তু তাহার পুনঃ সংস্কারে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন এবং বর্ত্তমান সময়ে সম্রাটের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্যের আশা করা দুরাশামাত্র জ্ঞানে যবরাজ পাটনার ভাগীরথীতীরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ তৎস্থানের নাম আজিমাবাদ রাখিয়া সমস্ত নগর উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত করতঃ বাস করিতে লাগিলেন।

বর্ষশেষে কারতলবখাঁ সম্রাটের সহিত দর্শনমানসে সুবার আয় ব্যয় সংক্রান্ত কাগজ প্রস্তুত করতঃ সদর কাননগু দর্পনারায়ণের নিকট তাঁহার দস্তখতের নিমিত্ত প্রেরণ করেন (২)। দর্পনারায়ণ স্বীয় রশুম ও কমিসন বাবদ প্রাপ্য বাকী তিন লক্ষ টাকা আগে না পাইলে কাগজে দস্তখত করিতে রাজি হন না। দেওয়ান সম্রাটের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া এক লক্ষ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হন কিন্তু তত্রাচ কাননগু দস্তখত করেন না। অপর কাননগু জয়নারায়ণ বিনাবন্দোবস্তেই কাগজে

(১) মুর্শিদাবাদের জমিদারী কাগজপত্রে এখনও এই মৌজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) সুবার দেওয়ানী কাগজপত্র বিশেষতঃ আয়ব্যয়সংক্রান্ত কাগজে সদর কাননগোদ্বয় দস্তখত না করিলে, সম্রাট্-দরবারে তাহা গ্রাহ্য হইত না।

দস্তখত করেন। দেওয়ান দর্পনারায়ণের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার বিনা দস্তখতি কাগজই সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। সম্রাটের নিমিত্ত বিপুল পেস্কস্ লইতেও দেওয়ান বিস্মৃত হন নাই। অতঃপর তিনি ডেকানে সম্রাটের সমীপে উপনীত হইয়া রাজস্বের উন্নতি, জায়গীর হইতে লভ্য প্রভৃতি নানাবিষয়ে স্বীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া সম্রাটের প্রীতিভাজন হইলেন। সম্রাটের প্রসন্নতার আর একটী কারণ এই যে, দেওয়ান কাগজপত্রে রাজস্ব বৃদ্ধির যে পরিমাণ প্রদর্শন করান, প্রকৃত পক্ষেও সেই পরিমাণ অর্থ তিনি দিল্লীর রাজকোষে ইরশাল করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

নেপালের প্রাচীন পুঁথি।

ঃ০ঃ——

(২য় প্রস্তাব)

"নেপালীয় দেবতা কল্যাণ পঞ্চবিংশতিকা" নাম্নী পুস্তিকা পাঠে ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়, তদ্দেশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের যত সাদৃশ্য আছে, অপর কোন বৌদ্ধ দেশে ধর্ম্মে বা আচারে তাহা নাই, অথচ নেপালের হিন্দুয়ানী তদঞ্চলের বৌদ্ধাচার দ্বারা বিকৃত বা রূপান্তরিত হয় নাই। নেপালের হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের এবং বৌদ্ধের সঙ্গে হিন্দুর যে পরিমাণে সহানুভূতি আছে, বাস্তবিক অন্য দেশে তাহা নাই। নেপালের বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধাচার বহু পরিমাণে হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ হইতে গৃহীত। নেপালের বৌদ্ধেরা সমুদয় বুদ্ধকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, তদ্যথা—লোকেশ্বর, বোধিসত্ত্ব এবং আদি বুদ্ধ। ইহাদের

দেবদেবী প্রায় হিন্দুশাস্ত্রের সহিত মিলে। বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ দুই প্রকার স্বভাবিকা ও ঐশ্বরিকা। মহাপুরুষদিগের লিখিত শাস্ত্র সমূহ "স্বভাবিকা" নামে খ্যাত; স্বয়ং বুদ্ধদেবের বাক্যসমূহ যাহাতে অভিব্যক্ত, তাহার নাম "ঐশ্বরিকা" শাস্ত্র। পাঠকেরা এস্থলে দেখিবেন, বৌদ্ধগণ নিরীশ্বর বাদী হইয়াও এখানে "ঈশ্বর" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বুদ্ধদেবকে ঈশ্বর বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন। "দেবতা কল্যাণ পঞ্চবিংশতিকা" পুস্তিকাখানি সিংহল, আভা, শ্যাম, তিব্বত, চীন, তাতার এবং বোর্ণিও দ্বীপে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গণ্য। আভা ও শ্যামদেশে, নেপালী বৌদ্ধগণের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ দেবদেবীর পূজা করে, এই সকল দেবদেবীর সাধারণ নাম "নট।" ("Religious sects of the Hindoos. Vol. II. Page 26 edition of 1862. By H. H. Wilson) হেমচন্দ্র কৃত কোষে আমরা দেখিতে পাই, নেপালের বৌদ্ধেরা ১৬ প্রকার দেবীর পূজা করিত, এখনও সেকালের সেই প্রথা তদ্দেশে প্রচলিত আছে। কতকগুলি দেবীর নাম এই—বিদ্যাদেবী, প্রজ্ঞাপত্নী, পদ্মপাণি, তারা, বসুন্ধরা, ধনদা, মরিচি, লোচনা, পদ্মাবতী, অনূপা, অম্বরী, ক্রীড়নাকা, তৃষিতা ইত্যাদি। কতকগুলি দেবী পূর্ণিমায় ও কতকগুলি দেবী অমাবস্যায় পূজিতা হইবার বিধিও আছে *

অনুবাদিত শ্লোক মধ্যে মঞ্জুনাথের উল্লেখ আছে; ইনি নেপালে সর্ব্ব প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন ও শিক্ষা দেন। কাশ্মীর দেশে

* অনেকদেশে অনেক বৌদ্ধসম্প্রদায় দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া হিন্দুর মত পূজা করিত এবং এখনও করে। হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্র অনেকস্থলে বৌদ্ধের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তদনুসারে বলি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এক সময়ে অনেক দেশের বৌদ্ধসমাজ ঘোরতর তান্ত্রিক ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের দেবদেবী পূজা সম্বন্ধে যাঁহারা একমত, এমন কতকগুলি সুবিখ্যাত গ্রন্থকারের নাম এস্থলে উল্লিখিত হইল।——জৈন কোষকার হেমচন্দ্র। জৈন কোষকার উৎপল আচার্য্য। নিরঞ্জন ভট্ট। H. H. Wilson., Burnouf, Hodgson and Lassen. এবং ত্রিকাণ্ডশেষ" অভিধান দেখুন। Professor Buchanan and also Professor Kirpatrick.

কশ্যপ নামক ব্যক্তি বৌদ্ধমতের আদি প্রচারক। শম্ভুনাথ নামক বিদ্বান্ পুরুষ চীনরাজ্যে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। "ত্রিকাণ্ডশেষ" কোষে মঞ্জুনাথ, মঞ্জু ঘোষ বলিয়া লিখিত আছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য নাম এই—খড়্গী, কুমার, সিংহকেলী, দণ্ডী, বদীরাজ, মঞ্জুভদ্র, মঞ্জুশ্রী, নীল, এবং মঞ্জুপদার। কামরূপ, রঙ্গপুর, কোচবিহার এবং সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে অতি পুরাকালে তান্ত্রিক মত প্রচলিত ছিল এবং শম্ভু পুরাণে লিখিত আছে, এই সকল অঞ্চল হইতে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণেরা নেপাল প্রভৃতি রাজ্যে গিয়া বৌদ্ধদিগের মধ্যে তন্ত্রমত প্রচার করিয়াছিলেন। (২২)

উদ্ধৃত শ্লোকের একস্থলে লিখিত আছে, অক্সাপাণি, সুখাবর্তী নগরী হইতে বঙ্গে গমন করিয়া, অবশেষে ললিতপুরে আসিয়াছিলেন। সুখাবতীর অপর নাম লোকধাতুপুরী। বঙ্গ অর্থে বঙ্গদেশ বুঝায়। আচার্য্য উইলসন লিখিয়াছেন Bangadesa is never applied to any country, except the east or north Bengal—"Religious sects of the Hindoos" By H. H. Wilson. Page 29. Vol. II. জনশ্রুতিতে জানা যায়, অক্সাপাণি, নেপালের রাজা নরেন্দ্র দেব কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া নেপাল অঞ্চলে আগমন করেন এবং পরিণামে তদ্দেশে তান্ত্রিক মত প্রচার করেন। অক্সাপাণি সম্ভবতঃ আসাম অঞ্চলের পণ্ডিত। তিনি নেপালে যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি অক্সাপাণির মন্দির বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কর্ণেল কারপেট্রিক এই কথার সমর্থন করেন। নরেন্দ্র দেবের শাসনকাল ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ। আচার্য্য কোপেনের মতে ইহা পঞ্চ শতাব্দী।* এক্ষণে আমি "অষ্টমী ব্রত বিধান" নামক পুস্তক সম্বন্ধে কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ইহার

(২২) "Religious sects of the Hindoos" Vol. II. page 29.

* Koppen's "Religion des Buddha". Vol. II. page 21-32.

সমুদয় মত, হিন্দুর তন্ত্র হইতে প্রায় গৃহীত। শুক্লপক্ষের প্রতি অষ্টমী তিথি, নেপালে খুব পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। ঐ তিথিতে মানুষের কি কি কর্ত্তব্য আছে, তাহাই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। এই শ্লোকের অনুবাদ এই—"হে দেবগণ! দেবীগণ! আমি (অমুক) তোমাদের আরাধনা জন্য উপস্থিত হইয়াছি। অমুক বংশে আমি সমুদ্ভূত, আমার বংশের তোমরা কল্যাণ কর। এই স্থান ও এই সময় শুভ হউক। তথাগাথা শাক্য সিংহ ভদ্রকল্পে সাহানগরীতে বৈবস্বতমন্বন্তরে কলিযুগের প্রথমাংশে ভারতখণ্ডে উত্তর পাঞ্চালে দেবসুখক্ষেত্রে এবং উপাচ্ছদোহ নাম পিঠে, পবিত্র আর্য্যাবর্ত্তে, কর্কট নাগের রাজ্যে, নেপাল প্রান্তরে এবং মণিলিঙ্গেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, কীলেশ্বর, গর্ত্তেশ্বর কুম্ভেশ্বর, ফণিকেশ্বর, গন্ধেশ এবং বিক্রমেশ্বর এই অষ্টবীতরাগ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ও বাঘমতী, মণিমতী এবং প্রভাবতী নদীর জলে স্নাত হইয়া দ্বাদশপর্ব্বত, ষড়তীর্থ, সপ্ত মুণি এবং পঞ্চ প্রাসাদ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন। তিনি যোগিনী কর্ত্তৃক সম্মানিত, অষ্টমাতৃকা ও অষ্টভৈরব কর্ত্তৃক শ্রদ্ধান্বিত এবং দশ দিকপাল দ্বারা আরাধিত হয়েন। আমি সপরিবারে এই স্থানে অমুক ক্রিয়া করিবার উদ্ধার প্রাপ্ত হইব। সকলে আমার কল্যাণ করুন।" *

তন্ত্রশাস্ত্রমতে যে সকল ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, নেপালে প্রায় তাহাদের সকলগুলিই এক সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কলিকাতা অঞ্চলে অষ্টমী ব্রত বিধান তান্ত্রিক মতানুসারে এখনও সম্পাদিত হইয়া থাকে, নেপালেও তাহাই হয়, তবে প্রভেদ এই যে, দেবদেবীর নাম ভিন্ন হইয়া থাকে। নেপালে শিব, শক্তি, ভূত, প্রেত, যোগিনী, ডাকিনী প্রভৃতির সঙ্গে বৌদ্ধেরও আরাধানা হয়, বাঙ্গালা

* "রাজতরঙ্গিণী" গ্রন্থে এই শ্লোকোক্ত সাহানগরী কাশ্মীরের রাজধানীর নাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। As Res. Vol. XV. P. 110; also Burnouf's Introduction 594.

দেশে তাহা হয় না। নেপালে অষ্টমীব্রত সম্পাদন সময়ে বহু মণ্ডল প্রস্তুত হইয়া থাকে, একটা মণ্ডলে এক এক প্রকার নৈবিদ্য দ্রব্য রক্ষিত হয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম মণ্ডলে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি থাকে। পূজকেরা বৌদ্ধ মণ্ডলে আঙ্গুলি রাখিয়া বলে "সমগ্র বিশ্বব্যাপী তথাগাথার কুশল হউক।" তদন্তর দূর্ব্বাঘাস হাতে লইয়া বলে "ওঁ ওঁ ওঁ। আমি বজ্র দর্ব্বাকে প্রণাম করি, ইহার মাহাত্ম্য প্রচারিত হউক।" ইহার পরে শূন্যে পুষ্প ও সুগন্ধি নিক্ষেপ করিয়া বলা হয় "সেথানে যত বুদ্ধ আছেন সকলে আইসুন। আমি এক্ষণে ভিক্ষু। আমি সকলের পূজা করি। আমি ইহাঁদের উদ্দেশে বজ্র অর্পণ করিতেছি"।*

অনন্তর বুদ্ধদেবের মুখ ও চরণ পরিষ্কার জল দ্বারা ধুইয়া দিয়া পূজক বলে "সাধু বুদ্ধের শ্রীচরণ জন্য জল গৃহীত হউক। আচমনের জন্য সলিল গৃহীত হউক। স্বাহা। স্বাহা।" তাহার পরে পুষ্পন্যাসের শ্লোকার্থ এই—ওঁ ওঁ ওঁ। পবিত্র বিরোচনের কল্যাণ হউক। স্বাহা। রত্নসম্ভবঃ স্বাহা অমিতাভঃ স্বাহা। অমোঘ সিদ্ধ স্বাহা। শ্রীলোচন স্বাহা। মামকী স্বাহা। স্বাহা তারা স্বাহা। ওঁ ওঁ ওঁ॥

ইহার পরে স্তোত্র পাঠ করা হয়। তাহা এই—"আমি অবনত মস্তক হইয়া প্রণাম করি। বিরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নদা, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধ, লোচন, তারা ও মামকীকে আমি প্রণাম করি। শাক্যমুণিকে আমি প্রণাম করি। সর্ব্বজ্ঞ, পদ্মপলাশলোচন, দয়ারনিধি এবং বুদ্ধির সাগর বৌদ্ধকে আমি প্রণাম করি।" ইহা সমাপ্ত হইলে, ভক্তেরা "সীকার ক্রিয়া" সম্পাদন করে। খৃষ্টানদিগের মধ্যে রোমান

* ডাক্তার এন্‌সলী সাহেব দূর্ব্বাঘাসের বড় প্রশংসা করিয়াছেন। Dr. Ainslie's "Materia Medica" Vol. II. P. 27 আচার্য্য বর্ণুফ সাহেবের মতে "বজ্র" অর্থে পবিত্র। ইহা যে কোন সুন্দর পুষ্পের প্রতি প্রযোজিত হইতে পারে। Burnouf's "Introduction". Page 527.

ক্যাথলিকেরা যেমন পাদ্রীদিগের নিকটে গিয়া মধ্যে মধ্যে confession করে, এই স্বীকার ক্রিয়াও তদ্রূপ। নেপালী ভাষায় ইহার নাম "দেশান।" ইহা এক প্রকার—"আমি যে কোন প্রকার পাপ কার্য্য করিয়াছি, হে প্রভো! তুমি তাহা মার্জ্জনা কর। জ্ঞানতঃ, অজ্ঞানতঃ, নির্ব্বোধিতা বশতঃ অথবা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ, যাহা কিছু পাপ করিয়াছি, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি এবং তজ্জন্য পশ্চাত্তাপ করিতেছি। আমাকে সকলে ক্ষমা করুন। পূর্ব্বেকার ও বর্ত্তমানের পাপ হইতে আমাকে মুক্ত করুন এবং ভবিষ্যতের পাপ হইতে আমাকে স্বতন্ত্র করুন।" অনন্তর গুরুসম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে কহিতে হইবে "আমি আমার পাপ স্বীকার করিয়া এক্ষণে বুদ্ধের শরণাগত হইলাম। আমার অজ্ঞান দূর হউক, তিনি আমার রক্ষক হউন, তিনি অবিনাশী, করুণাসিন্ধু ও সর্ব্বজ্ঞ। আমি সকল মনুষ্যের সম্মুখে ইহা স্বীকার করিতেছি।" ইহাতে গুরু কহিবেন "উত্তম, উত্তম, হে বৎস! উত্তম। এক্ষণে নির্য্যাতন ক্রিয়া কর।" তদনন্তর শিষ্য, চাউল, ফুল, জল ও মিষ্ট দ্রব্য লইয়া নির্য্যাতন ক্রিয়া সম্পাদন করে। এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ করে—"প্রভো অর্হৎ! তোমার জ্ঞানের সীমা নাই, তুমি সুগাথা, তুমি বুদ্ধ, আমি এই মণ্ডলে তোমাকে পুষ্পাদি অর্পণ করি। তুমি পাপ মোচন-কারী ও সর্ব্ব সুখদাতা।" এই মন্ত্রের পরে আর একটা মন্ত্র পড়িতে হয়, তাহা এই—"ওঁ! বুদ্ধ রত্নকে নমস্কার। এই দয়াময় প্রভু আমার নৈবিদ্য গ্রহণ করুন এবং আমাকে স্থির রাখুন। ওঁ অম্ হ্ৎ হুং ফট স্বাহা।" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিতে হয়, একবার ধর্ম্মের উদ্দেশে, একবার সঙ্ঘের উদ্দেশে এবং একবার মূলমণ্ডলের উদ্দেশে। ক্রিয়া শেষ হইবার সময়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি আবৃত্তি করা আবশ্যক। "হে দেবতা ও দৈত্য-গণ! হে সর্প ও সাধুগণ! হে বিহাদিদলপতি ও গন্ধর্ব্বগণ! হে যক্ষগণ! হে গ্রহগণ! হে মেরু, ইন্দ্র, হ্রদ, দেবদেবী ও অপ্সরাগণ!

এবং বৃক্ষে, পর্ব্বতে, গহ্বরে, জলে, স্থলে, শূন্যে, যে যেখানে আছ, তোমরা সকলে একত্র হইয়া আমার নমস্কার গ্রহণ কর। ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, পিশাচপতি, বায়ু, ভূত, দেবতা, দানব, আলোক ও অন্ধকারের দেবী এবং কীট ও পতঙ্গদিগের প্রভু, তোমরা সকলে আমার নমস্কার গ্রহণ কর। তোমরা খাও, পান কর এবং এই ক্রিয়াকে সুফল করিয়া দাও। হে কৃষ্ণা, রুদ্রী, মহারুদ্রী, শিব, উমা, জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, ভদ্রকালী, মহাকালী, স্থলকালী, যোগিনী, ইন্দ্রী, চণ্ডী, ঘোরী, বিধাত্রী দাত্রী, জম্বকী, ত্রিদশেশ্বরী, কম্বোজিনী, দ্বীপানী, চূষিণী, ঘোরাপুরা, মহারূপা, দৃষ্টারূপা, কপালিনী, কপালামালা, মালিনী, খট্টাঙ্গা, যমহৃদিকা খড়্গাহস্তা, পরশুহস্তা, বজ্রহস্তা, ধনুহস্তা, পঞ্চডাকিনী, মহাতত্ত্বা, যোগীশ্বরী বজ্রেশ্বরী তোমরা সকলে আমার নমস্কার গ্রহণ কর। ওঁ তথাগাথা। ওঁ বুদ্ধ। ওঁ শাক্যমুনি। ওঁ কা কা কর্দ্দানা কর্দ্দানা। ওঁম্ খা খা খাদানা খাদানা। ঘঘা, ঘটাা, ঘটাা। হুম্ হুম্ হ্রীং হ্রীং ফট্ ফট্ স্বাহা"।

সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য উইলসন সাহেব এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া এমন বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি লিখিয়াছেন "Such is the nonsensical extravagance with which this and the Tantrik ceremonies in Nepal generally aboured and we might be disposed to laugh at such absurdities, if the temporary frenzy, which the words excite in the minds of those who hear and repeat them with agitated awe did not offer a subject worthy of serious contemplation in the study of human nature"—Religious sects of Hindoos. Vol. Page 3½.

অতঃপর আমি তৃতীয় পুস্তকখানি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এই পুস্তকের নাম "সপ্তবুদ্ধস্তোত্র"। এই পুস্তকে

সাতজন বুদ্ধের স্তুতিব্যঞ্জক শ্লোক আছে। শ্লোকের সংখ্যা মোটে নয়টা, সুতরাং পুস্তিকা কত ক্ষুদ্রা তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই নয়টা শ্লোকের অনুবাদ দিতেছি। ১ম শ্লোক। দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণকারী, জ্ঞানের ভাণ্ডার, সকলের আরাধ্য ইএবং সর্ব্বজ্ঞ জিনেন্দ্র দেবকে আমি নমস্কার করি। ইঁহার অন্য নাম বিপাশ্বী, প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশে ইহাঁর জন্ম, বন্দুমতী নগরীতে ইহাঁর উদ্ভব এবং ইনি ৮০ সহস্র বর্ষ কালব্যাপিয়া দেব ও মানবগণের শিক্ষকতা করিয়াছেন।

২য় শ্লোক। আমি শিখিকে নমস্কার করি। স্বর্গের নয়জন জ্ঞান-দেবতার মধ্যে ইনি একজন। ইনি সমগ্র বিশ্বমণ্ডল পরিব্রজন করিয়াছেন এবং ৭০,০০০ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ভূতলে বর্ত্তমান ছিলেন।

৩য় শ্লোক। আমি বিশ্বভূকে নমস্কার করি। ইনি বিশ্বের বন্ধু, ধর্ম্মের অধিপতি, অনুপম নগরে ইহাঁর জন্ম, রাজবংশ হইতে ইনি উদ্ভূত এবং ৬০,০০০ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ধরাতলে বিরাজ করিয়াছিলেন।

৪র্থ শ্লোক। আমি করুচ্ছন্দকে নমস্কার করি। ইনি মুনিদিগের প্রধান, অতুল এবং ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। চল্লিশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ইনি ভূতলে ছিলেন।

৫ম শ্লোক। আমি কণ্য মুনিকে নমস্কার করি। ইনি সাধু ও ব্যবস্থাপক। ইনি মায়ারহিত এবং দ্বিজবংশ সমুদ্ভূত, শোভনাবতী নগরীতে ইহাঁর জন্ম। ত্রিশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ইনি ধরাতলে ছিলেন।

৬ষ্ঠ শ্লোক। আমি কশ্যপকে প্রণাম করি। ইনি বিশ্বের অধিপতি। ইনি মহান সাধু। কাশীধামে ইহাঁর জন্ম, ব্রাহ্মণকুলের ইনি অলঙ্কার বিংশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ইনি পৃথিবীতে ছিলেন।

৭ম শ্লোক। আমি শাক্য সিংহকে প্রণাম করি। ইনি বুদ্ধদেব। ইনি সূর্য্যের জ্ঞাতি এবং দেব ও মনুষ্যবর্গের আরাধ্য। কপিলাপুরে ইহার জন্ম। শাক্যবংশ হইতে ইনি সমুদ্ভূত। এই বংশ রাজকীয়। ইনি [illegible] পর্য্যন্ত ছিলেন।

৮ম শ্লোক। আমি সাধকগণাধিপতি প্রভু মৈত্রেয়কে নমস্কার করি। ইনি তুষিতাপুরে বাস করেন। কেতুমতী নগরীতে ইহাঁর জন্ম। ইনি বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৯ম শ্লোক। এই সাত বুদ্ধকে আমি পুনরায় প্রণাম করি। সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তাঁহারা দীপ্তিমান। ভবিষ্য অষ্টম বুদ্ধকেও অমি প্রণাম করি। (অনুবাদ শেষ)।

উপরি উক্ত পুস্তিকায় আট জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে, কিন্তু পুস্তিকার "সপ্তবুদ্ধস্তোত্র"। নেপালের অধিকাংশ বৌদ্ধগ্রন্থে "গোতম" শব্দ উল্লিখিত নাই; তদ্দেশীয় অনেক পুস্তক ও পুস্তিকায় "শাক্য" অর্থে কৃত্রিম বা কপটাচারী বুঝায়। "বুদ্ধ" এই শব্দ নেপাল অঞ্চলে অতীব প্রিয়। নেপাল রাজ্যে পঞ্চজন বুদ্ধ বিশেষ সম্মানিত। ইহাঁদের নেপালী নাম ও সংস্কৃত নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

নেপালীনাম	সংস্কৃত নাম
ককুসন্দে	করুচ্ছন্দন্
কোণাগামে	কণক
কশেরজীপে	কশ্যপ
গোতম	শাক্য
মত্রি	মৈত্রেয়

অপর দুই বৌদ্ধ কল্পান্তরকালে আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া বিশেষরূপে উল্লিখিত হয় নাই। * প্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র সম্ভবতঃ গুর্জ্জর দেশে (গুজরাটে) একাদশ শতাব্দীর শেষে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার অভিধান লিখিয়াছিলেন। ইহাঁর মতে সপ্তবুদ্ধ এই কয়েকজন—শিখি, বিপশ্যী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কাঞ্চন, কশ্যপ এবং শাক্যসিংহ।

* Captain Mahony's paper on Buddhas. (Asiatic Research Vol

আচার্য্য উইলসন সাহেবের মতে অনেক বুদ্ধ কেবল কল্পিতমাত্র। (Not real personage) উপরে যে কশ্যপ নামোল্লিখিত হইয়াছে এই কশ্যপ বিদ্যাবত্তা, প্রতিভা ও সামর্থ্য জন্য বুদ্ধসমতুল্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইনি হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া ককেশশ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচার করেন এবং অনেক জাতিকে সভ্য করেন। নেপাল ও কাশ্মীরের অনেক গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ আছে। ঐ সকল দেশে ইহার অনেক মঠও অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকের মতে শাক্য ও বুদ্ধ একই ব্যক্তি কিন্তু আচার্য্য হার্ডী সাহেবের অন্যমত। (R. Spence Hardy's "Manual of Buddhism" Page 96) আচার্য্য জর্জ্জী সাহেবের মতে (see "Religious sects of the Hindus" By H. H. Wilson, Vol. II. P. 9 সত্যযুগে মনুষ্যগণ ৮০ সহস্র, ত্রেতাযুগে ৬০ সহস্র, দ্বাপর যুগে বিংশ সহস্র এবং কলিযুগে একশত বর্ষ কালমাত্র বাঁচে। সুতরাং কল্পান্তরে বুদ্ধগণ বহুকাল অতীত হইবার পরে স্মৃতি পথের অতীত হইয়া যান. এই জন্য তাঁহাদের সকলের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গোতম নাম সদত ব্যবহার না থাকায় নেপালরাজ্যে গোতমকে বুদ্ধ বলিয়া অনেকে মানে না, কিন্তু শাক্যসিংহ এই নাম সেখানে খুব প্রচলিত। নেপালের নেওয়ারী ভাষার পুস্তক সমূহে লিখিত আছে, শাক্য-সিংহ সুদ্ধোধন রাজার বংশে সমুদ্ভূত হয়েন এবং এই সুদ্ধোধন গোতমের পিতা। নেওয়ারী পুস্তকে শাক্যসিংহের অপর নামগুলি এই—আদিত্য-বন্ধু, লৌকিক বন্ধু, বিশ্ববন্ধু, ইত্যাদি। কোষকার হেমচন্দ্র মতে এবং অমর কোষানুসারে শাক্য সিংহের বহুনাম ছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রধান—শাক্যমুনি, শাক্য সিংহ, সর্ব্বার্থ সিদ্ধ, শৌদ্ধধনী, গোতম, অর্কবন্ধু, মায়াদেবী সুত। অমরকোষ মতে সপ্তম বুদ্ধের নাম শাক্যসিংহ। আচার্য্য বুচানন সাহেবের মতে আভার পুরোহিতেরা গোতম ও শাক্যকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু অমর কোষের পালী অনুবাদ ও

টীকায় সিংহলের বৌদ্ধগণ এরূপ প্রভেদ করে নাই। পালী অভিধানের মূলটুকু এই—সুদ্ধোধনী চ গোতম শাক্যসিংহো তথা শাক্যমুনি চ আদিচ্চ বন্ধু চ।" *

যাহা হউক যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সিদ্ধান্তে আমরা এক্ষণে উপনীত হইতে পারিয়াছি, তাহা এই—(১) সর্ব্বদেশে বৌদ্ধাচার এক নহে; (২) সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম একভাবে সজ্জিত হয় না; (৩) বুদ্ধদেব একব্যক্তি নহেন; (৪) "বুদ্ধ" একটা সম্মানসূচক বিশেষণ; যে ব্যক্তি বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েন তিনিই বুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (৫) হিন্দুধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি; (৬) হিন্দুর অনেক প্রথা ও আচার বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত এখনও জড়িত আছে; (৭) বৌদ্ধদিগের বহুশাস্ত্র—প্রায় সমুদায় শাস্ত্র হিন্দুশাস্ত্রকে মূল করিয়া বিরচন করা হইয়াছে; (৮) আদিকালের বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম এখন কোথায় প্রচলিত নাই, অনেক প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; (৯) বৌদ্ধদের রাজনৈতিক শক্তি হীন হইয়া গেলে এবং কাল-ক্রমে হিন্দুর রাজনৈতিক শক্তি প্রবলা হইলে, বা হিন্দু জাতি স্বাধীন হইলে, বৌদ্ধগণ আবার হিন্দু হইয়া যাইতে পারে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

* Read Pali and Ceylonese versions of Amarkosh. By Mahatta Udayasekhar Pradhan Manikh. edition of 1804.

ঐতিহাসিক চিত্র।

সিরাজের ইংরেজ-বিদ্বেষ।

ইংরেজ বিদ্বেষের জন্য সিরাজ-উদ্দৌলার সর্ব্বনাশ সংঘটিত হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরেজ সহসা সিরাজের সর্ব্বনাশ করিতে না পারিলেও, সিরাজের অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্রসহায়ে ইংরেজ যে, সিরাজ-উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পথের ভিখারী ও অবশেষে তাঁহাকে ঘাতকের শাণিত তরবারির নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। কেন ইংরেজ যে, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ থাকিলেও, সিরাজের ইংরেজ-বিদ্বেষের কারণ সাধারণ ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় না, এবং তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতও দৃষ্ট হয়। এমন কি কোন কোন স্থানে তাহা সিরাজের খেয়ালের নিদর্শনস্বরূপেও কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু সিরাজের ইংরেজ-বিদ্বেষ যে গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব, এবং যদি তাহাকে খেয়াল বলিতে হয়, তাহা হইলে, তাহা যে রাজনৈতিক খেয়াল, ইহাও প্রদর্শনের চেষ্টা করিব।

ইংরেজ-বণিক্ বাঙ্গলায় বাণিজ্যের জন্য সমাগত হইয়া, ক্রমে ক্রমে তথায় আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হন। কেবল বাঙ্গলা বলিয়া নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহাদের এই নীতি প্রচারিত হইতে আরব্ধ হইয়াছিল। কি দাক্ষিণাত্য, কি বাঙ্গলা, সর্ব্বত্রই ইংরেজ-বণিকের প্রভুত্ব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কেবল রাজধানী দিল্লী ও আগরার নিকটস্থ স্থানে ইংরেজ-বণিক্ আপনাদের প্রভুত্ব তাদৃশ বিস্তার করিতে সক্ষম হন নাই। কারণ, মোগল বাদশাহদিগের অক্ষুণ্ণ গৌরব ইংরেজ-বণিক্ একেবারে উপেক্ষা করিতে সাহসী হন নাই। প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য-লিপ্সা-প্রবৃত্তিও ইংরেজ-বণিকের হৃদয়ে শনৈঃ শনৈঃ উদয় হইতেছিল, এবং দাক্ষিণাত্য প্রভৃতির প্রদেশে তাহার সূচনাও আরম্ভ হইয়াছিল। বাঙ্গলার দূরদর্শী নবাবগণ ইংরেজ-বণিকের ঔদ্ধত্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে ত্রুটি করেন নাই। নবাব সায়েস্তা খাঁ, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ প্রভৃতি সুচতুর নবাবগণ ইংরেজের ঔদ্ধত্য ও প্রভুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহা দমন করিতেও সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সময়ে ইংরেজ-বণিক্ সময়ে সময়ে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" অপদস্থ হইয়াও ইংরেজ-কোম্পানী নবাবদিগের উপদেশ বা তাড়না গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা আপনাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের এই চেষ্টা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিলে, তীক্ষ্নদর্শী নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তৎপ্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য করেন। সময়ে সময়ে তিনি ইংরেজ-কোম্পানীর ঔদ্ধত্যের জন্য দণ্ড বিধানও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে সক্ষম হন নাই। কি কারণে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ কৃতকার্য্য হন নাই, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হইয়া চারিদিকে অশান্তির স্রোত প্রবাহিত দেখিতে পান। মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ ও

আফগান-বিদ্রোহ দমনের জন্য, তাঁহার রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা বারংবার তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া এরূপ অশান্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল যে, নবাব তাহার প্রতিরোধের জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতেন। আফগানগণের বিদ্রোহও তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে তিনি রাজ্যের সকল দিকে সমানরূপ দৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যেরূপ তীক্ষ্ণদর্শী ছিলেন, তাহাতে কিছুই তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে নাই। ইংরেজেরা এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের আশঙ্কায় আপনাদিগের স্থানগুলি সুরক্ষিত করিয়া নিজেরা ক্রমে অজেয় হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং মধ্যে মধ্যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপনেরও চেষ্টা করেন। দেশীয় বণিক্‌দিগের উপর অত্যাচারের কথা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর কর্ণগোচর হইলে, তিনি ইংরেজদিগকে অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দেন।* এক সময়ে আর্ম্মেনীয়দিগের সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, নবাব ইংরেজদিগের দণ্ডবিধান করিলে, তাঁহারা শেঠদিগের দ্বারা ১২ বার লক্ষ টাকা নজর প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। † ফলতঃ ইংরেজ-বণিক্‌গণের ঔদ্ধত্যের প্রতি নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর লক্ষ্য থাকিলেও, তিনি নানা কারণে বিব্রত থাকায়, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে সক্ষম হন নাই।

আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে মুর্শিদাবাদের মসনদ লইয়া ভয়ানক গোলযোগ চলিতেছিল। আলিবর্দ্দী সিরাজ-উদ্দৌলাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তাঁহার

* Long's selection.
† Do.

জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসেটি বেগম সিরাজ-উদ্দৌলার ভ্রাতা এক্রাম-উদ্দৌলাকে দত্তক লইয়া ছিলেন। অকালে এক্রাম-উদ্দৌলার মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার শিশুপুত্র মোরাদ-উদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য তিনি আয়োজনে প্রবৃত্ত হন, এদিকে আলিবর্দ্দীর মধ্যম কন্যার পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব সকতজঙ্গও মুর্শিদাবাদের মসনদের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। কাশীমবাজার ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ সাহেব ঘেসেটী বেগমকে গোপনে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারই পরামর্শক্রমে ঘেসেটী বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস পরিবার ও ধনসম্পত্তি লইয়া কলিকাতায় ইংরেজদিগের আশ্রয়ে উপস্থিত হন। সিরাজ-উদ্দৌলা ঘেসেটীকে ইংরেজদিগের সাহায্যের কথা শয্যাগত নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে জানাইলে, তিনি তাঁহার চিকিৎসক কাশীমবাজার ইংরেজ-কুঠীর ডাক্তার ফোর্থ সাহেবকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তন্মধ্যে যে গুলি উল্লেখযোগ্য তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। নবাব ফোর্থ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কাশীমবাজারে ইংরেজদিগের কত সৈন্য আছে, ইংরেজ জাহাজ কোথায় কি ভাবে আছে, কি জন্য তাহারা এতদ্দেশে আসিয়াছে ইত্যাদি কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, ফোর্থ সাহেব ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধের জন্য জাহাজ আসিয়াছে ও কলিকাতার ইংরেজগণ নবাব সরকারের কোনরূপ অসন্তোষ উৎপাদন করিবেন না ইত্যাদি বলায়, নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে বলিয়া প্রকাশ করেন। সিরাজ তদুত্তরে বলেন যে, আমি তাহা প্রমাণ করিব। ডাক্তার ফোর্থের সমক্ষে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজ-উদ্দৌলাকে ঐরূপ কথা বলিলেও তিনি ইংরেজদিগকে বিশেষরূপে জানিতেন। ইংরেজদিগের ঔদ্ধত্য ও রাজ্যলিপ্সা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সেইজন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি ইউরোপীয় বণিকবর্গ বিশেষতঃ ইংরেজদিগের প্রতি সতর্কতা অবলম্বনের জন্য ও তাহাদিগকে দুর্গ নির্ম্মাণ বা

সৈন্য রক্ষা করিবার সুযোগ প্রদানে নিষেধ করিয়া যান। * তিনি ইংরেজদিগের সম্বন্ধে এই মর্ম্মে বিশেষ ভাবে সিরাজ-উদ্দৌলাকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

"তুমি যেরূপে পার প্রথমে এই ইংরেজ-বণিক্‌দিগকে পদদলিত করিবে, নতুবা তোমার রাজ্য স্থায়ী হইবে না। আমি জীবিত থাকিলে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতাম, ইংরেজেরা এতদ্দেশে অর্থোপার্জ্জনের জন্য আসিয়াছে। রাজ্যলিপ্সা ও অর্থপিপাসা খৃষ্টানদিগের অন্তরের বিষয়। তাহারা ঐশ্বরিক উপদেশ মনে করে বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা অনন্তজীবন বা অবিনশ্বরকে বিশ্বাস করে না। তাহারা যে সমস্ত সাধু উদ্দেশ্য প্রকাশ করার ভান করে, তাহারই বিপরীতাচরণ করিয়া থাকে। ইংরেজদিগকে কুঠী বা দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে এবং তাহাদিগকে সৈন্য রাখিতে দিবে না। তাহাদিগকে ক্রীতদাসের ন্যায় পদদলিত করিয়া রাখিবে ইত্যাদি।"†

* Keep in view the power the European nations have in the country. This fear I would also have freed you from, if God had lengthen my days.—The work, my son, must now be yours. Their wars and politics in the Telinga country should keep you waking. On pretence of private contests between their kings, they have seized and divided the country of the king, and the goods of his people, between them. Think not to weaken them altogether. The power of the English is great; they have lately conquered Angria, and possessed themselves of his country; reduce them first; the others will give you little trouble, when they have reduced them. Suffer them not, my son, to have factories or soldiers; if you do, the country is not yours. (An enquiry into our national conduct).

† "My son, the power of the English is great; reduce them first; when that is done, the other European nations will give you little trouble. Suffer them not to have factories or soldiers; if you

আলিবর্দ্দীর এই অমূল্য উপদেশ সিরাজের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং তিনিও যে, তাহার পূর্ব্ব হইতে ইংরেজদিগের পরিচয় পাইয়াছিলেন ইহাও সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন।

ইংরেজদিগের প্রতি আলিবর্দ্দীর অভিপ্রায় সম্বন্ধে অন্যমতও দৃষ্ট হয়। মুতাক্ষরীণকার তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এক সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, আলিবর্দ্দী খাঁর প্রধান সেনাপতি মুস্তাফাখাঁ ইংরেজদিগকে নিহত করিয়া কলিকাতা অধিকারের প্রস্তাব করিলে, আলিবর্দ্দী তাহার কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। আলিবর্দ্দীর জামাতাদ্বয় মুস্তাফাখাঁকে সমর্থন করিলে,

do, the country is not yours. I would have freed you from this task, if God had lengthened out my days.—The work, my son, must now be yours. Reduce the English first; if I read their designs aright, your dominions will be more in danger from them. They have lately conquered Angria and possessed themselves of his country and his riches. They mean to do the samething to you. They make not war among us for justice, but for money. It is their object; all the Europeans come here to enrich themselves; and, on pretence of private contests between their kings, they have seized the country of the king, and divided the goods of his people between them. Love of dominion and gold, hath laid fast hold of the souls of the Christians, and their actions have proclaimed, over all the East, how little they regard the express precepts they have received from God. They believe not that life and immortality which is brought to light by their revelation. They act in defience of the good principles they would pretend to believe. My son, reduce the Engligh to the condition of slaves and suffer them not to have factories or soldiers, if you do, the country will be theirs, not yours. They who, we see, are every day using all their policy, and their power, against what they themselves say is the law of the Most High, are only to be restrained by force."

নবাব মুস্তাফা খাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা কি অপকার করিয়াছে যে, তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে হইবে। স্থলে যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাহাই নির্ব্বাপিত হইতেছে না, তাহার উপর জলের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া স্থল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে কে তাহা নির্ব্বাণ করিতে সক্ষম হইবে?* অবশ্য আলিবর্দ্দী খাঁ এরূপ কথা ব্যক্ত করিলেও ইংরেজদিগের সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব কি ছিল, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায় না। যে সময়ে মুস্তাফা খাঁ উক্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ বাঙ্গলার শ্যামল প্রান্তরে যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিল, নবাব তাহার নির্ব্বাণের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই তিনি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া নদীর জলে আর অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার উক্ত উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ইংরেজদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, জলযুদ্ধে ও স্থলযুদ্ধে বঙ্গরাজ্য মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। সুতরাং ইংরেজেরা যে সহজ পাত্র নহেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণা ছিল, এবং সেই ধারণা তাঁহার মনে চিরদিনই জাগরূক থাকায়,

* "My dear children! Mustapha Khan is a soldier of fortune and a man in monthly pay who lives by his sabre; of course he wishes that I should always have occasion to employ him, and to put it in his power to ask favours for himself and friends; but in the name of common sense, what is the matter with your own-selves, that you should join issue with him, and make common cause of his oppnion? What wrong have the English done me, that I should wish them ill? Look at yonder plain covered with grass; should you set fire to it, there would be no stopping its progress; and who is the man then who shall put out a fire that shall break forth at sea, and from thence come out upon land? Beware of lending an ear to such proposal again; for they will produce nothing but evil. (Seir Mutaqherin)

তিনি সিরাজ-উদ্দৌলাকে তাহাদিগের দমন করিবার উপদেশ দিয়া যান, এবং সময় পাইলে তিনি নিজেই তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতেন, ইহাও প্রকাশ করেন। সুতরাং মুতাক্ষরীণকারের মতের সহিত আলিবর্দ্দীখাঁর সিরাজের প্রতি শেষ উপদেশের অনৈক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। মুস্তাফাখাঁর প্রস্তাবকালে তিনি ইংরেজদিগকে দমন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, ইহাই বোধ হইয়া থাকে।

আলিবর্দ্দীর উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া সিরাজ-উদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপূর্ব্ব হইতে ইংরেজদিগের ব্যবহার তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন; এই সময়ে ইংরেজেরা কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য দুর্গাদির সংস্কার ও কোন কোন স্থানে সৈন্য রক্ষার স্থানাদি নির্ম্মাণ করিতে ছিলেন। সিরাজ-উদ্দৌলা তাহারও সংবাদ পাইলেন, এবং কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়া ঘেসেটী বেগমের পক্ষ অবলম্বনের চেষ্টা করায়, তাঁহার বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ইংরেজদিগের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত করিলেন। ইংরেজেরা কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে কাশীমবাজার অবরোধ করিতে হইল। পরে কলিকাতা অধিকার করিতে হয়। যদিও সিরাজ-উদ্দৌলা স্বীয় অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্রের জন্য শেষে ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে জীবন বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি ইংরেজদিগের ঔদ্ধত্য, তাহাদিগের রাজ্যলিপ্সা প্রভৃতির জন্য তিনি যে, তাহাদের দমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎকালের সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সিরাজের ইংরেজ বিদ্বেষের সূচনা হয়, তিনি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কদাচ ইংরেজদিগকে নির্য্যাতিত করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। ইংরেজের ঔদ্ধত্য ও রাজ্যলিপ্সা সিরাজ-উদ্দৌলাকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

সম্পাদক।

মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্বিপ্লব।

দীনা-হীনা হৃতগৌরবা ভারতবর্ষ চিরদিনই এইরূপ ছিল না, একদিন ইহার ঐশ্বর্য্য-কাহিনী প্রবাদের মত দেশদেশান্তরে লোকমুখে মুখরিত হইত। একদিন কি এসিয়া, কি ইউরোপ, সকল দেশের নরনারীগণই মনে করিতেন, ভারতবর্ষের মৃত্তিকা স্বর্ণনির্ম্মিত, বৃক্ষ-লতাদি হীরকমণ্ডিত এবং তাহাতে মণিমুক্তা প্রভৃতি নানা প্রকার রত্নরাজি পুষ্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু হায়! আজ সে দিন কোথায়?

আমরা আজ বেশী দিনের কথা বলিতেছি না, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার গৌরব-সূর্য্যের আলোকে আকৃষ্ট হইয়া, দেশদেশান্তর হইতে যে সকল পর্য্যাটক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডাঃ বার্ণিয়ারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৬৬০ খৃঃ অব্দে বাদশাহ শাহ্‌জাহানের দরবারে চিকিৎসক নিযুক্ত হন। পরে তাঁহার প্রিয় ওমরাহ্ দানেশমন্দ খাঁর * সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, বহুকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে এক অশান্তির ছায়া পতিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ শাহ্‌জাহান পীড়িত হইয়া পড়ায়, তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই রাজ্যলোলুপ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে আগরা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। ডাঃ বার্ণিয়ার এতৎসম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবর্ষের তাৎকালীক

পর্য্যাটক বার্ণিয়ার।

* ইঁহার পূর্ব্ব নাম মহম্মদ সফি বা সফিয়োল্লা। শাহ্‌জাহান বাদশাহ ইঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে দানেশমন্দ খাঁ (অভিজ্ঞ যোদ্ধা) নামক উপাধিতে ভূষিত করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ণিয়ারের পরবর্ত্তী পরিব্রাজক চার্ডিন ঐতিহাসিক কাফি খাঁ বা ডাউ কেহই ইহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই।

অবস্থা সুন্দররূপে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার লিখিত এই বিবরণে ভারতবর্ষের শৌর্য্যবীর্য্য ঐশ্বর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া, যেমন একদিকে স্তম্ভিত হইতে হয়, অপর দিকে তেমনি বাদশাহের অন্তঃপুরের গুপ্ত পাপ-লীলা ও ভীষণ কাণ্ডের বিষয় জানিতে পারিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

বার্ণিয়ার যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন বাদশাহ শাহজাহানের বয়স ৭০ বৎসর। তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে প্রথম পুত্র দারা অত্যন্ত সাহসী, সদালাপী, সুরসিক ও উদারচরিত্রের পুরুষ হইলেও, অত্যন্ত গর্ব্বিত ও আত্মাভিমানী ছিলেন। নিজ বুদ্ধিবৃত্তির উপর তাঁহার এতই বিশ্বাস ছিল যে, অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অপমান বলিয়া বোধ হইত। কেহ এইরূপ দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হইলে, তাঁহার নিকট লাঞ্ছিত অপমানিত ও নির্য্যাতিত হইতেন। এই জন্য তাঁহার একান্ত সুহৃদ্ ও হিতৈষিবর্গ তাঁহার ভ্রাতৃগণের ষড়যন্ত্র ও অহিতচেষ্টা জানিতে পারিলেও, তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। দারার কোনও ধর্ম্মে বিশেষ আস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। যদিও তিনি প্রকাশ্যে প্রত্যেক ইসলাম রীতিনীতি প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, কিন্তু তাঁহাকে অনেক সময় হিন্দু পণ্ডিত ও খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে দেখা যাইত। তাহার উপর রেভারেণ্ড বুঝি নামক জনৈক খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মযাজকের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। এসকলের মূলে তিনি যে, একটা বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস বা ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা উদারতা পোষণ করিতেন, তাহা নহে। মোগল সম্রাটের নিযুক্ত সৈন্য মধ্যে খৃষ্টিয়ান গোলন্দাজ সৈন্যের সংখ্যা অত্যধিক থাকায় এবং দেশের অধিকাংশ রাজন্যবর্গ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায়, ইহাদের সহানুভূতি ও প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্যই দারা ধর্ম্ম

শাহজাহানের পুত্র-কন্যাগণ।

প্রথম পুত্র দারা।

দারার ধর্ম্মমত।

সম্বন্ধে এই কপট উদারতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন তাঁহার এই কপট উদারতা তাঁহাকে একদিন তাঁহার ভ্রাতৃবিরোধকালে ও তাঁহার সিংহাসনলাভে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু, হায় মানুষের জ্ঞান কত ক্ষুদ্র; মানুষ যে উদ্দেশ্যে যে কার্য্য সাধন করে পরে দেখা যায়, তাহার সেই কার্য্যই তাহার সে উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। দারার কৃতকার্য্যও ভবিষ্যতে তাঁহার সিংহাসন লাভের পক্ষে অন্তরায় হইয়াছিল। তাঁহার তৃতীয় সহোদর ঔরঙ্গজেব ভবিষ্যতে তাঁহাকে এই সূত্রে কাফের বা অবিশ্বাসী বলিয়া, লোক-সমক্ষে প্রতিপন্ন করিতে ও সকলের বিরক্তিভাজন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা।

শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজার প্রকৃতি কতকটা তাঁহার জ্যেষ্ঠেরই অনুরূপ ছিল। কিন্তু তিনি দারা অপেক্ষা স্থির প্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্যশীল ও গম্ভীর প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। অজস্র উৎকোচ প্রদানে সম্রাট্‌-দরবারের প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গকে কেমন করিয়া স্বীয় পক্ষভুক্ত রাখিতে হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং এইজন্যই বিখ্যাত প্রতাপশালী রাজা যশোবন্ত সিংহও তাঁহার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। এত গুণ সত্ত্বেও সুলতান সুজাকে তাঁহার চরিত্রহীনতার জন্য পরে লোকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। নৃত্যগীতে তাঁহার প্রাঙ্গণ সর্ব্বদা মুখরিত হইত। প্রতিনিয়ত মদ্যপানে তাঁহার চক্ষু আরক্ত থাকিত; ধর্ম্মসম্বন্ধে দারার ন্যায় তিনিও এক ভ্রান্তির পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।—মোগল দরবারে পারস্যদেশীয় ওমরাহগণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকায় এবং উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্যে এই সকল লোক নিযুক্ত থাকায় সুজা মনে করিয়াছিলেন, তাহাদের ধর্ম্মমত অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে এই সকল অমাত্যবর্গ হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। তাই সুজা স্বীয় সুন্নি মত পরিত্যাগ করিয়া সিয়ামত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সম্রাটের তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব দারার ন্যায় সাহসী না হইলেও, সংসার-নীতি ও লোকচরিত্র অভিজ্ঞতায় সম্রাটের সকল পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় কুচক্রী ও বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি তদানীন্তন মোগল সাম্রাজ্যে অন্য কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। কোন্ ব্যক্তি দ্বারা কি কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহারে এসকলের কিছুই প্রকাশ পাইত না। তিনি সর্ব্বদা বিষণ্ণচিত্তে বিষয়বাসনা বিবর্জ্জিত দরবেশের ন্যায় দিনযাপন করিতেন। রাজ্য, ধনদৌলত, কি অতুল-ঐশ্বর্য্য কিছুই যেন তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ ছিল না। আত্মভাব সংগোপনে তাঁহার এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল যে, স্বয়ং সম্রাট্ দারাকে অত্যধিক স্নেহ করিলেও ঔরঙ্গজেবের প্রতি প্রশংসার নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেন। এমন কি, ঔরঙ্গজেবই যে প্রকৃত পক্ষে রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণের একমাত্র উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল। দারা এই নিমিত্ত ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে ঈর্ষ্যার ভাব পোষণ করিতেন ও তাঁহাকে নমাজী বলিয়া উপহাস করিতেন।

তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব।

শাহ্জাহানের চতুর্থ পুত্র মুরাদ বক্স্ অতি সরল * প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। সংসারের কূটনীতি ভেদ করিতে তাঁহার সরল বুদ্ধি একেবারেই অসমর্থ ছিল। তিনি একদিকে যেমন বিনয়ী তেমনি উদার ছিলেন। হাস্যকৌতুকে, আমোদপ্রমোদে, পশুশিকারে ও মদ্যপানে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত। সাহসে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। স্বীয় হস্তস্থিত তরবারির

চতুর্থ পুত্র মুরাদ।

* মুরাদ এত অধিক সরল ছিলেন যে, "আলামগীর নামায়" তাঁহাকে মূর্খ ও নির্ব্বোধ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। খাফি খাঁও তাঁহাকে, অতিরিক্ত সরল প্রকৃতির লোক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

উপর তাঁহার অসাধারণ বিশ্বাস ছিল। হায়, এই বীরত্বের সহিত যদি ঔরঙ্গজেবের অভিজ্ঞতার ন্যায় সামান্য মাত্রও অভিজ্ঞতার সমাবেশ দেখা যাইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি ভিন্ন রঙ্গে চিত্রিত হইত।

প্রথমা কন্যা বেগম সাহেবা।

শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগম সাহেবা * অতিশয় রূপবতী ছিলেন; তাঁহার অসীম রূপলাবণ্য হাস্য-পরিহাস-রসাভিজ্ঞতা ও পিতৃভক্তির + সংবাদ জগদ্বিখ্যাত ছিল। পিতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিত্যনৈমিত্তিক সুবিধা অসুবিধা, এমন কি আহারের সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত এই অসাধারণ রমণী বিশেষ আগ্রহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এজন্য সম্রাটের উপর বেগম সাহেবার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। রাজ্যের যাবতীয় নরনারী এবিষয়ে সবিশেষ অবগত থাকায়, তাঁহার প্রকোষ্ঠ সম্রাটের অনুগ্রহপ্রার্থীদিগের প্রেরিত দেশদেশান্তর হইতে আনীত বহুমূল্য উপঢৌকনে পরিপূর্ণ থাকিত। তিনি মুক্তহস্তা উদারহৃদয়া রমণী ছিলেন। সৎকার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুরাগ থাকায়, অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। বেগম সাহেবা তাঁহার জ্যেষ্ঠ দারার প্রতি অতিশয় অনুরক্তা ছিলেন। তিনিই শাহ্‌জাহানকে সর্ব্বদা দারার মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন। বার্ণিয়ার বলেন যে, তাঁহার এই অনুরাগমূলে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃপ্রেম ছিল না; তিনি আশা করিতেন, দারা একদিন সমগ্র হিন্দুস্থানের হর্ত্তাকর্ত্তারূপে ভারত সিংহাসনে উপবেশন করিলে, তিনিই তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে ভারতের অধীশ্বরী হইতে সমর্থ হইবেন।

* বেগম সাহেবার অপর নাম জাহানারা বেগম।

\+ ডাঃ বার্ণিয়ার পিতাপুত্রীর এই অনুরাগকে সুন্দরচক্ষে গ্রহণ করেন নাই। তিনি ইহাতে যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব।

চন্দ্রের কালিমার ন্যায় এই বুদ্ধিমতী রমণীর চরিত্রে এক ঘোর কলঙ্ক-রেখা দৃষ্ট হইত। নানা সদ্‌গুণ সত্বেও তাঁহার চরিত্র-হীনতা * তাঁহাকে লোকচক্ষে নিন্দনীয় করিয়াছিল। মোগল বাদশাহ্‌দিগের অন্তঃপুরের বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। তাঁহাদিগের এই অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীগণ কেমন করিয়া স্বীয় গুপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতেন, তাহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। চতুর্দ্দিকে খোজা-প্রহরি-বেষ্টিত বা ভীষণ তাতার রমণী-সংরক্ষিত বাদশাহ্‌ অন্তঃপুরে এই সকল পুরুষই বা কেমন করিয়া স্বীয় জীবন হস্তে লইয়া যাতায়াত করিতেন, তাহা আরও বিস্ময়ের বিষয়। কথিত আছে, বেগম সাহেবা একদিন তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে এইরূপ একটী প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর সহিত নিভৃত রহস্যালাপে সময় যাপন করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ সম্রাট শাহ্‌জাহানের অপ্রত্যাশিত আগমনবার্ত্তা পাইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পলায়নের আর পথ নাই, নিরুপায় দেখিয়া, উক্ত হতভাগাকে সম্মুখস্থ জল উত্তপ্ত করিবার এক বৃহৎ পাত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। শাহ্‌জাহান আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুমাত্র চাঞ্চল্য বা ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া সহাস্যবদনে কন্যার সহিত কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বেগম সাহেবার চরিত্রহীনতা।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত।

* অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বেগম সাহেবাকে সচ্চরিত্রা ও সুশীলা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রবন্ধান্তরে এই মহীয়সী রমণীর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। Bill's oriental Biography. আলমগীর নামা Sleeman's Rambles and Recollections.

পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা।

প্রাচীনের স্মৃতি বড় মনোহর, বড়ই চিত্তানন্দদায়ক। বর্ত্তমানের উজ্জ্বল আলোকের মধ্য দিয়া অতীতের কুহেলিকামাখা স্বপ্নকাহিনী অতি সুন্দর। জগতের প্রত্যেকেই বিগত কাহিনী শুনিতে ও জানিতে বড় ভালবাসে। হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রাধান্য-সময়ে বিক্রমপুর কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার ইচ্ছা কি স্বাভাবিক নহে? তখনও এমনি ফলপুষ্প-ভারাবনতা শ্যামল তরুশ্রেণী—উর্ম্মিমালিনী তরঙ্গিণী—ও হরিৎ শস্যক্ষেত্রে পরিশোভিতা মাতা বসুন্ধরা শোভা পাইতেন—কিন্তু হায়! অতীত ও বর্ত্তমানে কত প্রভেদ। তখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন নরপতি—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন, সর্ব্বত্র স্বাধীনতার গৌরবপতাকা উড্ডীন ছিল, বর্ত্তমানে সে কল্পনা আকাশ-কুসুম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মুসলমানের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে বিক্রমপুরে পাল ও সেন রাজগণ প্রাচীন প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী রাজ্য-শাসন করিতেন। ব্রাহ্মণের শক্তি ও শাসন সমাজে বিশেষ সম্মানার্হ ছিল। পাল-নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, তাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন,—তাঁহাদের সময়ের যে সকল তাম্রশাসনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। পাল-রাজারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির জন্য সচেষ্ট থাকা সত্ত্বেও, তৎকালে বৈদিক ধর্ম্মই অধিকতর প্রতিষ্ঠাবান্ ছিল। তবে একথা ঠিক যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের তান্ত্রিকতা অলক্ষ্যে সে সকলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া বৈদিক আচার ও অনুষ্ঠানের পূর্ব্ব রীতিনীতি বহুল পরিমাণে শিথিল করিয়া ফেলিয়াছিল। পাল রাজাদিগের সময়ে হিন্দুসমাজের জাতিগত সংকীর্ণতা দূরীভূত হইয়া আর্য্য, শক ও অনার্য্যদিগের মধ্যে একতার দৃঢ়সূত্র

বৃদ্ধি পাইতেছিল—কাজেই সে সময় বিক্রমপুরে প্রত্যেক জাতিই বিদ্বেষভাব ভুলিয়া মিলনের সুমহান্ মঙ্গল আস্বাদে প্রত্যেকে প্রত্যেককে আপনার ভাবিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু হায়! পুনরায় সেনরাজগণের অভ্যুদয়ে জাতিভেদ হিন্দুসমাজে দৃঢ় মূল হইয়া বাঙ্গালীর উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। *

তাঁহাদের রাজত্ব সময়ে নৃপতি দেবতার ন্যায় পূজিত ও সম্মানিত হইতেন। প্রজা-সাধারণ রাজাকে দেবতা অপেক্ষা কোন অংশেই পৃথক্ জ্ঞান করিত না,—রাজদর্শনে পাপ-নাশ—সেকালে সেই মহৎ নীতি প্রচলিত ছিল। নৃপতিবৃন্দও প্রজাদের হিতার্থ সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; তাঁহারা "পরমভট্টারক," "মহারাজাধিরাজ" "পরমেশ্বর" ইত্যাদি উপাধিভূষণে ভূষিত হইতেন, হিন্দু-শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন না, এক কথায় বলিতে কি, তাঁহারা কেহই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তৎকালে পুষ্করিণী-খনন, দেবালয়-নির্ম্মাণ, পথপ্রস্তুত, পান্থশালা, অন্নসত্র, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। জলকষ্ট কাহাকে বলে, সে যুগে তাহা কেহ জানিত না। বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে অদ্যাপি অসংখ্য দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, মঠ, দেউলবাড়ী ইত্যাদি বিরাজমান থাকিয়া পাল ও সেন রাজন্যবৃন্দের কীর্ত্তিগরিমা বিঘোষিত করিতেছে। গমনাগমনের সুবিধার্থ খাল, নৌসেতু, ইষ্টকসেতু, প্রশস্ত রাজপথ ইত্যাদি এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বিস্তৃতির জন্য হাট, বাজার স্থাপন করিয়া পাল ও সেন রাজগণ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। রাজ্যরক্ষার্থ দুর্গও তাঁহারা নির্ম্মাণ করিতেন।

বিক্রমপুরবাসী প্রত্যেকেই মিরকাদিমের খাল ও তালতলার খাল

* জাতিভেদে সমাজের অমঙ্গল হয়, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। সং।

নামক দুইটি প্রশস্ত খালের উপর বহুদিনের প্রাচীন দুইটি পুল দেখিয়াছেন। এই পুল দুইটি মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্বে মহারাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।* মিরকাদিমের খালের উপর যে পুলটি আছে, উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৭৩ ফিট, খালের গর্ভ হইতে ইহা প্রায় ২৮ ফিট উচ্চ। পার্শ্বস্থ খিলানের দুই দিকে যে দুইটি পারিপার্শ্বিক স্তম্ভ বা span আছে, উহার প্রত্যেকটি ১৭ ফিট উচ্চ এবং ৭ ফিট ৩ ইঞ্চি পুরু। এই পুলটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর, ইহার গায়ে নানাজাতীয় বন্যবৃক্ষসমূহ জন্মগ্রহণ করায়, ইহা এক প্রকার ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। ঢাকার এক পূর্ব্বতন কালেক্টার সাহেব বলিয়াছিলেন যে, যদি আট নয় হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ইহা মেরামত করান যায়, তাহা হইলে ইহা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ের নির্ম্মিত পুলের সমতুল্য হইবে। তালতলার খালের উপরে যে পুলটী আছে, তাহার অবস্থা পূর্ব্ববর্ণিত খালের অপেক্ষা শোচনীয়, ইহার তিনটী স্তম্ভ ছিল, তন্মধ্যে মধ্যের বৃহত্তমটী ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকার সংবাদ-প্রেরণের সুবিধার এবং বড় বড় মাল বোঝাই নৌকার গমনাগমনের জন্য বারুদদ্বারা উড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে ফাটিয়া যাওয়ায় যাতায়াতের বড় কষ্ট হইয়াছে, তবে এখনও অতিকষ্টে জন সাধারণ এক খণ্ড কাঠের সাহায্যে ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করে। প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণের রাজধানী রামপাল হইতে যে সুপ্রশস্ত রাজপথ বরাবর পশ্চিমদিকে পদ্মা পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া যে দুইটী খাল সমান্তরাল ভাবে বর্ত্তমান, এই পুল দুইটী তাহার উপর অবস্থিত। আট শত বৎসর পূর্ব্বের হিন্দু-

বল্লালীপুল।

* "It is said to have been built by Raja Ballal Sen before the conquest of Bengal by Mahammedans. List of Ancient Manuments in the Dacca Division Page 26. Published by authority.

স্থাপত্য কতদূর উন্নত ছিল, এই পুল দুইটী হইতে তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

পাল এবং সেন রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশ 'ভুক্তি' 'মণ্ডলিকা' এবং মণ্ডলিকাসমূহ 'শাসনে' বিভক্ত হইয়াছিল। রাজা কর স্বরূপ উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিতেন। ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতেও শুল্ক গৃহীত হইত। রাজার অধীনে মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ (প্রধান বিচারপতি) মহা সন্ধিবিগ্রহিক (সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যের প্রধান অমাত্য) সেনাপতি, চৌরোদ্ধরণিক (প্রধান শান্তিরক্ষক) মহামাত্য, মহাপাত্র (প্রধান সভাসদ) কোটাল (নগরের শান্তিরক্ষক) কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি বহু বিভিন্ন নাম ও উপাধিধারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিয়া রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা নির্ব্বাহ করিতেন। এ সকল উচ্চ কর্ম্মচারী ব্যতীত রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নৃপতির নিকট বিবৃত করিবার নিমিত্ত বহু গুপ্তচরও নিযুক্ত ছিল।

পাল ও সেন রাজগণের অধীনে অশ্বারোহী, পদাতিক, নৌসৈন্য এবং বহু গজসৈন্য থাকিত। বঙ্গদেশাধিপতিগণের গজসৈন্যের তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। নৌ-যুদ্ধের খ্যাতিও বিক্রমপুরাধিপতি সেনরাজগণের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। যুদ্ধে এক প্রকার দ্রুতগামী সুদীর্ঘ নৌকা ব্যবহৃত হইত, সে সকলকে কোষা-নৌকা বলিত; এই সকল কোষা-নৌকায় বহু দাঁড় থাকিত। এ সমুদয় রণতরী কৈবর্ত্ত, চণ্ডাল ভুঁইমালী প্রভৃতিই সাধারণতঃ বাহন করিত। যুদ্ধার্থ 'কোষা' ছাড়া আর এক প্রকার বৃহৎ নৌকাও ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধোপকরণের মধ্যে অসি, চর্ম্ম, বল্লম, শড়্কি, তীর, ধনু, গদা, বন্দুক প্রভৃতি ছিল।

শিল্প সম্বন্ধেও এ সময় বিক্রমপুর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

শিল্প।

তখন এখানকার নির্ম্মিত কার্পাস বস্ত্র, ভারতের বিভিন্ন স্থানেও খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত মাটির বাসন, সোণারূপার বিবিধ অলঙ্কার, লৌহ নির্ম্মিত

দ্রব্যাদি, কাঁসা ও পিত্তলের বাসন ইত্যাদি নানা স্থানে প্রেরিত হইত। সে সময় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা থাকা সত্ত্বেও লোকে অধিকাংশ স্থলেই কড়ির বিনিময়েই ক্রয়বিক্রয়াদির কার্য্য নির্ব্বাহ করিত।

আমরা সেনরাজগণের সময়ের একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মুদ্রাটি কোন্ সময়ের তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। রবি গুপ্তের মুদ্রার সহিত ইহার কতকটা সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পুরুষেরা পাগড়ী-বন্ধন, দীর্ঘ কেশ রক্ষণ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসীদের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিতেন। এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বিক্রমপুরে কেন, সমগ্র বাঙ্‌লা দেশে ও পূর্ব্ববঙ্গে দীর্ঘ কেশরক্ষা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের কবি বিজয় গুপ্তের মনসার পুঁথি হইতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন "পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল।" পাল ও সেন রাজাদিগের সময় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কোনও রূপ অবরোধ-প্রথা ছিলনা—তখন তাহারা সর্ব্বত্র স্বাধীন-ভাবে গমনাগমন করিতে পারিতেন। রমণীরা যে অশ্বারোহণেও সুপটু ছিলেন বিক্রমপুরের প্রচলিত মহিলা-ব্রতাদি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন "দোলায় আসি ঘোড়ায় যাই।" (মাঘমণ্ডল ব্রতের কথা)

স্ত্রীলোকেরা ঘাঘরা, কাঁচুলি এবং বিলাসিতার উপকরণ স্বরূপ বারাণসী সাড়ী, পাটের কাপড় ও পশমী বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন।* অলঙ্কারের মধ্যে শাঁখা, অঙ্গুরী, কঙ্কণ, কেয়ূর, হার, বেসর, কুণ্ডল, নূপুর, নোলক, একদানা, পৈঁছে, গুজরী, বৈকী, তোড়ল, ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন। সধবা কুলস্ত্রীগণ সিঁথীতে সিন্দূর, গাত্রে চন্দন, পায়ে আলতা ও তাম্বূলরাগে অধর সুরঞ্জিত করিয়া প্রণয়ীজনের চিত্তবিভ্রম জন্মাইতেন।

* বিক্রমপুরে ও পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র স্ত্রীলোকদের 'দোবেড়ে কাপড় পরিধান' ঘাঘরার রূপান্তর একথা অনুমান করা অসঙ্গত কি?

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনসার গীত, মাণিকচাঁদের গীত, সত্য-নারায়ণের পাঁচালী ইত্যাদি সর্ব্বত্র পঠিত হইত।

রামপাল তখন বহু জনাকীর্ণ, সৌধরাজি-পরিশোভিত সুন্দরী নগরী ছিল। তখন ইহাতে তৎকালীন দ্রব্যসম্ভারাদি লইয়া বিবিধ বিপণিরাজী শোভা পাইত।

বর্ত্তমান কালের ন্যায় সে যুগে স্কুল কালেজ ছিল না; তালপত্রে এবং তুলট কাগজের লিখিত গ্রন্থই ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিত এবং নকল করিয়া লইত। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগের টোল ও চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতেন ও বৈদিগ যুগের সভ্যতার ন্যায় পাঠ সমাপ্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত গুরু-গৃহে অধ্যাপকের আজ্ঞাধীন হইয়া অবস্থান করিতেন। গ্রাম্য পাঠশালায় ছোট ছোট বালকগণ শিক্ষা লাভ করিত। তৎকালে ব্যায়াম ও সঙ্গীত বিশেষ আদরণীয় ছিল। সাধারণতঃ ছোট ছোট মোকদ্দমাদি গ্রাম্য বিচক্ষণ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের দ্বারাই মীমাংসিত হইত, অতি অল্প লোকই রাজদ্বারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য উপস্থিত হইতেন। তখন ডাক বিভাগ ছিল না—বাহক দ্বারা নিজ নিজ ব্যয়ে অভিলষিত স্থানে পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইত। খাদ্য দ্রব্যাদি বিশেষ সুলভ ছিল—দুর্ভিক্ষ, মারীভয় ইত্যাদি শুনা যাইত না। কমলার শস্যভাণ্ডার তখন দেশদেশান্তরে অন্ন যোগাইত—পাণ্ডিত্যের গৌরবদর্পে তখন রাজকক্ষ মুখরিত হইত, অভি-সারিণী রমণীর নূপুর-শিঞ্জনে নীরব নিশীথে রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইতেও তখন শুনা যাইত। বারবিলাসিনীগণের আধিপত্য তখন অত্যধিক ছিল। সে স্বপ্নময় যুগ সুখৈশ্বর্য্যে—গৌরবমাধুর্য্যে চিরদীপ্তিমান ছিল। ধনে মানে বিদ্যায় সকল বিষয়েই বিক্রমপুরের বিক্রম তখন বিশ্ববিশ্রুত ছিল। তখন সত্য সত্যই বঙ্গজননী, সুজলাং সুফলাং ও শস্যশ্যামলাং এবং বিক্রমপুর তাঁহার কিরীটমণি ছিল।

সঃ সম্পাদক।

ভারতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দ ভারতে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। মোগল সম্রাটগণের সমৃদ্ধির শেষ রশ্মি তখন পশ্চিম গগনে ম্লান রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছিল। তখন আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্‌জাহানের অসাধারণ বীরত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, প্রজাশীলতা প্রভৃতি গুণাবলী ভারত বাসীর স্মৃতিপথ হইতে একে একে লুপ্ত হইয়া যাইতে ছিল। ভারতের প্রত্যেক সুবা তখন স্বাধীন হইবার বৃথা চেষ্টা, গৃহকলহে শক্তি ও সৌহার্দ্দ ক্ষয় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিল। অদূরদর্শী সুবেদারগণ স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিবাদবিসংবাদকে চিরসহচর করিয়াছিলেন, আর চঞ্চল জয়শ্রী কখন একজনের সহিত কখন অন্যজনের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। বুঝি, তখন ভারতের গর্ব্বিত শিরে বিধাতার অভিসম্পাত বর্ষিত হইতেছিল।

ভবিষ্যের ছায়ার অন্তরালে কি আছে জানিতে পারিলে, মানবজীবনের ইতিহাস ভিন্নরূপে লিখিত হইত সন্দেহ নাই। ঔরঙ্গজেব যদি বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার অত্যাচারপূর্ণ কার্য্যাবলীর ভবিষ্যতে কি বিষময় ফল ফলিবে, তাহা হইলে তিনি, তিনি কেন, মনুষ্য মাত্রেই ঐরূপ ধর্ম্মদ্বেষী কার্য্য হইতে বিরত হইতেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই, প্রতিরোধে তরল জল প্রবাহেরও শক্তি নিহত হয় না, বরং সঞ্চিত হইয়া শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে; শারীরিক বিস্ফোটকের বিষাক্ত বস্তু নির্গত করিয়া দিয়া তাহাকে আরাম করাই যুক্তিযুক্ত, নির্গম বন্ধ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সে বিষ ছড়াইয়া দেওয়া প্রবীণ চিকিৎসকের কার্য্য নহে। ঔরঙ্গজেব মনে করিয়াছিলেন যে, শিখ বা মারহাট্টি বিপুল ক্ষমতাশালী তক্তাউসের অধীশ্বর দিল্লীর সম্রাটের নিকট সামান্য কাকের দল বিশেষ, অতিক্ষুদ্র

পার্ব্বত্য মূষিক মাত্র। তাই ঘৃণিত ব্যবহারে ও ধর্ম্মদ্বেষী অত্যাচারে মহারাষ্ট্রে শিবাজীর পঞ্চনদে গুরুগোবিন্দের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। বিপদের মাতৃ অঞ্চলছায়ায় বলিষ্ঠ তীক্ষ্ণবুদ্ধি দুইটি জাতি দুইটি ক্ষণজন্মা নেতার কর্তৃত্বে একত্রিত হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। ইহারা মুসলমানের মসজিদ দেখিলে ভাঙ্গিয়া দেয়, মোল্লা দেখিলে হত্যা করে। ঔরঙ্গজেব বুঝেন নাই যে, চিরদিন অত্যাচার করিয়া কাহারও ক্ষমতা অটুট থাকে না; মোগল ক্ষমতাও থাকিবে না, তবে বৃথা শত্রুবৃদ্ধি করিয়া এবং সে শত্রুকে প্রতিনিয়ত পদদলিত করিতে প্রয়াস পাইয়া, তাহাকে সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীকৃত করিতে আমি সাহায্য করি কেন?

বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা রাজ্যলাভ করিয়া ফকীর ঔরঙ্গজেব কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না, নিজের পুত্রদেরও নহে। তাই তিনি তাঁহার পিতৃপ্রপিতামহের সম্বল রাজপুতদিগকেও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন; সুধু তাহা নহে, অবমাননা করিতেও অবসর ত্যাগ করেন নাই। জিজিয়া কর স্থাপন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদিগকেই লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। তৎপরে যশোবন্ত সিংহের পত্নীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া প্রায় সমগ্র রাজপুত-জাতিকে তাঁহার বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব মোগল-গৌরব অপ্রতিহত রাখিতে চেষ্টা করিয়া রাজত্বের প্রথম ভাগে আধিপত্যের প্রসার যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; এত অধিক দূর কোন দিল্লীশ্বরই প্রসারিত করিতে পারেন নাই, রাজকার্য্যেও সুশৃঙ্খলার অভাব ছিলনা, কিন্তু রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ এ সম্মানিত অমূল্য উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই; হিন্দুর এ democracy in kingship ভাব তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি প্রজাপালন অপেক্ষা প্রজাশাসন ভাল বুঝিতেন, কারণ তিনি তাঁহার হিন্দু প্রজাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ঘৃণায় সহানুভূতির উদ্রেক হয় না, রঞ্জন করিবার ইচ্ছা, প্রজাপ্রীতির বাসনা মনোমধ্যে উদয় হয় না। ইহাতে প্রজাপুঞ্জের মধ্যে,

বিশেষতঃ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণের ভিতর বিদ্বেষভাব জাগরূক করিয়া গেলে। ইহাতে রাজার সমধর্ম্মাবলম্বী জাতির প্রভুত্ব এবং অন্যের ইচ্ছাবিরুদ্ধ অধীনত্ব অনিবার্য্য, সুতরাং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ইহার ফল। বস্তুতঃ এই বিদ্বেষই ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানের একতাহীনতার মূলকারণ, এই বিদ্বেষ বহ্নি ঔরঙ্গজেব সমীরিত করিয়া উত্তরকালের চিরসম্পত্তিরূপে প্রজাপুঞ্জকে দান করিয়া গেলেন। ইহার ফলে ভারতের রাষ্ট্রবিপ্লবের অভ্যুদয়। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়া এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, সে সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, দিল্লীকে মধ্যস্থল করিয়া তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর আধিপত্য আহিমাচল কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল না, তখন মোগল সাম্রাজ্যের লোপ হইয়া আসিয়াছে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলমগীরের নৃশংস হত্যার পর তাঁহার পুত্র বাঙ্গালা হইতে, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সাহ আলম উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নামেমাত্র দিল্লীর সম্রাট হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্য দিল্লীর চতুঃপার্শ্বস্থিত কয়েক খানিক্ষুদ্র ভূখণ্ড মাত্রে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। শক্তিহীন দিল্লীশ্বরের আর সমস্ত অধিকার তাঁহার সুবেদারগণ বা বিদেশী জাতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইল, সে সকলের উদ্ধার করিবার জন্য ঔরঙ্গজেবের বিপুলবাহিনী কালের অনন্তগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছিল। দিল্লী তখন পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতিচিহ্ন মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মহাসমৃদ্ধিশালী দিল্লী, যেখানে এক সময়ে মানসিংহ, জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহ, প্রতাপ সিংহ প্রভৃতির ন্যায় রাজপুতবীরেরা, শিবাজীর ন্যায় মহারাষ্ট্র বীর, প্রতাপাদিত্যের ন্যায় বঙ্গীয় বীর মোগল সম্রাটদিগকে উপঢৌকন সম্মান দিতে আসিতেন, যেখানে প্রবলপ্রতাপশালী আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব, বাহাদুর সাহ, আহম্মদ সাহের ন্যায়

বাদসাহেরা সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, সে দিল্লী তখন হতশ্রী, লুপ্তশক্তি নামে মাত্র সম্রাটের, ধ্বংসপ্রায়, প্রাসাদমাত্র সম্বল, গৌরবহীন, সামান্ত রাজধানী।

দিল্লীর দক্ষিণপূর্ব্ব অযোধ্যা, সেই অতি পুরাতন অযোধ্যা, কিন্তু তখন সে সীতাপতিও ছিল না, সে অযোধ্যাও ছিল না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে সফদরজঙ্গের পুত্র সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার সুবেদার এবং দিল্লীর উজীর। তখন অযোধ্যা অতুল ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতাশালিনী। আহম্মদ সাহের দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণকালে আফগানরাজ অযোধ্যার প্রতি ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শক্তিমানের নিকট বলপ্রয়োগ অধিকাংশ স্থলেই নিষ্ফল হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এইরূপ ক্ষমতাশালিনী সুবার তাৎকালিক সামর্থ্যহীন দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে, বস্তুতঃ অযোধ্যার নবাব তখন সর্ব্বপ্রকারেই স্বাধীন ছিলেন, কেবল নামে মাত্র দিল্লীর সুবেদার বলিয়া পরিচিত হইতেন।

দিল্লীর দক্ষিণপশ্চিমে রাজপুত গৌরব, ভারতের মধ্যযুগের বীরত্বের স্থল রাজপুতানা। তখনও রাজপুতানার প্রধান তিনটি রাজ্য জয়পুর, যোধপুর বা মারবাড় এবং উদয়পুর বা মেওয়ার পূর্ব্বকালের বীর্য্য গাথা বক্ষে করিয়া উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান। আহম্মদ সাহের ভারত আক্রমণের কিছু পূর্ব্ব হইতেই ঐ তিনটি প্রধান প্রদেশ দিল্লীতে কর প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং পরে দিল্লীশ্বরের দৌর্ব্বল্য দেখিয়া অন্যান্ত ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্যগুলিও রাজস্ব প্রদান স্থগিত করিয়াছিল, সুতরাং ক্ষীণশক্তি দ্বিতীয় সাহ আলমের সময় যে, রাজপুতানা কর প্রদান করিত এরূপ অনুমান করিবার কিছু কারণ লক্ষিত হয় না। রাজপুতানা তখন দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিত না।

রাজপুতানার দক্ষিণে মহারাষ্ট্র প্রদেশ। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার

বংশধরগণের ক্ষমতার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় এবং তাঁহার মন্ত্রিবংশ পেশবা-দিগের প্রাধান্য বৃদ্ধি হয়। ক্রমে তাঁহারাই স্বতন্ত্র রাজ্য চালাইতে আরম্ভ করেন। তৃতীয় পেশবা বালাজী বাজীরাও পুনাতে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার সময়ে মহারাট্টা ক্ষমতা তুঙ্গ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভা সমস্ত মহারাট্টা জাতিকে একত্রিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। নিজাম বাহাদুর মহম্মদ সাহের পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিতে আসিয়া দ্বিতীয় পেশবা বাজীরাওকে মালবের এবং নর্ম্মদা হইতে চম্বল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের সুবেদারী প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ইহা ব্যতীত খান্দেশ, বেরার, কটক, গুজরাট মহারাষ্ট্রীয় অধীনে ছিল। মহারাট্টারা দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। ইহারা বাঙ্গলায় বর্গীরূপে কর আদায় করিত, রাজপুতদিগের নিকট হইতে চৌথ, সর্দ্দেশমুখী ও ঘাসদানা আদায় করিত। শিবাজী বলিয়াছিলেন, মহারাট্টার অশ্বারোহী সেনা পশ্চিমে সিন্ধুনদের ও পূর্ব্বে ভাগীরথীর সাগরসঙ্গমের জল পান করিবে, মহারাট্টাগণের আধিপত্য সিন্ধু হইতে ভাগীরথিমুখ পর্য্যন্ত অনুভূত হইবে—তাঁহার এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতে মহারাট্টারাই একমাত্র পরাক্রান্ত জাতি যাহারা একাধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু মহম্মদ সাহ আবদালী সে পথ ধ্বংস করিয়া দিলেন। বালাজীর ভ্রাতা রঘুনাথ আহম্মদ সাহের নব অধিকৃত পঞ্চনদ প্রদেশ জোর করিয়া দখল করেন; ইহার প্রতিশোধ দিবার জন্য ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ সাহ ভারতে পদার্পণ করেন। মহারাট্টাদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি পুনরায় লাহোর আপনার অধিকারভুক্ত করেন এবং সসৈন্যে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পেশবা এ পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিশেষ চিন্তিত হন। পেশবার সৈন্যাধ্যক্ষ সদাশিব রাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মহম্মদ সাহের বিপক্ষে সৈন্য সঞ্চালনের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়ে প্যাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে

সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু ভাগ্যবশে বিজয়লক্ষ্মী আফগানের প্রতি সদয় হইলেন। সদাশিবের অবহেলায় ও বুদ্ধিভ্রমে মহারাট্টাদিগের সমস্ত ধ্বংস হইয়া গেল। শুধু সৈন্য ধ্বংস হইলে কথা ছিল না, কোন্ যুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় না হয়? কিন্তু তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মহারাট্টার জাতীয় শক্তির মূলে কুঠারাঘাত হইল; আর তাহারা একত্রে মস্তক উত্তোলন করিতে পারিল না।

মহারাষ্ট্রের আরও দক্ষিণে মহীশূর। ইহা অতি পুরাতন রাজ্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে গুজরাটের যাদব রাজবংশের এক ভ্রাতা একজন সামান্য ভূম্যধিকারীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া এই স্থানে বাস করেন। তাঁহারই পুত্রপৌত্রেরা চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান সকল অধিকার করিয়া মহীশূর রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বকালে মহীশূরের নিকট হইতে কর আদায় করেন ও ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাট্টারা চৌথের বাকী স্বরূপ প্রভূত অর্থ ও ১৫ খানি পরগণার রাজস্ব মহীশূর রাজার নিকট হইতে প্রতিশ্রুত করাইয়া লয়। এই সময় হায়দর আলি মহীশূর রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি মহারাট্টাদিগকে বিতাড়িত করিয়া ক্রমশঃ হিন্দুরাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সেই স্থান অধিকার করিয়া বসেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলি মহীশূরের সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি দিল্লীর কোন প্রকার অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ভারতের দক্ষিণে মহীশূর তখন একটি জীবন্ত শক্তি।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশ। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাৎকালিক সুবেদারের পিতা আসফ জার সময় হইতেই নিজাম বাহাদুর দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতেন না। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর মহারাট্টাদিগকে ও ইংরাজসহায় কর্ণাটের নবাবকে তাঁহার পিতার অধিকৃত অনেক স্থান বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নিজাম বাহাদুর যদিও তখন স্বল্পশক্তি ভূম্যধিকারী মাত্র তথাপি দিল্লী হইতে এতদূরে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া রাজকার্য্য চালাইতে সক্ষম ছিলেন।

উত্তরকালের ইতিহাসে যাহাদের বীরত্বকীর্ত্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত হইবে, সে শিখজাতি তখনও সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয় নাই। বন্দর মৃত্যুর পর তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের পিতা ও পিতামহ উহাদিগকে একত্র করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চনদের নানাস্থানে ইহারা আক্রমণ করিতেছিল। আহম্মদ সাহের অধীনতা তাহারা তখন স্বীকার করিত না বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়াও প্রচার করিতে পারিত না, তবে ইহারা দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিত না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আর একটি নূতন জাতি মানদণ্ড হস্তে করিয়া তখন ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহারা তখনও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নাই, করিবার প্রয়োজনও ছিল না। তাহারা সামান্য বণিক সম্প্রদায় মাত্র, যে রাজার রাজত্বে ব্যবসায় করে তাঁহাকেই সন্তুষ্ট রাখিয়া ব্যবসার উন্নতি করাই তাহাদের উদ্দেশ্য, সুতরাং অধীনতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ইহারাই ইংরাজ জাতি। পরন্তু ৩১ শে ডিসেম্বর ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের নিকট ইহারা ভারতে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত সনন্দ পাইয়া ভারতাভিমুখে যাত্রা করে। ভারতে পদার্পণ করিয়া তাহাদের অদ্ভুত অধ্যবসায় এবং কার্য্যকারিতা শক্তির গুণে বাঙ্গালা ও কর্ণাট প্রদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তাহারা কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থ ৩৮ খানি গ্রাম মাত্রের অধিকারী ছিল, মান্দ্রাজে সেণ্ট ডেভিড দুর্গ ও নিকটস্থ স্বল্পায়তন জমি এবং বোম্বায়ে বোম্বাই দ্বীপ, সুরাট আর দুই একখানি গ্রাম তাহাদের অধীন ছিল।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী জাতি তখন বলহীন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বন্দীবাস যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ফরাসীরা ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িয়াছিল, আবার চন্দননগর ও পণ্ডীচারী অবরোধের এবং বুসীর হায়দ্রাবাদ পরিত্যাগের পর ফরাসীশক্তি ভারতে হতবীর্য্য হইয়া পড়িল।

মহারাট্টা ও ফরাসীর পরাজয়ে ও সুবা সকলের আভ্যন্তরিক বিবাদ বশতঃ ইংরাজ আপনাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধির যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিল। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। তাহাদের সম্মুখে তখন বিস্তৃত ভারতসাম্রাজ্য নেতৃহীন, ঐক্যহীন অবস্থায় পড়িয়াছিল। ভারতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ ইংরাজকে নূতন পন্থা দেখাইয়া দিয়াছিল এবং সেই সময় হইতে এক নূতন যুগের প্রারম্ভ হইয়াছিল। এ যুগে ইংরাজ ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ কর।

আকবর, আবুলফজল, বিশপ রেডিফ্।

আকবর।—আপনার মুখে খৃষ্টধর্ম্মের সমস্ত অবগত হইয়া, ইহাই বুঝিলাম যে অন্যান্য ধর্ম্মে যাহা আছে, আপনাদের তাহাই আছে মাত্র। সেই সত্যের সঙ্গে কুসংস্কার ও মিথ্যা জড়ান, তবু যে আপনারা অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে কেন এত বিদ্বেষের চোখে দেখেন জানি না। প্রকৃত উদার নিরপেক্ষতা খৃষ্টানের মধ্যে না বলিলেই চলে, কিন্তু এইরূপ সঙ্কীর্ণ হৃদয় ধার্ম্মিকের বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষ যতই মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হয়, ততই তার প্রাণ থেকে নানারূপ ভেদ-জ্ঞান লোপ পাইয়া সাম্যের উদয় হয়। সমদর্শিতাই প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ।

রেডিফ্। জাঁহাপনা, বলিলে রুষ্ট হইবেন না, শুনিয়াছি দ্বিতীয় বার চিতোর আক্রমণ কালে আপনি যোদ্ধা ও ধার্ম্মিক এই উভয় চরিত্রেরই সঙ্কীর্ণতা দেখাইয়াছেন। হিন্দুর কীর্ত্তি কলাপ, বহুকালের গৌরব-

চিহ্ন স্বরূপ রম্য মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করিয়াছেন। এমন কি দেব দেবীর মন্দির ভাঙ্গিয়া কোরাণ পাঠের বেদিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

আকবর। এখন আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে। কূট রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া অনেক নৃশংস কার্য্য করিতে হইয়াছে। আবশ্যক হইলে আবার সেইরূপ করিতে পারি; কিন্তু যোদ্ধার জীবন একজন ধর্ম্ম যাজকের পক্ষে আদর্শ নহে। যাহা হউক, আপনার ভক্তিবিশ্বাসের নিন্দা করি না; প্রত্যেক ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিরই আপন ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা উচিত।

আবুলফজল। সংসারে এই শাস্ত্রের গোঁড়ামি হইতে যত অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে মনুষ্য জাতিকে পশুমাত্র মনে হয়। যে দিন মহম্মদ পৌত্তলিক আরবের বিরুদ্ধে যুক্তির অসি নিষ্কোষিত করিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে তাহাকে আত্মরক্ষার্থ তরবারি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সেই দিন হইতে নির্ম্মম আরব স্থির করিল যে, এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি লইয়া নবধর্ম্ম প্রচার করাই মহম্মদের আদেশ। তাহাদের বিশ্বাস হইল যে, তাহারা বেহেস্তা লম্বমান তরবারির ছায়ায় দেখিতে পাইবে। বদরের এল্ দেবতা আবার আল্লার স্থান অধিকার করিল। আর সেদিন হ'তে পৃথিবীতে নর-রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইল। শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাই অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস করিলে, অতি অল্পকাল মধ্যেই মনুষ্যচরিত্র অবনত হইয়া পড়ে।

আকবর।—সত্য কথা, প্রেমব্রত ও সত্যপ্রিয়তা ভিন্ন জগতে ধর্ম্ম বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। আত্মযুক্তি ও হিতাহিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্যপালনই প্রকৃত ধর্ম্ম।

আবুলফজল।—মূর্খেরা সত্য অপেক্ষা শাস্ত্রকেই সমধিক সম্মান করে, নতুবা কোরাণে পুরাণে প্রভেদ কি?

রেডিফ্।—বাইবেলই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য আপ্তবাক্য; কেননা, উহা

ভগবৎ প্রণীত। বিশেষ প্রভু যীশু খৃষ্টের পুণ্যকাহিনী উহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

আবুলফজল।—সাহেব, অবতার বাদের ন্যায় যুক্তিহীন কথা স্বীকার করিলে জগদীশ্বরের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। যিনি মনুষ্য-জ্ঞানাতীত, যাঁহার স্বরূপ কখনও জানিবার উপায় নাই, যিনি একমাত্র হৃদয়ের অনুভূতির বিষয় হইলেও হইতে পারেন, তাঁহাকে সামান্য পৌরাণিক দেবদেবীর ন্যায় শক্তিসম্পন্ন মনে হয়। তাঁহার অখণ্ড সত্যে খণ্ডত্ব আরোপ করা হয় এবং তৎসঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী নিত্য বিদ্যমান শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। অবতারবাদ মনুষ্য-কল্পনার ফল। অনন্ত নিয়ম-পরিচালিত প্রকৃতির কার্য্যে তাঁহার হস্তক্ষেপ আরোপণে কি ফল? তিনি ইচ্ছা করিলে অন্যরূপ বিশ্বসৃষ্টি করিতে পারিতেন, অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন ছিল না।

রোডিফ্।—মৌলবী সাহেবের কাছে আমি পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিলাম না। অবতারবাদ বিশ্বাসের ফল।

আবুলফজল।—ব্যক্তিগত বিশ্বাস লইয়া তর্ক সাজে না। খৃষ্টকে অবতার বলিলে, কৃষ্ণ বুদ্ধকেই বা বলিবেন না কেন?

রোডিফ্।—আমি যীশুখৃষ্টকে মনুষ্য মাত্র ভাবিতে পারি না।

আবুলফজল।—তিনি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, মনুষ্য মাত্র নহেন। অবতারাদি সামাজিক নিয়মের ফল, কৃষ্ণ হিন্দুর মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। চীনদেশে নহে; সর্ব্বত্র এইরূপ। আর খৃষ্ট বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাদের অবতার বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহাদের গৌরব লাঘব হয় মাত্র। কেননা, যে কার্য্য মনুষ্যসাধ্যাতীত, এবং যে চরিত্রের পুণ্যপবিত্রতা একমাত্র ঐশীশক্তি হইতে উৎপন্ন, তজ্জন্য তাঁহাদের কি গৌরব? অমন মহত্বপূর্ণ মানব কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের প্রকৃত আদর্শ হইতে পারে না; কিন্তু ইহা যদি ভাবা যায় যে, তাঁহারা মানব হইয়া চরিত্রগৌরবে

দেবতার উচ্চাসন গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের প্রতি আমাদের ভক্তি প্রীতি জন্মে। মানুষ তাঁহাদের পদচিহ্ন স্মরণ করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারে।

রেডিফ্।—আপনি জ্ঞানী, ইহা বোধ হয় জানেন যে, দার্শনিক যুক্তিতে জগৎনিয়ন্তাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি একমাত্র ভক্তি বিশ্বাসেই জ্ঞেয়।

আকবর।—যথার্থ কথা, ইহা আমিও স্বীকার করি। হিন্দুরা বলেন, আত্ম-দর্শন হইলেই তাঁহাকে দেখা যায়, কেননা তিনিই আমি তিনিই তুমি। আর জীবমাত্রই যখন তাঁহার অংশ তখন খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদকে ঈশ্বরের অবতার বলিলে কি দোষ?

আবুলফজল।—উত্তম কথা, তবে সকলেই অবতার, কেননা সকলেই ঈশ্বরের অংশ। সুতরাং খৃষ্ট বুদ্ধের কোন বিশেষত্ব নাই।

রেডিফ।—অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

আবুলফজল।—দেখিলাম, এ বিষয়ে একমাত্র হিন্দুই নিরপেক্ষ, সে কাহারও বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করে না। সকলের ধর্ম্ম তাহার ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মের দেবতা তাহার পূজ্য, এই খানে সকলের হৃদয়োপযোগী ধর্ম্মাদর্শ দৃষ্ট হয়। আর সকল শাস্ত্রের উল্লিখিত দুর্জ্ঞেয় পরমেশ্বরই তাহার হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি। তবে সব ধর্ম্ম সত্যের সঙ্গে বহুল মিথ্যা দৃষ্ট হয়; আত্মোন্নতি ও পরহিতব্রতই মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম, যাবতীয় ধর্ম্ম উহার সোপান মাত্র। ধর্ম্ম মনুষ্যত্বের সোপান কিন্তু লক্ষ্য নয়।

রেডিফ্।—হিন্দুর হৃদয় বড় কোমল, তাই তার ধর্ম্মসাহিত্যে এত সম্প্রসারণী শক্তি দৃষ্ট হয়।

আবুলফজল।—সত্য কথা, হিন্দু রণোন্মদ জাতি হইলে, তাহার ভাগ্যাকাশে অন্যরূপ নক্ষত্রের উদয় হইত।

আকবর।—কিন্তু স্মৃতির কৃত্রিম বন্ধন, জাতিভেদপ্রথা মানব সহৃদয়তা ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

রেডিক্।—বর্ত্তাববাত, কঠোর অবরোধ-প্রথা প্রভৃতি ঘৃণিত রীতি আপনাদের মধ্যেও দেখিলাম।

আবুলফজল।—সব সমাজেই কুসংস্কার আছে; যাক সে কথা, তবে হিন্দুর হইয়া এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যায়। স্মৃতি যে অনেক স্থলেই সমাজের অমঙ্গলকর ও জাতীয় শক্তি উত্থানের প্রতিবন্ধক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কেন না বাঁধাবাঁধির মধ্যে কোন জিনিষের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। অনেক সময় সামাজিক দোষ দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে বহু স্বাস্থ্যকর গুণের ধ্বংস করিয়া সমাজকে নির্জীব ও দুর্ব্বল করিয়া দেওয়া হয়। মানুষ অতি সহজেই কলের পুত্তলীর মত পরাধীন ও নিয়মের দাস হইয়া পড়ে। তবে যে জাতির রাজদণ্ড নাই, তাহার প্রবল বিজেতার আক্রমণ হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে স্মৃতির ন্যায় অনেক কৃত্রিম বন্ধন আবশ্যক।

আকবর।—কিন্তু জাতিভেদ ঘৃণ্য।

আবুলফজল। উহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু জাতিভেদ সমর্থন করিয়া যে কিছু না বলা যায় এমন নহে, কিন্তু যাহা আমার মতবিরুদ্ধ তাহা সমর্থন করিতে গিয়া আত্মপ্রতারণা করিতে চাই না। মানুষে মানুষে পার্থক্য গুণগতই হওয়া উচিত—আর পূর্ব্বে ভারতে তাহাই ছিল—কিন্তু বংশগত বা অর্থগত হওয়া উচিত নয়। সকল জাতির মধ্যেই একরূপ জাতিভেদ দেখা যায়, তবে হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠবর্ণে প্রবেশ-দ্বার নাই, কেবলমাত্র নিষ্ক্রমণের পথ আছে। পূর্ব্বে দুইই ছিল। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, শারিরিক গঠন ফলে মানুষ মানুষে চিরদিনই পার্থক্য থাকিবে। সৃষ্টিই কঠোর সাম্যবাদের অনোপযোগী, জলবায়ুর গুণে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির পার্থক্য

থাকিয়া যাইবে। তবে একটা জাতিকে আবার টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সমাজ দুর্ব্বল হয়।

রেডিফ্। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রথায় সমাজে অসন্তোষের চিহ্ন বড়ই অল্প দেখা যায়।

আবুল ফজল। যে যার নিজের সীমার মধ্যেই সন্তুষ্ট, সে বহুকালের প্রচলিত প্রথা পৈতৃক সম্পত্তির মত বিনা প্রশ্নেই গ্রহণ করে। তার মনে সহজে সন্দেহ উপস্থিত হয় না, সমাজে অবমানিত না হইলে এ বিষয়ে সে বিদ্রোহী হয় না। আর মহম্মদ, বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রেমমন্ত্রে সাম্যের যে গগনপ্লাবী তুর্য্যধ্বনি তুলিয়াছেন, সেই সাম্য মনুষ্যহৃদয়ে যত, বহির্জগতে তত নহে। উহা প্রকৃত মৈত্র, সকলে সকলের সহোদর মাত্র।

আক্‌বর।—যাক্, এ কথা। সাহেব, ধর্ম্মপ্রচারের জন্যেই কি আপনাদের আগমন?

রেডিফ্।—উহা প্রভুর আদেশ সত্য, কিন্তু এক্ষণে বাণিজ্যই মুখ্য উদ্দেশ্য।

আক্‌বর।—আপনার মুখে ভারত আবিষ্কারের অপূর্ব্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছি যে, আপনারা সত্যই পরিশ্রমী ও সাহসী জাতি। দুঃসাধ্য সাধনই আপনাদের আনন্দ ও অধ্যবসায়ই আপনাদের উন্নতির মূল।

রেডিফ্।—জাঁহাপনা, চিরদিনই নিরপেক্ষ।

আক্‌বর।—এক্ষণে বলুন, ভারত সম্বন্ধে আপনাদের দেশে কিরূপ ধারণা।

রেডিফ্।—ইয়োরোপে ভারতের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি প্রবাদের ন্যায় খ্যাত। বহুকাল হইতে ভারতের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য ইয়োরোপের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। গ্রীক ও লাটীন সাহিত্যে ভারত সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য বিবরণ দেখা যায়। * লোকের

* পাঠক আবশ্যক হইলে ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল্‌ (Mccrindles 'Ancient India as described by Classical authors') দেখুন।

ধারণা, ভারত সুবর্ণময়, দীন দরিদ্রের ঘরেও হীরা মুক্তা ছড়াছড়ি যায়।

আকবর।—সত্যই ভারতবক্ষে কল্পবৃক্ষ রোপিত আছে। জানি না, আপনাদের বাণিজ্য-পিপাসা কোথায় পর্য্যবসিত হইবে।

রেডিফ্।—আপনি হিন্দুস্থানের বিজেতা মাত্র।

আকবর।—আমি বিজেতা হইলেও হিন্দুস্থান আমার জন্মভূমি। মুসলমান বিধর্ম্মী হইলেও একণে বিদেশী নহে, সে আপন মাতৃভূমি লুণ্ঠন করিবে না। সে আজ হিন্দুর সুখ-দুঃখের একসূত্রে আবদ্ধ। হিন্দুস্থানের সুখদুঃখ মোস্লেমেরও কর্ত্তব্য।

রেডিফ্।—আপনি প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ, কিন্তু আপনার আশঙ্কা অমূলক। আমরা বণিক্ মাত্র।

আকবর।—দুর্ব্বল পথিকের ধনরত্ন যেমন তার মৃত্যুর কারণ হয়, ভারত-ভাগ্যেও বুঝি তাই ঘটে। জানি না, এই মোগল রাজ্যের পরিণতি কোথায়? ভারতের রত্নাগারে জগতের লুব্ধ দৃষ্টি।

আবুলফজল। উদয় অস্ত প্রকৃতির নিয়ম।

শ্রীমাখনলাল সেন বি,এ,।

ঢাকার জাতি-তত্ত্ব।*

বিভিন্ন জাতীয় লোকের সংখ্যা।

এ জেলায় বহু জাতীয় লোকের বাস। কোন্ জাতীয় লোকের সংখ্যা কত তাহাই এ প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে।

বাঙ্গালার হিন্দুদিগকে বিগত সেন্সাস রিপোর্টে সাত পর্য্যায়ে বিভক্ত

শ্রেণী বিভাগ।

করা হইয়াছে। যথা,—১ম—ব্রাহ্মণ, ২য়—ক্ষত্রিয়, রাজপুত, বৈদ্য ও কায়স্থ। ৩য়—শূদ্র ও নবশাখ;

* ঢাকার বিবরণ মুদ্রিত হইতেছে

৪র্থ—চাষি কৈবর্ত্ত ও গোয়ালা, ৫ম—জল অনাচরণীয়; ৬ষ্ঠ—নীচ জাতি কেন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণ করেনা। ৭ম—অতি নীচ।

ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সর্ব্ববাদী সম্মত। ব্রাহ্মণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক। যাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের পৌরোহিত্য করেন, তাঁহারা বর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদিগের স্থান উল্লিখিত বিভাগের চতুর্থ পর্য্যায়ের নীচে। হালুয়া দাসের ব্রাহ্মণের অন্ন হালুয়া দাসও গ্রহণ করে না। অগ্রদানী, লগ্নাচার্য্য ও ভাটদিগের স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চে। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ কেবল ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণীর কার্য্য করিয়া থাকেন। লগ্নাচার্য্য প্রায় অনেক নীচ জাতির কার্য্যই করিয়া থাকেন। ভাট জল আচরণীয়।

কৌলীন্য প্রথা।

এ জেলায় বহু কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। শ্রীনগর ও মুন্সিগঞ্জ থানায় কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। রাজা বল্লাল সেন, এই কৌলীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা।

প্রাচীন বিবরণ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষা দীক্ষা ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হইয়া যায়। মহারাজ আদিশূর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংস্কার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন; ইঁহাদের নাম সুধানিধি (কাশ্যপ) মেধাতিথি (ভরদ্বাজ) বীতরাগ (বাৎস্য) সৌভরি (সাবর্ণ) ও ক্ষতীশ (শাণ্ডিল্য)।

আদিশূরের পর বল্লালসেন এই ব্রাহ্মণদিগের বংশধরদিগকে তাঁহাদিগের বাসস্থানের নামানুসারে দুইভাগে বিভক্ত করেন। গঙ্গার দক্ষিণতীরে যাঁহারা বাসস্থান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ী ও গঙ্গার উত্তর তীরে যাঁহারা আবাস স্থান গ্রহণ করেন, তাঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন। বল্লাল সেন কেবল এই রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই শ্রেণী করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের ৫৯ ঘরের

মধ্যে ২২ ঘরকে কৌলীন্য খ্যাতি প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট ১৭ ঘরকে শ্রোত্রিয় আখ্যা প্রদান করেন। বারেন্দ্রদিগেরও ১৭ ঘরের মধ্যে ৯ ঘরেকে কুলীন এবং ৮ ঘরকে শ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত করিলেন। ঢাকা জেলার কুলীন ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বাঙ্গালার প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা যাঁহারা বল্লালের এই বিভাগ স্বীকার করিলেন না, তাঁহাদিগকে বল্লাল বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত করিলেন। ঢাকা জেলায় বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লক্ষ্মণসেন এই ব্রাহ্মণ সমাজের পুনঃ সংস্কার করেন। তিনি কুলীনদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কুলীনকুলকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। যাঁহারা তৎকালে অনুষ্ঠানাদি রক্ষা করিয়া স্বধর্ম্মে নিরত ছিলেন, তাঁহাদিগকে "মুখ্য কুলীন" ও যাঁহারা কোন কোন বিষয় আচার ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে গৌণ কুলীন এবং অবশিষ্টদিগকে বংশজ বলিয়া আখ্যাত করেন।

ইহার পর দেবীবর ঘটক কুলীনদিগের মেল সৃষ্টি করিলেন। এই মেল সৃষ্টিতে কুলীনদিগের বিবাহ ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া গেল। কোন কুলীন মেল ছাড়িয়া সম্বন্ধ করিতে পারিতেন না। কেবল তাহাই নহে, নিজ মেলের ও যাহার তাহার সহিত সম্বন্ধ করিলে বংশ গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিত না। এইরূপে ঘরের সৃষ্টি হয়। কুলীনের বিবাহ স্বঘরে হওয়া চাই। শুধু তাহাও নহে, যে ঘরের কন্যার যে ঘরের পাত্রের সহিত বিবাহ হইবে, তাহাদের উভয়ের বংশ-পর্য্যায় গণনায় এক হওয়া চাই।

বহু বিবাহ।

এইরূপে কুলীনের আদান প্রদানের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া যাওয়ায় কুলীন সমাজে বহু-বিবাহ-প্রথা প্রচলন আবশ্যক হইয়া পড়িল। উপায় নাই—কেননা পুরুষের বিবাহ না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত কন্যার বিবাহ না হইলে সমাজ কলুষিত হয়—বালিকাদিগকে আজীবন কুমারী অবস্থায়

থাকিতে হয়। সুতরাং সমাজে বহু বিবাহ চলিতে লাগিল, ক্রমে তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দশ বৎসরের বালক পঁয়ত্রিশ বৎসরের কুমারীকে এবং ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ ১২০ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিতে লাগিলেন কারণ অন্যত্র পর্য্যায় মিলিতেছে না। ক্রমে বহু বিবাহ জঘন্য ব্যবসায় পরিণত হইয়া গেল। কুলীন জামাতা অর্থ পাইয়া এক রাত্রে এক স্থানে বসিয়া বিভিন্ন পরিবারে ২০।২৫টী বালিকা, কুমারী ও বৃদ্ধার পাণি পীড়ন করিয়া উপায় হীন কন্যাদাতাগণের দায় ও কুল উদ্ধার করিতে লাগিলেন, এবং পর দিন প্রত্যূষে উঠিয়া সেই ধর্ম্মপত্নী (?) দিগকে তাহাদিগের পূর্ব্ব প্রতিপালকের হস্তে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। খাতায় পণের টাকা জমার সহিত বিবাহেরও বিবরণ লিখিত রহিল মাত্র। এইরূপ কুৎসিৎ আচার সত্ত্বেও অনেক কুলীন ঘরের মেয়েরা চির জীবন কুমারী অবস্থায় থাকিতে লাগিলেন। অনেক কুল রক্ষা করিতেন।

কুলীন শ্রোত্রিয়ের মেয়ে বিবাহ করিতে পারেন, তাহাতে কুলীনের কুল-ভঙ্গ হয় না। কুলীন বংশজের কন্যা গ্রহণ করিলে "ভঙ্গ-কুলীন" নামে আখ্যাত হন। ভঙ্গ কুলীনের মেয়ে বিবাহ করিলেও নৈকষ্য কুলীন "ভঙ্গ" হন। ভঙ্গ-কুলীন সাত পুরুষে বংশজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তখন পূর্ব্বের কুলীন "বাড়ুয্যা," "বাড়রী" "মুখুজ্যা" "মুখুটী" "চাটুজ্যা" 'চাটাতি" (চক্রবর্ত্তীতে) পরিণত হন।

এই কৌলীন্য প্রথার প্রাদুর্ভাব এক সময় অত্যন্ত প্রবল ছিল। তখন কুলীন পাত্র বিরল ছিল বটে, কিন্তু পাত্র জুটিলে বিশেষ টাকা পয়সার দরকার হইত না। বিগত শতাব্দীর মধ্য ভাগেও কুলীন কন্যা কুলীন পাত্রে পাত্রস্থ করিতে ৭৲, ১৫৲, ২১৲, ৩১৲, ৪১৲, ৫১৲ এইরূপ পণ দিতে হইত। জামাতার উপযুক্ততার নিদর্শনের কোন প্রয়োজন হইত না। বয়স ও বিবাহের সংখ্যা অনুসারে পণের টাকার হ্রাস বৃদ্ধি হইত।

অনেক স্থলে এক ঝাড় বাঁশ লইয়াও অনেক সদাশয় কুলীন জামাতা নিরুপায় স্বধর্ম্মীকে শ্বশুর পদে বরণ করিয়াছেন। *

সমাজ সংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

কুলীনদিগের এই বহু বিবাহ নিবারণ জন্য বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনিও বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। ১২৮২ সনে ইনি পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। ইহাই কুলীন সমাজে বিপর্য্যয় বিবাহ। বড়লাট লর্ড নর্থ ব্রুক ঢাকা আসিলে রাসবিহারী এই বিষয়ে তাঁহার সমীপে এক আবেদন পত্র উপস্থিত করেন। বড়লাট হিন্দুর সামাজিকতায় হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন না; রাসবিহারী ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। ১২৮৪ সনে তিনি পুনরায় ভিন্ন মেলে নিজ পুত্র কন্যার সম্বন্ধ করিলেন। ইহার পর তাঁহার যত্নে অনেক নৈকষ্য কুলীন মেলভঙ্গ করিলেন; সমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। রাসবিহারীর চেষ্টায় এখন কুলীনদিগের মধ্যে বহু-বিবাহ-প্রথা প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

অর্দ্ধকালী বংশ।

এই জেলার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মিতরার অর্দ্ধকালী বংশ শ্রেষ্ঠ। ময়মনসিংহ জেলার পণ্ডিতবাড়ী গ্রামে দ্বিজদেবের ঔরসে নিতম্বিনী দেবীর গর্ভে জয়দুর্গা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জয়দুর্গা মিতরানিবাসী রাঘবরামের সহিত বিবাহিতা হন। কথিত আছে, এই জয়দুর্গা দেবী অর্দ্ধকালীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতবাড়ীর দ্বিজদেববংশ মিতরার ভট্টাচার্য্যদিগের কুলগুরু। রাঘব গুরুর অনুরোধে গুরুকন্যাকেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

* জনৈক শ্রদ্ধা ভাজন সতীর্থ বলিয়াছেন যে, তাঁহার মাতামহ মহাশয় এরূপ স্বল্প সাজেই অনেক দারিদ্রের কুলরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস শ্রীনগর থানার অধীন।

সতরার ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ীতে পূজায় চণ্ডীপাঠ হয় না এবং পশ্চিমদ্বারী মণ্ডপে দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই বংশ রাঘবরাম হইতে ১১ পুরুষে পদার্পণ করিয়াছে।

বিক্রমপুর পরগণায় কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথা প্রচলিত আছে। এই কৌলিন্যপ্রথাও বল্লালসেন-প্রতিষ্ঠিত। বিক্রমপুরের কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, এই চারি ঘর শ্রেষ্ঠ কুলীন। বিবাহের পাত্রের মূল্য এখন আর কৌলীন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপর নির্ভর করে।

কায়স্থ।

বৈদ্যের সংখ্যা ঢাকা জেলায় অনেক। বাখরগঞ্জ ব্যতীত ঢাকার ন্যায় বাঙ্গালায় আর কোথাও এত বৈদ্য নাই। বৈদ্যদিগের পাঁচ সমাজ। যথা,—১ম—রাঢ়ী, ২য়—পঞ্চকোটী, ৩য় বারেন্দ্র, ৪র্থ—পূর্ব্ব উপকূলী ও ৫ম—শ্রীকলী। মুন্সীগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যগণ বারেন্দ্র সমাজের, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার উত্তর ভাগের বৈদ্যগণ পূর্ব্ব উপকূলী সমাজের বৈদ্য। বৈদ্যদিগের মধ্যেও কৌলীন্য আছে। যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহারা কুলীন বৈদ্য, ২য় মধ্য বা সিদ্ধ বৈদ্য ৩য় সাধ্য বৈদ্য, ৪র্থ কষ্ট সাধ্য বৈদ্য। সম্বন্ধ গৌরবে এই শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। মহেশ্বরদি ও ভাওয়াল পরগণায় কোন কোন স্থানে বৈদ্যকায়স্থ সম্বন্ধ আছে। ঢাকার অন্যান্য স্থানে বৈদ্যকায়স্থে সম্বন্ধ নাই। বৈদ্য সমাজ সর্ব্বত্র উন্নতিশীল। এই সমাজের ৯ অংশ পুরুষ এবং ৭ অংশ স্ত্রীলোক লেখা পড়া জানে এবং মোটের উপর ৭ অংশ লোক ইংরেজী জানে। বৈদ্যগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পুনরায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেছেন। রাজা রাজবল্লভ সেনের চেষ্টায় বৈদ্য সমাজ এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বৈদ্য।

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নবশাখ। বারুই, কামার, কুমার, মালাকার, ময়রা (মোদক), নাপিত, সদ্গোপ, তাঁতি ও তিলি (তেলি) এই নয়

ঘরই প্রকৃত নবশাখের অন্তর্গত। এই নবশাখ ব্যতীত গন্ধবণিক্, কালিতা, কাঁশারী, কান্দা, কুড়ী, মধুনাপিত, পাটীয়াল, রাজু, শাঁখারী, শূদ্র এবং তামলীও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর মধ্যে সদরের তাঁতি সমাজ উন্নত। ইহাঁরা দুই সমাজে বিভক্ত—ঝপানিয়া ও ছোট বাগিয়া। এই সমাজে খাওয়া বসা সম্বন্ধ চলে না। এক সময়ে ইহাদের নাম ঢাকাই মস্‌লিনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। ঢাকার তাঁতিগণ বসাক উপাধিতে পরিচিত। ইহারা নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত। ইঁহাদের অনেকে গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়া থাকেন

নবশাখ।

১৯০১ সনে এই জেলার চণ্ডালগণ 'নমঃ' পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র আখ্যার আব্দার করিয়াছিল। আব্দার রক্ষিত হয় নাই। চণ্ডালদিগের মধ্যে একশ্রেণী সূত্রধরের কার্য্য করে, তাহারা বারই চণ্ডাল বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। জেলার উত্তরাংশে রাজবংশী ও কোচদিগের বাস। ইহারা সম্ভবতঃ এতৎপ্রদেশের আদিম অধিবাসী। ঢাকা কালেক্টর (১৮৭১) লিখিয়াছেন, ইহাদের ৪১৫ পুরুষ হইল এজেলায় আসিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা রাজা দরং ও দগুর বংশধর, দুর্ভিক্ষ ইহাদিগকে দেশ বিদেশে বিতাড়িত করিয়াছে। কোচেরা উন্নত হইলে রাজবংশী নামে অভিহিত হয়। এ জেলার কোচেরা রাজবংশী শ্রেণীর অন্তর্গত। গারোয়ার নামক একজাতীয় লোক ঢাকা জেলায় বাস করিত ও কুম্ভীর শিকার করিত, বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না। ঢাকায় সূর্য্যবংশী আছে। ময়মনসিংহ ব্যতীত এই জাতি অন্য কোথাও নাই। সেন্সাস্ ডেপুটী কালেক্টর ইহাদিগকে কোচ শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করেন। ১৮৭১ সন হইতে সূর্য্যবংশীরা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছে।

চামার, ডোম, গার, হাড়ী, মালী, মুচি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতি ৭ম শ্রেণীভুক্ত। গারোদিগের বাস ভাওয়ালের জঙ্গলে। ইহারা প্রায় সর্ব্ব ভুক। ডোমেরা শূকর প্রতিপালন করিয়া থাকে।

নিকৃষ্ট জাতি।

কিচক ঢাকা ব্যতীত আর কোথাও নাই। ইহারা ঢাকায় ঝাড়ু বরদাদের কার্য্য করিয়া থাকে। কথিত আছে, ইহারা ডাকাইতের বংশধর। ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ডাকাতি করিয়া রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬০।৭০ বৎসর হইল নির্ব্বাসিত হয়। * ইহাদের জল কোন জাতি গ্রহণ করে না। শশক-শিকারে ইহারা অত্যন্ত পটু।

কিচক।

হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমানদিগের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে। এই ভেদ মূলে মুসলমান সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—(১) অসরক (সম্ভ্রান্তশ্রেণী) (২) আজলক (নিম্ন শ্রেণী) এবং (৩) আবজল (নিকৃষ্ট শ্রেণী)। প্রথম শ্রেণীতে যথাক্রমে সৈয়দ, সেখ, পাঠান, মোগল, মল্লিক ও মির্জ্জা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে (ক) শাখায় চাষী লোক। (খ) শাখায় দর্জ্জি, জুলা, ফকির। (গ) শাখায় দাই ধুনিয়া, কসাই, কুলু, মাহি করস, মাল্লা, নিকারি ইত্যাদি। (ঘ) শাখায় বাদিয়া, ধুবী, হাজাম, মুচি, নাগাচ্চি, নট প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণীতে—বাদিয়া, কসবি, লালবেগী, মেথর আবদাল প্রভৃতি।

মুসলমান শ্রেণী-বিভাগ।

তৃতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট মুসলমানেরা মসজিদে উঠিতে পারে না। সাধারণের কবরখানায়ও তাহাদের মৃত দেহের স্থান নাই। ইহাদের সংস্পর্শ নিষিদ্ধ।

প্রকৃত সৈয়দ যাঁহারা তাঁহারা খলিফা আলির বংশধর। তাঁহারা সিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। এই জেলায় প্রকৃত সৈয়দ আছে কিনা সন্দেহ। অনেক সৈয়দ সম্প্রদায়ের লোক সিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া সৈয়দ উপাধি গ্রহণ করেন। এইরূপ সৈয়দ এ জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু

সৈয়দ, সেখ, পাঠান, মোগল, মল্লিক ও মির্জ্জা।

* গাইট সাহেব ১৯০১ সনে লিখিয়াছেন "৬০ বৎসর হইল ইহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিল।

মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আপনাকে সৈয়দ বলিয়া পরিচয় দেন। আকবর শাহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারীদিগের সম্মান করিয়া সৈয়দ উপাধি প্রদান করিতেন। সেখ অতি উচ্চ-বংশীয়। কিন্তু এতৎ প্রদেশে "সেখ" উপাধির কোন বিশেষত্ব নাই। সাধারণ মুসলমানেরাই সেখ বলিয়া পরিচিত। পাঠান এ জেলায় অনেক। ধামরাইর অন্তর্গত পাঠানতলিতে সম্ভ্রান্ত পাঠানেরা বাস করিতেন। এখন জেলার সর্ব্বত্রই পাঠান আছেন। যাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা আফগানিস্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই আফগান বা পাঠান-বংশীয়। এই জেলার উত্তরে অনেক সম্ভ্রান্ত মোগল বংশধরগণ বাস করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম। মল্লিক ও মির্জ্জা এ জেলায় অতি অল্প। অনেক জুলা মল্লিক বলিয়া পরিচিত। সুতরাং বর্ত্তমান সময় এই সকল সম্ভ্রান্ত উপাধি দ্বারা প্রকৃত বংশ-মর্য্যাদা অবগত হওয়া যায় না। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা নিম্নশ্রেণীর সহিত সম্বন্ধ করেন না।

অন্যান্য জাতি।

এ জেলার বহু জুলা কসাইর ব্যবসায় করিয়া থাকে। যাহারা নাপিতের কাজ করে তাহারা হাজম বলিয়া পরিচিত। বেলদারেরা মাটী কাটে ও বেহারা পাল্কী বহন করে। উভয়ই চণ্ডাল হইতে মুসলমান হইয়াছে। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ কাজি ছিলেন তাহারা কাজি বলিয়া পরিচিত; দফাদার ও নলুয়া পাটী বুনিয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আহার বিহার নিষিদ্ধ। যাহাদের স্ত্রীলোকেরা ধাত্রীর কার্য্য করে, তাহারাই দাই বলিয়া পরিচিত। বাদিয়ারা জেলার সাময়িক অধিবাসী। ইহারা জলাভূমি হইতে ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন বাদিয়া বাঘ মারিয়া থাকে, তাহাদিগকে "বাঘমারিয়া" বলে। কেহ কেহ ইন্দুরের গর্ত্ত হইতে ধান তুলিয়া থাকে তাহাদিগকে "বিন্দা" বলে।

নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা সামাজিক ভাবে আপনাদের অপরাধের

বিচার ও দণ্ড করিয়া থাকে। এই সামাজিক বিচার-প্রথাকে "পঞ্চায়েতি" বলে। ঢাকা সদরের প্রত্যেক মহল্লায় এইরূপ "পঞ্চায়েতি" প্রতিষ্ঠিত আছে।

পঞ্চাইতি।

ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে পর্ত্তুগীজদিগের সংখ্যা এ জেলায় অধিক। ইহারা এ জেলার প্রাচীন উপনিবেশী। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে জন ডি সিলভেরিয়া চারি খানি জলযানসহ মলয় দ্বীপ হইতে বাঙ্গালা অভিমুখে আগমন করেন। ঢাকা তখন বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল। তিনি দলবলসহ চট্টগ্রামে অবতরণ করেন ও জল-দস্যুর ব্যবসা অবলম্বন করেন। ক্রমে দেশীয়দিগের সহবাসে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইহাদের এক দলকে বন্দুকচিরূপে নিযুক্ত করেন। তখন বহু পর্ত্তুগীজ আরাকান রাজের অধীনে গোলন্দাজের কার্য্য করিত। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁর সময় ইহারা আরাকান রাজের কার্য্য হইতে বিতাড়িত হইলে, তিনি ইহাদের বহু সংখ্যককে ঢাকায় আনিয়া বাসস্থান প্রদান করেন। * ইহাদের বংশধরেরা এখন ঢাকা জেলার অধিবাসী। ইহারা এখন দেশী ফিরিঙ্গী নামে অভিহিত। ঢাকা, তেজগাঁও, বলধুরা, হুসেনাবাদ, সুয়ালপুর, তুমিলিয়া, নাগারি প্রভৃতি স্থানে ইহারা বাস করে। ইহাদের অধিকাংশ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। স্ত্রীলোকেরা আয়ার ও ধাত্রীর কার্য্য করে। ইহাদের বিলাতী নামগুলি এখন দেশীনামে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যথা—ডেমিঙ্গো কোষ্টা (Domingo Costa) = ডেঙ্গুকাণ্ড; মেনুয়েল ডিক্রোজ (Menuel-de-Croz) = মনু; হেরি ফ্রেজার (Herry Fraser) = হরিপ্রসন্ন ইত্যাদি।

ঢাকার উত্তর লালকুঠি নামক স্থানে মণিপুরের রাজভ্রাতা দেবেন্দ্র

* নবাব জাফর খাঁর সময় ৯২৩ জন ফিরিঙ্গি নবাবের বন্দুকচিরূপে নিযুক্ত ছিল।

সিংহ (১) সপরিবারে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "নজরবন্দী" অবস্থায় রক্ষিত ছিলেন। ইহাঁদের সঙ্গে আরও কতিপয় মণিপুরী স্বেচ্ছায় আসিয়া ঢাকায় বাস করিতে থাকে। ইহারা ভাওয়ালের রাজার অধীন তেজপুর গ্রামে স্থান লইয়া কৃষিকার্য্যে মনোযোগ প্রদান করে এবং ক্রমে এ জেলার অধিবাসী রূপে গণ্য হইয়া যায়। ইহার পর কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার আরও ২১ জন মণিপুরীকে অভিযুক্ত করিয়া ঢাকায় প্রেরণ করেন। (২) তাহারা গবর্ণমেণ্টের খোরাক পোষাকে প্রতিপালিত হইতে থাকে। এই সকল মণিপুরীদিগের বংশধরগণ এখন ঢাকার অধিবাসী। ইহাদের সংখ্যা ১৫০ এর অধিক নহে। আদম সুমারিতে ইহাদের ভাষা মণিপুরী লিখা হইয়াছে এবং জাতি স্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় এ জেলায় মণিপুর ও তেজপুর নামক স্থানদ্বয়ে মণিপুরীরা বাস করিতেছে। ইহাদের কেহ কেহ "পোলো" খেলায় খুব সুদক্ষ।

মণিপুরী।

এই সময় জয়ন্তীয়ার রাজাও ঢাকায় আবদ্ধ ছিলেন। ১৮৬২ সনে জয়ন্তীয়ার আবদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার ওয়ারিশ ঢাকা আসিয়া পেন্সন পাইতেছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ স্থানের কোন লোক এ জেলায় নাই।

(১) ১৮৫০ সনে রাজা নরসিংহের মৃত্যু হইলে কীর্ত্তিচন্দ্র মণিপুরের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। রাজা নরসিংহের ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ রাজ্য-বহিষ্কৃত হইয়া বারংবার মণিপুর আক্রমণ করেন ও ভীষণ হত্যাক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করেন। রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইলে দেবেন্দ্র সিংহ ধৃত হন।(১৮৫১—৫৮)ও প্রথমে নদীয়া, তৎপর মুর্শিদাবাদ ও তৎপর ঢাকায় আনীত হন। দেবেন্দ্র সিংহ ও পরিবার ভুক্ত ৪ জনে ১২৲ টাকা হইতে ৯০৲ টাকা মাসে পেন্সন পাইতেন। অন্যান্যেরা পুরুষ ।০ ও স্ত্রীলোক ৵০ আনা হিসাবে দৈনিক খোরাকী পাইতেন।

(২) Report & Statistics of Cachar.

ভাওয়ালে টীপরা আছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ভাওয়ালের জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য ভাওয়ালের রাজা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হইতে প্রায় শতাধিক লোক আনয়ন করিয়া বাসস্থান প্রদান করেন। ইহাদের বংশধরগণই এখন এ জেলার স্থায়ী অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইয়া গিয়াছে।

টীপরা।

ঢাকায় এখন কোন ইউরোপীয় জাতির স্থায়ী বাসস্থান নাই। ফরাসীরা ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী ও ইংরেজের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইংরেজ ঢাকার ফরাসীকুঠী অধিকার করিয়াছিলেন, এবং পুনরায় তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে ফরাসীগবর্ণমেণ্ট ১৮৩০ সনে তাঁহাদের স্বত্ব বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন।*

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার এম, আর, এ, এস্।

* ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এখনও ঢাকাতে তাঁহাদের স্থায়ী রাজকীয় অধিকার দাবী করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমানে ঢাকায় তাহাদের কোন রাজকীয় স্বত্ব নাই। ঢাকায় বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিয়া তাঁহারা যে স্বত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর ইংরেজ সন্ধিসূত্রে তাহাদিগকে সেই স্থান পুনরায় ফিরাইয়া দেন। পরিশেষে ১৮৩০ সনে ফরাসীগবর্ণমেণ্ট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ঐ বিক্রয়ের পরে ঐ স্থান বর্ত্তমান নবাবপ্রাসাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া ফরাসীচিহ্ন লোপ করিয়া ফেলিয়াছে।

কেদার রায়

প্রথম সর্গ

উপক্রমণিকা।

কবি-কুল-প্রমোদিনী, কল্পনা সুন্দরি !
বঙ্গের দুর্দ্দশা আর না পারি সহিতে
হৃদয় দুর্ব্বল ক্রমে নয়ন আঁধার।
শ্রবণ বিকল শুনি গভীর চীৎকার
বুক ভাঙ্গা আর্ত্তনাদ তপ্ত অশ্রুধার
শুনিতে দেখিতে আর চাহেনা পরাণ।
চায় শুধু তোর কোলে উঠি ধীরে ধীরে
ভুলে গিয়ে বর্ত্তমান যুগের অস্তিত্ব
ভুলি গিয়ে ভবিষ্যৎ বঙ্গের প্রাক্তন
চলে যাই অতীতের সেই পুণ্য যুগে।
যে যুগে মায়ের পুত্র বীরেন্দ্র কেশরী
বিক্রমপুরের রাজা ত্রিপুর নিবাসী
সুধীর কেদার জনমিয়ে বঙ্গদেশে
জনম ভূমির তরে সারাটী জীবন
যাপিয়ে দেখায়ে কত অদ্ভুত বীরত্ব
রাখিতে মায়ের মান হাসিতে হাসিতে
দেশের কল্যাণ হেতু আপন পরাণ
দল বলিদান, চল যাই সেই যুগে,
য যুগে দুখিনী বঙ্গ জননী আমার
ীর মাতা বলে খ্যাতা হইয়ে ভুবনে,
হাসিত খেলিত সদা মনের উল্লাসে
ডুবিত ভাসিত শুধু আনন্দ পাথারে
গাহিত মনের সুখে বেহাগ পঞ্চম,
চল যাই সেই যুগে। যে যুগে কল্পনে !
বঙ্গের সন্তানগণ দুঃখের পসরা
লইয়ে মাথায় সদা ভুলিয়ে জননী
কাঁদিত না হায় ! এই অভাগার মত,
চিনিত মায়েরে তার, চিনিত কেদারে,
কেদার কেদার সম তাহাদের প্রাণে।
জাগিত সতত চল যাই সেই যুগে !
কল্পনে ! জানিনা তোর স্তুতি আরাধনা
জানিনা কেমনে পাব তোমার করুণা,
কবি নহি কিন্তু হায় ! বাসনা সতত
উড়ে যাই একবার তোমার সহায়ে
উড়ে যথা বিহঙ্গম পক্ষ ভর দিয়া
অনন্ত বিমান মার্গে, উড়ে যাই সেই
অতীতের স্বর্ণপুরে, বর্ত্তমানে যথা
শ্মশানের শোভা সব ধরি বক্ষঃস্থলে
আপন মহিমা কাল করিছে প্রচার
জাগিছে কল্পনে হায় ! পরাণে আমার

আকুল পিয়াসা এক, মিটিবে কি তাহা ?
কর যদি দয়া এই অধম সন্তানে
চল যাই দুই জনে সেই পুণ্যদেশে
যথায় বঙ্গের রবি সুধীর কেদার
জনমিয়ে, বাল্যলীলা করিয়ে কৌতুকে
কৈশোর যৌবন কাল মাতৃপদ সেবি
বার্দ্ধক্যের জরাগ্রস্ত না হইতে হায় !
রাখিয়ে অতুল কীর্ত্তি ভুবন ভিতর,
স্বরগের দেব সম লুকাল স্বরগে,
চল যাই সেই ভূমে, যাহার পশ্চিমে
উত্তাল তরঙ্গ তুলি পদ্ম বেগবতী
যুগযুগান্তর হতে আছে প্রবাহিতা
পূরবে উত্তরে যার গরবে সতত
চলিছে ধবলেশ্বরী, কুলকুল নাদে,
কাল জলে ঢেউ তুলে দক্ষিণে যাহার
মেঘনা করিছে খেলা আরিয়ল সহ,
চল যাই সেই পুণ্য ভূমে, বেশী নয়
তিনটী শতাব্দী মাত্র হইয়াছে গত
গেয়েছিল একদিন সেই মেঘনদে
আনন্দ সঙ্গীত কত মনের উল্লাসে
স্বাধীন হেরিয়ে সব বঙ্গালীর দল।
বেশীদিন নয় তিনটী শতাব্দী পূর্ব্বে
এই মেঘনদ। তুলে তার কাল জলে
গভীর উচ্ছ্বাস মোগলের রক্ত স্রোতে
রঞ্জিয়া আপনি গেয়ে ছিল কত গান।
চল যাই দুই জনে সেই পুণ্য ভূমে।
স্বপন সম্ভূত কথা ভাবিয়ে পাঠক !
হাসিওনা কভু, ইহা বাতুলের
বিকৃত প্রলাপ, সত্যই পাঠক হায়,
এই বঙ্গ ভূমে ভীরু কাপুরুষ প্রায়
চিরদিন ছিলনা গো বাঙ্গালীর দল।
অসির ঝঙ্কার আর কামান নিনাদে
সমর বাদ্যের ঘোর প্রবল নির্ঘোষে
কাঁপিত না সেই যুগে বাঙ্গালীর হৃদি
কাপুরুষ সম চাহিতনা পলাইতে
প্রেয়সীর সুশীতল অঞ্চল ছায়ায়,
জনম ভূমির তরে পরাণ আহুতি
তুচ্ছকার্য্য এক দিন ছিল বাঙ্গালীর,
সেই পুণ্য যুগে ছিলনা বাঙ্গালী এত
হীন কাপুরুষ, ছিলনা তাহারা এত
অধম অজ্ঞান, ছিলনা ছিলনা তারা
দুর্ভিক্ষে পীড়িত, ছিলনা অধম দিন
পরের প্রত্যাশী, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে
বীরের জনম, বাঙ্গলার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে
সোনার ফসল, বীরত্বধীরত্ব আর
সুখশান্তি কত এক দিন ছিল হায়
এই বাঙ্গালায়, গিয়েছে সকলি আজ !
কি কাজ স্মরিয়ে আর অতীত কাহিনী
চল আজি কল্পনারে করি সহচরী
হেরিগে প্রত্যক্ষ সব, ঐ যে সম্মুখে
বিক্রম পুরের মাঝে বঙ্গের গৌরব
শ্রীপুর নগরী শোভে অলকা সমান
পাদ মূলে ধৌত করি কুল কুল নাদে
চলিতেছে স্রোতঃস্বিনী কালীগঙ্গা নাম
সারি সারি সৌধ রাশি গরবে যথায়
ভেদিয়ে অম্বর সদা কার অভিলাষ

উন্নত গর্ব্বিত শিরে আছে দাঁড়াইয়া,
ইহাই কেদার পুরী ভুবন মোহিনী,
কাঞ্চন মণ্ডিত চূড়া দেবের মন্দির
কাঞ্চন জঙ্ঘার মত ঐ যে দাঁড়ায়ে
রহিয়াছে এক পাশে, চিন কি উহায় ?
কেদারের প্রতিষ্ঠিত কেদারমন্দিরে
বিরাজেন মহেশ্বর কোটীশ্বর রূপে।
কোটি মুদ্রা ভূমিতলে করিয়ে প্রোথিত
তদুপরি বাণলিঙ্গ স্থাপিয়ে ভূপাল
ভক্তি গদগদ চিত্তে প্রণমি কেদারে
কেদার রাখিল নাম কোটীশ্বর তাঁর।
চেয়ে দেখ অন্য দিকে কেমন সুন্দর
তুষার নিন্দিত সিত শুভ্র হর্ম্ম্য মাঝে
অনন্ত রূপিণী দুর্গা করিয়ে করুণা
দশমহাবিদ্যা রূপে বিরাজে ভুবনে,
প্রথমে কালিকা রূপা ভীষণা মূরতি
পতি বক্ষে দিয়ে পদ বিপদ নাশিনী
মুক্তকেশী লোল জিহ্বা নরমুণ্ড গলে
দাঁড়ায়ে রয়েছে অই কি শোভা অতুল !
দ্বিতীয়ে রয়েছে অই ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরা
পিঙ্গল বরণা ভীমা খর্ব্বাকৃতি বামা
তারা রূপে লম্বোদরা নৃমুণ্ড মালিনী
তৃতীয়ে ষোড়শী রূপে শুভ্র কলেবরে
দাঁড়ায়ে রয়েছে মাতা কিবা শোভা তাঁর !
চতুর্থে ভুবনেশ্বরী উজলি ভুবন
দশ দুঃখ বিনাশিনী ত্রিনয়নী তারা
পীন স্তনী হাস্যযুতা অঙ্কুশ অভয়া
বরপাশ চারি করে করিয়ে ধারণ
বিরাজে কেমন হেথা নেহার পাঠক !
পঞ্চমে ভৈরবী মাতা ভৈরব ভাষিণী
রক্তে মাখা গাত্র বস্ত্র রক্তে মাখা স্তন
হেরিলে শিহরে সদা পাপীর পরাণ,
শ্যামাঙ্গী মাতঙ্গী পরি শঙ্খের বলয়
এলাইয়ে কেশদাম বীণা লয়ে করে
ষষ্ঠ স্থানে বিরাজিতা নেহার নয়নে।
মুক্তকেশী ধূমাবতী কুটিল নয়না
বিধবার বেশে অই হাতে নিয়ে কুলা
সপ্তমে আছেন তিনি সরবের ভরে
দারিদ্র্য দলনী রূপে নিস্তারিতে জীবে !
অষ্টমে বগলা মাতা আছেন দাঁড়ায়ে,
নবমে বিকট মূর্ত্তি বিপরীত ভাব
উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা নিজ শির কাটি
নিজের রুধির পান করিতেছে নিজে।
অবশেষে মহালক্ষ্মী পরমা প্রকৃতি
কনক জিনিয়ে কান্ত পদ্মোপরি স্থিতা
নাশিছে জীবের দুঃখ দুঃখ বিনাশিনা।
অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী শ্রীপুর নগরী
এইরূপ কত শত অতুল বিভবে
রয়েছে সজ্জিত তাহা কে বলিতে পারে ?
প্রণমামি বীণাপাণি স্বয়ম্ভুনন্দিনী।
বামন হইয়ে আমি চাঁদ ধরিবারে
ধরেছি বাসনা হৃদে, বাতুলের প্রায়,
কেদার বীরত্ব গাথা গাহিবারে আজ
হৃদয়ে রয়েছে সাধ বড়ই দুর্ব্বার
বিনা তব কৃপাকণা কি সাধ্য আমার,
পূরাতে বাসনা মম উন্মত্ত প্রয়াস ?

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।

একটি পুরাতন দুর্গ (২৯৫ পৃষ্ঠা

ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গলার সুবেদার মিরজুমলা কর্তৃক
১৬৬০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত।

মাইল দূরবর্ত্তী; কাজেই ষ্টেসন হইতে সহরের কোনওরূপ অস্তিত্বই অনুভূত হয় না। আমরা বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় ষ্টেসনে পঁহুছিয়া একখানা শকটারোহণে নগরের দিকে অগ্রসর হইলাম। জয়পুর নগর উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত (Fortified)। দেখিতে দেখিতে অশ্বশকট একটী প্রকাণ্ড তোরণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, দ্বাররক্ষক আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিক্রয়োপযুক্ত কোনও দ্রব্যাদি আছে কিনা এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি আছে কিনা দেখিয়া সসম্ভ্রমে নগরে প্রবেশের পথ ছাড়িয়া দিল। এই উচ্চ ফটকের

নগরের কথা।

নাম চাঁদপোল। ফটকের পরে একটী ক্ষুদ্র আঙ্গিনা—ইহা চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা সুবেষ্টিত। এই নগরে এইরূপ আরও ছয়টি তোরণ আছে। ষ্টেসনের নিকট যে সকল ধর্ম্মশালা আছে, তাহার একটীও সুবিধাজনক নহে, সে নিমিত্তই আমরা নগরের বাহিরে না থাকিয়া নগরের মধ্যেই ভিন্ন এক বাসা ঠিক করিয়া তাহাতে বাস করিয়াছিলাম। যদিও এখানে সংসার বাবু প্রভৃতি খ্যাতনামা বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ বাস করিতে-ছেন এবং প্রায় সকল বাঙ্গালী পর্য্যটকই তথায় অতিথি হন, তথাপি আমরা ইচ্ছা করিয়াই ভিন্ন বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলাম। জয়পুর রাজপুতানার একটী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী জনপদ—মহারাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ এই নগরের স্থাপয়িতা। ভারতবর্ষের কোথাও এইরূপ পরিপাটী সহর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার আবর্জ্জনা রহিত রাজপথগুলি উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব্ব পশ্চিমে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত, যেস্থানে এই রাজপথগুলি পরস্পরে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানেই এক একটী চকের সৃষ্টি হইয়াছে—প্রতি চকের মধ্যেই প্রস্তরগঠিত কৃত্রিম সরোবর ও তন্মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ উৎস সমূহ স্থাপিত রহিয়াছে। জয়পুর নগরী সবাই জয়সিংহের বিদ্যাধর নামীয় বঙ্গদেশবাসী জনৈক সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে নিজনামে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করিয়াছেন। কথিত আছে

যে, একটী শুষ্ক হ্রদগর্ভের মধ্যে এই নগরী স্থাপিত। ইহার তিন দিকে সুন্দর নীল গিরিশ্রেণী উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া নগরের প্রহরা-কার্য্যে রত রহিয়াছে। জয়পুর নগরী দৈর্ঘ্যে দুই মাইল এবং প্রস্থে বার মাইল। পূর্ব্বে আমরা যে সাতটি তোরণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি দ্বারের উপরিভাগেই দুইটি করিয়া বিশ্রামকক্ষ ও তোপ রাখিবার স্থান আছে। নগরের ঠিক মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। নাগরিক সর্ব্ববিধ শোভাসম্পদেই ইহা গরীয়ান্। জয়পুর নগরী রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বৃহৎ ও বাণিজ্যের স্থান। দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-প্রধান স্থানের সহিত এখানকার বহু জিনিষের আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। সোণা, রূপা ও পাথরের কার্য্যের জন্য ইহা চিরপ্রসিদ্ধ।

দুইধারের শ্রেণীবদ্ধ বিপণিশ্রেণী ও সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সমূহ দেখিতে দেখিতে রাজপ্রাসাদের নিকট আসিয়া পঁহুছিলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে ফুটপাথ—আর মধ্য দিয়া গাড়ী ঘোড়া চলিতেছে। এই ফুটপাথগুলি কলিকাতার রাজপথ হইতে দৃঢ় ও সুপ্রশস্ত, রাজপথগুলিও অধিকাংশ স্থলেই রাজধানীর রাজপথকে হারমানায়। এই প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ নগরের প্রায় একাংশ লইয়া বিরাজিত। এইরূপ মনোহর হর্ম্ম্যাবলী পরিশোভিত রাজবাটীর প্রকৃত বর্ণনা করা অসম্ভব। তোরণ ছাড়িয়া প্রবেশ করিলেই এক পার্শ্বেই একটী প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, এই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে সমুদয় বিচারালয় ও কার্য্যগৃহ ইত্যাদি বিরাজিত। প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের শাসনপ্রণালী কিরূপ সরল ও সহজভাবে নিষ্পন্ন হইত, তাহা এখনকার বিচারাদি দর্শন করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জয়পুরের মহারাজা নিজেই নিজরাজ্যের প্রজাবৃন্দের দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তাকর্ত্তা। দেওয়ানী, ফৌজদারী বিচারাদি সকলই তাঁহার ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে। শাসনশৃঙ্খলা সম্পাদনার্থ চারিটি

রাজপ্রাসাদ।

বিভাগ আছে; যথা—আইন আদালত, রাজস্ব, সৈনিক ও বহির্ভাগ। রাজ্য-শাসনের ভার তাঁহার অধীনস্থ আটজন সচিবের উপরে নির্দ্ধারিত আছে। জয়পুরের প্রজাবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ মহারাজ অহিফেন ও আবকারী ব্যতীত আর সকল পণ্যদ্রব্যাদির মাশুল তুলিয়া দিয়াছেন। হিন্দুর হিন্দুত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা প্রজাবাৎসল্য ও বিচার-পদ্ধতি দর্শন করিলে সেকালের হিন্দুরাজত্ব ও নৃপতিমণ্ডলীর কথা মনে পড়িয়া বর্ত্তমানের শোচনীয় পরিণামে আক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। দিল্লী ও আগ্রার রাজপ্রাসাদের মত এখানেও দেওয়ান-আম, দেওয়ান-খাস প্রভৃতি শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত তুষারধবল অট্টালিকা সমূহ সাজ সজ্জায় শোভাবর্দ্ধন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্তম্ভ, অলিন্দ প্রভৃতি সমুদয় কারুকার্য্যময়, সমুদয় শোভা-সম্পদে শ্রেষ্ঠতম। এই গৃহ দুইটির সাজ-সজ্জা দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে, মোগলদের সময়ে তাহাদের এই গৃহগুলি কিরূপ সুন্দর সুন্দর সাজ-সজ্জায় সুশোভিত থাকিত। রাজবাটীর ঠিক মধ্যস্থলে মহারাজার আবাস ভবন "চন্দ্রমহল" নামক সুন্দর প্রাসাদটি বিরাজিত। এই অট্টালিকাটি বিলাত এবং ইংরেজী স্থাপত্যানুসারে নির্ম্মিত—গৃহটি ইংরেজী উপকরণে সুসজ্জিত। অট্টালিকার পশ্চাতে প্রশস্ত ও মনোহর পুষ্পকানন, জল-প্রণালী ও ফোয়ারা ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম শোভায় ইহা দর্শকের মনোমুগ্ধ করিয়া থাকে। শ্রেণীবদ্ধ তরুশ্রেণী—নানাজাতীয় প্রস্ফুটিত কুসুমবৃক্ষনিচয়, লতাকুঞ্জ—মকমলের ন্যায় বিস্তারিত সবুজ সুন্দর ঘাস প্রত্যেকেই যেন সুন্দর ও মনোহর। অনেক সময় স্বভাবকেও যে কৃত্রিমতার সাজে সাজাইলে যে কতদূর নয়ন-মন মুগ্ধ করে, তাহা এই উদ্যান দর্শন করিলে, সহজেই অনুভূত হয়। এই উদ্যানের অপর প্রান্তে 'গোবিন্দজীউ'র মন্দির বিরাজিত—ইঁনি বৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়া এস্থানে স্থাপিত আছেন। মূর্ত্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত, দেখিতে মন্দ নহে।

তবে ইঁহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে লোকমুখে যতটা শুনিয়াছিলাম—চক্ষে ততটা দেখিলাম না। ভক্ত নহি, ভক্তের চক্ষে দেখিতে পারি নাই, তাই কি গোপিনী মনোমোহন আপনার সৌন্দর্য্যটুকু আমার নয়ন হইতে মুছিয়া লইয়াছিলেন? গোবিন্দজীউকে দর্শনান্তে মৃত মহারাজ রামসিংহের বৈঠকখানা ও বাদলামহল ইত্যাদি দর্শনান্তে "হাওয়া মহল" দর্শন করিলাম। হাওয়া মহলের সৌন্দর্য্য দূর হইতে পরম উপভোগ্য। দূর হইতে ইহাকে একটি রথের মত দেখায়। তলের উপর তল, তার উপরে তল, এইরূপভাবে ক্রমশঃ মন্দিরাকারে ছোট করিয়া তোলা হইয়াছে। উন্মুক্ত দ্বারপথে বায়ু প্রবেশ করিয়া সর্ব্বদা কক্ষগুলিকে শীতল করে বলিয়াই ইহার নাম হাওয়া মহল হইয়াছে। ইংরেজ ও অন্যান্য বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এক মহল হইতে আর এক মহলে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত ইহার মধ্যে ললিতভঙ্গিমায় বহু বক্রপথ বিদ্যমান রহিয়াছে। গঠনে, সৌন্দর্য্যে ও নৈপুণ্যে ইহা অতুলনীয়। ইহার উপর হইতে নগরের সৌন্দর্য্যও কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইহার নিম্নস্থ রাস্তাটি সুপ্রশস্ত ও সুন্দর—নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উঁচু রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিবার নিমিত্ত এই রাস্তা বহুদূর হইতেই ঢালু করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। রাস্তার মধ্যস্থলটি প্রস্তরমণ্ডিত। পথের সেই উন্মুক্ত স্থলে ধীর মলয়ানিল সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতে থাকে! বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে হইলে 'পাশ' লওয়ার প্রয়োজন হয়। হাওয়া মহল সপ্ততল—এখন পাঠকবর্গ হয়ত সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে কতটা দৃঢ়তা ও স্থাপত্য কৌশল নিহিত রহিয়াছে।

মহারাজের এই সপ্ততল চন্দ্রমহল সত্যসত্যই এক অলৌকিক প্রস্তরগৃহ, বহুদূর হইতেই ইহার অভ্রভেদী উচ্চচূড়া দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে যে গোবিন্দজীউর কথা উল্লেখ করিয়াছি,

তাঁহার পুরোহিত একজন বাঙ্গালী, তিনি আমাদের সহিত নানা বিষয় আলাপ করিলেন—স্বদেশী লোকের পরস্পরের প্রতি যে কতটা সৌহার্দ্দ্য থাকে, তাহা নিকটে অনুভব করা যায় না—এই দূরপ্রবাসে সমুদয় বাঙ্গালীই এক। প্রধান ফটকের সম্মুখে মুদ্রাযন্ত্রাগার। প্রধান তোরণের সম্মুখে "স্বর্গশূল মিনার" এবং রাজা ঈশ্বরী নির্ম্মিত 'ঈশ্বরী মিনার' অবস্থিত। উভয়টিই দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। জয়পুরের আর্টস্কুল একটি দেখিবার জিনিষ, এ স্থানের শিল্প কারুকার্য্য দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। এক কলিকাতা আর্টস্কুল ব্যতীত ভারতের আর কোন শিল্প-বিদ্যালয়ই ইহার সমকক্ষ নহে। এই শিল্প-বিদ্যালয়টি মৃত মহারাজ রামসিংহের এক অক্ষয়কীর্ত্তি। ছাত্রগণকে চিত্র, কাষ্ঠ, পিত্তল ও পাথর ইত্যাদির দ্বারা নানাবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্য নির্ম্মাণ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শিক্ষকগণও প্রত্যেকে এক একজন খ্যাতনামা শিল্পী। রাজা মহারাজগণ প্রতিষ্ঠাপিত এ সমুদয় শিল্পবিদ্যালয় দ্বারা ভারতবর্ষের লুপ্তপ্রায় শিল্প-গৌরবের যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে, তাহা এখানকার ছাত্রগণের নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্যাদি দর্শন করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শিল্পের অবনতির নিমিত্তই যে আমাদের দেশের এই দারুণ অবনতি সংঘটিত হইতেছে, তাহা আর নূতন করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে যাওয়া অনাবশ্যক। আমরা কাঞ্চন ফেলিয়া কাচে গেরো দিতেছি—তাই দুর্দ্দশাও দূর হইতেছে না—দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর বিকটগ্রাস হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। এখানে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত গাভী ও বাছুর দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

আর্টস্কুল।

রাজপ্রাসাদ দর্শনের পর, বাসায় আসিয়া আহার ও বিশ্রামাদির পরে আমরা মহারাজ রামসিংহের সাধের "রামবাগ" নামক উদ্যান দর্শন করিতে গমন করিলাম। এত বড় এবং এমন সুন্দর শিল্পকারুকার্য্যময় উদ্যান ভারতবর্ষের অন্যত্র

রামবাগ।

দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। উদ্যান মধ্যে লর্ড মেওর একটী সুন্দর মূর্ত্তি আছে। নানাজাতীয় কুসুমতরু সুশোভিত সবুজ সুন্দর দূর্ব্বাদল সজ্জিত এই উদ্যানটি পর্য্যটককে একেবারে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। কোথাও লতাকুঞ্জবনে লাল সাদা ও হলুদ রঙ্গের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও কৃত্রিম সরিৎ দিয়া জল নির্গত হইতেছে—কোথাও জলস্রোতের উপর ক্ষুদ্র সেতু এবং কোথাও বা কৃত্রিম প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি রক্ষিত। উদ্যানের একপার্শ্বে সুদৃশ্য ও সুরুচিসঙ্গত নানারূপ মূল্যবান প্রস্তরাদি গঠিত 'এলবার্ট হল' বিরাজিত; এই সুন্দর সৌধখানি নির্ম্মাণ করিতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। অট্টালিকার মধ্যে দরবার গৃহ ও যাদুঘরও আছে, উহা দুইটি সুন্দর ও বৃহৎ ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে অবস্থিত। ইহার সম্মুখস্থ বারান্দায় জয়পুরের পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণের চিত্র সমূহ অঙ্কিত রহিয়াছে। একটী সুপ্রশস্ত দ্বিতল উচ্চ হল এবং তাহার তিন পার্শ্বে কক্ষের সারি, তাহার পার্শ্বে একটী সুন্দর প্রাঙ্গণ, আবার চতুষ্পার্শ্বে প্রকোষ্ঠ সমূহ অবস্থিত। হলের উপরিস্থিত গবাক্ষে, কাচে নানা বর্ণে নলদময়ন্তী, সীতাবর্জ্জন, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা, আলেকজণ্ডার কর্ত্তৃক দারিয়াসের পরাজয়, হনুমানের লঙ্কাদহন এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি আলেখ্য সমূহ বর্ণের বৈচিত্র্যতায় এবং চিত্রনৈপুণ্যে মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। সম্মুখস্থ সুসজ্জিত ঘরের পরেই মিউজিয়ম বা যাদুঘর দর্শন করিলাম। কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ যাদুঘরের আকৃতির তুলনায় ইহা হীন বলিয়া বিবেচিত হইলেও কোন কোন অংশের গুণে ইহাকে হীন বলিয়া মনে হয় না। এস্থানে শ্বেতপ্রস্তরের নানা সূক্ষ্মকার্য্য সমন্বিত দেব দেবীর মূর্ত্তি, ধাতব অস্ত্র শস্ত্র ও ক্রীড়া পুত্তলিকাদি দর্শন যোগ্য। রামবাগ মধ্যে যে মনোহর উদ্যান এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বিরাজিত, শুনিলাম যে তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেই মহারাজের বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। আমরা যখন মিউজিয়ম ও এলবার্ট হল ইত্যাদি দেখিয়া বাহির হইলাম, তখন সন্ধ্যা

হইয়াছে; আকাশে তারকারমালা ফুটিয়া উঠিয়াছে ও ব্যাঙের মধুর বাদ্যে চারিদিকে একটা হর্ষকোলাহল ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। আলোতে বাঁশীতে বাতাসের শীতল স্পর্শে ক্লান্তি দূরে গমন করিল—প্রাণে এক শান্তি ও সুখের উদয় হইল।

জয়পুরে অন্যান্য দর্শনীয় স্থান সমূহের মধ্যে মেওহাঁসপাতাল, মহারাজের কলেজ ও নগর-প্রাচীরের বাহিরে গেথুরে মহারাজাদিগের কবর; ইহার সাধারণ নাম ছত্রী—ইহার চতুর্দ্দিকেও সুন্দর বাগান। উহার মধ্যে জয়সিংহের ছত্রীই দেখিতে অত্যন্ত মনোহর। জয়পুর হইতে দেড় মাইল দূরে পাহাড়ের উপর সূর্য্যদেবের একটী বৃহৎ মন্দির আছে, তাহাও উল্লেখ যোগ্য। এই দেবমন্দিরের নাম গুল্তা, এখানে একটী প্রস্রবণ হইতে ৭০ ফিট নিম্নে অনবরত জল পতিত হয়। হিন্দুদের নিকট এই জলও অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। ডাকঘর, অতিথিশালা, ইংরেজী ও সংস্কৃত বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, চিত্রশালা, কারাগার, টাঁকশাল ইত্যাদি সমুদয়ই জয়পুরে আছে। জয়সিংহের

জয়সিংহের মানমন্দির।

মানমন্দির এখানে একটী প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে গণনীয়। প্রাচীন যন্ত্রসমূহ এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহার বিশেষত্ব অগোচর রহিয়া অব্যবহারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। জয়পুরের লোকসংখ্যা ১৫৪৯০৫, ইহার মধ্যে হিন্দু ১০৯৮৬১, মুসলমান ৩৮৯৫৩, জৈন ৯৭৮০। এখানকার জলবায়ু উৎকৃষ্ট। জয়পুর রাজের বর্ত্তমান আয় প্রায় এক কোটি টাকা হইবে। পূর্ব্বে জয়পুর রাজগণ বহু ব্রহ্মোত্তর ও জায়গীর দান করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল জায়গীর ও ব্রহ্মোত্তরের আয়ও প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জয়পুর মহারাজের বহুসৈন্য ছিল এবং তাহারা বীর ও সুদক্ষ যোদ্ধা বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল ; এখন আর সে দিন নাই, সেই বীর্য্যবত্তা কালবশে বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এখন মহারাজের অধীনে ২৯টি সুরক্ষিত পার্ব্বত্য দুর্গ, ১৩৫৭৮ জন অশ্বারোহী, ৯৫৯৯ পদাতি, ৭১৬ গোলন্দাজ, ৬৫টি কামান আছে। রেসিডেণ্টের বাটী, তাহার কার্য্যালয়, টেলিগ্রাফ আফিস ও ইংরেজদিগের বাসস্থান নগরের বাহিরে অবস্থিত। বিটিশ গবর্ণমেণ্টকে প্রতিবৎসর মহারাজের চারি লক্ষ টাকা কর দিতে হয়। নগরস্থ টাকশাল হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে—এই সমুদয় মুদ্রাই জয়পুর রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচলিত। বাঙ্গালী অধিবাসীদের মধ্যে সংসার চন্দ্রসেন, তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রগণ পর্য্যটকগণের একমাত্র সহায়, আপদে বিপদে প্রত্যেক বিষয়েই বাঙ্গালী ভ্রমণকারিগণের সহায় ও অবলম্বন। আমরা এখানে জয়পুর রাজগণের একটা নামের তালিকা প্রদান করিলাম।

১। দুহ্লারাও ১০২৩ সম্বতে অভিষেক।
২। কঙ্কাল (দুন্ধররাজ্য উদ্ধার কর্ত্তা)
৩। মাদলরাও
৪। হনুদেব
৫। কুণ্ডল
৬। পূজন
৭। মল্লসিংহ (মালসিংহ)
৮। বিজলী
৯। রাজদেব
১০। কল্যাণ
১১। কুন্তল
১২। জোয়ানসিংহ
১৩। উদয় করণ
১৪। নরসিংহ
১৫। বনবীর।
১৬। উদ্ধারণ
১৭। চন্দ্রসেন।
১৮। পৃথ্বীরাজ
১৯। ভীম (পিতৃঘাতী)
২০। অত্যশকর্ণ পিতৃহন্ত
২১। বাহারমল্ল
২২। ভগবান দাস
২৩। মানসিংহ
২৪। ভবসিংহ
২৫। মহাসিংহ
২৬। জয়সিংহ
২৭। রামসিংহ
২৮। বিষ্ণুসিংহ

২৯। সবাই জয়সিংহ
৩০। ঈশ্বরীসিংহ
৩১। মধুসিংহ
৩২। পৃথ্বীসিংহ
৩৩। প্রতাপসিংহ
৩৪। জগৎসিংহ
৩৫। মোহনসিংহ
৩৬। জয়সিংহ
৩৭। রামসিংহ
৩৮। মাধোসিংহ (দত্তক) *

জয়পুর দর্শনান্তে আমরা অম্বর রওয়ানা হইলাম। অম্বর প্রাচীন রাজধানী। এতদ্দেশবাসিগণ সাধারণতঃ ইহাকে অমর কহে জয়পুর হইতে অম্বর পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত অম্বর পথাভিমুখী ফটকের নাম আমেরকা দরজা—আমরা সে দরজা দিয়া একারোহণে অম্বর চলিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী, বৃক্ষলতা এ সকল পাহাড়ে এক প্রকার নাই বলিলেও কোনরূপ অত্যুক্তি হয় না। ধীরে ধীরে বক্রগতিতে আমাদের যান ক্রমশঃ উর্দ্ধ হইতে আরও উর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিল—পথের উভয় পার্শ্বে পুরাতন আম্বেরের দুর্দ্দশা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলাম জগতে স্থায়ী কি? হায়! মানবের চেষ্টা, যত্ন উদ্যোগ সমুদয়ই ধরাগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। মাতঃ বসুন্ধরে তুমি কি দয়াবতী না রাক্ষসী? নিজ সন্তানকে নিজেই আবার গ্রাস করিতেছ—যে ফুলটি তোমার বুকে ফুটিয়া উঠে, যে পাখীটি তোমারি কোলে গান গায়, যে কবি তোমার মহিমার তান ধরে—তুমি কিনা সর্ব্বনাশী আবার তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেল। জানি না, মা তোর এ কেমন বিশ্বগ্রাসী নীতি—সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিকটলীলায় প্রাণ অহরহঃ আকুল-ক্রন্দনে ব্যাকুল—তবুও পাষাণী—তবুও রাক্ষসী, তুই তাহা শুনিস্ না। হায়! জগতে কি এমন কেহই নাই, যিনি মানবের দুঃখমোচন করিতে পারেন?

বেলা প্রায় এগার বারটার সময় আমরা অম্বর পঁহুছিলাম, নির্জ্জন

* বিশ্বকোষ ৬৭৭ পৃঃ।

নিভৃত স্থানে এই মনোহর নগরটী অবস্থিত। অম্বরের যাহা কিছু শোভা-সম্পদ সে সমুদয় মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হইয়াছিল। অম্বরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে

অম্বর নগর।

দুইটি ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কাহারও কাহারও মতে অম্বাদেবীর নাম হইতেই সহরের নামোৎপত্তি হইয়াছে, আবার কাহারও কাহারও বিশ্বাস, অম্বরে যে অম্বকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা হইতে অম্বর নামোৎপত্তি। এ সমুদয় জনপ্রবাদ যাহার যেরূপ ইচ্ছা তিনিই তদ্রূপ বিশ্বাস করিতে পারেন। অম্বর আসিতে হইলে জয়পুর হইতে পাশ আনিতে হয়, আমরাও পাশ লইয়া আসিয়াছিলাম। নীলগিরিশ্রেণীর ধূসর বক্ষে অম্বর সহর আপনার লুপ্ত সৌন্দর্য্য বুকে করিয়া বিরাজিত। বর্ষার সময়েই এখানকার গিরিসমূহ নবীন নধর বিটপী সমূহের শ্যামল পত্রপল্লবে পরিশোভিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য শোভা ধারণ করে। গিরি-শ্রেণীর পাদ-মূলে অম্বর সহর স্বীয় প্রশান্ত শোভায় বিরাজিত। উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের নিম্নস্থলে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ—হ্রদের তীরে সমতল ভূমিখণ্ডের উপর অম্বরের দুর্গ ইত্যাদি বিরাজিত। হ্রদের স্বচ্ছ সলিল মধ্যে তীরের সৌধাবলীর ছায়া পতিত হইয়া কি অনির্ব্বচনীয় সুষমাই না ধারণ করিয়াছে। আমরা ক্রমে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া অম্বর দুর্গের তোরণে প্রবেশ করিয়া দুর্গে আরোহণ করিতে লাগিলাম। বাহির হইতে ইহার শোভা যেরূপ অতুলনীয় ভিতরেও তাহা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। ইহার ঐশ্বর্য্য, গঠন, নিপুণতা

অম্বর দুর্গ।

দেখিয়া আগ্রা ও দিল্লীর প্রাসাদাবলীর কথা মনে পড়িল। অম্বর দুর্গের পাদদেশস্থিত উদ্যানটি সুন্দর ও মনোহর এবং নানাবিধ ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। প্রথমেই একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, দেখিবার স্থানগুলির মধ্যে দেওয়ানী-আম, জয়মন্দির, যশোমন্দির, সোহাগমন্দির, রঙ্গমহল, দেওয়ানী-খাস, অন্দরমহল ও

শিলাদেবীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। আমরা একে একে সে সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) দেওয়ানি-আম—যদিও দিল্লী এবং আগ্রার দেওয়ানী-আমের সহিত ইহার তুলনা হয় না—তথাপি সৌন্দর্য্য-গরিমায় ইহার স্থান একেবারে নীচে নহে। কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভনিচয় এবং মধ্যস্থলের ষোলটি মার্ব্বেল স্তম্ভের শোভা সত্যসত্যই অতুলনীয়। স্তম্ভনিচয়ের ঈষদ্ নীলাভ সৌন্দর্য্য অম্বরের স্থপতিগণের গৌরব বিকাশক। দেওয়ানী-খাসের পাশেই বর্ত্তমান মহারাজের বিলিয়ার্ড খেলিবার স্থান। দেওয়ানী-খাস, অন্তঃপুর মহল প্রভৃতি দিল্লীর অনুকরণে সুসজ্জিত ও শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত। অন্দরমহলের চতুর্দ্দিকে সুরক্ষিত প্রাচীর—প্রাচীরের ফটকের নাম গণেশপোল। কপাট পিতল নির্ম্মিত, তাহার উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের একটী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে বলিয়াই, ইহার নাম গণেশপোল হইয়াছে। অন্দরমহলের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। রাজপুত শিল্পিগণের অপূর্ব্ব শিল্প-নিপুণতা এখানে বিদ্যমান। নানাবিধ বিচিত্র সৌন্দর্য্যে, ভাস্করের অনিন্দ্য-সুন্দর অলঙ্কারে ইহা অনিন্দ্য সুন্দর। হায়! একদিন যে কক্ষগুলি নানাদেশের সুন্দরীগণের কলহাস্যে প্রতিধ্বনিত হইত, কত আমোদ কত উল্লাস যেখানে অহরহঃ ক্রীড়া করিত, এখন তাহা নীরব ও ব্যাঘ্রের আবাসস্থল। যে মানসিংহের বীরত্বদর্পে, যাহার অসির ঝনঝনায় সুদূর কাবুল হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল—সেই মোগলের বীর্য্য-বত্তার স্রষ্টা মোগলের খ্যাতিপ্রতিপত্তির মূল মানসিংহের অন্দরমহল কিনা বিজন ও ব্যাঘ্রাবাসে পরিণত, হায়রে দুর্দ্দৈব! হায়! মানব কত ক্ষুদ্র তুমি! কবির ভাষায় মানবের এ অনিত্যতা দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,—

"বিধাতা হে আর করো না সৃজন
এমন পৃথিবী, এমন জীবন;

কর যদি প্রভু ধরা পুনর্ব্বার
মানব সৃজন করো নাক আর ;
আর যেন, দেব, না হয় ভুগিতে
জীবাত্মার সুখ—না হয় আসিতে,
এ দেহ এমন ধারণ করিতে,
এরূপ মহীতে কখন আর।"

(হেমচন্দ্র)

পূর্ব্বে যে সুন্দর উদ্যানের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বামদিকে "দেওয়ান খাস" অবস্থিত—ইহার অপর নাম "জয়মন্দির"। এই ঘরে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটি কক্ষ, প্রত্যেকটির ছাদ ও ভিতরকার দিকের প্রাচীর মুকুরখণ্ড সংযোগে অতি সুন্দর ভাবে সুশোভিত—উহা দেখিলে মন মুগ্ধ হইয়া যায়। প্রাচীন কারুকার্য্যগুলি এখন বিলুপ্তপ্রায়।

অতঃপর আমরা স্নানাগার, এবং সোপানাবলি আরোহণ করিয়া দেওয়ান খাসের উপরিস্থিত 'যশোমন্দির' দর্শন করিলাম, উহাতে মাত্র তুইটি কক্ষ, একটী বৃহৎ ও অপরটি ছোট—আভ্যন্তরিক প্রাচীরগুলি 'জয়মন্দিরের ন্যায়' মুকুর খণ্ডের দ্বারা সুসজ্জিত। গৃহের তুই পার্শ্বে তুইটি গুম্বজ, মধ্যস্থলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ক্ষুদ্র দেহ। এ স্থান হইতে উর্দ্ধের জয়গড় কেল্লার দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ইহার পরে 'সোহাগ মন্দির' এই কক্ষের বহির্ভাগস্থ প্রাচীরগুলি শ্বেতপ্রস্তর মণ্ডিত। গৃহের উভয় পার্শ্বে আরও তুইটি ছোট ছোট ঘর তাহাদের উপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুম্বজ—ভিতরে ছিদ্রযুক্ত প্রস্তর-জানালা—কক্ষের মধ্যেও এইরূপ প্রস্তর-জানালা দৃষ্ট হইল। বোধ হয়, সে কালের পুরস্ত্রীবর্গ এই জানালার অন্তরাল দিয়া দেওয়ানখাসের কার্য্যাবলী অবলোকন করিতেন। কারুকার্য্যময় শিল্পালঙ্কৃত প্রাচীরগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর।

রাজবাটীর কিয়দ্দূরে উচ্চ পর্ব্বতোপরি প্রাচীন কুন্তলগড় অবস্থিত

ইহা প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন। এখন আর সে সৌন্দর্য্য নাই— চারিদিক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। এখন বন্য শূকর ও ব্যাঘ্রের ইহা লীলাভূমি। এই কুন্তলগড়ের আরও উর্দ্ধে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিরাজিত। এই ভূতেশ্বর যে কতদিনের প্রাচীন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। উত্তর দিকের প্রাচীরের নিকট একটী মস্‌জিদ দেখিলাম, কথিত আছে যে, আজমীর হইতে গমনাগমনের সময় জনৈক মুসলমান সম্রাট্ এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন অম্বর যেন উপকথার এক নিদ্রিত নগরী। চারিদিকে কেমন যেন এক গভীর নিস্তব্ধ ভাব ইহার সর্ব্বাঙ্গে বিজড়িত। সেই ঢল ঢল ছল ছল লাবণ্য নাই বটে, কিন্তু তবু সে রূপরাশির হ্রাস হয় নাই। একদিন যে হাটবাজার লোকজনে পূর্ণ ছিল, এখন তাহা বিজন। পূর্ব্বে এ স্থানে উৎকৃষ্ট বন্দুক ও বিবিধ অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমান সময়ে অম্বরের শিল্পিগণ জয়পুরে বাস করিতেছে। জয়সিংহ কেন যে এমন সুন্দর স্বর্ণনগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক জয়পুর সমতল-ক্ষেত্রে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব।

অন্দরমহল ও এদিক ওদিকের সমুদয় মহল প্রভৃতি দর্শন করিয়া আমরা অম্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শিলাদেবীকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই দেবীকে প্রত্যেক বাঙ্গালী পর্য্যটকেরই ভক্তি সহকারে দর্শন করা কর্ত্তব্য। এই শিলাদেবী একদিন বঙ্গের বারভূঁইয়ার অন্যতর ভূঁইয়া চাঁদরায় ও কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর নগরীতে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বাস করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু পরিশেষে মানসিংহ কর্তৃক কেদার রায় পরাজিত হইলে, তিনি এই অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি অম্বরে আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন। এতদিন পর্য্যন্ত উহা প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ

শিলাদেবীর মন্দির।

রায় মহাশয় বিশেষ প্রমাণ সংযোগে উহা বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায় ও কেদার রায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া ঠিক্ করিয়াছেন। আমরা এখানে দেবীর বর্ণনা দিলাম। দেবী অষ্ট ভুজা, মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। কটিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত ঘাঘরায় ঢাকা, সেজন্য নিম্নস্থ সিংহ প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। আর একটী হস্তে ব্রাহ্মণেরা এখন ফুলের তোড়া দিয়া থাকেন, বোধ হয় পূর্ব্বে ঐ হস্তে চক্র ছিল। দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, তীর ও ত্রিশূল; অপর হস্তে যে অস্ত্র আছে, তাহা চিনিতে পারিলাম না। বোধ হয়, দেবী ঐ হস্তে বর ও অভয় দিতেছেন। পূর্ব্বে নাকি প্রতিদিন এ স্থানে একটী করিয়া নরবলি হইত, এখন তৎপরিবর্ত্তে ছাগ ও পর্ব্বোপলক্ষে মহিষ বলি হইয়া থাকে। দেবী যেরূপ ভীষণা তাঁহার মন্দিরও তেমনি ভীষণ; দৃঢ়প্রস্তর নির্ম্মিত দৃঢ় প্রাচীরবদ্ধ। আমার সেই ভীষণার ভীষণমূর্ত্তি দৃষ্টে প্রাচীন ইতিহাস মনে পড়িয়া গেল। হায়! একদিন যে বঙ্গদেশ বীরত্বে ও শৌর্য্যে মোগলসম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল—সেই রণরঙ্গিণী দেবী আজ সুদূর রাজপুতানার নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত।

আমরা অম্বর হইতে যখন জয়পুরের দিকে রওয়ানা হইলাম তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে—চারিদিকে সন্ধ্যার স্তব্ধতা ও নীরবতা অবতীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই নির্জ্জন গিরিপথে—প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল,—আমার মন আর সে সমুদয় বাহ্যিক দৃশ্যের প্রতি নিয়োজিত ছিল না—আমি ভাবিতেছিলাম—অতীতের সেই সমৃদ্ধি—অতীতের সেই গৌরবকাহিনী—সেই বীরত্ব—সেই মহত্ত্ব—আজ তাহা কোথায়? যে দিন যায় সে দিন আর আসে না কেন? যদি আর নাই আসিবে তবে তাহা যায় কেন? হায়! এই কি সেই দেশ একদিন যাহা—

"জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল

সে দেশে নিবিড় আজ আঁধার রজনী—
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি!
বুদ্ধি বীর্য্য বাহুবলে, সুধন্য জগতী-তলে,
ছিল যারা আজ তারা অসার তেমনি।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি!

একবার বুঝি এই শেষবার—যখন পশ্চাৎদিকে অম্বর দুর্গের দিকে তাকাইলাম—তখন উহা অস্তগামী তপনের স্তিমিত রশ্মিতে মিলাইয়া যাইতেছিল।

শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

মহম্মদ গজনী ও তিব্বতাধিপতি।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহম্মদ গজনী যখন ভারত আক্রমণ করিয়া তাহার গৌরব স্থল বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস সাধন পূর্ব্বক সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইয়াছিল না, যখন তাহার সলোলুপ দৃষ্টি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রতিও পতিত হইয়াছিল, সে সময় লাহ্ লামা ইয়েশি হদ (Lah Lama Yeshi Had) নামক জনৈক দেশীয় বৌদ্ধ নরপতি শতদ্রুর তীরবর্ত্তী নিয়ারি কোর সম (Niari kor-sum) নামক দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি উক্ত প্রদেশে থডিং সের কি লাহখাং Thoding-ser-ki-Lhakhang (উচ্চ স্বর্ণ মন্দির) নামক এক বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য তিব্বত দেশীয় সাত জন দশমবর্ষীয় বালককে তাহাদের মাতাপিতার অনুমতি ক্রমে বৌদ্ধ ভিক্ষুর অন্তর্গত করিয়া লইয়াছিলেন। এই সকল বালক উত্তমরূপে সুশিক্ষিত হইলে

তাহাদের প্রত্যেকের পরিচর্য্যার জন্য দুটি করিয়া সন্ন্যাসাকাঙ্ক্ষী যুবককে সেবকরূপে নিযুক্ত করেন। তখন পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রিয়াকর্ম্মে হিন্দু তান্ত্রিকতার প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তিব্বতীয়গণ সে পবিত্র ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া অসার ক্রিয়াকর্ম্মের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। একমাত্র মগধ ও কাশ্মীর প্রদেশে তখনও এ পবিত্র ধর্ম্মের উজ্জ্বল কিরণালোক বিস্তার করিতেছিল। রাজা এই ভিক্ষুমণ্ডলীকে ঐ সকল প্রদেশ হইতে লোকশিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশ এই উষ্ণ প্রদেশের জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কতক বা চোর দস্যু সর্পাঘাত বা নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। এই একবিংশ ভিক্ষুগণের মধ্যে শুধু বিখ্যাত লোচভ * রিংচেন জাংপো (Ringchen Zangpo) লেগ পাই সিরাব (Legpai sherab) স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহারা বহুদিবস মগধে অবস্থান পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া উক্ত ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করতঃ বিক্রমশিলার অন্তর্গত রাজ-বিহার পরিদর্শনে গমন করেন। এই স্থানেই ইঁহারা সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞানের † সহিত পরিচিত হন। ইঁহার পাণ্ডিত্য অকালে সর্ব্বজন বিদিত ছিল। এই ভিক্ষুদ্বয়

* সংস্কৃত ও তিব্বতীয় উভয় ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিলে তিব্বতীয়গণ লোচভ উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। সম্ভবতঃ সংস্কৃত লোচ. (কথনে) ধাতু হইতে এই শব্দ সৃজিত হইয়া থাকিবে। সমালোচনা, আলোচনা প্রভৃতি শব্দও এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

† দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞান বুদ্ধ অবতার বলিয়া এক্ষণে তিব্বতে পরিগণিত হইয়া থাকেন। ইঁহার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র তিব্বতীয়গণ সম্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী ইঁহার জন্মস্থান।

ইঁহার বিবরণ জানিতে পারিয়া স্বদেশে রাজার নিকট যথাযথ বর্ণন করেন। রাজা তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া একশত লোক সমভিব্যাহারে তগট্‌ সাল (Tag-i shal) নিবাসী গিয়াৎসন্ সিঙ্গি (Gya-tson senge) নামক জনৈক ভৃত্যকে ঐ মহাপুরুষের নিকট প্রেরণ করিলেন।

এই ভৃত্য যথাসময়ে বহু বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গার দক্ষিণ তীরস্থ বিক্রমশিলায় উপস্থিত হন এবং রাজার প্রদত্ত বহু স্বর্ণমুদ্রা সহ তাঁহার লিখিত পত্র দীপাঙ্করের হস্তে অর্পণ করেন। দীপাঙ্কর এই সকল অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া তিব্বত-গমনে অস্বীকৃত হইলে, ভৃত্যও স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকৃত হইল ও তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিতে লাগিল।

এইরূপে দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে গিয়াৎসন সিঙ্গি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিব্বতে প্রত্যাগমন করেন এবং রাজাদেশে পুনরায় দীপাঙ্করের নির্ব্বাচিত অপর যে কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতকে আনয়নের জন্য মগধে প্রেরিত হন। এই সময় বিদ্বান্ (লোচভ) গিয়াৎসন সিঙ্গির যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নাগৎসো (Nag-tsho) নামক জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই সময় ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। রাজবিহারের অবস্থা এই সময় অত্যন্ত স্বচ্ছল ছিল। ইহার অন্তর্গত ছয়টি বিদ্যালয়ে নানাদেশ হইতে শিক্ষার্থিগণ আগমন করিয়া বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইতেন। ধনবান্ বণিক্‌গণ ইঁহাদের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতেন। তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে ছয়টি ছত্র শিক্ষার্থী, ধর্ম্মার্থিগণে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। গিয়াৎসন তথায় উপস্থিত হইলেন।

তিব্বতাধিপতি এই সময় একশত অশ্বারোহী ও বহু পদাতিক সৈন্যসহ ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশে অর্থ সংগ্রহে আগমন করেন। সেই সময়েই *

* তিব্বত পর্য্যটক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস C. I. E. মহোদয় বলেন তিব্বত প্রদেশে মুসলমানগণ পূর্ব্বে Garlong বলিয়া অভিহিত হইতেন; এক্ষণে তাঁহাদিগকে লালোস্ বলিয়া থাকে।

গার্লঙ্গ (Garlong) নরপতি মহম্মদ গজনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের মধ্যে তখন যে খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে তিব্বতাধিপতি স্বীয় লোকসংখ্যার অল্পতা হেতু মহম্মদ গজনীর হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার তুই পুত্র ও ভ্রাতুস্পুত্র চং-চব হোড (Chang-chub Hod) বহু সৈন্য সহ তথায় আগমন করিলেন, এবং যুদ্ধ ঘোষণায় তিব্বতাধিপতির প্রতি মহম্মদ গজনী তুর্ব্যবহার করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। মহম্মদ গজনী তদুত্তরে এই মাত্র বলিয়া পাঠান যে, তিনি বন্দীর অবয়বের পরিমাণ অনুযায়ী স্বর্ণ প্রাপ্ত হইলে অথবা বন্দী স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইসলাম ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিতে: সম্মত আছেন। চং-চব্ হোড, প্রস্তাবের প্রথমাংশ সহজ ও সম্ভবযোগ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার পিতৃব্যের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য গজনীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন ও তাঁহার আদেশ মতে কারাগারে যাইয়া পিতৃব্যের সমক্ষে সন্ধির প্রস্তাবগুলি যথাযথ বিবৃত করিলেন ও তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তৎপ্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইবে আশঙ্কায়, তিনি এইরূপ সন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিব্বতাধিপতি ইহা শ্রবণ করিয়া সস্মিতবদনে বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর জন্য কিছু মাত্র ভীত হইবার কারণ নাই। জরাজীর্ণ দেহে আর কত দিন এ জগতে তিনি বিচরণ করিবেন? ধর্ম্মের জন্য দেশের জন্য এ জন্মে সম্ভবতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও বিশেষ কিছু করিতে সমর্থ হন নাই। এবার তাঁহার সুযোগ উপস্থিত; সে সুযোগ নষ্ট করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে; বিশেষ অর্থে কাহারও লোভ প্রশমিত হয় না। এ তুরাত্মা গার্লঙ্গেরও হইবে না, বরং অর্থলোভে পুনঃ পুনঃ তিব্বত দেশ আক্রমণ করিয়া তিব্বতবাসীদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবে।

তিনি আরও বলিলেন "তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্য হইতে এক কপর্দ্দকও যেন উক্ত বিধর্ম্মীকে প্রদান করা না হয়; বৌদ্ধ মঠ সকলের উন্নতিবিধান এবং ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে একজন পণ্ডিত আনয়নের জন্য ঐ সকল অর্থ ব্যয়িত হউক। আর দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিবার জন্য উপদেশ দিলেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি ও তাহার পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য লাহ্ লামা ইয়েসি হোদ্ অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়া গাল´ং দস্যুর হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। তাঁহার বড়ই আশা ছিল যে, দীপাঙ্করের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ও তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া গিয়া জীবন সার্থক করিবেন; ভগবান্ সে আশা পূর্ণ করিলেন না; তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। এক্ষণে ভবিষ্যতের দিকে আশার নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি পবিত্র দেবের শরণাপন্ন হইয়াছেন।" প্রহরিগণ চং-চবকে আর তথায় উপবেশন করিতে দিল না। তিনি ক্রোধে দুঃখে অভিভূত হইয়া বারংবার বৃদ্ধ নরপতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। বহু শতাব্দীর পর সে বিবরণ পাঠ করিয়া আজও কত তিব্বতবাসী নির্জ্জনে অশ্রুজলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া থাকেন। কত জন বা ধর্ম্মের জন্য স্বার্থ ত্যাগের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠেন। আর এই একই দৃষ্টান্ত ভারত ও তিব্বতের ইতিহাসকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া লোক সমক্ষে গজনীর অত্যাচারকাহিনী বর্ণন করিতেছে। ভারত আর তিব্বত কি আর কখনও এইরূপ পরস্পরের জন্য সমবেদনা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে?

শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত।

মহারাণা প্রতাপসিংহ ও কুলপুরোহিত।

(হল্‌দিঘাট-যুদ্ধের পরে)

কুলপুরোহিত। প্রতাপ, ব্রাহ্মণ-পদে তোমার অচলা ভক্তি, সেই সাহসেই আজ তোমাকে এত কথা বলিতেছি।

প্রতাপ সিংহ। আপনি বাপ্পারাওয়ের বংশের একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনার আশীর্ব্বাদই রাজার অক্ষয় কবচ।

কুঃ। যদি ইহাই হয়, তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, চিতোরের সিংহাসন আবার অধিকৃত হইবে।

প্রঃ। গুরুদেব, আপনি এই নিরাশার সমুদ্রে কি ভাসমান তৃণ অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন জানিনা। ইহা কৃতনিশ্চয় যে, সূর্য্য-বংশের গৌরব রবি আর উদিত হইবে না, কাল যবন ভারতের অঙ্গে যে কলঙ্ক ছায়া অর্পণ করিয়াছে, তাহা আর মুছিবেনা।

কুঃ। নিরাশাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া কি তোমার উচিত?

প্রঃ। আশা? আর আশা করিতে সাহস হয় না, হল্‌দিঘাটের নরমেধের পূর্ব্বে আশা করিয়াছিলাম, আজ আর তাহা পারিনা। এই ঝটিকাবিক্ষুব্ধ ঘোর বর্ষিণী নিশীথে ঐ কম্পিত শিখা রহিবে কেন প্রভু?

কুঃ। ঐ বিদ্যুতালোকে কি পথ দৃষ্ট হয় না? এই কর্কশ বন্ধুর-পথে প্রতি মুহূর্ত্তে পতনের আশঙ্কা। প্রতিপদে মৃত্যুচ্ছায়া আলিঙ্গন করিয়া চলিতে হইবে, কিন্তু প্রতাপের উহাতে কোন দিন ভয় হইয়াছে?

প্রঃ। গুরুদেব! যে অতল গর্ভে ডুবিয়াছে, তাহাকে তুলিতে আর চেষ্টা কেন? যে মরিয়াছে, তার কর্ণে আশার মোহিনী মন্ত্র কেন? একবার আকাশপ্রান্তে চাহিয়া দেখুন কি ঘনঘটা; প্রতাপের হৃদয়েও দেখুন বর্ষার সমস্ত জলদমালা আচ্ছন্ন করিয়াছে; তারও হৃদয়ে মহা

সংঘর্ষণে লোলশিখা জ্বলিতেছে। তারও মর্ম্মভেদী হাহাকার; তারও নয়ন ধারায় মিবারের বন্য পথ ভিজিয়া যায়; জানিনা, কেন সূর্য্যবংশে এ কাপুরুষের জন্ম হইল?

কুঃ। প্রতাপ কাপুরুষ? নাগেন্দ্র দুর্ব্বল? বনকেশরী ভীরু? বীরত্বই তোমার পতনের কারণ!

প্রঃ। বীরগর্ব্বই পতনের কারণ একথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

কুঃ। নহে কেন? ভাবিয়া দেখ, যদি তুমি প্রবঞ্চক যবনের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতে, তবে কি তোমার অধঃপতন হইত? তুমি কেন— যদি পূর্ব্বে হিন্দুগণ ছলপরায়ণ বিদেশীর সহিত ছলনা করিতেন, তবে কি তাহারা সিন্ধুতীর লঙ্ঘন করিয়া আসিতে পারিত? যুদ্ধবিদ্যা শুধু শক্তির পরিচায়ক নয়, কৌশল সমধিক। হিন্দুর বীরত্ব আছে, কিন্তু কৌশল নাই, হিন্দু মরিতে জানে, কিন্তু যুদ্ধ জানেনা।

প্রঃ। ক্ষুধিত সিংহ ইরম্মদ গর্জ্জনে শৈল প্রতিধ্বনিত করিয়া শত্রু আক্রমণ করে, সে তো ঘৃণিত তস্করতুল্য পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করেনা। জন্মাবধি তো কখনও ছলনা শিখি নাই, আজ কি করিয়া শিখিব প্রভো?

কুঃ। কৌশল ও ছলনা এক নহে, যদি তাহাও হয়, মাতৃভূমির রক্ষার্থে তাহাও ধর্ম্ম সঙ্গত, তাহাও শ্লাঘণীয়। প্রতাপ, তুমি আপনার বীরগর্ব্ব ও খ্যাতিকে জন্মভূমি অপেক্ষা ভাল বাসিলে,—অধোবদনে রহিওনা। এই বৃদ্ধ তোমাকে আরও মর্ম্মান্তিক পীড়া দিবে। যখন দেখিলে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া মুসলমানের বিপুলবাহিনী জয় করিবার আশা নাই, তখনই পলায়ন করিলেনা কেন? কেন বৃথা রক্তে রাজস্থান কলুষিত করিলে?

প্রঃ। গুরুদেব! বীরব্রতে কি মাতৃভূমি কলুসিত হয়? হলদী-ঘাট কি আত্মোৎসর্গের যজ্ঞস্থল নয়? ঐ শোণিতে কি ভবিষ্যতের ইতিহাস গৌরব রঞ্জিত হইবে না? তাহা না হইলেও প্রতাপ পলাইতে

পারিত না, সে শৈশবাবধি রণক্ষেত্রে হাসি মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে শিখিয়াছে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাইতে শিখে নাই।

কুঃ। তোমার উপযুক্ত কথা বটে। রণস্থল রাজপুতের ক্রীড়াক্ষেত্র, মৃত্যুশয্যা তাহার পুষ্পবাসর। কিন্তু প্রতাপ, যদি তুমি রণস্থল হইতে আজ ফিরিয়া না আসিতে, তবে হিন্দুর এই ক্ষীণ আশা কোথায় থাকিত? যার মৃত্যুতে সমগ্র দেশের মৃত্যু হয়, তাহার কি মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করা উচিত? মায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে প্রাণ সমর্পণ করিবে, কিন্তু প্রাণ যত্নে রক্ষা করিও, তাহা না হইলে মায়ের কাজ করা হইবে না। যতক্ষণ কাজ করিবার ক্ষীণ আশা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অতি যত্নে আত্মরক্ষা করিও। মাতৃপদে সামান্য কারণে প্রাণ বলিদান অপেক্ষা ভবিষ্য মহাপূজার জন্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যুদ্ধে সামান্য সৈনিকও প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, তাহা গৌরবের সন্দেহ নাই; কিন্তু সেনাপতির জীবনের ব্রত তদপেক্ষাও উর্দ্ধে। মাতৃপূজায় যশ বা কলঙ্কের দিকে চাওয়া উচিত নহে। আপনার যশের জন্যে, আপন বর্ত্তমান লাঞ্ছনার ভয়ে, প্রাণ ত্যাগ করা স্বার্থপরতা মাত্র। আশা করি, ভবিষ্যতে আর পলায়ন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, কেননা তুমিই হিন্দুর একমাত্র আশার স্থল।

প্রঃ। বড়ই কঠিন আদেশ।

কুঃ। প্রতাপ, এখনও তোমার হৃদয়ে অভিমান আছে। একবার মায়ের মলিন মুখকান্তির প্রতি চাহিয়া দেখ। মা যেমনই হউন, সন্তান মাত্রেরই আরাধ্যা দেবী। যাক্ আবার সৈন্য সংগ্রহ কর। একটী দুইটী যুদ্ধে পরাজয় হইলেই জাতীয় শক্তির অবসাদ হয় না।

প্রঃ। প্রায় সকলেই মোগলপক্ষাবলম্বী, সাহায্য করিতে অসম্মত। —জানি না, কি বিষে সকলে মোহাচ্ছন্ন; এই গৃহবিচ্ছেদই পতনের মূল।

কুঃ।—হায়! রাজপুত অপেক্ষা বন্য পশুও শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যেও স্বজাতিদ্রোহিতা নাই। উহাদের ধমনীতে কি পূর্ব্বপিতৃপিতামহের পবিত্র

শোণিত প্রবাহিত? ইহাদের মা, ভগ্নীই একদিন জহরব্রত উদযাপন করিয়াছেন? সেই অনন্ত শিখায় রাজপুতের কত সুখ, কত শান্তি, কত স্নেহ মমতার করুণপ্রতিমা ভস্ম হইয়াছে। যবনের লালসানলে কত রূপ দাবদগ্ধ কুসুমের মত শুকাইয়াছে; কিন্তু রাজপুত তথাপি পরাজয় স্বীকার করে নাই। সেই লোলশিখা অতীতের তমোগর্ভ আলো করিয়া আছে। জানিনা আকবর কোন্ মন্ত্রবলে সকলকে বশীভূত করিয়াছে? আকবর কি এতই সৌভাগ্যের দাস? ভারতলক্ষীর আশীর্ব্বাদ কি কেবল মাত্র তারই শিরে বর্ষিত হবে? শুনিয়াছি, মকানী * বেগম মরুভূমে এই দুর্দ্দান্ত পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, বোধ হয় ভারতবক্ষ মরুময় করিতেই এই ধূমকেতুর আবির্ভাব। হিন্দুকে আপন কর্ম্মফলের উপযুক্ত পুরস্কার দিবার জন্যেই বুঝি আকবরের জন্ম। নতুবা কে সে মোগল? শুনিয়াছি সুদূর "ফারগান" রাজ্যের বর্ব্বর অধিবাসী মাত্র! তবে আজ কেন সে মূর্খ হিন্দুর উপর অত্যাচার করিতেছে?

প্রঃ। হিন্দুর অদৃষ্টে।

কুঃ। প্রতাপ, আমি অদৃষ্ট মানি না। ভগবান নিষ্ঠুর নহেন। তিনি বিনাদোষে পূর্ব্ব হইতে কাহাকেও মারিয়া রাখেন না। অন্যের চোখের জলে স্নান করাইয়া কাহাকেও সৌভাগ্যের সিংহাসনে বসান না। আমরাই আপন আপন অদৃষ্টের নির্ম্মাতা। আমি মানি আকস্মিক দৈব, তাহাও আমাদের অদূরদর্শিতার ফল মাত্র। ঐ মোগলের কাছে আজ স্বজাতিপ্রিয়তা ও অধ্যবসায় শিক্ষা কর।

প্রঃ। গুরুদেব এক দিন প্রতাপও অদৃষ্ট মানিত না, তখন বিশ্বাস ছিল, এই মুষ্টিবদ্ধ অসিধারে কর্ম্মফল খণ্ডন করা যায়। এই উন্মুক্ত কৃপাণফলকে সেও আপন অদৃষ্টলিপি আপনি লিখিতে পারে; কিন্তু

* কেহ কেহ বলেন হামিদাবাবু।

এক্ষণে বুঝিয়াছি, ঐ রাক্ষসীর কোপ-কটাক্ষে প্রতাপের মুষ্টিবদ্ধ অসি খসিয়া পড়ে, চিতোরের দুর্ভেদ্য দুর্গ চূর্ণ হইয়া যায়, ভারতের সৌভাগ্য-মুকুট যবন পদে লুণ্ঠিত হয়; প্রভু, এও কি অদৃষ্ট নয়?

কুঃ। প্রতাপ, এই স্বর্ণপ্রসূ ভারত দেবতার লীলাভূমি, কমলার আবাসস্থল, নীল সমুদ্রবক্ষে স্বর্ণকমলের ন্যায় শোভিত, কোন্ প্রাণে মোগলের পদে অর্পণ করিবে? জানিনা জগদীশ্বর! কি তোমার অভিপ্রায়? আমি ক্ষুদ্র পতঙ্গ, কি করিব? পুড়িয়া মরিবার শক্তি আছে, তবে পুড়িয়া মরিব না কেন? কিন্তু মা! যে দিন সকলে তোমায় মা বলিয়া চিনিবে, সেই দিন ঐ পাদপদ্ম হ'তে লৌহশৃঙ্খল খসিয়া পড়িবে। সে দিন কি আসিবে, মা? কিন্তু যেদিনই হউক, এই বৃদ্ধের ভস্মরাশি, তোমার হৃদয়ের প্রাণ অবশিষ্ট মৃত্তিকা বিমিশ্রিত জড় স্তূপ—শিহরিয়া উঠিবে। আমি বৃক্ষ হই, লতা হই, কীট হই, পতঙ্গ হই, তোর সেই শুভদিনে এক মুহূর্ত্তের জন্য মনুষ্যজ্ঞান দিস্ মা। সেই দিন—সেই আনন্দের দিনে এই দুর্ব্বল সন্তানকে ভুলিস্ না, মা।—বৎস, রোদন করিও না, দুর্ব্বলের ন্যায় অশ্রু বর্ষণ করা তোমার সাজে না।

প্রঃ। দুর্ব্বল! দুর্ব্বলই কি কেবল অশ্রু বর্ষণ করে? তবে দুর্ব্বল বড় সুখী! বীরের অদৃষ্টে সে সুখ নাই কেন—পৃথিবীতে সে কি পাপ করিয়া আসে? প্রতাপ বড় দুঃখ পাইয়াছে, আজ তাহাকে কাঁদিয়া সুখী হইতে দিন্।

কুঃ। হিমাদ্রি কি ভূকম্পনে অধীর হয়?

প্র। আমিও অধীর নহি, কিন্তু তার হৃদয়েও তো দারুণ উত্তাপে হিমাশ্রু ঝরে।

কুঃ। প্রতাপ, তুমি তাহারও ঊর্দ্ধে, এই যবনবিপ্লব সাগরমধ্যে অভ্রভেদী মৈনাকের ন্যায় দণ্ডায়মান থাক, সাগরতরঙ্গ ঐ অঙ্গে ফেনপুষ্প বর্ষণ করিবে মাত্র, তুমি কেবল ক্ষুদ্র মিবারের আশাস্থল নও; সমগ্র ভারত তোমার মুখ চাহিয়া আছে। সূর্য্যবংশরবি! দৃঢ়মুষ্টিতে অসি

গ্রহণ কর। চিতোর কৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র সমগ্র ভারত তোমার মাতৃভূমি।

প্রঃ। সমগ্র ভারত! নূতন কথা।

কুঃ। নূতন কথা? কিন্তু মহৎব্রত, মায়ের আদেশ।

শ্রীমাখন লাল সেন।

* ঢাকার ধর্ম্ম সম্প্রদায়।

মুসলমান ধর্ম্ম বাবা আদম।

ঢাকা জেলায় কোন্ সময় মুসলমানধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। প্রবাদ আছে, রাজা বল্লালসেনের শাসন সময়ে বাবা আদম নামক জনৈক পীর সোণার গাঁয়ে প্রবেশ লাভ করেন। এ প্রবাদ প্রকৃত হইলে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বাবা আদমই যে এ জেলায় সর্ব্বপ্রথম আগমন করেন, ইহা বলা যাইতে পারে। বাবা আদমের মসজিদ রামপালের অনতিদূরে এখনও দৃষ্ট হয়। এই মসজিদে বাবা আদমের মৃত্যুর বহু দিন পরে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান।

বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর হইতেই যে মুসলমানগণ পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রকৃত এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ঐতিহাসিকগণও ঐ সময়কেই পূর্ব্ববঙ্গে (সোণার গাঁও) মুসলমান আগমনের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এর পর ক্রমে এতদ্‌প্রদেশে (ঢাকা জেলায়) মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। মুসলমান সমাজে সিয়া ও সুন্নি এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে মত-বিরোধ বড়ই প্রবল।

* ঢাকার বিবরণ মুদ্রিত হইতেছে।

১৮৬৯ সনে কোন ঘটনা উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল, রাজপুরুষদিগের চেষ্টায় তাহা নিবারিত হয়।

পীর। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট পীলখানার নিকট আজিমপুরে, মগরাবাজারে এবং ইক্রামপুরে এই তিন স্থানে তিন জন পীর বাস করিতেন। ঢাকা জেলার বহু মুসলমান ইঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফেরাজী। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক নূতন সম্প্রদায় আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় ফেরাজী নামে পরিচিত। ফরিদপুর জেলায় দৌলতপুর গ্রামের সরিতুল্লা নামক এক ব্যক্তি এই দলের প্রবর্ত্তক।

সরিতুল্লা ও দুদু মিঞা। ১৮ বৎসর বয়সে সরিতুল্লা মক্কা গমন করিয়া ওহাবি সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করেন ও নূতন ভাবে প্রমত্ত হন। অতঃপর ২০ বৎসর তীর্থবাস করিয়া সরিতুল্লা দেশে আসিয়া এক অভিনব সম্প্রদায় গঠন করেন। ১৮২৮ সনে তাঁহার অভিনব মতে দীক্ষিত হইয়া এ জেলার বহু মুসলমান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সরিতুল্লার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দুদু মিঞা তাঁহার মত প্রবল রাখিয়া ফেরাজি সম্প্রদায়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিল। দুদু মিঞা গ্রামে গ্রামে শিষ্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক মত বিস্তারের চেষ্টা করিলে অনেক স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এই দলের দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়। *

মুসলমান ধর্ম্মমন্দির। এ জেলার নিম্নলিখিত স্থানসমূহ মুসলমানদিগের ধর্ম্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঢাকার সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত "হোসেনী দালান" এই দালান ঢাকার নবাব মহম্মদ আজিমের সময়

* ফরিদপুরের বিবরণে "দুদু মিঞার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

নাওয়ারা মহালের দরগা মীর মোরাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নবাবি আমলে মহরমের সময়ে এই স্থানে মহাসমারোহের সহিত নমাজ ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পন্ন হইত। "ইদ ঘর" ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজার দেওয়ান মীর আব্দুল কাসেম প্রস্তুত করেন। নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত কদম রছুলের দরগা, মানিকগঞ্জের অন্তর্গত হায়দর সা কি দরগা প্রভৃতি।

খৃষ্টধর্ম্ম রোমান ক্যাথলিক পর্ত্তুগীজ মিশন।

এ জেলায় বহু খৃষ্টানের বাস। খৃষ্টানের সংখ্যা ১১৫৫৬। ইহাদের অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের খৃষ্টান, এবং এতদ্দেশীয় মগ স্ত্রীলোক ও পুর্ত্তুগীজ পুরুষের সংশ্রবে জন্ম। এইরূপ বহুদেশী ফিরিঙ্গি ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম হইতে আনীত হইয়া ঢাকার ১২ মাইল দক্ষিণে উপনিবেশিত হয়। যে স্থানে তাহারা প্রথম উপনিবেশের স্থান প্রাপ্ত হয়, ঐ স্থান ফিরিঙ্গি-বাজার নামে পরিচিত। ফিরিঙ্গি-বাজারে এখন ফিরিঙ্গি অধিক নাই। নবাবগঞ্জ ও রূপগঞ্জ থানার এলাকায় ইহাদের সংখ্যা অধিক।

চার্চ্চ।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের পার্ত্তুগীজ মিশন এজেলায় তিন স্থানে স্থাপিত আছে। (১) তেজগাঁও, (২) নাগরি ও (৩) হাসনাবাদ। তেজগাঁও চার্চ্চ সেণ্ট আগষ্টিন মিশনারি সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে।* ইহাতে একজন ধর্ম্মযাজক ও ২১৫ জন দেশীয় খৃষ্টান আছেন। ভাওয়ালের অন্তর্গত নাগরি চার্চ্চ ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। সেখানে এক জন ধর্ম্মযাজক ও ১৫০০ খৃষ্টান আছেন। নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত হোসেনাবাদ চার্চ্চ ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে; হোসেনাবাদ চার্চ্চে ২ জন ধর্ম্ম-

* Imperial Gazettear Eastern Bengal & Assam (Draft). এই চার্চ্চের অন্তর্গত (সমাধি স্থানের কোন প্রস্তরফলকই ১৭১৪ খ্রীঃ পূর্ব্বের দেখা যায় না। এই কারণে অনেকে এই চার্চ্চকে আরও আধুনিক বলিয়া মনে করেন।

যাজক ও ২৫১৮ জন খৃষ্টান আছে। এতদ্ব্যতীত ঢাকাতেও এই সম্প্রদায়ের একটী চার্চ্চ্ আছে; এখানে দুই জন ধর্ম্মযাজক ও ১২০ জন খৃষ্টান। এ চার্চ্চগুলি ময়লাপুর চার্চ্চের প্রধান ধর্ম্মযাজকের (Bishop) অধীন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সহিত গোয়ার পর্ত্তুগীজ মিশনের মতভেদ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে ঢাকার প্রধান ধর্ম্মযাজকের কর্ত্তৃত্বাধীনে ১৮১৫ খৃঃ ঢাকার রোমান ক্যাথলিক-দিগের আর একটী চার্চ্চ্ স্থাপিত হয়। এই চার্চ্চের অধীন ধর্ম্মশালা ও অনাথ আশ্রম আছে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান চার্চ্চ ও ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্রীক চার্চ্চ নির্ম্মিত হয়। ১৮১৯ সনে সেণ্টথমাস প্রটেষ্টেণ্ট চার্চ্চ নির্ম্মিত হয়; ১৮২৭ সনে তাহার প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় ইংলিস বাপ্তিষ্ট মিশন সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংলিস বাপ্তিষ্ট মিশন।

বিশপ হিবর ঢাকায় আসিয়া ১৮২৪ সনের ১৬ই জুলাই চার্চ্চ ও কবরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪০ সন হইতে ১৯ জন সভ্য ছিল। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দুই শতাধিক লোক এই মিশনে দীক্ষিত হইয়াছিল।

অক্সফোর্ড।

অক্সফোর্ড মিশনও কিছু দিন হইল ঢাকায় এক শাখা মিশন স্থাপন করিয়াছে।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ক্রমে ইহার

ব্রাহ্ম সমাজ।

শক্তিবৃদ্ধি হইতে থাকে; ১৮৫৭ সন পর্য্যন্ত ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য একটী ভাড়াটিয়া গৃহে চলিতে-ছিল। ইহার পর একজন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীয় গৃহে সমাজের স্থান প্রদান করেন। ১৭৬৯ সনে পূর্ব্ব বঙ্গের ব্রাহ্মগণের চাঁদা দ্বারা ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় প্রায় তিন শত সভ্য সমাজে যোগদান করিতেন। ১৮৭৭ সনে নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এ জেলায় ২২১ জন ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী। *

* ১৯০১ সনের সেন্সাসে ৭৩ জন ব্রাহ্ম জাতিতে "ব্রাহ্ম" বলিয়া লিখাইয়াছে। ২৯ জন বৈদ্য, ১২ জন ব্রাহ্মণ, ৭ জন কৈবর্ত্ত, ২০ জন কায়স্থ, দুইজন নমশূদ্র পর্য্যায়ে নাম লিখাইয়াছে।

ভেকধারী বৈষ্ণবের বা বৈরাগীর সংখ্যা এ জেলায় ৯২৪০ তন্মধ্যে পুরুষ ৩১২৫, স্ত্রী ৬১২১। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী দ্বিগুণ। ইহারা নানা স্থানে 'আখড়া' করিয়া আছে। বৈষ্ণবদিগের একটী পবিত্র স্থান "গুপ্ত বৃন্দাবন"—মধুপুর গড়ে অবস্থিত। তাহা ময়মনসিংহ জেলার অধীন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজনগরে এক প্রসিদ্ধ আখড়া ছিল। এ জেলার অধিকাংশ বৈষ্ণব রাজনগর আখড়ার শিষ্য। এ জেলায় বিথলঙ্গের রাম কৃষ্ণ গোসাঞির শিষ্যও দেখা যায়। বিথলঙ্গ শ্রীহট্ট জেলায়। এ জেলায় অনেক সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণবপরিবার আছেন। তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের শিষ্য। সেন্সাসে তাহাদিগকে বৈষ্ণব শ্রেণী ভুক্ত করা হয় নাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি স্ব স্ব শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছেন ও ধর্ম্মাবলম্বী স্থলে হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

এ জেলায় হিন্দুদিগের ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য ঢাকার ঢাকেশ্বরীর বাড়ী, রমনার কালির বাড়ী, ধামরাইর মাধববাড়ী প্রসিদ্ধ। অশোক অষ্টমীতে লাঙ্গলবন্ধ পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়। লাঙ্গলবন্দ ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের তীরে অবস্থিত।

হিন্দু দেবালয় ও তীর্থ স্থান।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা এ জেলায় মাত্র ৩০ জন। ইহার মধ্যে মগ ১৫ জন। ব্রাহ্মী ও দেশীয় ১২ জন। চীন দেশীয় ৪ জন। * প্রেতোপাসক একজন, ও একজন গারো।

বৌদ্ধ ও প্রেতোপাসক।

শ্রীকেদার নাথ মজুমদার এম, আর, এ, এস,

* ১৫+১২+৪=৩১। গণনায় ৩১ হয়। সেন্সাস রিপোর্টে ইহার কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই।

ছিয়াত্তর সালের মন্বন্তর। *

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যে লোক-সংহারক দুর্ভিক্ষ বাঙ্গলা দেশকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, বাঙ্গলার নিভৃত পল্লী মধ্যে আজও তাহার স্মৃতি-চিহ্ন বিদ্যমান। যে সময় এই দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়, ইতিহাসের পক্ষে তাহা সন্ধিকাল। দেশীয় রাজন্যগণের অত্যাচারমূলক কালনিশির অবসান ও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে ভারতে ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত। কিন্তু যেরূপ প্রদোষের পূর্ব্বে আলোর সহিত অন্ধকারের অপূর্ব্ব সম্মিলন দৃষ্ট হয়, যেমন নবভানুরশ্মি ধরণীপৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বে অন্ধকার বৃক্ষবল্লর মধ্যে সভয়ে ক্রীড়া করিতে থাকে, সেইরূপ মুসলমান রাজত্বের অবসানে ও ইংলণ্ডমহিষীর ভারতশাসনদণ্ড গ্রহণের পূর্ব্বে, কোম্পানীর রাজত্বে নানাপ্রকার অমানুষিক অত্যাচার দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু সে অত্যাচার সাময়িক মাত্র; ভানুর প্রথমকরে লুক্কায়িত অন্ধকারের ন্যায়, "কোর্ট অভ্ ডিরেক্টরে"র কর্ণগোচর হইবামাত্র বৃটিশ সুশাসনে সে অত্যাচার বিদূরিত হইয়া, ভারতে শান্তিময় রাজ্যের সূত্রপাত হইয়াছে। আমরা এই সময়কার তিন চারি বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মন্বন্তর-প্রসঙ্গে বর্ণন করিব।

পল্লীগ্রামের বৃদ্ধাদিগের নিকট হইতে মন্বন্তর সম্বন্ধে আজও অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে বৃদ্ধা ঠাকুরমার স্নেহময় ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া, সে গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়া আজিকার অনেক প্রৌঢ়ের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। কিন্তু তিনি অশিক্ষিত। গ্রাম্য নারী, তাঁহার কথা কে শুনিবে? তাই আজ আবার এত দিন পরে ইংরাজিতে সেই গল্প পাঠ করিতে হয়। তবে আমরা সে কথা ইতিহাস রূপে গ্রহণ করিতে পারি। হায় নামের কি কুহক! আমাদিগের কি বিড়ম্বনা!

* বৈদ্যবাটী "যুবক সমিতি" গৃহে পঠিত।

ভারতে দুর্ভিক্ষ বলিতে যাহা বুঝায়, বোধ হয় অন্য ভাষার অভিধানে তাহার প্রতিশব্দ নাই। সেই বিদেশী যখন দেখে যে, এক মন্বন্তরে অন্নাভাবে ও বিনা চিকিৎসায় বঙ্গদেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত তখন সে ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল না হইয়া থাকিত পারে না। কিন্তু আমাদিগের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়—ইহা নিত্য ঘটনা। এই যে ডিগ্‌বী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, দশ বৎসরে (১৯০০) দুর্ভিক্ষে ভারতে সর্ব্ব সমেত ১,৯০,০০,০০০ ভারতবাসী মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে। আর সুদূর অতীতে যখন লোকের গৃহপ্রাঙ্গণে সভ্যতার আলোকরশ্মি পড়ে নাই ; যখন তাহারা মিলনসূত্রে এক হয় নাই, যখন পণ্যবাহী বাষ্পীয় শকট লৌহবর্ত্মে বায়ুবেগে ছুটিত না, তখন যে দেশের তৃতীয়াংশ লোক কালকবলে কবলিত হইবে বড় কথা নয়। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের সহিত আরও কোন ছোট বড় কথা আছে ; ঐতিহাসিকেরা সেইগুলিকে ৭৬ সালের মন্বন্তরের নিদানভূত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সে সব আমরা যথাসময়ে বর্ণনা করিব।

মন্বন্তরের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বিষয়টী উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য, আমরা সংক্ষেপে বঙ্গীয় কৃষকদিগের অবস্থা আলোচনা করিব। বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, ও কৃষাণের বেতন, বীজশস্যের মূল্য ও গরুর খোরাক যোগাইয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় জমিদার ও মহাজনে আটক করেন। দরিদ্র কৃষক বৎসরের প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর, দেড়ীসুদে অর্থ কর্জ্জ করিয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করে। কৃষকের জীবন যে কিরূপ কষ্টের জীবন, বঙ্কিম বাবু তাহা সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশটী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।—

"পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল—কাহার বাকী রহিল। ধানপালা দিয়া আছ-

ড়াইয়া গোলায় তুলিয়া সময় মত হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া, কৃষক সংবৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্রমাসে জমিদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা। চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকী আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন "তোমার পৌষের কিস্তি তিন টাকা বাকী আছে।" পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল, দোহাই পাড়িল—হয়ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয়ত না। হয়ত গমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয়ত চারি টাকা লইয়া দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকী স্বীকার না করিলে সে আখিরী কবচ পায় না, হয়ত তাহা না দিলে সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকী স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার দেনা। তখন গমস্তা সুদ কষিল। জমিদারী নিরীখ টাকায় চারি আনা। তিন বৎসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা। তিন টাকার বাকী সুদ ৸০। পরাণ মণ্ডল ৩৸০ আনা দিল। পরে চৈত্র কিস্তির তিন টাকা দিল। তারপর গমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২৲ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১৲ দিতে হইল। তারপর তার পার্ব্বনী। নায়েব, গমস্তা, তহলশীলদার, মুহুরী, পাইক সকলেই পার্ব্বনীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর ২৲ টাকা দিতে হইল।

* * * * *

তাহার পর, আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভপুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে ২৲ টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল,

কিন্তু সে কোন্ খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিন জমিদারকে কিছু নজর দিতে হইবে ; তাহাও দিল। হয়ত জমিদারের অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর নায়েব মহাশয় আছেন—তাহাকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গমস্তা মহাশয়েরা তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা তাঁহারা পাইলেন। পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এ দিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু তাহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতিবৎসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল। আবার আগামী বৎসর তাহা সুদসমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে।”

ইহাই আমাদের দেশের চাষার অবস্থা। ইহা যাঁহারা ঔপন্যাসিকের উর্ব্বরা-মস্তিষ্ক প্রসূত অতিরঞ্জিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা দেশের প্রকৃত তথ্য রাখেন না। তাঁহাদিগকে আমরা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের “Famines in India” গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কৃষকের অবস্থা লইয়া এত দীর্ঘ স্থান অধিকার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতীয় কৃষকেরা আজন্ম দরিদ্র, এরূপ জীব ভূমণ্ডলে আর নাই। দেড়া সুদে অর্থ কর্জ্জ করিয়া খায়। যে বৎসর ফসলের সুলক্ষণ থাকে, সেই বৎসরে সে কর্জ্জ পায়, নচেৎ কদন্ন খাইয়া অর্দ্ধাহারে তাহাকে অনশনে দিন কাটাইতে হয়। এখনকার এই অবস্থা। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি, সে সময় জমিদারের দৌরাত্ম্য আরও অধিক ছিল। দেশ অরাজক থাকাতে নানারূপ উৎপাত ছিল ; সে সমুদয় কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ হইলে দরিদ্র কৃষকগণ যে কিরূপ নিরুপায় হইয়া পড়িত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হইল না। দরিদ্র কৃষকগণ মহাজনের

নিকট হইতে যে কর্জ্জ করিয়াছিল, তাহা শুধিতে না পারিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল। ১১৭৫ সালে (১৭৬৯ খৃঃ) চাউল মহার্ঘ্য হইল। রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরাজের হস্তে। ইংরাজ কোম্পানী দেখিলেন যে, এই অজন্মা বৎসরে রাজকর হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। নানাস্থানে দুর্ভিক্ষের সূচনা সূচিত হইতে লাগিল। ইংরাজ কোম্পানী কি উপায়ে নিরূপিত অর্থ সংগৃহীত হইবে, এই চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। রাজকর কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইবার জন্য, নানারূপ কঠোর নিয়ম প্রচলিত হইল। ফলকথা, অজন্মার কথা স্বীকার করিয়া, রাজকর হ্রাস হইতে দিতে, ইংরাজ কোম্পানী কিছুতেই সম্মত হইলেন না। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া, দরিদ্রপ্রজা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ভাবিল বর্ষায় দেবতা প্রসন্ন হইবেন। হায় বাঙ্গলার দরিদ্র কৃষক! তোমরা আশাতেই বাঁচিয়া আছ। তোমরা পদদলিত ও পিশিত পেশী হইয়াও, চীৎকার করিতে শিখ নাই; গভীর মর্ম্মন্তুদ অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া ভবিষ্য আশায় সব দুঃখ ভুলিয়া যাও।

অর্দ্ধাহারে অনাহারে, কৃষকের কয়টা মাস কাটিয়া গেল। ৭৬ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। পাষাণের ন্যায় দুঃশ্চিন্তার ভার লোকের মন হইতে সরিয়া গেল। ভাবিল দেবতা কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার কৃষক ঘরের বাহিরে গললগ্নিকৃতবাস হইয়া সে মহাজনের দ্বারে দাঁড়াইল। কাঁদিয়া কাটিয়া দুই পাঁচটী টাকা কর্জ্জ করিয়া মাঠে হাল চষিতে লাগিল। এই সময় মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তারা বাংলার শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট শস্য সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। বাংলাদেশ হইতে মাদ্রাজের অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্ন যোগাইতে, চাউল দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। এসময় আর একটী অবান্তর কথা বলা প্রয়োজন। এই সময় বঙ্গদেশে এক প্রকার ইংরাজ কোম্পানীর সৃষ্টি

হয়। চাউলের কার্য্য তাহারা একচেটিয়া করিয়াছিল। যে সময় মুষ্টি-মেয় অন্নের জন্য দরিদ্রগ্রামবাসিগণ প্রাণত্যাগ করিতেছিল, সে সময় ইংরাজ কোম্পানীর গমস্তাগণ সঞ্চিত ধান্য ক্রয় করিতে ব্যাপৃত ছিল। ইহাদের বিষয় পশ্চাৎ বিস্তারিতরূপে বলা হইবে।

সকলের আশা নিদাঘদগ্ধ মুকুলের ন্যায় ম্লান হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। কৃষকের হর্ষোৎফুল্ল মুখখানি বর্ষার ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় গম্ভীর হইয়া উঠিল। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি হইল না। মাঠে ধান সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। কৃষক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। লোকে ভাগ্যের উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়া, এক সন্ধ্যা উপবাস করিল। ইংরাজ কোম্পানী বিপদ গণিলেন। দুর্ভিক্ষের সূচনা যাহাতে লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া না পড়ে, তাহার জন্য কোম্পানী বাহাদুর দুর্ভিক্ষের কথা একেবারে আমলেই আনিলেন না। ১৭৬৯ খৃঃ ২৪ ডিসেম্বর Mr. Verelst প্রেসিডেণ্টের পদ ত্যাগ করেন, কিন্তু তিনি তৎপূর্ব্বে অথবা পদত্যাগ কালে দেশের অবস্থা যথাসম্ভব গোপন রাখিয়া ও কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণকে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সংবাদ জ্ঞাত না করিয়াই, কর্ম্ম হইতে অপসৃত হন। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত হওয়া দূরের কথা, বরং দেশে যে কিছু সামান্য ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল, যেরূপে বঙ্গবাসী তাহা হইতেও বঞ্চিত হইল, তাহা আলোচনা করিতেও হৃদয় ব্যথিত হয়।

যে কিছু চৈত্রের ফসল হইল, তাহা কাহারও মুখে কুলায় না। তাহার উপর কোম্পানী বাহাদুর সিপাহীর জন্য ছয় মাসের খোরাকের উপযুক্ত খাদ্য কিনিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পাটনা হইতে ৮০,০০০ মণ ও দিনাজপুর হইতে ৪০,০০০ মণ চাউল সংগ্রহ করিবার জন্য মন্ত্রণাসভায় স্থির হইয়া গেল। আরও স্থির হইল যে Mr. Summer বাখরগঞ্জে

স্বয়ং উপস্থিত হইয়া চাউল ক্রয় করিবেন। এইরূপে যে দুই এক কাহণ শস্য ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীদিগের জন্য কিনিয়া রাখিলেন। বঙ্গে কান্নার রোল পড়িয়া গেল।

এইরূপে ১৭৬৯ খৃঃ বঙ্গের দীর্ঘ নিশ্বাসের মধ্যে কালের ক্রোড়ে লুকাইল। ১৭৭০ খৃঃ নূতন বৎসরের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দেখা দিল। এই সময় হইতে বাঙ্গলায় প্রকৃত দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইল। বঙ্গবাসী শুষ্ক-কণ্ঠে দীননয়নে রাজপুরুষদিগের নিকটে রাজকর বৎসরের জন্য অনাদায় রাখিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সে অনুরোধে কর্ণপাত কে করে! রাজকর নির্দ্ধারিতরূপে সংগৃহীত হইল। লোকের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। লোকে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল বেচিল, জোয়াল বেচিল, বীজ ধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী সর্ব্বস্ব বেচিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিল না। মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা। তিনি অবসর বুঝিয়া শতকরা দশ টাকা হিসাবে রাজস্ব ক্রমশঃ বাড়াইয়া দিলেন। গৃহস্থ ঘর দ্বার ফেলিয়া পলাইতে লাগিল। কোম্পানী বাহাদুর এই অভাবনীয় ব্যাপারে রাজস্ব আদায়ের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণের দক্ষতায় রাজকোষে প্রায় ১০,০০০,০০ টাকা অধিক সংগৃহীত হইল। হেষ্টিংস্ মহাশয়ের পত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নানা উপায়ে এবং নূতন রাজকর স্থাপনের দ্বারা এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে, রাজস্ব হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে যে সেই উপায় সমূহ প্রজার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়, ইহা তিনি বুঝিতেন, এবং প্রকৃত কথা চাপিবার জন্য বৃথা ওকালতি করিয়াছেন।

১৭৭০ খ্রীঃ এপ্রিল মাস উপস্থিত, কৃষকের গৃহে অন্ন নাই। সে তাহার ঘর দ্বার বীজ শস্য পূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়াছে। এখন কি খাইয়া জীবন যাপন করিবে। মানুষ অভাবে মনুষ্যকে জলাঞ্জলি দিয়া পশুত্বকে বরণ করিয়া লয়। এইবার মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য মাতা মাতৃস্নেহে

জলাঞ্জলি দিয়া পুত্রকন্যাকে বিক্রয় করিল। কিন্তু ক্রেতা কোথায়? সকলেই বেচিতে চায়। দরিদ্র কৃষকগণ খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। এরূপে খাদ্যাভাবে অন্নাভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া হাজারে হাজারে লোক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহারা দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল। বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। সরকারী কাগজেই প্রকাশ যে, এই দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশের এক তৃতীয়াংশ লোক অন্নাভাবে ভবলীলা সংবরণ করিয়াছে।

গৃহে গৃহে অন্নকষ্ট। দারিদ্র্যপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। অন্নক্লিষ্ট কৃষকগণ গৃহদ্বার ফেলিয়া পলাইতে লাগিল। সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহা বিক্রয় করিয়া রাজকর "উসুল" করিয়া লইলেন। লোকের দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। তাহার পর রোগ সময় বুঝিয়া আক্রমণ করিল, বসন্তে গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল। লোকাভাবে শব সকল প্রশস্ত জনপদের উপর স্তূপাকারভাবে পড়িয়া রহিল। মৃত্যুর করাল ছায়া মূর্ত্তিময়ী হইয়া দেখা দিয়াছে, কে কাহার সৎকার করে? সমস্ত দেশ তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত প্রাণ, অনশনে নিস্তেজ ও মুহ্যমান!

ইহাই ৭৬ সালের দরিদ্র প্রজার দুর্গতির ইতিহাস; কিন্তু ইহা কি সত্য? অথবা বিদ্বেষ প্রসূত অতিরঞ্জিত কাহিনী? ১৭৭০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে কাউন্সিল স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে জনসাধারণের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা মনুষ্য অদ্যাপি সৃষ্টি করিতে পারে নাই. মনুষ্যের কোন ভাষাতেই উক্ত মন্বন্তর সম্বন্ধে বর্ণনা সত্যের গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সমর্থ নয়। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে কয়েক মাসের মধ্যেই বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক কৃষক মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে। সার জন শোর (Sir John Shore) এই সময় ভারতে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে ইহার ভীষণতা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়।—

" Still fresh in memorys' eye the scene I find
The sherivelled limb, sunk eyes and lifeless hues.
Still hear the mother's shrieks and infant's moans,
Cries of despair and agonizing moans.
In wild confusion dead and dying lie ;—
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl as midst the glare of day.
They riot unmolested on their prey!
Dire scenes of horror which no pen can trace,
No rolling years from memory's page efface."

ক্রমশঃ

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

একটী পুরাতন দুর্গ।

বিক্রমপুরে অনেক স্থানে পুরাতন ইতিবৃত্ত সংশ্লিষ্ট অনেক জীর্ণ অট্টালিকাদি বর্ত্তমান আছে, তাহা পুরাতত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবে সন্দেহ নাই। যে সব সুন্দর মঠ, দেবমন্দির প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবের স্মৃতি মস্তকে লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, তাহার কোনটী বা কালের কবলে, কোনটী বা পুরাকীর্ত্তি সংহারিণী পদ্মা কিংবা অন্য কোন নদীর গ্রাসে পতিত হইয়া চিরদিনের জন্য আমাদের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব-পুরুষগণের এই কীর্ত্তিস্তম্ভ-গুলির বিবরণ একত্র সঙ্কলিত হইয়া ইতিহাসের অক্ষয় পৃষ্ঠায় স্থাপিত

না হইলে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও অনেক পুরাতত্ব অনুদ্ঘাটিত থাকিয়া যাইবে।

আমরা বিক্রমপুরস্থ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন দুর্গের চিত্রসম্বলিত ক্ষুদ্র বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। দুর্গটী আয়তনে বৃহৎ না হইলেও, ইতিহাসের—অনেক তথ্য ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ইতিহাস হিসাবে ইহার মূল্য নিতান্ত কম নয়।

দুর্গটী বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার একটী অতি প্রকাশ্য স্থানে অবস্থিত। দুর্গের সম্পূর্ণ বিদ্যমান নাই; যাহা বর্ত্তমান আছে তাহাও প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র দুর্গের ন্যায়।* পুরাতন দুর্গের ইহাই সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছে; অবশিষ্টাংশ ভগ্নস্তূপে পরিণত অথবা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে ও পশ্চিমে অর্দ্ধমাইল পর্য্যন্ত দুর্গের ও সৈন্যাবাসের উপযুক্ত নাতি ক্ষুদ্র কুঠরী, অট্টালিকা ও প্রাচীরাদির অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, দুর্গের প্রসার এক সময়ে নিতান্ত কম ছিল না। যে সব ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে, তাহাতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ নাই, সুতরাং ইহার সীমা ও পরিধি নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে। দুর্গটী ইছামতী (বর্ত্তমান ধলেশ্বরী) নদীর ঠিক তীরে অবস্থিত ছিল। বুভুক্ষু-নদী তীরবর্ত্তী—প্রাচীরাবলী গর্ভভূত করিয়া সমগ্র দুর্গটীকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইয়াছিল; কালক্রমে নদীতে চড়া পড়িয়া দুর্গের অবশিষ্টাংশ রক্ষা পাইয়াছে এবং নদীর অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে সরিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান দুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের স্থান নিরীক্ষণ করিলে নিতান্ত

* চারি বৎসর গত হইল স্থানীয় ভূতপূর্ব্ব সবডিভিসনেল অফিসার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে দুর্গের এই অংশের জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে।

আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এই সকল স্থানের মৃত্তিকা বালুকাময় এবং বৃক্ষাদিও প্রাচীন নয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দুর্গের যে অংশ রক্ষা পাইয়াছে তাহা একটী ক্ষুদ্র দুর্গের ন্যায় এবং একরূপ স্বতই সম্পূর্ণ (complete in itself)। বৃহৎ দুর্গের প্রাচীরাবলীর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নাই; কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছে। বৃহৎ দুর্গের* ভিত্তিভূমি গোলাকার ছিল; ইহার ভিত্তিভূমির পশ্চিমাংশ সমচতুষ্কোণ এবং পূর্ব্বাংশ চতুর্ভুজের ন্যায়। পূর্ব্বাংশ পশ্চিমাংশ হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং একটী প্রাচীর দ্বারা ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান সংস্থাপন (situation) এবং অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে অনুমিত হয়, ইহা দুর্গের মধ্যে দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল। † দুর্গের এই অংশ পরিখাপরিবেষ্টিত ছিল, তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্বদিকস্থ পরিখা একটী সুন্দর গভীর জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে এবং এই জলাশয়ের মধ্য হইতে পূর্ব্বদিকের প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত; প্রাচীরগাত্রে কামান সজ্জিত করার ছিদ্র সকল বর্ত্তমান আছে। প্রাচীরাবলী মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত হওয়ায় উহার উচ্চতা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। এ দুর্গের পশ্চিমাংশে চারিকোণে প্রাচীর সংলগ্ন বৃত্তাকার চারিটী উচ্চতর প্রাচীর আছে, তাহাও প্রাচীরগাত্রের ন্যায় সচ্ছিদ্র, পূর্ব্বাংশেও ঐরূপ একটী গোলাকার প্রাচীর আছে, তাহার আয়তন উক্ত চারিটী হইতে ছোট।

* See Hunter's Statistics p-72 account of Dacca.

† বর্ত্তমান দুর্গের বহির্ভাগে কিছু উত্তরে একটী সুন্দর মসজিদ আছে। এই স্থানে নাকি পূর্ব্বে একটী পুরাতন মসজিদ ছিল এবং তাহা বৃহৎ দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। পরে তাহা সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান সুন্দর নূতন মসজিদে পরিণত হইয়াছে।

এই অংশের প্রাচীরাবলী উচ্চতায় স্থানে স্থানে ১২ ফিট হইবে. পূর্ব্বাংশে কোথাও ইহার উচ্চতা ৩ ফিট, ৪ ফিটে পরিণত হইয়াছে। এই দুর্গে কোন স্থাপত্য বিদ্যার নিদর্শন নাই সত্য, কিন্তু ইহার গঠন-প্রণালী অতীব সুন্দর এবং দৃঢ়। আজও প্রাচীরাবলী বজ্রসদৃশ কঠিন। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ৩ফিট পুরু এবং উপরিভাগ সমতল না হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্দ্ধ বৃত্তাকারে সংবদ্ধ হইয়াছে। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র তোরণ দ্বার। এই দ্বারটী পশ্চিমাংশের উত্তরদিকস্থ প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থলে বর্ত্তমান। ইহা উচ্চে ১২ ফিট এবং প্রস্থে ৭ ফিট।

দুর্গের মধ্যে পূর্ব্বাংশে ইষ্টকনির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ টিলা আছে। এই টিলা এক সময়ে খুব উচ্চ ছিল এবং ইহার উপরে হইতে সৈন্যদল বিপক্ষীয় রণতরী সকল পর্য্যবেক্ষণ করিত। ইহাও ক্রমে মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে। আজও উচ্চে ইহা ৪৫ ফিটের কম হইবে না এবং ইহার উপর হইতে নদী দৃষ্টিগোচর হয়। এই টিলার গঠন-প্রণালী অতীব সুন্দর, এইরূপ প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার চতুর্দ্দিক নিখুঁত গোলাকার। ইহার উপরিভাগ খিলানের উপরে স্থাপিত। ভিতর পূর্ব্বে ফাঁপা ছিল, পরে উহা সর্প সমাকীর্ণ হইয়া বিপজ্জনক হওয়ায় মৃত্তিকা ও বালুকা দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে। টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র দ্বার ছিল, তাহাও জীর্ণ সংস্কারের সময় একেবারে রুদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ দ্বার হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত যে সিঁড়ি ছিল তাহা বংশখণ্ড সাহায্যে প্রমাণিত হইত। এই টিলাটীর আয়তন কত বড় হইবে তাহা চিত্র দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার ব্যাস ২৫ গজের কম হইবে না। বর্ত্তমান দুর্গের পরিধি ৬০০ গজের কম নয়।

সম্ভবতঃ এই ক্ষুদ্র দুর্গ মধ্যে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র এবং ধন রক্ষিত হইত এবং সেইজন্যই ইহাকে দুর্গের মধ্যে স্থাপন করিয়া ইহার রক্ষার

নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিম্বদন্তী এইরূপ, এই টিলার মধ্যে ধনাগার স্থাপিত ছিল। এই দুর্গের মধ্যভাগে পশ্চিমাংশে একটী জলাশয় আছে এবং সেই জলাশয় হইতে টিলার উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্রশস্ত সিঁড়ি আছে। এই সোপানাবলীর বাম পাশে নিম্নে একটী গোলাকার কুঠরী আছে; লোকে বলে উহাতে বারুদ রক্ষিত হইত। এক্ষণে উহা উই এবং ইঁদুরের বাস, ইহাও জীর্ণসংস্কারের সময় রুদ্ধ করা হইয়াছে।

টিলার উপর হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে নিম্নাভিমুখে একটী সংকীর্ণ রাস্তা আছে। সম্ভবতঃ ইহা গুপ্ত দ্বাররূপে ব্যবহৃত হইত। এই রাস্তার পার্শ্বেই টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যাঁহারা শত্রু প্রতিরোধ এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাঁহারা পলায়নের সুবন্দোবস্ত করিতেও ত্রুটি স্বীকার করেন নাই। যে দুর্গ একদিন শত শত সৈন্যের বিচিত্র হুঙ্কারে ও কলরবে এবং অগ্নিবর্ষী কামানের ভীষণ শব্দে ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় শব্দায়মান ছিল, আজ তাহা শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী ডেপুটীর বাঙ্গলা, তৎসন্নিকটবর্ত্তী জেলখানা এবং জনকতক পুলিশ প্রহরীর আবাসে পরিণত হইয়াছে। ডেপুটীর বাঙ্গলা টিলার উপর অবস্থিত। যখন মুন্‌সীগঞ্জে মহকুমা স্থাপিত হয় এবং তদুপযোগী স্থান পরিষ্কৃত করা হয় তখন এই দুর্গ জঙ্গল সমাকীর্ণ ছিল। আজ ইহা পরিষ্কৃত হইয়া সুরম্য প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে।

চিত্রখানি দুর্গের মধ্যস্থিত জলাশয়ের পশ্চিমপার হইতে তোলা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরাবলী সম্যক দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল জলাশয় হইতে উত্থিত সোপানাবলী, টিলা, তদুপরিস্থ বাঙ্গলা, দুর্গের মধ্যস্থ প্রাচীরেরর কিয়দংশ এবং নিম্নে সোপানাবলীর বাম-পার্শ্বের-গোলাকার কুঠরী দেখা যায়।

এই দুইটী কত প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন নহে। ইহা ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বসময়ে বাঙ্গলার সুবেদার মিরজুম্‌লা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। টেলার সাহেব তাঁহার "Topography of Dacca"তে এই দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। ক্লে সাহেব কৃত "Principal heads of the history and Statistics of the Dacca Division"এ ইহার ক্ষুদ্র বিবরণ আছে। ইহা "ইদ্রাকপুর কেল্লা" নামে পরিচিত। তখন ঐ স্থানের নাম ইদ্রাকপুর ছিল এবং ঐ স্থানের নাম অনুসারে দুর্গের নামকরণ হইয়াছে। "মুন্সীগঞ্জ" নাম খুব আধুনিক, ইহা সম্ভবতঃ স্থানীয় মুসলমান জমিদারের নাম হইতে উদ্ভূত। বর্ত্তমান সময়েও মুন্সীগঞ্জের এক অংশের নাম ইদ্রাকপুর। টেলার সাহেব ১৮৩০ খৃঃ অব্দে এই দুর্গ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তখনও দুর্গ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং নদী ঐ স্থান আক্রমণ করে নাই। সেই সময়ে ঐ স্থানে তিনি অনেক অট্টালিকা ও ঘাট ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, ইদ্রাকপুর মুসলমান রাজত্ব সময়ে পূর্ব্ববাঙ্গলার একটী প্রধান বন্দর ছিল এবং ঐ স্থানে বিক্রমপুর পরগণার জলকর ইত্যাদি গৃহীত হইত। টেলার সাহেব এই দুর্গ সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।—

Idrakpore situated on the Ichhamati river contains the remains of a circular fort built by Mir Jumla, one of the Governors of Bengal during the reign of Aurangzeb and also brick buildings and ghats where probably river dues or customs of Bikrampur fiscal division were levied within which it is situated."—

কি উদ্দেশ্যে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য বিষয়। ইদ্রাকপুরের ভৌগলিক সংস্থান পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই উপ-

লক্ষি হয় যে, বাঙ্গলার তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা নগরীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য এইরূপ স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করা আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ইদ্রাকপুর মেঘনা, ধলেশ্বরী ও লক্ষ্যা এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। পূর্ব্ববাঙ্গলা নদীবহুল স্থান। শক্রগণের ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিতে হইলে জলযুদ্ধ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না; এবং সাধারণতঃ ঐ প্রদেশে নৌযুদ্ধ সংঘটিত হইত। ইদ্রাকপুর যেরূপ স্থানে স্থাপিত, তাহাতে ইহাকে ঢাকার প্রবেশদ্বার (Gate of Dacca) বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। ঢাকা নগরী আক্রমণ করিতে হইলে, ঐ স্থান অতিক্রমণ করিতে হইত এবং ঐ পথ ভিন্ন অন্য জলপথ ছিল না। সুতরাং ঐ স্থান সুরক্ষিত হইলে ঢাকা একরূপ শক্রর আগমন হইতে নিরাপদ হইত। এই দুর্গ ইছামতী নদীর দক্ষিণপারে স্থাপিত হইয়াছিল। নদীর পারে হাজিগড়েও এইরূপ অন্য একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহারও ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই উভয় দুর্গ আফগান (পাঠান), আসামী, ফিরিঙ্গি ও মগের প্রভৃতি শক্রগণের আক্রমণের প্রতিরোধ করিত।

ঢাকা নগরী সংরক্ষিত করা ব্যতীত এই দুর্গ স্থাপনের অন্য এক মহত্তর উদ্দেশ্য ছিল। একদিকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী যেমন আসামী ও আফগানের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত, অন্যদিকে তেমনি পর্ত্তুগীজ ও অন্য জলদস্যুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছিল। নদীবহুল পূর্ব্ববাঙ্গলায় এই ফিরিঙ্গি ও মগের প্রকোপ এত বাড়িয়া উঠে যে, ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। ইদ্রাকপুর ও হাজিগঞ্জে দুর্গস্থাপন ইহার অন্যতম উপায়। পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে উদ্ধার করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঐতিহাসিকগণও—রিয়াজউস্ সালাতিন রচয়িতা গোলাম হোসেন, আলমগীরনামা রচয়িতা সিরজামহম্মদ কাজেম প্রভৃতি—লক্ষ্যা ও ইছামতীর

সঙ্গমস্থলে মিরজুমলা কর্ত্তৃক নৌদুর্গ স্থাপনের এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। টেলার সাহেব মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"With a view to guard against invasions from Arracan Mir Jumla built in 1660 the different forts about the confluence of the Luckhia and Ichhamutty and constructed several good military roads and bridges in the vicinity of the town of Dacca." (1)

উল্লিখিত উক্তিতে ইনি যে ইদ্রাকপুর ও হাজিগঞ্জের দুর্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্লে সাহেব এই দুর্গ স্থাপনের বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ;—

To guard against the invasion of Mughs and Portuguese and other frontier tribes from Arracan Mir Jumla built the several forts at the confluence of Luckhia and Delessery the ruins of which still remain. The principal of those are the forts of Hajgunje and Irakpore." (2)

এই মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণের অত্যাচারে সমগ্র বঙ্গভূমি সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের ঘৃণিত ও পশুতুল্য অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করিলে আজও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। আরাকান, গোয়া, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি স্থান হইতে নির্ব্বাসিত চরিত্রহীন ফিরিঙ্গিগণের আশ্রয় স্থল হইয়াছিল। আরাকানরাজ মোগলের আক্রমণ হইতে সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে চাটগাঁও বন্দরে স্থাপন করেন। তখন চাটগাঁও পোর্ট গ্রাণ্ডো নামে অভিহিত হইত এবং মগরাজের অধীনে ছিল। ফিরিঙ্গিগণ ঐ স্থানে বাস করিত এবং নানারূপ দস্যুবৃত্তি

(1) See Taylor's Topography of Dacca. p-76.

(2) See Clay's Principal heads of the history and Statistics the Dacca division p-35.

করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই উদ্দেশ্যে তাহারা এত ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর কার্য্য করিত যে, তাহা শ্রবণ করিলে তাহাদিগকে সভ্যজাতির সন্তান বলিয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহারা যে কেবল বঙ্গোপসাগরের উপকূলের আতঙ্কস্বরূপ হইয়াছিল, তাহা নহে, ইহারা মগগণের সহিত মিলিত হইয়া উন্মুক্ত নৌকায় আরোহণ করিয়া পদ্মা, মেঘনা ও তাহাদের শাখানদী ও চাড়ির মধ্যে ভ্রমণ করিয়া লোকজনের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। তাহারা নদীতীরস্থ গ্রামে গিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিত এবং স্ত্রী-পুরুষ * সকলকে ধরিয়া লইয়া যাইত। অক্ষম বৃদ্ধদিগকে অসহনীয় নির্য্যাতন করিয়া ছাড়িয়া দিত; কিন্তু যুবক ও প্রৌঢ়গণকে লইয়া গিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত অথবা তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইত। হাট বসিবার দিনে, বিবাহ দিবসে বা অন্য কোন পর্ব্বোপলক্ষে যখনই কোন স্থানে লোক সমাগম হইত, তখন তাহারা অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সমবেত জনসঙ্ঘের উপর পতিত হইত এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া অথবা ধৃত করিয়া লুণ্ঠন কার্য্য সমাধা করিত। ইহাদের অত্যাচারে গঙ্গা † ও পদ্মার মোহানাস্থিত অনেক স্থান জনশূন্য ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসরূপে পরিণত হইয়া যায়। আজও পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিশেষতঃ ঢাকা অঞ্চলের লোক ফিরিঙ্গি ও মগের নাম শুনিলে ভীত

* ইহারা যে সকলকে ধরিয়া লইয়া যাইত তাহা কবিকণ্ঠহার-প্রণীত সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকায় একটী শ্লোকে প্রমাণিত হয়। মগেরা বৈদ্যজাতীয় এক জনের একমাত্র পুত্রকে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহাতে তাহার বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়। শ্লোকটী এই:

মহেশ সেনজামাতুর্গোপীনাথাৎ সুতোঽভবৎ।
চাটীগ্রাম মগৌনীতো বনাম্মণচন্দ্রচট্টৈর॥"

এই পুস্তক ১৫৭৫ শক (১৬৫৩ খ্রীঃ অব্দে) রচিত হইয়াছিল। ইহাতে ঐ সময়ের মগের ও ফিরিঙ্গির অত্যাচারের আভাস পাওয়া যায়। শ্রীরাজকুমার সেন সঙ্কলিত কবিকণ্ঠহার, ৫৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ "মহেশ সেনের জামাতা গোপীনাথের একমাত্র পুত্র মগের অনুচরগণ বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়।"

† In Major Remell's Bengal Atlas a considerable district marked as "Lands depopulated by the Mughs"

হইয়া উঠে। বার্ণিয়ার সাহেব ইহাদের অমানুষিক অত্যাচারকাহিনী তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তাহা পড়িতে পড়িতে ক্রোধে ও ঘৃণায় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ফিরিঙ্গিরা জাতিতে খৃষ্টান হইলেও ইহাদের আচারব্যবহার বর্ব্বরের তুল্য ছিল।

আমরা এই বিষয়ে বার্ণিয়ার সাহেবের একস্থানের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মন্তব্য সমর্থন করিতেছি। তিনি একস্থানে নিম্নলিখিত ভয়াবহ বিবরণ দিয়াছেন।

Rakon had been the refugee of all the runaway Portuguese from Goa, Cochin, Malacca and other places which they had in the Indies, as well as of their slaves and of the Europeans. They consisted of such as had abandoned their monasteries; had been twice or thrice married; murders and the ukes.

The king of Rakon kept them as a guard of his frontier against the Moghs, in the port called Chategon, which he had taken from Bengal; giving them lands and liberty to live as they pleased. Their usual trade was robbery and piracy; they not only scoured the seacoasts, but entered the rivers, especially the Ganges, and often penetrating forty or fifty leagues up the country, surprised and carried away whole towns and villages of people, with great cruelty, and burning all which they could not carry away. They ransomed the old people; but the young ones they made rowers of and such Christians as they were themselves; boasting that they made more converts in one year than the missionaries, through the Indies, did in ten.*

ক্রমশ—

শ্রীসুখবিন্দু সেনগুপ্ত।

---

* See Modern Universal History Vol. vi.

ঐতিহাসিক চিত্র।

ঢাকার বস্ত্রশিল্প ও ঢাকা নামের কারণ।*

বস্ত্র শিল্প, রৌপ্যালঙ্কারের কারুকার্য্য, শঙ্খ নির্ম্মাণ নৈপুণ্যের জন্য ঢাকা সুপ্রসিদ্ধ।

ঢাকার বস্ত্রশিল্প এক দিন জগতের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

বস্ত্রশিল্প—মসলিন।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্র ইয়োরোপের গৃহে গৃহে অতি আদরের সহিত গৃহীত হইত। ধনী মহিলাগণ মস্‌লিনের সুচিক্কণ পোষাকে তাঁহাদের পরিচ্ছদ-ভূষিত-অঙ্গ—আপাদ মস্তক ঢাকিয়া ভ্রমণ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। ঢাকাই মস্‌লিনের শিল্পনৈপুণ্য এত সূক্ষ্ম যে, শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ভ্রমণকারী ট্রাভার্ণিয়ার লিখিয়াছেন, পারস্যের দূত মহম্মদ আলি বেগ ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমনকালে পারস্যের শাহকে উপহার প্রদানজন্য ৬০ হস্ত দীর্ঘ একখানা মস্‌লিন, একটী অতি ক্ষুদ্র নারিকেলের খোলের ভিতর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ১ গজ প্রস্থ ২০ হাত লম্বা একখানা মস্‌লিন জড়াইয়া একটী অঙ্গুরীর ছিদ্র দ্বারা এ দিক ও দিক লওয়া যাইত। এইরূপ ৩০ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ এক খণ্ড মস্‌লিন ওজনে ৪।৫ তোলা হইত, এবং তাহা ৪০০৲।৫০০৲ টাকায় বিক্রীত হইত।

* ঢাকার বিবরণ মুদ্রিত হইতেছে।

নুরজাহান বেগম ঢাকাই মস্‌লিনের প্রভূত আদর করিতেন। সম্রাট্ জাঁহাঙ্গীর প্রিয়তমা পত্নীর জন্য অগণিত অর্থ ঢাকাই মস্‌লিনের জন্য ব্যয় করিতেন। ইহার পর শাহ্‌জাহান ও অওরঙ্গজেব ঢাকাই মস্‌লিন দিল্লীর অন্তপুরে একচেটিয়া করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; এবং যাহাতে মস্‌লিন ভারতবর্ষ হইতে অন্য দেশে না যাইতে পারে, তাহার জন্য রাজকীয় আদেশও প্রচার করিয়াছিলেন।

মস্‌লিনের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

ঢাকাই মস্‌লিন বিভিন্ন নমুনায় প্রস্তুত হইয়া বিভিন্ন নামে পরিচিত হইত। যথা—সঙ্গতি, সরবতি, ঝুনা, আবরওয়া, সরকার আলি, সব্‌নম্, মলমল খাস, রং, বদন খাসা, আলবল্লা, তনজেব, তরন্দাম, নয়নসুখ, সরবন্দ ইত্যাদি। এই সকল নামের অবশ্যই বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে।

আবরুয়া জলে ফেলিলে জলের সহিত মিশিয়া থাকে। জল হইতে না তুলিলে কাপড় বলিয়া বুঝা সুকঠিন। সব্‌নম্ ঘাসের উপর রাখিলে শিশির পাতে ঘাসের সহিত মিশিয়া যায় এবং ঘাস বলিয়া ভ্রম হয়। এতৎ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ পরীক্ষাচ্ছলে একখানা সব্‌নম্ বস্ত্র ধুইয়া ঘাসের উপর মেলিয়া রাখিয়াছিলেন—একটা গরু ঘাস খাইতে খাইতে ক্রমে সেই বহুমূল্য বস্ত্রখানাও উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল।

কাসিদা।

ঢাকার বুটা-তোলা মস্‌লিন 'কাসিদা' নামে পরিচিত। কাসিদা এক সময় আরব দেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে নীত হইত। এবং তদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষদিগের পাগ্‌ড়ী রূপে ব্যবহৃত হইত। কাসিদা প্রায় ৫০।৬০ প্রকারের প্রস্তুত হইত এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত হইত। কাসিদা রেশম-মিশ্রিত। নবাবী আমলে এক এক খানা রেশমি কাসিদা ৪।৫ শত টাকায় বিক্রয় হইত। কেবল সূতা দ্বারা যে কাসিদা প্রস্তুত হয়, তাহা

"চিকণ" নামে অভিহিত হয়। ১৮৪০ সনে কাসিদার মূল্য ৫০৲ হইতে ৮০৲ টাকা ছিল, তখন অবশ্য নবাবী আমলের ন্যায় উৎকৃষ্ট কাসিদা প্রস্তুত হইত না। ঐ সনেও (১৮৪০) ১২০,০০০ খণ্ড কাসিদা বস্ত্র ঢাকা হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পর ১৮৯৫ সনেও ৯০,০০০৲ টাকার কাসিদা ঢাকা হইতে রপ্তানী হইয়াছিল এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর ১৫০,০০০৲ টাকার মাল আরব দেশে রপ্তানী হয়। বর্ত্তমান সময় ঢাকা হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার কাসিদা বস্ত্র বৎসর রপ্তানী হইয়া থাকে। এখন এক এক খানা কাসিদার মূল্য ৮৲ হইতে ৫০৲ টাকা। কাসিদার কারুকার্য্য সহরের উপকণ্ঠির (সানেরা, বিলিশ্বর, মাতাইল, দাপর প্রভৃতি স্থানের) মুসলমান স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকে।

জামদানী।

বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত মস্‌লিনের নাম জামদানী। জামদানীও বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তুত হইত। যথা,—কারেলা, তোড়াদার, বুটীদার, তেরছা, জলবায়, পান্না হাজরা, ছাওয়াল, দুবলী জাল, মেল ইত্যাদি। এক এক খানা জামদানী ২৫০৲ হইতে ৪৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত।* এখন ২০০৲ টাকা মূল্যের কয়েক খানা বস্ত্র মাত্র প্রতি বৎসর ত্রিপুরার মহারাজ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে ৪০০৲ টাকা মূল্যের জামদানীও প্রস্তুত হয়।† ১৮৮৪ সনে ৩৫,০০০৲ টাকার ১৮৮৬ সনে ৪৫,০০০৲ টাকার, ১৮৮৭ সনে ২৮১,০০০৲ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন প্রতি বৎসর দুই লক্ষ টাকার অধিক এই বস্ত্র প্রস্তুত হয় না। নাপিত্তি, ডেমরা, সিদ্ধিগঞ্জ, কাচপুর, ধামরাই প্রভৃতি স্থানেও জামদানী

* সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের জন্য ২৫০৲ টাকায় ১ খানা জামদানী তৈয়ারি হইত। ঢাকার নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁর জন্য প্রত্যেক খান ৪৫০৲ টাকা করিয়া পড়িত।

† "Historical Acct. of cotton Manufacture Taylor, Mr. G. N Guptas Report.

প্রস্তুত হয়। ঐ সকল স্থানের প্রস্তুত বস্ত্র, সহরের প্রস্তুত বস্ত্র অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

মস্‌লিনের নানা রকম ছিটও প্রস্তুত হইত। ঐ সকল ছিট—নন্দন সাহি, আনারদানা, কবোতার খোপ, সাকুতা, পাছাদবর, কুণ্ডিদার প্রভৃতি নামে পরিচিত হইত।

ছিট।

১৬৬৬—৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাই মস্‌লিন সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে পরিচিত হয়। সেই সময় হইতে ফরাসি, ইংরেজ ও দিনেমারগণ ঢাকায় কুঠি স্থাপন করিয়া, মস্‌লিনের ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। ঢাকার সেই উন্নত সময় ঢাকা হইতে বৎসর ক্রোর টাকার মস্‌লিন কেবল ইয়োরোপেই রপ্তানী হইত। এতদ্ব্যতীত দিল্লীর বাদসাহ ও বেগমদিগের জন্য এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও আমীর উমরাওগণের জন্য প্রচুর পরিমাণে ঢাকাই মস্‌লিন প্রস্তুত হইত। ১৭০৭ সন পর্য্যন্ত ইয়োরোপে ও অন্যান্য স্থানে এইরূপ সমভাবে মস্‌লিনের ব্যবসায় চলিয়াছিল। এর পর হইতে ঢাকই বস্ত্র-শিল্পের অধঃপতনের সূচনা হয়।

মস্‌লিনের ব্যবসায়।

১৭৮৫ সনে কলের সূতার আমদানী হয়। এই সূতার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে মস্‌লিনের বাজারও মন্দা পড়িয়া যায়। ঐ বৎসর মাত্র ৫ লক্ষ খানা বস্ত্র ইংলণ্ডে রপ্তানী হয়। ১৮০০ সনে কোন কোন ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডে রপ্তানী হইবার নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হয় এবং ১৮০১ সনে ঢাকাই মস্‌লিনের উপর শতকরা ১৫৲ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। এইরূপ অবস্থায় ১৮০৭ সনে মাত্র ৮½ লক্ষ টাকার মস্‌লিন বস্ত্র ইয়োরোপে রপ্তানী হয় এবং ১৮১৩ সনে ৩½ লক্ষ টাকার মস্‌লিন ইয়োরোপে যায়। এর পর ১৮১৭ সনে ঢাকার ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি উঠিয়া গেলে, ঢাকাই বস্ত্রের রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ১৮২১ সনে বিলাতি চিকণ সূতার আমদানী

ব্যবসায়ে অধঃপতন।

হইতে আরম্ভ হইলে, দেশী সূতাও অচল হইয়া যায়। ১৮২৫ সনে মিঃ হাসকিসেন বস্ত্রের মাশুল ১০৲ দশ টাকার হ্রাস করিয়া দেন। কিন্তু এ অসাময়িক অনুগ্রহ ঢাকার বস্ত্র-শিল্পের আর উন্নতি করিতে পারিল না।* অবশেষে ১৮২৮ সন হইতে বিলাতি সূতার মস্‌লিন প্রস্তুত হইতে থাকে।

এই অধঃপতনের পরেও ঢাকায় বৎসর প্রায় বিশ হাজার খণ্ড মস্‌লিন প্রস্তুত হইত। টেলার সাহেব লিখিয়াছেন, ঐ সময় (১৮২৮) একখানা ৯ তোলা (১৬০০ গ্রেণ) ওজনের মস্‌লিন ১০ পাউণ্ড (তখনকার ১০০৲ টাকা) পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। ১৮৯০ সনে কলিন্স সাহেব লিখিয়াছেন—"যাহারা বিলাতি সূতার সাধারণ রকম মস্‌লিন প্রস্তুত করিতে পারেন, ঢাকাতে এখনও এরূপ ৫০০ ঘর ব্যবসায়ী আছে এবং ২।১টী পরিবারে এখনও সেই সুপ্রসিদ্ধ ঢাকাই মস্‌লিন প্রস্তুত করিতে পারে।" ঢাকার কমিসনর পিকক সাহেব তাঁহার বর্ষিক বিবরণীতে লিখিয়াছেন—"১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আবদুলগনি বাহাদুর প্রিন্স-অব-ওয়েলস্‌কে উপহার দেওয়ার জন্য যে তিন খানা মসলিন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এই তিন খানা সর্ব্ব বিষয়ে প্রাচীন সূক্ষ্ম শিল্পের আদর্শানুরূপ হইয়াছিল। এই তিন খানার ওজন ৯½ তোলা মাত্র হইয়াছিল। আকারে এক এক খানা ২০ গজ লম্বা ও ১ গজ প্রস্থ ছিল। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে এখনও এইরূপ বস্ত্র ঢাকায় প্রস্তুত হয়—মিঃ গুপ্তের রিপোর্ট হইতে অবগত হওয়া যায়।

এখনও ঢাকার মস্‌লিন আফগানিস্থান, পারস্য, আরব ও তুরস্কে রপ্তানী হইয়া থাকে। তুরস্কে পূর্ব্বের প্রচুর পরিমাণে মস্‌লিন রপ্তানী হইত। রুষ-তুরস্কের যুদ্ধের পর তুরস্কে রপ্তানীও অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ১৮৭৯—৮০ সনে ৮০ হাজার টাকার মস্‌লিন বিক্রয়

* "This boon came too late." *Clay.*

হইয়াছিল—এরপর ক্রমে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮৮০ সনে ২০০৲ টাকার মস্‌লিন প্রস্তুত হয়। ইহার অর্দ্ধেক বিক্রয় হয়, অর্দ্ধেক অবিক্রীত থাকে। পর বৎসর ১৮৮২ সনে ২৫০০০৲ টাকার মস্‌লিন বিক্রয় হয়। ১৮৮৩ সনে মাত্র এক হাজার টাকার এবং ১৮৮৪ সনে পাঁচ হাজার টাকার মস্‌লিন প্রস্তুত হয়। এর পর বৎসর নেপালে ১৫২৮০৲ টাকার মস্‌লিন নীত হয়। ১৮৮৬ সনে বিক্রী আরম্ভ কিছু বৃদ্ধি হয়। ঐ সনে ২৭০০০৲ টাকার মস্‌লিন বিক্রয় হয়। এরপর ক্রমে রপ্তানী হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

ঢাকা নামের কারণ।

ঢাকা নামটী অতি প্রাচীন। এই নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবাদ ও গল্প প্রচলিত আছে। কেহ বলেন ঢাক নামক এক প্রকার বৃক্ষ এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিত, এই কারণে এই স্থান "ঢাক" নামে পরিচিত হয়।* ঢাক ক্রমে ঢাকায় পরিণত হইয়াছে।

দ্বিতীয়—প্রবাদ ঢাকেশ্বরী দেবীর নাম হইতেও ঢাকা নামের উৎপত্তি। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে আদিশূর ও বল্লালসেনের নাম যুক্ত করিয়া ঢাকা নামের প্রাচীনতা প্রতিপাদন করেন। এই প্রবাদ প্রচলিত গল্পটী এইরূপ রাজা আদিশূর তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর ধর্ম্মবিদ্বেষ ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বনবাস ব্যবস্থা করেন। রাণী এই অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন জন্য, ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দেন। দেবরাজ ব্রহ্মপুত্র রাণীকে সযত্নে রক্ষা করিয়া বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিতা দেবী ভগবতীর হস্তে প্রদান করেন। সেই স্থানে রাণীর একটী পুত্র প্রসূত হয়। পুত্র দেবীর কৃপায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রবাদ অনুসারে এই পুত্রই বল্লাল সেন। একদিন রাজকুমার ভ্রমণ করিতে করিতে, সেই নিবিড় অরণ্যে দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া, সেই দেবীকেই তাঁহার রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া

বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন এবং দেবীকে—ঢাকেশ্বরী দেবী নামে অভিহিত করিলেন। এই দেবীর নাম হইতেই ঢাকা নামের উৎপত্তি হইল। *

তৃতীয়—প্রবাদ এইরূপ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইছলাম খাঁ পূর্ব্ববঙ্গকে মগদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বাঙ্গালার রাজধানী রাজমহল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া, মেঘনার উপকূলে আনিতে ইচ্ছুক হন। তিনি বহু স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়া বুড়ীগঙ্গার তীরে উপনীত হন এবং এই স্থানকে রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ব্বাচন করেন। এই সময় এক দল বাদ্যকর ঢাক বাজাইয়া পূজা করিতেছিল দেখিতে পাইয়া, নবাব তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মনোনীত স্থানে ঢাক বাজাইতে আদেশ করিলেন। ঢাকের শব্দ পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তরে যতদূর পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইল, ততদূর পর্য্যন্ত রাজধানীর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। নবাব ইছলাম খাঁ এইরূপে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রাজধানী স্থাপন করতঃ, তাহা 'ঢাকা' নামে আখ্যাত করিলেন। †

এই সকল গল্প ও প্রবাদের সহিত ঐতিহাসিক তত্ত্বের কতদূর সম্বন্ধ আছে, তাহা "ঢাকার ইতিহাসে" আলোচিত হইবে। প্রবাদ যেরূপই প্রচলিত থাকুক না কেন, ঢাকা যে অতি প্রাচীন নাম, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ঢক্কা শব্দ হইতে ঢাকা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা অনুমিত হইতে পারে। ঢাকার নাম আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে ঢাকা বাজু নামে যে পরগণার নাম লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই ঢাকা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে টোডর মল্ল ঢাকা বাজুর (পরগণার) বন্দোবস্ত করেন। তৎকালে বুড়ীগঙ্গার উত্তর

* The Renance of an Eastern Capital.

† Notes on the Antiquities of Dacca.

তীর ভূমি "ঢাকা বাজু" নামে পরিচিত থাকিয়া তাহা সরকার "বাজুহার' অন্তর্গত ছিল। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাব ইছলাম খাঁ এই ঢাকা বাজুতে অসিয়া স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন ও পরগণাব (বাজুর) নাম অনুসারে রাজধানীর নাম প্রদান করেন। তদবধি এই স্থান ঢাকা নামে পরিচিত।

এই জেলা স্থাপন সময় ইহার আকার বর্ত্তমান আকার অপেক্ষা ছয় গুণ বৃহৎ ছিল। ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, ইহার আয়তন হ্রাস হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে।

বিক্রমপুরে বৌদ্ধ-প্রভাব।*

বিক্রমপুরের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস বৌদ্ধযুগ হইতেই আরম্ভ। ইহার পূর্ব্বে সুদূর অতীতে এই প্রদেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মে। যে বৌদ্ধ-সভ্যতার বিজয়-নিশান প্রাচ্য-আকাশের নীলিমা চুম্বন করিয়া, পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ভারতের গৌরব-গাথা প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল, তাহার প্রভাব একদিন পূর্ব্ববঙ্গকেও সঞ্জীবিত করিয়াছিল। তখন এই প্রদেশ সমতট নামে অভিহিত হইত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসিয়াঙ্‌ সমতটে পদার্পণ করিয়া, ইহার পূর্ব্বগৌরব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে হিউয়েনসিয়াঙ্‌এর বৃত্তান্তই আমাদের একমাত্র প্রামাণিক অবলম্বন। তাঁহার গ্রন্থমধ্যে সমতট সম্বন্ধে যে কয়টী অনুগ্রহোক্তি আছে,

* সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত "বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ

তাহাই পূর্ব্ববঙ্গের কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন অতীত গগনে ক্ষীণ জ্যোতির্দ্দীপ। তিনি সমতটে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মঠ, সঙ্ঘারাম দেবমন্দিরাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কোথায় আজ সেই দেবমন্দির, কোথায় সে সঙ্ঘারাম, কোথায় বা সেই পাণ্ডিত্যগৌরবের মধুর স্মৃতি!—সব কালের কবলে বিলীন হইয়া বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। দুই একটী প্রক্ষিপ্ত স্মৃতিচিহ্ন, দুই একটী শব্দ আজ সেই বৌদ্ধ-প্রভাব সূচিত করিয়া অতীতের দগ্ধ-স্মৃতি আমাদের প্রাণে জাগাইয়া দিতেছে। আজ ইহারাই বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ।

গ্রামের নাম :—বিক্রমপুরে দুই একটী গ্রামের নামে বৌদ্ধ-প্রভাব সূচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা "বজ্রযোগিনী" গ্রামের নামটী উল্লেখ করিতে পারি। 'বজ্র' এবং 'যোগিনী' এই দুইটী বৌদ্ধ-তন্ত্রে অর্থবোধক শব্দ। ইহাতে এই গ্রাম যে কোন দিন বৌদ্ধ-প্রভাব সংসৃষ্ট ছিল, সেই বিষয়ে ধারণা জন্মে। ভারতী সম্পাদিকা এই বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"——সুয়াপুর গ্রামের পূর্ব্বে নান্নারগ্রামের পশ্চিমে বাজাসন মৌজায় কৈকুরী নামক বিলের তীরে বহুসংখ্যক পতিত ভিটাভূমি দেখিতে পাওয়া যায়

'বাজাসনের ভিটা' এই সংজ্ঞায় স্পষ্ট প্রতীতি হয়, স্থানটী বৌদ্ধগণের সংস্পৃষ্ট ছিল। 'বাজাসন', 'বজ্রাসন' শব্দের অপভ্রংশ; এই বজ্রাসন বৌদ্ধ-তন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত। এই দেশে বজ্রাসন, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি স্থানের নাম দেখিলেই অনুমান করা স্বাভাবিক যে তথায় বৌদ্ধগণের কোন না কোন প্রভাব ছিল।"*

* See ভারতী, ১৩১১ আশ্বিন।

দেবমূর্ত্তি :—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিক্রমপুরে প্রচুর প্রস্তরমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দুই একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। বিক্রমপুরে বৌদ্ধ-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে এইস্থানে বৌদ্ধমূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? অন্যান্য দেবতা হিন্দুদেবতা বলিয়া পরিগণিত হইলেও, তাহাদের মধ্যেও বৌদ্ধ শিল্পির নির্ম্মাণ-কৌশল প্রকটিত। এই সব মূর্ত্তি দৃষ্টে অনুমিত হয়, যেন সত্ত বৌদ্ধ-মূর্ত্তিকে শঙ্খ-চক্র গদা পদ্ম দিয়া হিন্দুদেবতা বাসুদেবরূপে দাঁড় করান হইয়াছে।* শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীতে এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিক্রমপুরে অদ্ভুত শিল্প-কৌশল পরিচায়ক পদ্মাসনোপবিষ্ট বুদ্ধের সৌম্যমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। আমরা যে সব বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার সমস্তই বুদ্ধের দণ্ডায়মান অবস্থার প্রতিকৃতি। ঢাকা কালেক্টরীর প্রাঙ্গণে সোনারঙ্ হইতে নীত একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে, তদ্ভিন্ন দেবভোগ, মূলচর, কামারখাড়া, বাইনখাড়া প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধমূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে দেবভোগের মূর্ত্তিটী উল্লেখযোগ্য। ইহা উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত রাইমোহন গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহা যে তেজঃপুঞ্জ হাস্যময় বুদ্ধের প্রতি-মূর্ত্তি, তাহা দৃষ্টিমাত্র প্রতীতি জন্মে। বুদ্ধ দণ্ডায়মান অবস্থায় জগৎবাসীকে ত্যাগের মহামন্ত্রে প্রবুদ্ধ করিতেছেন, এই ভাবে মূর্ত্তিটী নির্ম্মিত। এই মূর্ত্তি অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জ্জিত সরল সুন্দর। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ইহাও বাসুদেব মূর্ত্তি। প্রায় সকল দেবমূর্ত্তিই বিক্রমপুরে "নাককাটা বাসুদেব" বলিয়া পরিচিত। অধিকাংশ মূর্ত্তিই ছিন্ননাসিকা; উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সম্বন্ধে একটী প্রবাদ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—"শুনা যায় উড়িষ্যার পাঠান রাজগণের দুর্দ্দান্ত

* See ভারতী, ১৩১১ কার্ত্তিক, ৭০৪ পৃঃ।

সেনাপতি কালাপাহাড়, হিন্দু দেবদেবীমূর্ত্তির সঙ্গে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলিরও ঐরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছিল। এখনও দেশে দেবদ্বেষী লোকের সহিত কালাপাহাড়ের তুলনা করিয়া থাকে। এই প্রদেশে ঐ সকল মূর্ত্তিকে লোকে "নাককাটা বাসুদেব" বলিয়া থাকে। মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন্ কোনটী কোন্ দেবতার মূর্ত্তি তাহা সহজে স্থির করা যায় না, প্রস্তর মূর্ত্তির মধ্যে বৌদ্ধমূর্ত্তির সংখ্যা অল্প হইলেও, ঐ সকল মূর্ত্তি দৃষ্টে এই প্রদেশে বৌদ্ধ প্রভাব সূচিত হয়।

বিক্রমপুরে নবাবিষ্কৃত অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধমূর্ত্তি এইবিষয়ে প্রামাণিক তথ্য উৎঘাটিত করিয়াছে, এই মূর্ত্তিটী এই পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে অন্য কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম যে বিক্রমপুরে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং সুদৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এই মূর্ত্তিদ্বারা প্রমাণিত হয়।

দেউলবাড়ী :—দেউলবাড়ী বিক্রমপুরে একটী দর্শনীয় জিনিস। বিক্রমপুরের অন্তর্গত জোড়ার দেউল, সুখবাস পুর, দেওনগর, সোনারঙ্, চূড়াইল ও রাউৎভোগ গ্রামে সাতটী প্রশস্ত ভিটাভূমি অবস্থিত আছে। এই ভিটাভূমিগুলি কোনটী ৩।৪ বিঘা, কোনটী ততোধিক স্থান লইয়া গঠিত। ইহাদের উপর পুরাতন ইষ্টক, প্রস্তরখণ্ড ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়, যে কোন কোনটীকে ইষ্টকের স্তূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত ভিটাভূমি পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে ৮.৯ হাত উচ্চ এবং দূর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহারা সর্ব্বত্রই "দেউলবাড়ী" নামে পরিচিত। এই সব স্থান যে একদিন অট্টালিকাদি পরিপূর্ণ ছিল এবং তাহাদের ভগ্নাবশিষ্টই যে উহারা এরূপ উচ্চতা লাভ করিয়াছে, তাহা দৃষ্টিমাত্র উপলব্ধি হয়। প্রত্যেক দেউলবাড়ীর নিকটেই সুবৃহৎ দীঘি দৃষ্টিগোচর হয়; তাহাদের কোন কোনটী শুষ্ক কর্ষিত প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে; কোন কোনটী এখনও স্বল্প জলপূর্ণ

আছে। এই সব দেউলবাড়ী হইতে প্রস্তরখণ্ড, পুরাতন ইষ্টক ইত্যাদি লইয়া অনেকে নানাকার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। দেউলবাড়ীর নিকট-বর্ত্তী বাটীতে ভগ্নপ্রস্তরের কবাট, সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, প্রস্তরনির্ম্মিত সিঁড়ী, ইষ্টক ইত্যাদি দেখা যায়। সোনারঙ্ গ্রামস্থ শ্রীহরকিশোর সেন গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে সোনারঙ্ দেউলবাড়ীতে প্রাপ্ত ভগ্নপ্রস্তরনির্ম্মিত সিঁড়ী, প্রস্তরখণ্ড ইত্যাদি আছে। কোন কোন দেউলবাড়ী বর্ত্তমানে জঙ্গলে সমাকীর্ণ অবস্থায় আছে, কোন কোনটী পরিষ্কৃত হইয়া বাসযোগ্য স্থানে পরিণত হইয়াছে। এই সব স্থান খনন করিলে প্রচুর ইষ্টক দৃষ্টি-গোচর হয়; সময় সময় মৃত্তিকা নিম্নে ইষ্টকালয়ের প্রকোষ্ঠাদি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। অধুনা বুড়াইল গ্রামের দেউল বাড়ীর নিকটে মৃত্তিকা নিম্নে একটী অভগ্ন প্রকোষ্ঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেউলবাড়ীতে অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সোনারঙের ৺বৈকুণ্ঠ নাথ সেন মহাশয় সোনারঙস্থিত দেউলবাড়ী হইতে প্রস্তর মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। এই সব দেউলবাড়ী যে একদিন সুরম্য অট্টালিকা, দেব-মন্দিরাদি পরিবৃত হইয়া বিক্রমপুরের শোভাসম্পদ বৃদ্ধি করিত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্য দিয়া বিক্রমপুরের লুপ্ত গৌরবের ম্লান জ্যোতি আমাদের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে শোকাভিভূত করিয়া তোলে।

ইহারা কোন সময় কাহার দ্বারা স্থাপিত, তাহা আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়ে সঠিক খবর কেহ বলিতে পারে না; তবে ইহারা যে খুব প্রাচীন, তাহা স্থান দৃষ্টেই সম্যক উপলব্ধি হয়। জোড়ার দেউলে দুইটী দেউল বাড়ী আছে; সেই জন্যই উক্ত গ্রামের নাম জোড়ার দেউল হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটী দেউলবাড়ীর এক স্থান খনন করিয়া দেবনাগরী অক্ষর সম্বলিত একখানি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। তাহা এক কাগ-জীর নিকট যৎসামান্য মূল্যে বিক্রীত হয়; উহা এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়

নাই। প্রস্তরখণ্ডখানি আবিষ্কৃত হইলে, এবিষয়ে সঠিক খবর আংশিক-রূপে পাওয়া যাইত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি এই সমস্ত দেউলবাড়ীর উপর আকৃষ্ট হইলে, অনেক পুরাতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

এই দেউলবাড়ী সম্বন্ধে তিনটী মত আছে; তাহা যথাক্রমে উল্লেখ করিতেছি:—

১। মহারাজ বল্লাল তাঁহার মন্ত্রী, অমাত্যবর্গ প্রভৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া প্রাচীর—'দেয়াল' দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত দেউলবাড়ীগুলিই তাঁহাদের বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, বল্লালের পতনের পর অমাত্যবর্গ ঐ সব স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, পরে মুসলমানগণ উহাদিগকে একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলে।' তার পর হইতে ঐ সব বাসভবন 'দেয়াল' পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া, দেওয়ালবাড়ী তৎপর 'দেউলবাড়ী' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

এই উক্তিতে কোন ভিত্তি আছে কিনা সন্দেহ। 'দেয়াল' হইতে 'দেউল' হওয়াটা সম্ভবপর নয়। 'দেউল' শব্দ দেবালয়ের অপভ্রংশ এবং বঙ্গভাষাতে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—"আছিল দেউল এক পর্ব্বত প্রমাণ"—এই পংক্তিটী একটী উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বিশেষ মহারাজ বল্লাল সৎকার্য্য ইত্যাদি দ্বারা সকলের প্রাণে একপভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং জনসমাজে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বিষয়েরই বিক্রমপুরে একটা 'বল্লালীআখ্যা' দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উক্ত মতটীর যাথার্থ্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

২। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ সময়ে রামপালের নিকট-বর্ত্তী স্থানে জগন্নাথ বণিকনামে একজন অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সওদাগরনামা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে অনেক বাহুল্য-

পূর্ণ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তিনি বিক্রমপুরে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে স্থানে স্থানে দেউলবাড়ী অথবা দেবালয় স্থাপন অন্যতম। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত দেউলবাড়ীর ভগ্নাবশেষ উল্লিখিত গ্রামে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহাও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। জগন্নাথ বণিক ওরফে জগা বেণে সম্বন্ধে অনেক অলীক কিম্বদন্তী শুনা যায়; তাহার প্রায় সমস্তই অবিশ্বাস্য। তাঁহার সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী এই। জগন্নাথ বণিক শৈশবাবস্থায় খুব দরিদ্র ছিলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় সামান্য মুদী দোকান দিয়া অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি করিয়াছিলেন। এই সময় জগন্নাথ বণিক একটী বোয়ালমাছের পেটে একটী স্পর্শমণি প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন হয়। সেই স্পর্শমণির সাহায্যে তিনি লৌহ স্বর্ণে পরিণত করিয়া, স্বীয় অবস্থার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি করেন এবং সময়ে কোটিপতি হন। এই অবস্থায় তিনি এক স্বর্ণ দেউল প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন; এই প্রস্তাব তাঁহার কৃত নানারূপ সৎকার্য্যের সহিত নানাদেশে প্রচারিত হয়। এইরূপে ইহা সোনারগাঁও পাঠান রাজপ্রতিনিধির কর্ণগোচর হয়। শুনিবামাত্র পাঠান প্রতিনিধি জগন্নাথ বণিককে আহ্বান করে এবং স্পর্শমণি রাজপ্রাপ্য বলিয়া দাবী করে। জগন্নাথ বণিক স্পর্শমণি লইয়া লক্ষ্যা নদীতে রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যায় এবং উহা দেওয়ার সময় কৌশলক্রমে লক্ষ্যানদীতে নিক্ষেপ করে। তদবধি লক্ষ্যার জল অতিশয় শীতল হইয়াছে এবং লক্ষ্যা শীতললক্ষ্যা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

এই উপাখ্যানটী ঠাকুরমার রূপকথার মতই মনে হয় এবং ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

৩। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেকের মত এই সব "দেউলবাড়ী" বৌদ্ধ দেবালয় ছিল। কালের কঠোর শাসনে এবং বিক্রমপুরের

বিলুপ্ত গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেবালয়াদি এইরূপে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

উপরোক্ত তিনটী মতের মধ্যে এইটাই সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহাদের সমস্তই বৌদ্ধ দেবালয় না হইতে পারে, হিন্দু দেবালয়ও ছিল; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন কোনটী বৌদ্ধ দেবালয় ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বিক্রমপুর সিমুলিয়া নিবাসী ইতিহাসানুরাগী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন গুপ্ত এম্, এ, পোষ্টেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় এই সব দেউলবাড়ী এবং উহাতে প্রাপ্ত দেবমূর্ত্তি ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই দেউলবাড়ীতে প্রাপ্ত দেবমূর্ত্তির মধ্যে বৌদ্ধমূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইয়াছে। সোনারঙএর দেউলবাড়ী হইতে সংগৃহীত দেবমূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি ছিল বলিয়া শুনা যায়। ঢাকার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার লায়ন সাহেব সোনারঙ গ্রামে প্রাপ্ত যে কয়টী মূর্ত্তি কালেক্টরীর প্রাঙ্গণে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী মাত্র অর্দ্ধ ভগ্ন অবস্থায় বর্ত্তমান আছে; অবশিষ্টগুলি মুখ, হস্ত, পদ ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ঐ মূর্ত্তিটী যে বৌদ্ধমূর্ত্তি তাহা স্থির হইয়াছে। সুতরাং সোনারঙের দেউলবাড়ী হইতে যদি বাস্তবিক বৌদ্ধমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া থাকে, তবে উহা যে বৌদ্ধ দেবালয় ছিল, তাহাতে বিচিত্র কি? সোনারঙ হইতে যে অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা একদিন নিশ্চয়ই কোন সুপ্রতিষ্ঠিত সুরম্য দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সুরম্য দেবালয় এখন কোথায়? বিক্রমপুরের এই অংশ নদীদ্বারা আক্রান্ত হয় নাই; সুতরাং এই অংশ তদ্রূপ দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ থাকা সম্ভবপর নয় কি? হিউয়েন সিয়াঙ যে সমতটে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন ভগ্নাবশেষ কিংবা স্তূপ থাকা সম্ভব। কিন্তু অদ্যাপি উহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। বিশেষ "সমতটে" এই প্রদেশই সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোন স্থানে এই

স্থানের মত ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সব কারণে অনুমান অসঙ্গত নয় যে, এই দেউলবাড়ীই বৌদ্ধ ধর্ম্ম মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ।

বিক্রমপুরের পালবংশ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় রাজগণের অধিষ্ঠানের সময় বঙ্গদেশে বৌদ্ধ প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গেই তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছিল; পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহারা প্রথমতঃ তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। মূল পালবংশীয় রাজগণ গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে তাঁহাদের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। উত্তর বঙ্গে: পালরাজগণের স্মৃতিবিজড়িত অনেক শিলালিপি, তাম্রফলকাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তথায় তাহাদের অনেক স্মৃতিস্তম্ভাদি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে সেরূপ মূল পালরাজসংশ্লিষ্ট কোন স্মৃতিচিহ্নাদি পরিলক্ষিত হয় না। কথিত আছে, তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গেও শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন এবং তথায় একটী রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। গোপাল, ধর্ম্মপাল, দেবপাল, রাজ্যপাল, মহীপাল, নরপাল, রামপাল প্রভৃতি নৃপতিগণ গৌড়ের সিংহাসনে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এই রামপালের সঙ্গে বিক্রমপুরে প্রসিদ্ধ রামপাল গ্রামের সৌসাদৃশ্য থাকায় অনেকে মনে করেন, তিনি ঐ স্থানে রামপাল নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে বিক্রমপুরে তখন আদিশূর নৃপতি ছিলেন; সেইজন্য তাঁহার প্রভাবে পালবংশীয় নৃপতিবর্গ পূর্ব্ববঙ্গে তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। *

* See বল্লাল মোহমুদ্গার, প্রথম সংস্করণ ৩২৭।৩২৮ পৃঃ।

ধনঞ্জয় বলিয়াছেন:—

"শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদবনিপতিস্তত্র বঙ্গাদিদেশে।
সল্লোকঃ সদ্ বিচারৈর্ব্বিদিতি শ্রুতপতিঃ পার্থপনীৎ উপনীৎ।
প্রতাপাদিতাতপ্তাখিল তিমির রিপুস্তত্ববেত্তা মহাত্মা।
জিত্বা বুদ্ধান্ চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড় রাজ্যাৎনিরস্তান্।"

অর্থাৎ শ্রীমান্ রাজা আদিশূর বঙ্গপ্রভৃতি দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি অতি

তিনি পালরাজগণকে তৎপরে গৌড়ের সিংহাসন হইতে উচ্ছেদ করিয়া গৌড়ে স্বাধীন রাজা হন। এই বিষয়ে ঠিক কোন উপসংহার উপনীত হওয়া অসম্ভব। এই সময়ের ইতিহাস নানারূপ বিপ্রলাপে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক ইতিহাসবেত্তাই স্বীয় বিভিন্ন মত স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, ফলে এই সময়ের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। প্রক্ষিপ্তা ঘটনাবলী দৃষ্টে আমরা যতটুকু আমাদের দেশের ঐতিহাসিক মূল্য স্থির করিতে পারি, ততটুকুই আমাদের লাভ। আমরা সমস্ত ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আদিশূরের পরলোক গমনের পর বঙ্গদেশে বৌদ্ধগণ প্রবল হইয়া উঠে এবং তখন সমস্ত বঙ্গদেশে ইহাদের অধিকার স্থাপন করে। আদিশূরের সময়ের পর রাজা নরপালের সময় বিক্রমপুরে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপতি দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়। ইহাতে প্রতীয়মান হয় তখন বিক্রমপুরে * বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আমরা বিক্রমপুরের অদূরবর্ত্তী বুড়িগঙ্গার উত্তর পারে তালিপাবাদ পরগণান্তর্গত মাধবপুরে যশপাল, সাভারের নিকটবর্ত্তী কাটবাড়ীতে হরিশপাল, ভাওয়াল অন্তর্গত কাপাসিয়া গ্রামে শিশুপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ লক্ষ্য করিয়া থাকি। সুতরাং ইহাদের প্রভাব যে পঞ্চদশ মাইল দূরবর্ত্তী

ব্যক্তি। তাঁহার প্রতাপে সমুদায় শত্রুকুল নির্ম্মূলপ্রায় হইয়াছিল, তিনি স্বয়ংই বৌদ্ধগণকে গৌড়রাজ্য হইতে দূরীকৃত করেন। ধনঞ্জয় বলিতেছেন তিনি বঙ্গাদি দেশের অধিপতি ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, আদিশূর পূর্ব্ববঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়াই প্রথম পালরাজগণ তথায় অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই।

* বর্ত্তমান বৎসরের 'সুপ্রভাতে' শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার গুপ্ত বিক্রমপুরে বৌদ্ধপূর্ণ প্রবন্ধে মাধবপুর, সাভার ও কাপাসিয়া এই গ্রামত্রয়কে বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি উক্ত গ্রাম সমূহের বিশেষ ভাবে নাম না দিয়া বিক্রমপুরে উক্ত রাজত্রয়ের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হয়ত কোন বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন। যদি ইহা যথার্থ হয় তবে বিক্রমপুরের উত্তর পশ্চিম সীমা একদিন ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বিক্রমপুরেও সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। ইঁহারা মূল পালরাজবংশ ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের পালরাজগণের নামের সঙ্গে ইহাদের নামের সাদৃশ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, ইহারা সমবংশোদ্ভব অথবা অভিন্ন ব্যক্তি। হরিশ্চন্দ্র পালের নাম সংশ্লিষ্ট অনেক দীর্ঘিকা ও স্মৃতিচিহ্নাদি রঙ্গপুরে পরিলক্ষিত হয়। মাধবপুর, সাভার ও কাপাসিয়া গ্রামত্রয়ে উক্ত রাজগণের ধ্বংসাবশেষ ভীষণ জঙ্গলে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে; এস্থানেও দেউলবাড়ীর ন্যায় ইষ্টক স্তূপ ও দীর্ঘিকাদি দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রবাদ অনুসারে উক্ত হরিশ্চন্দ্র রাজার বংশেই বিষয়বিরাগী মাণিকচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাণিক চাঁদ ও গোপীচাঁদের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও সন্ন্যাসের গান আজিও * রঙ্গপুর ও বিক্রমপুরে

* এই পালবংশীয় নৃপতিগণ সম্বন্ধে টেইলার সাহেব নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

The next rulers we hear of, belonged to the Booueahs or Bhuddist Rajas, who imegrated from the western side of India to perform a religious ceremony in one of the rivers lying to the east of the Ganges, and who settled in Dinajpore, Rungpore, and several of the Eastern Districts. The date of the arrival of these chiefs is not known, but it is said to have been at a very remote period and it is probable, that it was as early at last as that of Bikramadit. The Pal dynasty of the kings of Bengal of whom these Booueahs were the ancestors, commenced to reign, it would appear from the Ayeen-Akbery, upwards of 1420 years ago. But it is probable, that before they acquired this ascendency in the country, a considerable period intravened during between the origin imegrants and their descendants possessed only small settlements in the eastern part of the kingdom. Three of the Booueah Rajas took up their abod in the district, and in that portion of it lying to the north of the Booriganga and Dellassery where the sites of their capitals are still to be

যোগিগণের মধ্যে গীত হইয়া থাকে। উক্ত রাজাদ্বয় পালবংশীয় ছিলেন বলিয়াই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র গোপীপাল নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। এই গোবিন্দ চন্দ্র দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সমসাময়িক রাজা ছিলেন। *

দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

বিক্রমপুরে বৌদ্ধযুগের যদি কিছু গৌরব করিবার থাকে তবে এই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি। তমসাচ্ছন্ন অতীত গগন হইতে এই পুণ্য নক্ষত্রটী বিকসিত হইয়া অতীত গৌরবের মধুরস্মৃতি আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত করিতেছে। যে মহা-পুরুষ একদিন পাণ্ডিত্যগৌরবে এবং ধর্ম্মবলে সমস্ত ভারতবাসী—কি হিন্দু বৌদ্ধ—সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যাঁহার নাম একদিন সমস্ত বৌদ্ধকেন্দ্রে প্রচারিত হইয়াছিল, আজও যাঁহার নামে তিব্বতবাসী

seen. Jush Pal residded it Moodubpore, in the Perganneah of Tallipabad, Harishcandra at Catebury near Sabar and Sissod Pal at Capassia in Bhawal. From the similarity existing between the names of these chiefs and these of the Booueahs that settled in Rungpore, it likely that they belonged to one and the same family. The Rungpore branch of Booueah. It is well-known,ruled at one time, the ancient kingdom of Kamrup or Lower Assam of which the district appears to have formed a portion.

* বিক্রমপুরে এই যোগিসম্প্রদায় কতকগুলি আচার ব্যবহারে হিন্দু হইতে অস্বাভাবিক রকম একটী স্বাতন্ত্র্য রক্ষণ করিয়া আসিতেছে। যে সব আচার পদ্ধতি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশ হিন্দুর সহিত এক হইলেও কোন কোন বিষয়ে নিয়মাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, এই যোগিজাতি একদিন বৌদ্ধসম্প্রদায় ছিল এবং তাহারই কোন কোন নিয়ম ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যোগী নামটীও অর্থবোধক। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়িগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমাদের উপরু পতিত হইলে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

লামাগণ অবনত মস্তকে তাঁহার স্মৃতির সম্মাননা করিয়া থাকেন। সেই বৌদ্ধপণ্ডিত দীপাঙ্কর এই উল্লেক্ষিত বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া বিক্রম-পুরকে পাণ্ডিত্য-গৌরবে জগতের সমক্ষে অতি উচ্চস্থান প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

ইনি ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিক্রম-পুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইঁহার আদি নাম চন্দ্রগর্ভ, তিনি যৌবনে অবধূত নেতারির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। জীবাঙ্কর দীপযান শ্রাবকদিগের ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন, স্থাপন অবলম্বীদিগের তিন পিটক মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদিগের দুরূহ ন্যায়দর্শন এবং চারি তন্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তীর্থকদিগের সহিত শাস্ত্রে সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি সাংসারিক সুখভোগ বিসর্জ্জন করেন এবং ধর্ম্ম, ধ্যান ও আধ্যাত্মজ্ঞান সম্বলিত ত্রিশিক্ষা নামক বৌদ্ধদিগের তত্ত্বগ্রন্থ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ইহাতেও তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা পরিতৃপ্ত না হওয়ায়, তিনি উক্ত তত্ত্বগ্রন্থবিষয়ে উপদেশ লাভার্থ কৃষ্ণগিরির বিহারস্থ প্রসিদ্ধ রাহুলগুপ্তের নিকট গমন করেন। এইস্থানে তিনি বৌদ্ধদিগের গুহ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' নাম প্রাপ্ত হন। ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তিনি দণ্ডপুরীর মহাসাঙ্ঘিকাচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষালাভ করিয়া দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধি লাভ করেন। একত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীজ্ঞান উচ্চতম ভিক্ষুপদবী প্রাপ্ত হইলেন এবং ধর্ম্মরক্ষিত তাঁহাকে বোধিসত্ত্বমন্ত্র গ্রহণ করাইলেন। অবশেষে নানা বিষয়ে শিক্ষা হেতু সর্ব্বদা মনের চাঞ্চল্য নিবারণ ও ধর্ম্মে ঐকান্তিকতা লাভার্থ সুবর্ণদ্বীপস্থ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির নিকট গমন করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে উপদিষ্ট হন। তদনুসারে তিনি বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া সুবর্ণ

দ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় দ্বাদশবর্ষকাল বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করিয়া, মনোবৃত্তির উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব লাভ করেন। তৎপরে তিনি বজ্রসত্ত্ব (বোধগয়া) মহাবোধির মঠে আসিয়া বাস করেন। এই সময় তিনি পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মগৌরবে চরমোৎকর্ষ লাভ করেন এবং তাঁহার নাম সমস্ত ভারতবর্ষময় রাষ্ট্র হয়। পরিশেষে তিনি তিব্বতে চলিয়া যান, সেখানে লামাদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী থাকিয়া সমাধি লাভ করেন। তথায় অদ্যও তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। তিব্বতবাসিগণের তিনি এরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, অদ্যাপি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুরু লামাগণ তাঁহার নামে মস্তক অবনত করেন।

এই দীপাঙ্করের সময় বিক্রমপুরে সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশীয় পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দ তাঁহার পরম ভক্ত ছিলেন।

তাঁহার জন্মস্থান বজ্রযোগিনীর অর্চ্চুত্তর, চূড়াইল, সুখবাসপুর, দেবসার প্রভৃতি গ্রামে দেউলবাড়ী অবস্থিত আছে, ইহাতে কি অনুমিত হয় না যে, ঐ সব দেউল বাড়ী কোন না কোন প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্পৃষ্ট ছিল?

শ্রীসুখবিন্দু সেন।

৭৬ সালের মন্বন্তর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৭৭০ খৃঃ শেষ ভাগে, বিভিন্ন স্থান হইতে সরকারী কর্ম্মচারিগণ আপনাদের এলাকাধীন স্থানের অবস্থা কাউন্সিলের গোচর করেন। আমরা নিম্নে কয়েকটী বিশেষ স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি ;—

পূর্ণিয়া :—১৭৭০ খৃঃ ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে পূর্ণিয়ার পরিদর্শক (Supervisor) Mr. Ducarel লিখিয়া পাঠান যে, পূর্ণিয়ার অন্তর্গত চারিটী পরগণা তিনি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া দেখিয়াছেন যে, পরগণাগুলি প্রায় জনশূন্য। গ্রামবাসিগণ বহুদিন অনাহারে থাকিয়া হয় মৃত, না হয় দেশান্তরিত।

যে উর্ব্বরা ভূমিখণ্ডে একদিন অন্নপূর্ণা তাঁহার শ্যামল অঞ্চল বিছাইয়া, দেশ বিদেশের ক্ষুধিতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, আজ তাহা হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি—বিস্তৃত জঙ্গলে পরিপূর্ণ! যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথায় শস্যের চিহ্নমাত্র নাই। এক পূর্ণিয়ায় এই দুর্ভিক্ষে অন্যূন ২০০,০০০ লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

রাজমহল :—১৮শে মার্চ্চ Mr. Harwood বলেন যে, রাজমহলে উৎপন্ন শস্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অতি সামান্য। দরিদ্র রায়তগণের দুর্দ্দশা বর্ণনার অতীত। শক্তিশালী ভূম্যধিকারিগণই সরকারের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া উৎসন্ন গিয়াছে। সরকার নিযুক্ত কালেক্টরগণের উৎকট অত্যাচারে উৎপীড়িত রায়তগণ গৃহদ্বার বিক্রয় করিয়া রাজকর পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

যশোহর :—মিঃ উগারমল কলিকাতার কাউন্সিলে লিখিয়া পাঠান যে, অন্নাভাবে দরিদ্র অধিবাসিগণ উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য খাদ্যাভাবে বৃক্ষপত্র ভোজন করিয়াছে। লাঙ্গল যোত বিক্রয় করিয়া রাজকর পরিশোধ করিতে যাইয়া, তাহারা ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছে। এক মুষ্টি অন্নের জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রকন্যা অবাধে বিক্রয় করিয়াছে।

বীরভূম।—২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৭৭১ খৃঃ Mr. Higgison কাউন্সিলে লিখিয়া পাঠান যে, গত বৎসর বিন্দুমাত্র বারিপাত না হওয়াতে, বীরভূম-বাসীর কষ্টের পরিসীমা নাই। দুর্ভিক্ষের দ্বারা এ স্থানের যে কিরূপ

ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। শত সহস্র গ্রাম প্রাণিশূন্য। জনাকীর্ণ নগর ম্লান, বিগত বৈভব। তাহার সুধাধবলিত মুখরিত প্রাসাদশ্রেণী প্রাণিহীন, নীরব নিস্তব্ধ। সহরে পূর্ব্বেকার তুলনায় এক চতুর্থাংশ লোক আছে কি না সন্দেহ। কৃষাণ অভাবে ধান্যক্ষেত্র সমূহ অনাবাদে পড়িয়া রহিয়াছে।

পাটনা।—Mr Alexander (Supervisor of Beher) সিতাব রায়ের সহিত পাটনা নগরীর অবস্থা পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইয়া অবগত হন যে, এক পাটনা নগরীতে প্রত্যহ ৬০ জন অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তি অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রায় ৮০০০ ভিক্ষুককে সহরে অন্নের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে, তিনি স্বচক্ষে দর্শন করেন। দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দিতে যাইয়া তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার বদান্যতার সন্ধান পাইয়া, পঙ্গপালের ন্যায় ভিক্ষুকগণ দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে। দরিদ্রগণের অনশন-ক্লেশ দূর করিবার জন্য মহারাজ সিতাব রায় Mr. Alexanderকে দুই লক্ষ টাকা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ক্ষুধিত দরিদ্র ভিক্ষুককে দান করিয়া ২০০,০০০ টাকা নষ্ট করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

বেহার।—১৭৭০ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর Mr Grose লিখিয়া পাঠান যে, বেহারে সামান্য বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও, দেশের নানা স্থান অকর্ষিতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। কারণ নিরন্ন কৃষকগণ বহুপূর্ব্বে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। দেশে যে কতিপয় কৃষক অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগের দ্বারা কৃষিকার্য্যের কোনরূপ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই।

রংপুর।—রংপুরের সুপারভাইজারের পত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অনশনক্লিষ্ট কৃষকগণের হৃদয়বিদারক হাহাকার একান্ত অসহনীয় হইয়া উঠাতে রিলিফ কার্য্য খোলা হয়; এবং প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলের আদেশে ৪০০,০০০ লোকের মধ্যে প্রত্যহ পাঁচ টাকার খাদ্য

বিতরণ করিয়া, ইংরাজ কোম্পানী অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা দূর করিতে সচেষ্ট হন।

দিনাজপুর। এই ৭৬ সালের মন্বন্তরে দিনাজপুরের অধিকাংশ স্থান প্রাণশূন্য হইয়া জঙ্গলে পরিণত হয়। দিনাজপুরের রাজা এই সংবাদ ইংরাজ কোম্পানীকে অবগত করিয়া তাঁহার প্রাপ্য কর হ্রাস করিয়া এই দুঃসময়ে তাঁহার প্রতি অনুকম্পা করিবার জন্য এক আবেদনপত্র কাউন্সিলে প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত পত্রে জানান যে, কৃষাণ অভাবে ক্ষেত্রসমূহে বীজ রোপিত হইতে পারিতেছে না। দেশে যে কতিপয় কৃষাণ দুর্ভিক্ষের প্রতাপ সহ্য করিয়া জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের শস্য বপন করিবার ধান্য নাই, ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিবার সামর্থ্য নাই, ভূমি কর্ষণ করিবার উপযুক্ত লাঙ্গল, যোত ও বলদ তাহারা পূর্ব্বে বিক্রয় করিয়া সরকারী খাজনা দিয়াছে। সুতরাং এখন তাহারা কি লইয়া কর্ষণ করিবে?

দিনাজপুরের রাজস্ব তৎকালে বার্ষিক ১৩,৭০,৯৩১৲ টাকা ছিল, এবং রাজা ১২০০,০০০৲ টাকা সরকারে প্রেরণ করিয়া অবশিষ্ট অর্থ “রেহাই” দিবার জন্য উক্ত অনুরোধ পত্র কাউন্সিলে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার পত্র পাইয়া কাউন্সিল এই মতে উপনীত হন যে, যদ্যপি তিনি অঙ্গীকৃত অর্থ কড়ায় গণ্ডায় সরকারে জমা দিতে অপারগ হন, তবে তিনি তাঁহার জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়া ভবিষ্যতে ইংরাজ কোম্পানীর নিকট দেনাদার ও বন্দিরূপে প্রতিপন্ন হইবেন।

উপরিলিখিত ঘটনা সমূহ হইতে পাঠকগণ ৭৬ সালের ভীষণতা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহার বিস্তৃত ইতিহাস নাই। ইংরাজ ক্লাইবের জীবনী ও ইংলণ্ডাধিপতির বংশ তালিকা দিয়া, ইতিহাসে যে কতিপয় পৃষ্ঠা অবশিষ্ট ছিল, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ দয়া করিয়া, তাহাতে যে কতিপয় বাক্য যোজনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে

গিয়া হৃদয়ে নানারূপ প্রশ্নের উদয় হয়। কিন্তু সে সমুদয় প্রশ্নের সমাধানের উপযুক্ত ঐতিহাসিক উপাদান আজিও সংগৃহীত হয় নাই। কখন হইবে কিনা, কে বলিতে পারে ?

যে সময় অনশনে দেশের অর্দ্ধাংশ লোক মুমূর্ষু, সে সময় ইংরাজ কোম্পানী নিরন্ন কৃষকগণের জন্য কি উপায় উদ্ভাবন করেন, আমরা এইবার তাহার আলোচনা করিব। দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভেই জানুয়ারী মাসেই কৌন্সিলে ইহা ঠিক হইয়া যায় যে, দেশের প্রজাবৃন্দকে রাজকরভারে প্রপীড়িত করিয়া তাহাদের ক্লেশ বৃদ্ধি করা উচিত নয়। সুতরাং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান বিভাগের রাজস্ব হইতে তিন লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষের বৎসরে "রেহাই" দিবার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, ইংরাজ কোম্পানী তিন লক্ষ টাকার মায়া চিরকালের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা অনুমান করেন যে, এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে যদি তিন লক্ষ টাকা সংগৃহীত না হয়, তবে আগামী বৎসর সুজন্মা হইলে, বাৎসরিক রাজস্বের সহিত এই তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইবে। কি বদান্যতা! কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে কর্ম্মবীরের এই বদান্যতাও বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

পাঠক! আমরা রুক্ষকেশ কোটরান্তর্গত চক্ষু কঙ্কালময় দেহ বঙ্গবাসীর আলোচনা করিয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে, প্রত্যহ শত শত হতভাগ্য লোক সকল অনশনে মৃত্যুর শক্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কোনস্থানে অনশনক্লিষ্ট জননী স্নেহ পুত্তলী মুমূর্ষু সন্তানকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় আহারান্বেষণে ছুটিয়াছে, কোন স্থানে শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি জীব সকল দিবালোকে মৃত, অর্দ্ধমৃত অথবা চলচ্ছক্তিহীন ব্যক্তিগণকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিক যেন নিরাশার গাঢ় মেঘ বঙ্গদেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। গ্রামসকল পরিত্যক্ত অথবা ক্রন্দনরোলে মুখরিত ; বসু-

ন্ধরা শবপরিপূর্ণা। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের বিকট তাড়নে যেন বঙ্গদেশ মুহ্যমান দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের হৃদয়মথনকর আর্ত্তনাদের বিরাম নাই। কিন্তু ইহাই কি সমস্ত বঙ্গের অবস্থা? যে নদীমালিনী বঙ্গভূমি শস্যপসরা মস্তকে বহুবৎসর ধরিয়া জগতের পণ্যবীথিকায় উদ্‌বৃত্ত শস্য-রাশি বিক্রয় করিয়াছে, যে বঙ্গভূমি সুজলা সুফলা বলিয়া জগতে পরিচিতা, যাহার উদ্‌বৃত্ত শস্যে পৃথিবীর বহুপ্রাণী অদ্যাপি জীবনধারণ করিতেছে, সেই চির উর্ব্বরা বঙ্গভূমি কি (?) সত্যসত্যই উৎপাদিকা শক্তি হারাইয়াছিল? তাহার শস্যভাণ্ডার কি সত্যসত্যই নিঃশেষ হইয়াছিল?—বঙ্গজাত শস্যে কি বাস্তবিক বঙ্গবাসীর উদর পূর্ণ হইত না? কুহেলিকাময় অতীতের অন্ধকারে ও অসারহৃদয় ব্যক্তিগণের আবর্জ্জনা-পূর্ণ প্রাগ্ভারে সত্যের দীপ্তশিখা মুহ্যমান দূরাগত সঙ্গীতের অস্ফুট স্বরের ন্যায়, আজ প্রায় দেড় শত বৎসরের সুদূর অতীতের যবনিকা করিয়া তাহার অস্পষ্ট আলোকসম্পাতে, ঐতিহাসিকের কল্পনায় এক অভিনব চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিতেছে। আজ দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, যখন বঙ্গমাতা পুণ্যাহ নবান্নের দিনে, তাঁহার মৃন্ময় পাত্র সজ্জিত করিয়া বঙ্গবাসীর সম্মুখে ধরিয়াছিল, বঙ্গবাসী দেখিল যে পাত্র, অন্য বৎসর তুলনায় নিরাভরণা ও অকিঞ্চিৎকর হইলেও, মাতৃপ্রেমের সুধাসলিলে পরিপক্ব অন্ন জঠরজ্বালা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট; পবিত্র মাতৃ-করস্পর্শে যাহা কদন্ন ছিল, তাহা উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। হতভাগ্য বঙ্গবাসী কৃতজ্ঞতার অশ্রু সলিলে সিক্ত হইয়া, সেই পুণ্য অন্ন মস্তকে ধারণ করিল। কিন্তু হায়! বিধির কি বিড়ম্বনা! তাহাদের পরিশ্রমোৎপন্ন অন্ন হইতে অনিচ্ছায় অমানুষিকভাবে তাহারা যেরূপ ভাবে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহা বড়ই বিস্ময়-কর। আমরা সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করিতেছি।

যে সময়কার কথা বলিতেছি, সে সময় বঙ্গদেশে এক শ্রেণীর শক্তিশালী ইংরাজ দৃষ্ট হইত। তাহারা ইংরাজ কোম্পানীর অপেক্ষা

অনেক বিষয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। ইহারা বেনিয়ান নামে অভিহিত হইত। ইংরাজ কোম্পানীর শক্তি যত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, বেনিয়ানদিগের ক্ষমতা ততই বাড়িতে লাগিল। ইহারা ইংরাজ কোম্পানীর নামে নানাব্যবসায় তত্ত্বাবধান করিত, এবং বাণিজ্য ব্যাপারে ইহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। বেনিয়ানরা কখন দোভাষীর কার্য্য, কখন হিসাব রক্ষা প্রভৃতি নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহারা নানা কার্য্যে নানা উপায়ে দরিদ্র প্রজাগণের অর্থ শোষণ করিত। মানুষের কল্পনায় এমন কোন কুৎসিৎ উপায় আসিতে পারে না, যে কার্য্যে অর্থের সম্ভাবনা স্বত্বেও তাহারা পশ্চাৎপদ হইত। ইহারা এতই দুর্দ্ধর্ষ ছিল যে, হেষ্টিংস ইহাদিগকে দৈত্যনামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও কিছু বলিলে, বঙ্গের সমগ্র বেনিয়ানকুল একত্র হইয়া তাহার তীব্রতর প্রতিবাদ করিত। ইহারা যে কত উপায়ে প্রজার সর্ব্বনাশ করিত, তাহার কল্পনা করাও কষ্টকর। ইহারা প্রজার অর্থ শোষণ করিত, তাহাদিগের যোত বলদ বিক্রয় করিয়া লইত এবং লবণ, তামাক ও চাউল প্রভৃতি এক চেটিয়া ব্যবসায় তাহারা বাংলায় অবাধে চালাইত। যদি কোন দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসীর গৃহে চাউলের সন্ধান তাহারা পাইত, তবে ছলে, বলে, কৌশলে অর্দ্ধমূল্যে বা বিনিময়ে ইহারা উক্ত চাউল ক্রয় করিয়া লইত। Auber's British Power গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই দুর্বৎসরে যাহাতে দেশের সমস্ত চাউল প্রথমতঃ তাহাদিগের হস্তগত হয় ও দ্বিতীয়তঃ তাহারা উক্ত চাউল অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিতে পারে, এই জন্য তাহারা সমুদয় চাউল ক্রয় কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল। ভয় ও নানা অসৎ উপায়ে কৃষকগণকে বশীভূত করিয়া তাহারা দরিদ্র প্রজাগণকে তাহাদিগের বীজ শস্য পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছিল; একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া গ্রামবাসিগণ গৃহদ্বার ত্যাগ করিয়া পলায়ন

করিত। যেরূপ মরিচিমালিনী তাহার সহস্রকর বিস্তার করিয়া, জলাশয় হইতে জল শুষিয়া লয়, সেইরূপ বেনিয়ানগণের নানা উপায়ে বঙ্গের শস্য রাশি যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইতে লাগিল—বাংলার শস্য ইংরাজের হস্তগত মৃন্ময় আধারের পরিবর্ত্তে সুধাধবলিত ইষ্টকাগারে সঞ্চিত হইতে লাগিল। দয়ালু ইংরাজগণের ভবনে প্রচুর শস্য সঞ্চিত আছে অবগত হইয়া, বুভুক্ষিত বঙ্গবাসী, সাহায্য প্রাপ্তির আশায় শ্বেত চরণতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রত্যহ শত শত কঙ্কালসার ব্যক্তি দেহখানিকে যষ্টি-মাত্রে ভর করিয়া, বিলাস নিক্কনমুখরিত, বিস্তৃত, উন্নত স্ফটিক হর্ম্ম্যের দ্বারদেশে অতিকষ্টে টানিয়া আনিয়া, দীননয়নে, যুক্তকরে মুক্তবাতায়ন পথে দাঁড়াইয়া নিশা যাপন করিত। প্রত্যহ প্রভাতে শত শত ব্যক্তির মৃত-দেহ রাজপথে পড়িয়া থাকিত: অনশন ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া অভাগাদের প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া অনন্তের কোলে মিশাইত। অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের চীৎকারে বিলাসের ব্যাঘাত ঘটাতে প্রতিহারীর শাসনে কোন হতভাগ্য ব্যক্তির জীবনলীলা শেষ হইত কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু প্রত্যাশগণ যে নিতান্তই নিষ্ফলতা মাত্র লাভ করিয়া, অবশেষে এই শ্বেতপুঙ্গবদিগের দ্বারদেশে আপনাদিগের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনকে শক্তিময় মৃত্যুর ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিত, ইহা ইংরাজ চরিত্র বর্ণনাচ্ছলে ইংরাজ কর্ত্তৃকই বিবৃত হইয়াছে। (An Enquary into our National Conduct) আর যে বিলাসিতায় প্রত্যহ প্রচুর ব্যয়িত হইত, যদি ইংরাজেরা তাহার এক অংশ দরিদ্র ব্যক্তিগণের জন্য ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে শত শত ব্যক্তি মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইত, একথাও প্রকাশ পাইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্বিপ্লব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কথা-প্রসঙ্গে কন্যার শারীরিক অবস্থা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বাতজ্বরে স্নান করিবার উপদেশ দিলেন এবং জল উষ্ণ করিবার ছলনায় নিজে সম্মুখে দাড়াইয়া ভৃত্যগণকে ঐ পাত্রের নিম্নে অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ করিলেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐ হতভাগ্য মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ ঐ স্থানেই কন্যার সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিলেন। অপর একস্থানে এইরূপ আরও এক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। নজর খাঁ নামক তাঁহারই এক সভাসদ শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহার বীরত্ব ব্যঞ্জক অবয়ব বস্তুতই লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিত। সাহসিকতা ও জ্ঞান-গরিমার জন্য এই যুবক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কন্যা বেগম সাহেবার সহিত ইহার গুপ্ত প্রণয়ের সংবাদ অবগত হইয়া, শাহ্‌জাহান ইহাকে স্বীয় সমক্ষে আহ্বান করেন ও অত্যন্ত সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে যে তাম্বূল উপহার দেন, তাহা ভক্ষণ করিয়া এই হতভাগ্য যুবককে আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় নাই, পথি মধ্যেই তাহাকে স্বীয় পালকী অভ্যন্তরে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইতে হইয়াছিল।

শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয়া কন্যা—রোশেনারা বেগম, বেগম সাহেবার ন্যায় সৌন্দর্য্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। ইনি ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় চিরপ্রফুল্লা হাস্যকৌতুক প্রিয়া ছিলেন।

২য় কন্যা রোশেনারা

সর্ব্ববিষয়ে ঔরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করিতেন বলিয়া দারাও বেগম সাহেবার অপ্রিয় ছিলেন এবং পিতার নিকট প্রতিপত্তি না থাকায়, রাজ্যসংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই ইঁহার অধিকার ছিলনা; কাজেই ইঁহার গৃহে বেগম সাহেবার ন্যায় ধন রত্নের আধিক্য

দেখা যাইত না। ইঁহার নিযুক্ত অসংখ্য গুপ্ত চর ইঁহাকে রাজ্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ আনিয়া দিত এবং তিনি তদ্দ্বারা ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবকে সময়োপযোগী সংবাদ প্রদান করিয়া, সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেন।

বিদ্রোহের পূর্ব্বে পুত্রগণের মানষিক অবস্থা।

পুত্রগণের বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবার কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই বৃদ্ধ সাহাজাহান তাহাদিগের আন্তরিক অবস্থা কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহাদের হস্তে জীবন নিরাপদ নহে। তিনি দেখিলেন, তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে সদ্ভাব নাই, পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছে। সকলেই সম্রাটের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এই বাহানায় গোপনে স্ব স্ব দলের পুষ্টি সাধন করিতেছে। সকলেই প্রবল, সকলেরই ভারত সিংহাসনের প্রতি সলোলুপ দৃষ্টি। গোয়ালিয়রের দুর্গে * ইহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব। সম্রাট একেবারে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, এই সকল রাজকুমারগণকে স্বীয় সমক্ষে রাখিয়া ভবিষ্যতে তাহাদের পরস্পর বিচ্ছেদ (রক্তারক্তি সন্দর্শন করা) অপেক্ষা দূরে প্রেরণ করাই সঙ্গত। তিনি তজ্জন্য তাঁহার ২য় পুত্র

বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্ত্তারূপে পুত্রগণকে প্রেরণ।

সুলতান সুজাকে বঙ্গদেশে, ঔরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যে এবং কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদকে গুজরাটে শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরণ করিলেন, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দারার হস্তে মুলতানের ভার অর্পণ করিলেন। দারা ব্যতীত সকল ভ্রাতৃ-

* গোয়ালিয়রের উচ্চ দুরারোহ শৈলে এই গিরি দুর্গ অবস্থিত। এই স্থানেই মোগল রাজবংশের দুর্বিনীত রাজকুমারগণকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। Rambles and Recollections—Sleeman p. 330 Chap. XXXVII Archaebl survey reports Vol. II. p. 369.

গণই সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব স্ব ভারপ্রাপ্ত রাজ্যে চলিয়া গেলেন। সকলেই তথায় অর্থ এবং রাজ্য রক্ষাবেক্ষণের উছিলায় সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দারা সম্রাটের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সম্রাটের নিকটই রহিলেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর দারা তাঁহার সিংহাসনে উপবেশন করেন, ইহা তাঁহারও অনভিপ্রেত ছিল না; সুতরাং তিনি রাজ্যের অধিকাংশ কার্য্যের ভার তাহার উপর অর্পণ করিলেন। এই স্বল্প সময় ভারতবর্ষ দুইজন সম্রাট্ কর্ত্তৃক শাসিত হইত বলা একেবারে অসঙ্গত হয় না। দারা পিতার অনুগত হইলেও, সময় সময় তাঁহাদের মতান্তর উপস্থিত হইত এবং শাহ্জাহান অনেক বিষয়ে দারাকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাছে তিনি বিষ প্রয়োগে জগত হইতে অপসারিত হন, তজ্জন্য একান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে এই সময় শাহ্জাহান তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেবকে গোপনে পত্রাদি লিখিতেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ঔরঙ্গজেবের ক্ষমতার উপর সম্রাট্ শাহ্জাহানের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং রাজ্য শাসনের পক্ষে ঔরঙ্গজেব যে উপযুক্ত, সে বিষয়ে তাঁহার কিছু মাত্র সন্দেহ ছিল না।

ঔরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণের পর গোলকণ্ডার ঘোরতর রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। তথাকার উজীর ও সৈন্যাধ্যক্ষ মিরজুম্লা একান্ত সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। রাজকীয় সৈন্যব্যতীত তাঁহার অধীনে কতকগুলি ফিরীঙ্গি * গোলন্দাজসৈন্য সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞাবাহী ছিল। তিনি এই সকল সৈন্যের সাহায্যে দেশদেশান্তর হইতে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিতেন; বিশেষতঃ কর্ণাটরাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহু পুরাতন মন্দির ও মস্জেদ্ ধ্বংস করিয়া বহু অর্থাহরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাণিজ্যেও তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হইত। গোলকণ্ডার অধিপতি তাঁহার এই ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া এবং তাঁহার প্রতি তাঁহার মাতার

দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্র-বিপ্লব ও মীরজুম্লা।

অস্বাভাবিক অনুরাগের বিষয় অবগত হইতে পারিয়া, গোপনে তাঁহার অনিষ্ঠ সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। সম্প্রতি এইরূপ এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল যে, গোলকণ্ডাধিপতি আর তাঁহার মনোভাব গোপন রাখিতে পারিলেন না। গোলকণ্ডাধিপতির জননী উহা সত্বর কর্ণাট প্রদেশে মীরজুমলাকে জ্ঞাপন করিলেন। মীরজুম্লা আত্মরক্ষার্থ সবিশেষ যত্নবান হইলেন। তাহার স্ত্রীপুত্র সেই সময় গোলকণ্ডায় অবস্থান করিতেছিলেন। মীরজুম্লা শিকারের ছলনায় পুত্র আমীর খাঁকে গোলকণ্ডা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আসিতে উপদেশ দিলেন। গোলকণ্ডা অধিপতির সতর্কতায় পুত্রের ঐরূপ পলায়ন অসম্ভব হইল। মীরজুম্লা প্রমাদ গণিলেন ও ঔরঙ্গজেবের স্মরণাপন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন ঔরঙ্গজেব যদি তাঁহার পরামর্শগ্রহণ করেন, গোলকণ্ডা নিশ্চয়ই ঔরঙ্গজেবের করতলগত হইবে। মীরজুম্লার পরামর্শে ঔরঙ্গজেব ৫০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ গোলকণ্ডার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে জনরব রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, সম্রাট, শাহজাহানের দূত বিশেষ কোন পরামর্শের জন্য গোলকণ্ডার অধিপতি বাগনগরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। দাবীর নামক গোলকণ্ডার জনৈক অমাত্য তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য-সাধনে সাহায্য করিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। ঔরঙ্গজেব এইরূপে বাগনগরে উপনীত হইলে, রাজা তাহার দুরভিসন্ধি কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া, তাহাকে এক বাগান বাটীতে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। ঔরঙ্গজেবের নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ জন গুর্গনদেশীয় দাস তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিলে, রাজা তাহার জনৈক অমাত্যের সতর্কতায় বাগান-বাটী পরিত্যাগ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে একেবারে অদূরবর্ত্তী গোলকণ্ডার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মীরজুম্লার ষড়যন্ত্র।

ঔরঙ্গজেব উদ্দেশ্যসাধনে এইরূপে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া অবিলম্বে রাজ-

প্রাসাদ আক্রমণপূর্ব্বক সমস্ত ধন-রত্ন ও বহুমূল্য তৈজসাদি লুণ্ঠন করিয়া লইলেন এবং রাজার অন্তঃপুরস্থ মহিলাবর্গকে সসম্মানে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। পরে গোলকণ্ডার দুর্গ আক্রমণ করিয়া দুইমাস কাল উহা অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখেন এবং দুর্গাধিপতি যখন উহা রক্ষা করিবার আর উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন শাহ্‌জাহানের আদেশমত পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করেন। শাহ্‌জাহানের এই আদেশের মূলেও দারা এবং তদীয় ভগিনী বেগম সাহেবা ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব এই দুর্গ অধিকার করিতে পারিলে, এতদূর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিবেন যে, তাঁহাকে দমন করা ভবিষ্যতে তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হইবে।

গোলকণ্ডার দুর্গ আক্রমণ।

শাহ্‌জাহানের আদেশ প্রাপ্তির পর, ঔরঙ্গজেব গোলকণ্ডার অধিপতির সহিত নিম্নলিখিত মর্ম্মে সন্ধি স্থাপন করেন। গোলকণ্ডার প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রাদিতে সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের নাম অঙ্কিত থাকিবে। মীরজুম্লার স্ত্রীপুত্র আত্মীয়স্বজনকে মীরজুম্লার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় ঔরঙ্গজেবকে প্রদান করিতে হইবে।

গোলকণ্ডাধিপতির সহিত সন্ধি-সংস্থাপন।

সন্ধি সংস্থাপিত হইবার পর, ঔরঙ্গজেব যখন মীরজুম্লা সহ দৌলতাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে বিজাপুরের অন্তর্গত বিদার ইঁহারা অধিকার করেন এবং দৌলতাবাদে আসিয়া ইঁহারা উভয়ে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সখ্যতাই ভবিষ্যতে ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করে। ঔরঙ্গজেবের সৌভাগ্যরেখার প্রথম অঙ্কন, এই সখ্যতা হইতেই আরম্ভ হয়।

মীরজুম্লা ও ঔরঙ্গজেবের সখ্যতা।

এদিকে দারা সম্রাটের প্রিয় ওমরাহ সাদুল্লা খাঁর সহিত অত্যন্ত

দুর্ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই ওমরাহ দ্বিতীয় সহোদর সুলতান সুজার একান্ত অনুরক্ত ও তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সাদুল্লা যেরূপ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, ভবিষ্যতে ইনি সুলতান সুজার পক্ষ অবলম্বন করিলে, দারার পক্ষে সিংহাসনে আরোহণ করা বড় সহজ হইবে না, ইত্যাদি মনে করিয়াই হউক অথবা সাদুল্লা মোগলের হস্ত হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া পুনরায় পাঠানদিগের হস্তে উহা অর্পণ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহার শত্রুমুখে ইহা অবগত হইয়াই হউক, দারা তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে এ জগত হইতে চিরদিনের মত অপসারিত করিলেন। বস্তুতঃই এই প্রবাদের মূলে কতটা সত্য নিহিত আছে, দারা তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়াও দেখিলেন না। সম্রাট্ সদনে সাদুল্লার প্রতিপত্তি যে তাঁহার কত শত্রু সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। এই সকল শত্রুর প্রচারিত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া, দারা এইরূপ গুরুতর ঘটনা সংঘটিত করায়, সম্রাট্ অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হন।

সাদুল্লার হত্যা।

ঠিক সেই সময়ে মীরজুম্লা বহুমূল্য উপঢৌকন সহ সম্রাট্ সদনে উপস্থিত হন। এই উপঢৌকন মধ্যে সুবিখ্যাত সুবৃহৎ হীরকখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, শাহ্‌জাহান বস্তুতঃই প্রীতিলাভ করেন। গোলকণ্ডার হীরকের তুলনায় কান্দাহারের রত্নরাজি প্রস্তরসদৃশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল বহুমূল্য হীরকের লোভেই হউক বা দারার প্রতি পূর্ব্বোক্ত কারণে অসন্তোষ হেতুই হউক, সমাট্ মীরজুম্লার প্রার্থনা মত গোলকণ্ডা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্য প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য, মীরজুম্লার সাহায্যার্থে একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দারা দেখিলেন, এইরূপ সৈন্য প্রেরণ করিলে ঔরঙ্গজেবের বল ভবিষ্যতে অত্যন্ত

সম্রাট্ সদনে মীরজুম্লার আগমন।

দাক্ষিণাত্যে সৈন্য-প্রেরণ।

বৃদ্ধি পাইবে, তিনি তজ্জন্য ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ কিছুতেই তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে স্থির হইল, ঔরঙ্গজেবের এই সৈন্য পরিচালনে কোন ক্ষমতা থাকিবে না; যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না; তিনি শুধু দৌলতাবাদের শাসনকর্ত্তারূপে তথায় অবস্থান করিবেন, মীরজুম্লাই এই সকল সৈন্য পরিচালনা করিবেন, বিশ্বাসের জন্য মীরজুম্লা তাঁহার পরিবার সম্রাট্ সকাশে রাখিয়া যাইবেন। মীরজুম্লা প্রথমে এইরূপ প্রস্তাবে বিশেষতঃ শেষ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। পরে শাহ্‌জাহানের অভয়বাণীতে সন্তুষ্ট হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সম্রাট্ শাহ্‌জাহান বলিয়াছিলেন, যত সত্বর সম্ভব তাঁহার স্ত্রী-পুত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইবে। পথিমধ্যে মীরজুম্লা বিজাপুরের প্রসিদ্ধ স্থান কলগনী অধিকার করেন।

সমগ্র হিন্দুস্থানের যখন এই প্রকার অবস্থা, সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের পুত্রগণ মধ্যে যখন বিদ্বেষবহ্নি ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল, বৃদ্ধ সম্রাট্ তখন হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দেশ দেশান্তরে এই সংবাদ দ্রুত প্রচারিত হইয়া পড়িল। সমগ্র হিন্দুস্থান ভয়ে ও বিপদাশঙ্কায় কালাতিপাত করিতে লাগিল। সম্রাট্-তনয়গণ স্ব স্ব স্থানে সৈন্য সংগ্রহ ও দলপুষ্টি সাধনে যত্নবান হইলেন। সুদূর বঙ্গদেশ হইতে গুজরাষ্ট্র, দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্য সর্ব্বত্রই অস্ত্রের ঝনঝনি, গুপ্ত পরামর্শ, যুদ্ধের ব্যগ্রতা দেখা যাইতে লাগিল। স্বার্থের সংঘর্ষণে ভীষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে ভ্রাতৃবর্গের ষড়যন্ত্র মূলক কতকগুলি পত্র দারার হস্তগত হয়। তিনি ও বেগম সাহেবা সেইগুলি পীড়িত বাদশাহের নিকট উপস্থিত করিয়া, তাঁহাকে পুত্রগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে যত্নবান্ হইলেন। বৃদ্ধ সেদিকে বড় কর্ণপাত করিলেন না, বরং তিনি সে সময়ে আরও ভীত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি দারাকে

সম্রাটের পীড়া।

সন্দেহের নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে তৎকর্তৃক পাছে বিষপ্রয়োগে বিনষ্ট হন, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি পুত্র ঔরঙ্গজেবকে যে একখানি পত্র প্রেরণ করেন, তজ্জন্য দারা ক্রোধান্ধ হইয়া, তাঁহাকে কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অতঃপর শাহ্‌জাহানের পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হঠাৎ না জানি কেমন করিয়া একদিন সম্রাটের অলীক মৃত্যু-সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল সমুত্থিত হইল। ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য কিছুদিনের জন্য স্থগিত হইল।

সম্রাটের অলীক মৃত্যু সংবাদ।

দরবারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। হিন্দুস্থান যুদ্ধবিগ্রহ ভীষণ রক্তপাত দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সম্রাটের পুত্রগণ রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের অদৃষ্ট-লিপি বড় ভয়ঙ্কর; হয় তাঁহারা মণিমুক্তাখচিত ভারতের ময়ূর-সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, নতুবা ঘাতকের শাণিত কৃপাণের নিম্নে তাঁহাদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইবে। মোগলবংশের বুঝি ইহাই চিরন্তন প্রথা ছিল। যিনি যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন, তিনিই তখন এইরূপে তাঁহার পথের কণ্টক অপসারিত করিয়াছেন। সম্রাট্ সাহাজাহানও এইরূপে ভ্রাতৃহত্যা করিয়া স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত।

মহারাজ সুসঙ্গের সামাজিক নায়কত্ব-লাভ।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুসুঙ্গের প্রাচীন রাজবংশ সর্ব্বত্র পরিচিত। এই বংশের সামাজিক উন্নতি কিরূপে সাধিত হইয়াছিল, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সম্রাট্ শ্রেষ্ঠ আকবরশাহের রাজত্বকালে সুসুঙ্গ রাজবংশে মল্লিক জানকীনাথ স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। Lethbridge সাহেব তাঁহার Golden Book of India তে লিখিয়াছেন :—Prior to the reign of Emperor Jahangir they seem to have been altogether independent, and had little or no intercourse with the Mahomedan conquerors of Bengal, some of these early chiefs bearing the style or title of 'Mallik.' উক্ত জানকীনাথ একদিকে নীতি নৈপুণ্যে যেমন রাজ্যের আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধন করেন, অন্য দিকে তেমনই সামাজিক গৌরব ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন।

সুসুঙ্গের রাজবংশ উচ্ছরথিগ্রামীণের নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয় ছিলেন। জানকীনাথের পূর্ব্বে বুদ্ধিমন্ত খাঁ শ্রেষ্ঠতম কুলীনের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইলেও, আসাম প্রদেশে অবস্থানহেতু সামাজিক গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। সংসারে পরশ্রীকাতর নিন্দুকের অভাব নাই, অন্যের দোষান্বেষণে এবং দোষ কীর্ত্তনেই অনেকে তৃপ্ত লাভ করিয়া থাকে। সুসুঙ্গ রাজবংশীয়েরা ক্রমশঃ উন্নতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন দেখিয়া, ঐ সকল নিন্দুকের দল বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, অন্য কোনও উপায়ে তাঁহাদিগকে নিন্দিত ও অপদস্থ করিবার সুযোগ না থাকায়, সামাজিক

হীনতার কথা কীর্ত্তন করিত। তাঁহারা কনৌজী ব্রাহ্মণ, আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের সংস্রব নাই, ইত্যাদি নানারূপ কথায় তাঁহাদের গৌরব লাঘবের চেষ্টা করিত।

মল্লিক জ্ঞানকীনাথ ঐ সকল নিন্দার কথা শুনিয়া, স্বীয় কুলগত দোষ বড়ই তীব্রভাবে অনুভব করিলেন। এবং কুলগত ত্রুটির নিরসন ও ও সামাজিক মর্য্যাদা বর্দ্ধনের জন্য, তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথের এক বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। কোনও সমাজপতি শ্রেষ্ঠ কুলীনের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া কুলোন্নতি করিবার জন্য, তাঁহার আগ্রহ জন্মিল। কমল লাহিড়ী নামক একজন সম্ভ্রান্ত কুলীন সমাজের প্রধান ছিলেন। তাঁহার পৌত্র রামচন্দ্র লাহিড়ীর সহিত ভ্রাতৃকন্যার বিবাহ দিবার জন্য, জ্ঞানকীনাথ চেষ্টিত হইলেন; ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিল, অনেক বাধা বিঘ্ন ঘটিল। কিন্তু অর্থের অসাধ্য কার্য্য নাই। জ্ঞানকীনাথ প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া, অভীপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। রাম লাহিড়ীর সহিত ভ্রাতৃকন্যার বিবাহ হইয়া গেল।

শুভক্ষণে শুভবিবাহ হইল বটে, কিন্তু যে আশায় জ্ঞানকীনাথ অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, কমল লাহিড়ীকে সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিঘ্ন ঘটিল। কমল লাহিড়ী নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয়ের সহিত সংস্রব রাখিতে অস্বীকার করিলেন। জ্ঞানকীনাথ তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য, অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; অগত্যা জ্ঞানকীনাথ স্বীয় সর্ব্ববিধ শক্তিপ্রয়োগে কমল লাহিড়ীকে আয়ত্তাধীন করিতে উদ্যত হইলেন। কমল লাহিড়ী মহা তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, "যদুনাথী অবসাদ বা দোষ" বশতঃ কুলপাত ভয়ে পৌত্রকে ত্যাগ করিলেন এবং পাঁচ জন কুলীন সহ দেশত্যাগ করিয়া পদ্মার পরপারে ভূষণা পরগণার রাজা কুমুদের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পৌত্র রামচন্দ্র লাহিড়ী নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয় যদুনাথের কন্যা

বিবাহ করায়, "যত্নাথী অবসাদ বা দোষ" গ্রস্থ বলিয়া কুলীন সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন।

মল্লিক জানকীনাথ এইরূপে ব্যর্থ সঙ্কল্প হইয়া, বড়ই বিষণ্ণ ও ক্ষুণ্ণ হইলেন; কি উপায়ে যত্নাথী অবসাদ বা দোষের সংশোধন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে প্রধান প্রধান কুলীন ও কুলজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ব্যবস্থা দিলেন, যদি কমল লাহিড়ী স্বীয় পৌত্রকে গ্রহণ করেন এবং বারেন্দ্র কুলনায়ক তাহিরপুরের রাজা বা রাজপুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে পারেন, তবে সর্বসম্মতিক্রমে যত্নাথী অবসাদের নিরসন হইতে পারে।

জানকীনাথ এইবার পথ পাইলেন। তাঁহার শক্তি, ধন, ঐশ্বর্য্য, প্রতিপত্তি প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিলনা, তাহিরপুরের রাজবংশে কন্যা দান করিবার জন্য, তিনি স্বীয় সমস্ত শক্তি ক্ষয় করিতে প্রস্তুত হইলেন। অধ্যবসায়শীলের কোন কার্য্যই নিষ্ফল হয়না। জানকীনাথ অচিরেই সফল কাম হইলেন। তাহিরপুরের রাজা ইন্দ্রজিত বাকী রাজস্বের জন্য, ঢাকা নগরীতে কারারুদ্ধ ছিলেন। জানকীনাথ এই সংবাদ অবগত হইয়া বাকী রাজস্ব প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে কারামুক্ত করেন এবং ভ্রাতুষ্কন্যা বিবাহের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিয়া, স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করেন। রাজা ইন্দ্রজিত অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন, যদি কমল লাহিড়ী তাঁহার পৌত্রকে গ্রহণ করেন, তবে আমি নিশ্চয়ই আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিব।

এইবার কমল লাহিড়ীকে বশীভূত করাই জানকীনাথের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইল। তিনি বহু চেষ্টা করিলেন, ভয়, প্রলোভন প্রভৃতি কিছুতেই কমল লাহিড়ীকে টলাইতে পারিলেন না। বারভূঁইয়ার অন্যতম চাঁদ রায়ের সহিত জানকীনাথের বন্ধুত্ব ছিল। অনন্যোপায় হইয়া, তিনি এজন্য চাঁদ রায়ের সাহায্য প্রার্থী হন; চাঁদ রায়ের অনুরোধে

রাজা কুমুদ, কমল লাহিড়ী ও তৎসঙ্গীয় পাঁচ জন কুলীন সুসঙ্গ গমন করেন। জানকীনাথ মহাসম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া এবং কুলীন কুলজ্ঞগণের পরামর্শানুসারে, ঐ ছয় জন কুলীনকে করণ করাইয়া যত্তনাথী দোষ হইতে নিরাকৃত করেন। এই করণের পর পৌত্রকে গ্রহণ করিতে কমল লাহিড়ীর আর কোন আপত্তি রহিল না।

কমল লাহিড়ী তাঁহার পৌত্রকে গ্রহণ করিলে, রাজা ইন্দ্রজিত জানকী-নাথের কন্যা গ্রহণে সম্মত হন। এই বিবাহ কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। বহুসংখ্যক কুলীন কুলজ্ঞ ও সমাজপতি এই বিবাহ ব্যাপারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আবাল সরস্বতী নামক একজন কুলজ্ঞ এই বিবাহে মধ্যস্থ ছিলেন। জানকীনাথ রাজা ইন্দ্রজিতকে কন্যাদানের পর বহুমূল্য রত্নালঙ্কার, তৈজস-পত্র ও বিস্তৃত ভূসম্পত্তি যৌতুক স্বরূপ দান করেন। এই সময় কুলজ্ঞেরা বলেন যে, দুষ্কুল হইতে স্ত্রীরত্ন গ্রহণের বিধি আছে, কিন্তু দুষ্কুল হইতে যৌতুক গ্রহণের কোনও বিধি শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। রাজা ইন্দ্রজিত কুলজ্ঞগণের এই মন্তব্যে কুলভ্রষ্ট হইবার ভয়ে যৌতুক দ্রব্য ও ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিলেন না।

মল্লিক জানকীনাথ অতি উচ্চমনাঃ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি দত্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিলেন না, সুতরাং কুলজ্ঞগণই সমস্ত তৈজসপত্র রত্নালঙ্কার ও ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিলেন। কুলজ্ঞগণের মন্তব্য ও ইন্দ্রজিতের ব্যবহারে জানকীনাথ অতীব ক্ষুব্ধ হইলেন এবং যাহাতে তাহিরপুর রাজবংশের কন্যা স্বীয়বংশে আনিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই; পরিশেষে রাজা ইন্দ্রজিতের বৈমাত্রেয় ভগিনীর সহিত স্বীয় পৌত্র রামনাথের বিবাহ দিয়া, জানকীনাথ চিরসঞ্চিত আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে জানকীনাথ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে নায়কত্ব লাভ করেন। এই হইতে বারেন্দ্রকুলের শ্রোত্রিয়গণ মধ্যে সুসঙ্গ

উদয়াচল, তাহিরপুর, অস্তাচল বলিয়া বিখ্যাত হইল। ইহার পর হইতেই সুসঙ্গ রাজবংশীয়েরা বারেন্দ্র শ্রেণীর আটপঠী বা আট বিভাগী কন্যা আদান প্রদান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

মল্লিক জানকীনাথ কনৌজী ব্রাহ্মণের বংশধর হইয়াও, বঙ্গীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে যেরূপ মর্য্যাদা, প্রতিপত্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন—তাহা তৎকালে অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত ছিল।

শ্রীশৌরীন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী।

একটী পুরাতন দুর্গ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ষ্টুয়ার্ট সাহেব একস্থানে লিখিয়াছেন ;—

Such was the extent of their depredations that the inhabitants of Dacca trembled when they heard the name of the Mughs :—

ফিরিঙ্গি দস্যুদের মধ্যে গঞ্জালেস, ফ্রান্সোয়ান ও বাষ্টিয়ান কনসালভের নাম প্রসিদ্ধ, ইহাদের মধ্যে গঞ্জালেসই সর্ব্বপ্রধান। ইহার নামে আজও পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভীত চকিত হইয়া উঠে।

এই পর্ত্তুগীজ ও মগজলদস্যুর অত্যাচারই রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্ব সময়ে ১৬০৮—১৬ ২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গলার সুবেদার সেখ ইসলাম খান আফগান, মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণের অত্যাচার

দমন করার জন্য ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং সম্রাটের সম্মানার্থ ঢাকার নাম জাহাঙ্গীর নগরে পরিবর্ত্তিত করেন। টেইলার সাহেব লিখিয়াছেন ;—

It was not however until the year 1608 and 1612 that Dacca became a place of historical importance. Prior to that time Sunnergong was the capital of the Mughul Provincial administration, but to check the aggression of the Afghans, Mughs and Portuguese. Islam Khan now transferred the seat of Government from Rajmahal to Dacca. *

Stewart সাহেব তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহাকেই ঢাকার রাজধানী স্থাপনের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

"† Although the oriental historians have not assigned any reason for Islam Khan's changing the seat of Govt. his notes ars satisfactorily accounted for in the annals of Portuguese Asia."—

এস্থলে মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুর কাহিনী সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে গঞ্জালেসের নেতৃত্বে ফিরিঙ্গিরা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজ তাহাদের প্রতিপত্তি দেখিয়া, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং ফিরিঙ্গি সংযোগে বাঙ্গলা আক্রমণের কল্পনা করেন। সনদ্বীপে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর প্রভুত্ব আরাকান-রাজের সহিত তাহাদের সন্ধি ও বাঙ্গলা আক্রমণের ‡ বিষয়

* See Historical portion of Mr.Taylor's Topography of Dacca.

† See Chapter on Islam Khan in Stewart's History of India

‡ See translation Fariade Songa's History Vol. III. p-154.

"ফেরিয়া ডি সুজা"র ইতিহাসে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বাঙ্গলা আক্রমণের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার আশঙ্কা দেখিয়াই, সেখ ইসলাম খাঁ ১৬১১ খৃঃ ঢাকা রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং ইহাদিগকে প্রতিদমন করিবার উদ্যোগ করেন। মগগণ পর্ত্তুগীজের সহিত মিলিত হইয়া, বাঙ্গলার দিকে অগ্রসর হয় এবং অনায়াসে "ভুলুয়া" ও "লক্ষ্মীপুরের" নিকটবর্ত্তী মেঘনার পূর্ব্বদিকের স্থান সমূহ অধিকার করে। এই সময় ইসলাম খাঁ বহুসংখ্যক রণতরী ও পদাতিক সৈন্যবলসহ ইহাদের প্রতিরোধ করেন এবং সম্মিলিত পর্ত্তুগীজ ও আরাকানিদিগকে পরাভূত করেন। এই পরাজয়ের পর ও ঢাকায় রাজধানী স্থাপনে জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের শেষভাগে ইহাদের অত্যাচার প্রশমিত হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী ইহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়া অনেক দিন শান্তিতে বাস করে।

পরে বাদশাহ শাহ্‌জাহানের রাজত্ব সময়ে ইহাদের প্রভুত্ব আবার কিছুদিন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাঙ্গলার তদানীন্তন সুবেদার কাশীম খাঁ জলে স্থলে তিন দল সৈন্য লইয়া ইহাদিগকে দমন করেন। এই সময় ইহাদের প্রভুত্ব পশ্চিমবঙ্গেই বেশী বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী একরূপ নিরাপদ ছিল। ১৬৪৯ খৃঃ অব্দে সুলতান সুজা দ্বিতীয় বার বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার পদে বৃত হন। তিনি ঢাকা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া রাজমহলে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করেন। শাসনমঞ্চ স্থানান্তরিত হওয়ার পর, পূর্ব্ববঙ্গে সুশাসনের তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। এই অবকাশে মগগণ ফিরিঙ্গির, সহিত মিলিত হইয়া আবার মস্তক উত্তোলন করে এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসীর উপর অত্যাচারের সূচনা করে। সুজা কর্ত্তৃক বাঙ্গলার শাসনদণ্ড গ্রহণের ৯ বৎসর পর বাদশাহ শাহ্‌জাহান সাঙ্ঘাতিক রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার রুগ্নাবস্থায় দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিপ্লবের সূচনা হয়। এই

সময় বাঙ্গলায় শাসনের কিছুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল না। এই সুযোগে মগ ও ফিরিঙ্গির উপদ্রব আরও প্রবল হইয়া উঠে এবং জলে স্থলে পূর্ব্ববঙ্গবাসীর উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে। ইহারা তখন দল বাঁধিয়া হঠাৎ গ্রামবাসীর উপর পতিত হইত এবং নৌকায় করিয়া গ্রামে যাহা পাইত, সব লইয়া যাইত এবং যাহা সঙ্গে লইতে পারিত না, তাহা জ্বালাইয়া দিয়া যাইত। এই পাশবিক অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গবাসীর প্রাণধারণ অতিশয় বিপজ্জনক হইয়া উঠে। এই সময়ে ঔরঙ্গজেব মিরজুম্লার সহায়তায় তিন ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মিরজুম্লাকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার পদে ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে নিযুক্ত করেন। সুলতান সুজা টোণ্ডার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সপরিবারে ঢাকা পলাইয়া আসেন এবং সেখানে কতকদিন বাস করেন। সেখানেও জীবন নিরাপদ নয় ভাবিয়া মক্কা যাইবার অভিপ্রায়ে চাটগাঁ অভিমুখে গমন করেন এবং আরাকান রাজার শরণাপন্ন হন। আরাকানরাজ সুজাকে সপরিবারে নৃশংসরূপে হত্যা করে। এই হত্যাসম্পাদনের পর মগগণ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। মিরজুম্লার শাসনকালে চারিদিকে বিদ্রোহ সূচিত হইয়া বাঙ্গলার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একদিকে আসামিগণ ও কোচগণ পূর্ব্ব ও উত্তর-বাঙ্গলা আক্রমণ করে; অন্যদিকে মগগণ সুজাকে নিহত করিবার পর পশুবলে উদ্দীপ্ত হইয়া, ফিরিঙ্গি সংযোগে ভয়াবহ অত্যাচার আরম্ভ করে। এই সময় ইহাদের অত্যাচার শেষ সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। মিরজুম্লা এই সব কারণে আবার ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং স্বীয় অসীম সাহস ও তীক্ষ্ণ প্রতিভা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। তিনি বিদ্রোহ দমন ও রাজধানী সুরক্ষিত করিবার জন্য নানারূপ সুবন্দোবস্ত করেন। সুদক্ষ ও দূরদর্শী মিরজুম্লা আসামী ও কোচগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা বিশেষ ঢাকা মগ ও ফিরিঙ্গিগণের অত্যাচার

হইতে রক্ষা করিবার জন্য, ইদ্রাকপুরে ও হাজিগঞ্জে এই দুই দুর্গ স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য, সৈন্য নিয়োজিত করেন। এই উভয় দুর্গেই দুইটী উচ্চ টিলা আছে। এই টিলার উপর হইতে সৈন্যদল শত্রুর রণতরী সকল পর্যাবেক্ষণ করিত এবং সর্ব্বদা স্বপক্ষীয় রণতরী সকল ঘাটে বাঁধা থাকিত। শত্রু দৃষ্টিগোচর হইলে সৈন্যদল রণতরী সকলে আরোহণ করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিত। এইরূপে তাহাদের অত্যাচার নিবারিত হইয়াছিল। মিরজুম্লার শাসন সময়েই বাঙ্গলার মোগল শাসন খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী মগ, ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়া, সুখ-শান্তি ভোগ করিয়াছিল। এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ ইতিহাস-প্রণেতাগণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

এই দুর্গ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এই দুর্গ বিষয়ে প্রচলিত কিম্বদন্তী এবং লোকমতের সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যের কোন সামঞ্জস্য নাই। স্থানীয় লোকের কাহারও কাহারও বিশ্বাস, ইহা "মগের কেল্লা," কাহারও ধারণা, ইহা পর্ত্তুগীজের স্থাপিত। শেষোক্ত দল তাঁহাদের মত সমর্থন করিবার জন্য, এই দুর্গ হইতে ১ ক্রোশ পশ্চিম উত্তরে "ফিরিঙ্গ বাজার" গ্রাম নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন ফিরিঙ্গ বাজারে পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এই স্থানে এই দুর্গ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু উভয় পক্ষের ধারণাই যে ভ্রমমূলক তাহা ইতিহাস আলোচনা করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাসে ফিরিঙ্গি বাজারের নামোল্লেখ আছে। নবাব মিরজুম্লা মুয়াজেম খাঁর মৃত্যুর পর মগগণের শক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। এই সময় নবাব সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকা আসিয়া মগ ও পর্ত্তুগীজের সমূল উচ্ছেদ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং বহুসংখ্যক রণতরী ও সৈন্যবল সহ হোসেন বেগকে

চাটগাঁও প্রেরণ করেন। এই সময় পর্ত্তুগীজগণের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না; তাহারা মগদের সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিত। হোসেন বেগ পর্ত্তুগীজগণকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং আরাকানরাজও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ফিরিঙ্গিগণ হোসেন বেগের শরণাপন্ন হয় এবং কতক মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সৈন্যদলভুক্ত হয়। অবশিষ্টাংশ হোসেন বেগ ফিরিঙ্গি বাজারে স্থাপন করেন। তদবধি এই স্থানের নাম "ফিরিঙ্গি বাজার" হইয়াছে। মোগলরাজত্বের সময় ফিরিঙ্গি বাজার একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেব ও টেইলার সাহেব এই স্থানের বিবরণ তাঁহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে আছে,—

"Who (Hosen Beg) having selected the most efficient of them to assist in the expedition against Arracan sent the remainder to the Governor, who assigned for their residence a place twelve miles from Dacca still called Firingy Bazar or European town where many of the descendants yet reside."

Taylor সাহেব এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"Firinghi Bazar, situated upon a branch of the Icchamati is noted as the place where the Portuguese first settled in the district during the Governorship of Shaistha Khan. They were mostly persons who had deserted from the service of the Raja of Arracan to that of Hosein Beg, the Maghul General besieging Chittagong which at that time belonged to Arracan. Firighi Bazar was once a place

of considerable size, but from the period of the decay of Dacca trade it has dwindled down to a village"

ফিরিঙ্গি বাজারে একটী গির্জ্জাঘর আছে, তথায় একজন রোমান ক্যাথলিক পাদরী আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করেন। সেখানে ফিরিঙ্গি নামধেয় অনেক কৃষক বাস করে, তাহারা প্রতি রবিবার গির্জ্জায় গিয়া থাকে। বর্ত্তমানে তাহাদের সঙ্গে এবং দেশীয় কৃষকের সঙ্গে কোনও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই বৎসর হইল মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দেওভোগ গ্রামের একটী ভদ্রলোক এই স্থানে মৃত্তিকা নিম্নে ২ জোড়া "কাটা চামচ" পাইয়াছিলেন। তথায় অনেক ভগ্ন ইমারত ও পুরাতন ইষ্টকাদি আজিও, ইহার অতীত গৌরব ও কালের শাসনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই বিবরণও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। আশা করি স্থানীয় লোকের ভ্রম বিশ্বাস অপনোদন করিবে।* ক্রমশঃ)

শ্রীসুখবন্ধু সেনগুপ্ত—বি, এ।

কেদার রায়।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

দ্বিতীয় সর্গ।

চারু-সৌধ-কিরীটিনী শ্রীপুর নগরী—
কালী গঙ্গাতীরে শোভে নয়নরঞ্জন,
বিলাস ভবন তায় গ্রথিত মর্ম্মরে
রচিত কতই চারু রতন সম্ভারে
চিত্রিত কতই চারু বিচিত্র লতায়
সজ্জিত কতই চারু মুকুতা সজ্জায়।

তারি এক কক্ষ মাঝে নিভৃতে বিজনে
সুবর্ণ পালঙ্ক পরি ভুবন মোহিনী
নারী এক উপবিষ্টা আলেখ্যের মত।
গোলাপ, কমল, চাঁপা, সেফালি, মল্লিকা,
জাতি, যূঁথি ফুলদল লুকায় বদন;
রমণী বদন চন্দ্র নেহারি সলাজে।

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

অগুরু, চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কুঙ্কুম,
বিতরিছে সুধাগন্ধ। থরে থরে থরে
সজ্জিত রয়েছে কত কুসুম মল্লিকা।
কে ইনি পাঠক জান? শ্রীপুর ঈশ্বরী
কেদার-হৃদয়রাণী কমলা সুন্দরী।
নিভৃতে বসিয়ে রাণী চিন্তায় মগনা
পদ্মালয়ে পদ্মমুখী ইন্দিরা যেমন
ভাবিছে নীরবে সদা মাধবের তরে।
নীল ইন্দীবর জিনি নয়ন যুগল
চকিত সতত যেন দেখিতে কাহারে।
ছাড়য়ে সুদীর্ঘ শ্বাস থাকি কতক্ষণ
কাতরে কমলা রাণী বলিলা সুস্বরে।
"কেনরে পাষাণ হৃদি কাঁদিস সতত
তাঁহার লাগিয়ে? হৃদয় রঞ্জন তিনি
নহেরে আমার শুধু; শুধু আমি নই
হৃদয় মন্দিরে তাঁর সতত জাগ্রত।
সহস্র প্রজার প্রাণ রঞ্জিয়ে সতত
রাজা তিনি—জাগে তাঁর মনে অনুক্ষণ
সহস্র প্রজার কথা। বঙ্গ জননীর
প্রিয় পুত্র তিনি; বিক্রীত জীবন তাঁর
মাতৃপদতলে, রক্ষিতে মায়ের মান
এ ঘোর দুর্দ্দিনে সতত বিব্রত তিনি।
তিলমাত্র অবসর নাইরে তাঁহার
করিবারে প্রেমালাপ অধীনীর সনে।
দয়ার সাগর তিনি, তবু দয়া করে
আদরে অন্তরে স্থান দেন অভাগীরে।
আরেরে অবোধ মন! কি আর অধিক
চাহ তুমি—বল মোরে ওলো লো মানসি
ভাগ্যদেব সুপ্রসন্ন, তাইরে তোমার
দিনান্তে চরণ প্রান্তে বসি একবার
মিটাইতে পার সব আকুল পিয়াসা।
আত্মসুখী স্বার্থপর অবোধ পরাণ!
ধিক্‌রে তোমায়! দয়িত নিয়ত লিপ্ত
দেশের কল্যাণে মুহূর্ত্ত বিরহ জ্বালা
সহিতে না পারি, নীচ স্বার্থ সিদ্ধি আশে
তুচ্ছ প্রেমালাপ তরে রোধিতে প্রবৃত্তি
তব হেন পুণ্যকাজে, ধিক্‌রে তোমায়
ভুলিয়ে দেশের কাজ, ভুলে প্রজাগণে
ইন্দ্রিয় বিলাস তৃপ্ত যুবকের প্রায়
তোমার অঞ্চল ধরি শ্রীপুর ঈশ্বর
অন্তঃপুর মাঝে সদা থাকেন বসিয়ে
এই তব অভিলাষ? অবোধ পরাণ!
স্বামী যার মাতৃপদে সঁপিয়ে জীবন
আহার বিহার ভুলি দিবস যামিনী
নিয়ত নিযুক্ত আছে মায়ের সেবায়
তাঁহার রমণী শ্রীপুর ঈশ্বরী আমি।
সাজে কি আমার হেন নীচ বিলাসিতা
বীর প্রসূ বঙ্গভূমি জননী আমার
বীরের দুহিতা আমি বীরের বনিতা
বীর পুত্র গর্ভে ধরি সাধ চিরদিন।
আমার কর্ত্তব্য কিগো বিলাস শয্যায়
বল্লভের ক্ষণকাল বিলম্ব নেহারি
অভিমান ভরে মানভঞ্জনের পালা
পুনঃ করি অভিনয়? বিলাসের বশে
অবলা কমলা কিরে এতই দুর্ব্বলা?
হের এই দুর্দ্দশার কি ভীষণ চিত্র
চিত্রিত রয়েছে আজ সম্মুখে তোমার
হের অই বঙ্গভূমি, দুঃখিনী জননী

ক্রমশঃ।

দ্বাদশহস্তবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বরমূর্ত্তি

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

ঐতিহাসিক চিত্র।

বিক্রমপুরের অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি।

বিক্রমপুরের ইতিহাস সংকলন কার্য্যে ব্রতী হওয়ার পর, আমাকে বিক্রমপুরের বহুগ্রাম পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। সেই পর্য্যটনের ফলে যে সকল প্রাচীন দর্শনযোগ্য ও আলোচনার উপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বাদশহস্তবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি একটি।

বিক্রমপুরে যে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাধিপত্য বিস্তৃত ছিল, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং প্রত্যেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতও, তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক যুয়নচঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মধ্যে যে সমতটের বর্ণনা আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ এবং সুন্দরবনের কতকাংশ পর্য্যন্ত সমতট বিস্তৃত ছিল। বিক্রমপুর এই সমতটাখ্যাপ্রাপ্ত জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দীপঙ্কর অতিষ শ্রীজ্ঞান, বঙ্গের আদি গৌরব শীলভদ্র প্রমুখ প্রখ্যাতনামা বৌদ্ধযতিগণ বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। অতএব বৌদ্ধ প্রাধান্যপ্লাবিত বিক্রমপুরে অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তিটি পাওয়ায় তেমন বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। প্রায় প্রতি বৎসরই প্রাচীন পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা ইত্যাদি খনন করিতে করিতে নানাবিধ প্রস্তরগঠিত বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে

প্রাবল্য হেতু সে সমুদয় মূর্ত্তি এখন হিন্দু দেবতারূপে হিন্দুর দেবমন্দিরে পূজিত হইতেছে।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যেরূপ ভগবানকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সাকার ও নিরাকার উপাসনার দুইটি স্তর আছে, বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমাবনতির সঙ্গেও তদ্রূপ নানাবিধ মূর্ত্তিপূজা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন আমরা যে সকল বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা সেই ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভূত।

প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক থাকে। এক শ্রেণী শিক্ষিত ও উন্নত, অপর শ্রেণী অশিক্ষিত অথচ ভক্তিতে নত। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যখন দেখিতে পায় যে, তাহারা ধর্ম্মের যে সকল গূঢ়তত্ত্ব ও প্রকৃত জ্ঞানঃ বিদ্যা ও জ্ঞানবত্তার দ্বারা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদেরই সমধর্ম্মী অজ্ঞ লোকেরা অজ্ঞতা নিবন্ধন তাহা অনুভব করিতেছে না; তখন তাহারা সমধর্ম্মী লোকদিগকে ধর্ম্মের সংকীর্ণতার মধ্য দিয়া, প্রকৃত মূল-কেন্দ্রে পৌঁছাইবার জন্য নানাবিধ পন্থার সৃষ্টি করে, সে সকল সহজ ও সরল পথ সাধারণে অনুসরণ করে বলিয়াই, উহা সর্ব্বত্র সহজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং কালবশে আরও বিকৃত হইয়া অদ্ভুত অদ্ভুত ধর্ম্ম ও মতের সৃষ্টি করে। তান্ত্রিকতাপূর্ণ মহাযান মত, এইরূপেই ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্তই ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি গ্রামেই প্রাচীন বৌদ্ধ তান্ত্রিকতাপূর্ণ মহাযানমতানুযায়ী নানাবিধ কল্পিত আকৃতিবিশিষ্ট বৌদ্ধমূর্ত্তিসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। *

এ সকল রূপকমূর্ত্তি সমূহ এতদিন পর্য্যন্ত কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ

* Nearly every village throughout the Buddhist Holy Land contains old Mahayana and Trantrick Buddhist Sculptures, and I have also seen these at most of the old Buddhist sites visited by me in other parts of India J. R. A. S. 1894—L. A. Waddell M. B. M. R. A. S.'s. article on the Indian Buddhist Cult of Avalokita p. 51.

করিতে পারে নাই, এমন কি পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণও এ সকলের কোনও গূঢ়ত্ব অনুভব করেন নাই। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত বলিয়া তাঁহারাও এতদিন পর্য্যন্ত এই সকল মূর্ত্তিকে কোনও অদ্ভুতাকৃতি হিন্দুর পৌরাণিক মূর্ত্তি মনে করিয়া আলোচনার অনাবশ্যক জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও যে এই সকল পরিত্যক্ত মূর্ত্তিসমূহের বিশেষরূপে আলোচনা হইতেছে, তাহা বলা যায় না।

আলো ও ছায়া জগতের স্বাভাবিক রীতি। যেখানে আলো সেখানে অন্ধকারকে থাকিতেই হইবে। একদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্ঞানতপনালোকে যেরূপ সুদূর চীন, জাপান প্রভৃতি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল, আবার তেমনি ইহার একাংশ গাঢ়তম অন্ধকারে আবৃত ছিল। য়ুয়নচঙের ভারতাগমনের পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের এসকল রূপকমূর্ত্তির পূজা ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়া উঠে, সে সময়কার প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে হইলে, এ সকল মূর্ত্তির সূক্ষ্ম আলোচনা ব্যতীত প্রাচীন অজ্ঞাত বিবরণ সমূহ জানিতে পারা অসম্ভব।

অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের মনঃকল্পিত দেবতা। প্রত্যেক ধর্ম্মের যেমন জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটি অঙ্গ আছে, তদ্রূপ বৌদ্ধধর্ম্মেরও দুইটি আছে, একটি নানাবিধ দার্শনিক মতানুযায়ীর সমষ্টি, দ্বিতীয়টী আনুষ্ঠানিক বা সাধারণ ধর্ম্ম। ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবপ্রবর্ত্তিত প্রথমোক্ত জ্ঞানধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য এবং সাধারণের নিকট উহার নিগূঢ়তত্ত্ব, সরল ও সহজ ভাবে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত হিন্দুগণের পৌত্তলিকতার বহু দেব দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রশাখার সৃষ্টি করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মূর্ত্তিপূজার রহস্য সম্বন্ধে অন্যরূপ কল্পনা করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ধর্ম্মের পৌত্তলিকতাপ্রিয় জনসাধারণের মধ্যে শুষ্ক দার্শনিক মতের সমন্বয় করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব বোধে, ঠিক সেই জন্যে জন

মিশাইয়া অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ধর্ম্ম-প্রচারের কৌশলরূপে এই সকল মূর্ত্তির প্রবর্ত্তন করাই বৌদ্ধধর্ম্মের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ছিল, নচেৎ বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্য কি?

এ সকল ধর্ম্মমত স্থূল দৃষ্টিতে পৌত্তলিকতা বলিয়া বিবেচিত হইলেও, কিন্তু মূলতঃ সেই মহান্ সার সত্যের সহিত একই ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ। যে মহান্ সত্য ও ধর্ম্ম আপনার মূল কেন্দ্রে অবিচলিত রহিয়া শূন্যতার মধ্যেও এই দৃঢ় বিশ্বাসকে পোষণ করে যে, ধর্ম্মশীল মানবের সহিত অজ্ঞেয় ও মহান্ বিশ্বপতির প্রত্যক্ষ যোগ হইতে পারে। এ কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাক্। জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য ঈশ্বর। কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য বা তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার নিমিত্ত যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত ও যুক্তি বিদ্যমান, তেমনি জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মের সার বা মহৎ শিক্ষা নির্ব্বাণ বা আত্মার সেই মহান্ শক্তির সহিত সম্মিলন। ইহা সকল ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠ সাধনা। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ সাধনাকে আয়ত্ত করিতে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োজন। সেই শিক্ষা ও জ্ঞান অল্প সময় মধ্যে কাহারও পক্ষে আয়ত্ত করা সহজ-সাধ্য নহে বলিয়াই, প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যেই নানা প্রকার শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। এই শাখা-প্রশাখাগুলি প্রথম দৃষ্টিতে জ্ঞানবানের চক্ষে হাস্যাস্পদ বলিয়া বিবেচিত হইলেও, কিন্তু মূলতঃ এক বৃন্তে দুইটি ফুলের ন্যায়, উভয়ে একই বৃক্ষমাতার স্নেহ-কোলে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট। একটি পত্রাবরণমুক্ত সৌন্দর্য্যে ও সুরভিমাধুর্য্যে মনোহর, অপরটি এখনও পত্রাবগুণ্ঠন হইতে আপনাকে বিকাশ করিবার শক্তির জন্য পথ চাহিয়া আছে। অতএব সাকার ও নিরাকার, হীনযান ও মহাযান, মূলতঃ একই লক্ষ্যে চলিয়াছে।

আবার উভয়ে একই কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ। এই নিমিত্তই সাকার ও নিরাকার, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সেই এক বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বরকে পাইবার

জন্য পাশাপাশি প্রবাহিত ছু'টি নদীর ন্যায় সাগরে মিশিবার জন্য একটি একটু ঘুরিয়া এবং অপরটি একটু সরল পথে একটানা স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে।

অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তির অর্চ্চনাও তদ্রূপ। ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণের দ্বারা বোধিসত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সহজে প্রচারিত করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল! অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তির গঠনের মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্প-কার্য্যের বাহাদুরীর সঙ্গে সঙ্গে কল্পনারও যথেষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়।

অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তিগুলি দুই হাত, চারি হাত, ছয় হাত, দশ হাত, বার হাত এমন কি সময় সময় সহস্র হস্ত সমন্বিতও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন অবলোকিতেশ্বর তিন বা একাদশ শীর্ষ বিশিষ্ট। যেমন শিবের পার্ব্বতী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শচী, তেমনি অবলোকিতেশ্বর দেবেরও এক শক্তি আছেন, তাঁহার নাম তারা। এই শক্তিমূর্ত্তিই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার পরিচায়ক।

অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে ডাক্তার আইটেল (Dr. Eitel) তৎপ্রণীত Handbook of Chinese Buddhism নামক গ্রন্থে, বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। চীন ও জাপানে অবলোকিতেশ্বর দেব স্ত্রী-মূর্ত্তিতে এবং তিব্বতে ও ভারতে পুরুষমূর্ত্তিরূপে অর্চ্চিত হইতেন। চীন-দেশে অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেই গল্প বা প্রাচীন কাহিনীটি এই :—

অতি প্রাচীনকালে চীনদেশে এক রাজা ছিলেন; তাঁর নাম ছিল সুভর ন্যাম্পো (Shubharyynpu)। ইনি আমাদের দেশের হিরণ্য-কশিপুর ন্যায় দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির নরপতি ছিলেন, এই রাজার গৃহে অবলোকিতেশ্বর দেবকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল কোয়ান উইন (Kwanyin)। কোয়ান উইন রাজার, তৃতীয়া কন্যা। বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, ক্রমে কোয়ান উইন

বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেন, রাজা বিবাহের পাত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এদিকে কিন্তু মহাবিভ্রাট, কোয়ান উইন বিবাহ করিতে নারাজ। রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে একটি মঠে (আশ্রমে) পাঠাইয়া দিলেন এবং আশ্রমের অধিবাসিনী রমণীগণের সর্ব্ববিধ নীচ কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী করিলেন। তথাপিও কিন্তু কন্যার মত পরিবর্ত্তিত হইল না। রাজা ইহাতে আরও ক্রোধান্বিত হইলেন, তিনি কোয়ান উইনকে হত্যা করিবার জন্য জল্লাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জল্লাদ কোয়ান উইনকে অসি দ্বারা আঘাত করিবামাত্রই তরবারিখানা সহস্র খণ্ডে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল—কিন্তু কোয়ান উইনের জীবননাশ দূরে থাকুক, একটি কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। রাজার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি কোয়ান উইনকে শ্বাসরোধ করাইয়া হত্যা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এবার তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু যমলোকে মহাবিভ্রাট। নরক স্বর্গে পরিণত হইল, যম মহা প্রমাদ গণিলেন, এ যে সৃষ্টি রসাতলে যায়, নিয়মশৃঙ্খলা কিছুই থাকে না। নরকে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যম কোয়ান উইনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিলেন। একটি শতদলোপরি নিঙ্গপোর (Ningpo) নিকটবর্ত্তী পোটলা (Potala) বা পুটুদ্বীপে তিনি নয় বৎসর পর্য্যন্ত যমালয় হইতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। কোয়ান উইনের কীর্ত্তিকলাপ দিন দিন চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল, পীড়িতের পীড়ামুক্তি, সমুদ্রের করাল কবল হইতে পথভ্রষ্ট নাবিকের জীবন রক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ সৎকীর্ত্তিরাজী লোকের মুখে মুখে সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতে লাগিল। এরূপ সময়ে কোয়ান উইনের পিতার দারুণ পীড়ার সঞ্চার হওয়ায়, কোয়ান উইন নিজের বাহু ছেদন করতঃ সেই মাংস দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পিতার জীবনরক্ষা করিলেন। এইবার নির্দ্দয় পিতার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। কন্যার এইরূপ মহত্ত্বের

স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য তিনি ভাস্করকে কোয়ান উইনের একটি প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। ভাস্কর রাজার আদেশ শুনিতে ভুল করিয়া সহস্র চক্ষু এবং সহস্র ভুজসমন্বিত এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল। কালবশে তাহাই বোধিসত্ত্ব ও অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিরূপে চতুর্দ্দিকস্থ জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। কোয়ান উইনকে অবলোকিতেশ্বর অবতাররূপে প্রমাণিত করিবার জন্য চীনদেশবাসী বৌদ্ধগণ কোয়ান উইন অর্থে যে দেবতা ঊর্দ্ধ হইতে অধঃপানে দৃষ্টি করেন এবং যিনি লোকেশ্বর ও মানবের সর্ব্ববিধ শোক দুঃখের বিধান কর্ত্তা এবং দয়ার অবতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া অবলোকিতেশ্বরের আভিধানিক বা প্রকৃতি ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। জাপানেও বৌদ্ধেরা কোয়ান উইন দেবীকে অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। সেখানেও তিনি সহস্র হস্ত এবং সহস্র চক্ষু বিশিষ্টরূপে অঙ্কিত।

তিব্বত দেশে অবলোকিতকে চে-রি-সাই (che-re-si) বা দীপ্ত-নয়ন সম্পন্ন দেবতা কহে। আইটেল সাহেব বলেন যে, "Avalokita is the first ancestor of the E Eitel's Handbook of Chinese Buddhism, and Three lectures on Buddhism, pt 123-131 and 23-8.

"Tibetan Nation" তিব্বতীয়েরা কিন্তু ইহা বিশ্বাস করে না। তাহারা কিন্তু ডারউইনের সিদ্ধান্তানুযায়ী আপনাদিগকে বানরের বংশজাত বলিয়াই প্রকাশ করে। এ বানর—সাধারণ বানর নহে,—স্বয়ং অব-লোকিতেশ্বর দেব বানরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক রাক্ষসীর সহিত বাস করেন, তাহাতেই তিব্বতীয়দিগের উৎপত্তি।

তদ্দেশবাসিগণ অবলোকিতেশ্বরকে আমাদের বিষ্ণুর অবতারের ন্যায় মানবের শোকদুঃখ মোচনার্থ বোধিসত্ত্বের অবতাররূপে অর্চ্চনা করেন।

য়ুয়নচয়ঙের ভ্রমণকাহিনী পাঠে জ্ঞাত হই যে, তিনি অবলোকিতেশ্বর দেবকে পুষ্পগুচ্ছ অর্পণ করিয়াছিলেন। অবলোকিতেশ্বরের মূলমন্ত্র ওঁ মণিপদ্মে হুঁ (Om mani padme Hun) এবং বীজমন্ত্র হ্রী, ইহা হৃদয় শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। *

অবলোকিতেশ্বর সাধারণতঃ 'মহাকরুণা' এবং 'পদ্মপাণি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মূর্ত্তির অর্চনা ও অভ্যুদয় কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে প্রথম প্রবেশলাভ করে, সে সময়ের নির্ণয় এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাজা কণিষ্কের সময় হইতেই অবলোকিতেশ্বর দেবের পূজার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মূল কারণ এই যে, প্রথম খৃঃ অঃ রাজা কণিষ্কের নামাঙ্কিত একটি অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব তারিখের কোনও মূর্ত্তি অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। আজ পর্য্যন্ত অবলোকিতেশ্বরের মোট ৮২টি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই ৮২টি মূর্ত্তিই অবলোকিতেশ্বরের বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন মূর্ত্তিতে তিনি বোধিসত্ত্ব দীপঙ্কর প্রভৃতি রূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। † আমরা ৮২টি মূর্ত্তির উল্লেখ করিলাম, তন্মধ্যে ক্যাম্বিজ Bendall (বেণ্ডল) এর পুস্তক তালিকার ১৬৪৩ সংখ্যক অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপিতে একত্রিশটি অবলোকিতেশ্বরের পরিচয় আছে। কলিকাতার A 15 সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে আরও দশটি অবলোকিতেশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল মূর্ত্তির মধ্যে ৪২টি মূর্ত্তি নিম্নলিখিত স্থান সমূহ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। কটাহ প্রদেশে দুইটি, কঙ্কনে চারিটি কোরত্র এক, গান্ধার ১, দক্ষিণাপথ ২, দণ্ডভুক্তি ১, নলেন্দ্র ১, নেপাল ২, পোতালক

* E. Eitel's Three lectures on Buddhism. pp. 123-137.

† Anderson's catalogue and handbook of Arch. collection, 1883 volumes.

২, মগধ ৫, মহাচীন ১, রাঢ়া ২, রাঢ় ১, বঙ্গীকোট ১, বরেন্দ্র ৩, কিয়োরয়ণ ১, সমতট ৩, সিংহলদ্বীপ ২, সুবর্ণপুর ১। 'ললিত বিস্তর,' বা বুদ্ধদেবের জীবনী গ্রন্থে অবলোকিতেশ্বর দেবের কোনও নামোল্লেখ না থাকিলেও, তাঁহার অন্যান্য নাম, যেমন 'মহাকরুণা', 'ধরণীশ্বররাজ' প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ললিত বিস্তর গ্রন্থ ২১১ খৃঃ অঃ চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। 'সাধারণ পুণ্ডরিক' নামক অপর একখানা বৌদ্ধ গ্রন্থে কিন্তু অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। উক্ত পুস্তকে অবলোকিতেশ্বর দেব মহান্ বোধিসত্ত্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। 'সাধারণ পুণ্ডরিক' গ্রন্থ ২৬৫ খৃঃ অঃ চৈনিক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় চারিশত অব্দে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান এবং সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে য়ুয়নচয়ঙ ভারত পর্য্যটনে আগমন করিয়া অবলোকিতেশ্বর ও মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি বিশেষরূপ পূজিত হইতে দেখিয়াছেন। জ্ঞান ও বিধানের অবতার রূপে মহাযান গ্রন্থে মঞ্জুশ্রী দেব উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার আবাহন গীতিও গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধলামাগণের 'ত্রিমূর্ত্তি স্তোত্রে' মঞ্জুশ্রীর নাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইলেও, কিন্তু তাঁহারা মঞ্জুশ্রী অপেক্ষা অবলোকিতেশ্বরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহাদের এই বিশ্বাসানুযায়ী ত্রিমূর্ত্তি মধ্যে অবলোকিতেশ্বরকেই মধ্যস্থ আসন প্রদান করিয়াছেন।

ডাক্তার বুকানন ও হেমিলটন সাহেবের বিহারের সার্ভেরিপোর্টে এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহামের সার্ভেরিপোর্টের স্থানে স্থানে অবলোকিতেশ্বর দেবের নামোল্লেখ থাকিলেও, তেমন বিস্তারিত কোনও বিবরণ উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল রিপোর্টের মন্তব্য পাঠে সহজেই অনুমিত হয় যে, তাঁহারা অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে বিশেষরূপে কোনও তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই। কানিংহাম ও বুকানন ব্যতীত Geog's Csoma

Korosi নামক গ্রন্থে এবং সিফনার (Schiefner) ও Schlagin tweit's এর পুস্তকে অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতদেশীয় জনসাধারণের বিশ্বাস দলুইলামা অবলোকিতেরই অবতার।

বৌদ্ধ পুরাণোক্ত এ সমুদয় দেবমূর্ত্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সহজেই মনে হয় যে, এইরূপ মূর্ত্তিপূজার পদ্ধতি বৌদ্ধগণ হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু আদর্শানুকরণে মূর্ত্তিপূজা বৌদ্ধ সমাজে গৃহীত হইলেও, উভয় সম্প্রদায়ের মূর্ত্তিগুলির গঠনে ও শিল্প নৈপুণ্যে বহু প্রভেদ বিদ্যমান। গঠনে ও শিল্পে উভয় মূর্ত্তিতে এত পার্থক্য যে, একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও সে পার্থক্য অনায়াসে অনুভব করিতে পারে। অপর পক্ষে উভয়ের নামেরই বা কত প্রভেদ।

গ্রীশ, রোম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যেমন দয়া, ধর্ম্ম, ন্যায়, পবিত্রতা, শান্তি, তৃপ্তি, সুখ প্রভৃতি মানবের গুণ ও প্রবৃত্তিগুলির রূপক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বৌদ্ধধর্ম্মের এ সমুদয় মূর্ত্তিগুলিও কোন না কোন নৈতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। অবলোকিত, তারা, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতিও এইরূপ ভাবেই অবতাররূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বৌদ্ধপুরাণ গ্রন্থে ১০৮টি রূপক-মূর্ত্তির উল্লেখ থাকিলেও, অতি অল্প কয়েকটিরই সন্ধান পাওয়া যায়। ডাক্তার ওয়াডেল (Waddel) সাহেব অবলোকিতেশ্বর অর্থে (Lord of the world) জগৎপতি বুঝায় বলিয়া তাঁহার সহিত আমাদের হিন্দু দেবতা প্রজাপতি অর্থাৎ লোকপালনকর্ত্তা ব্রহ্মার সঙ্গে সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধগণ ব্রহ্মার আদর্শানুকরণেই অবলোকিতেশ্বর দেবকে গঠন করিয়াছেন। *

* "Avalokita's image was modelled after that of the Hindoo Creator, Prajapati or Brahma; and the same type may be traced even in the monstrous images of the later Tantrik period. This

ওয়াডেল সাহেবের এই যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে সম্মত নহি। এক হস্তে বিকশিত শতদল, এক হস্তে কমণ্ডলু, এক হস্তে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন বলিয়া ব্রহ্মার সহিত অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও, আমরা অবলোকিতেশ্বর দেবকে একমাত্র ব্রহ্মার আদর্শা-নুকরণে গঠিত বলিয়া মনে করি না। আইটেল সাহেবের যুক্তিই এ বিষয়ে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি বলেন, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটি হিন্দু দেবতার প্রত্যেকটির মধ্য হইতেই কিছু কিছু লইয়া অব-লোকিতেশ্বর দেবের সৃষ্টি হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলেও, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। *

আমরা এখানে অবলোকিতেশ্বর দেবের কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নাম ও তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম।

১। মহাকরুণা—তিব্বতীয় নাম Thugs-rjschen po। ইনি শ্বেতবর্ণ, একমুখ ও চতুর্ভুজবিশিষ্ট এবং দণ্ডায়মানভাবে নির্ম্মিত। তাঁহার প্রথম দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা, দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে জপমালা, প্রথম বাম হস্তে প্রস্ফুটিত শতদল, দ্বিতীয় বাম হস্তে কমণ্ডলু।

২। আর্য্য অবলোকিত—তিব্বতীয় নাম h phagsha s pyanras-g zigs. ইনি শ্বেতবর্ণ এবং দ্বিভুজবিশিষ্ট।

observation is important with reference to the original functions attributed to the god Avalokita as a Lokesvara or Lord of the World, and Prajapti or Lord of animals' and active Creator of the universe, both being titles of Brahma. Though the ordinary function of Avalokita is more strictly a preserver and defender like Vishnu, his image, excepting the presence of a lotus which is common to Brahma and many other Hindu gods, has nothing in common with that of Vishnu or did he seem to be in any way related to Surya or Solar myths."

J. R. A. S. of Bengal 1894, p.57.

* Eitel's Three lectures on Buddhism.

৩। —দুঃস্বপ্ন নিবারক—হিন্দুগণ যেমন 'দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ, অর্থাৎ দুঃস্বপ্ন দেখিলে গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বৌদ্ধগণও দুঃস্বপ্ন দেখিলে অবলোকিতেশ্বর দেবকে স্মরণ করেন। তিব্বতীয় নাম Mi-lam-n gen-pa dek-che। ইহার গাত্রবর্ণ শ্বেত—কিন্তু পরিধানে নীল বস্ত্র। ইনিও দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে শরণ মুদ্রা, বাম হস্তে শ্বেত শতদল। ইহার গাত্রে কোনও ভূষণ নাই—চুলগুলি চূড়ার মত করিয়া বাঁধা।

৪। অবলোকিত—অষ্টভীতিনিবারক মূর্ত্তি। তিব্বতীয় নাম—s Pyan-ras-g zigs n jigs-pa br gyad s kyobs.

৫। সিংহনাদ অবলোকিত বা গর্জ্জনকারী সিংহ। তিব্বতীয় নাম—s Pyan-ras-g zigs Seng-es gra সিংহনাদের গাত্রবর্ণ শ্বেত—এক মুখ এবং দুই বাহু। তিনি একটি শ্বেতবর্ণের সিংহের উপরে চন্দ্রের মত গোলাকার আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার মুখ একটু দক্ষিণদিকে হেলানো, মস্তকে মুকুট। দক্ষিণ হাঁটু অর্দ্ধ উত্তোলিত, এবং তাহারই উপরে দক্ষিণ হস্ত রক্ষিত, বাম বাহু লম্বিত। গলায় যজ্ঞোপবীত, এবং লোহিতবর্ণের রেশমী বস্ত্র পরিহিত। ত্রিনেত্র, নয়নত্রয় নিম্নাভিমুখে নত। বামদিকে একটি প্রস্ফুটিত শতদল—মস্তকোপরি অমিতাভ বুদ্ধ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট।

৬। সাগর জিৎ—বা সমুদ্রবিজয়ী। তিব্বতীয় নাম—s Pyan-ras-gzgs-r gyal-wa-rgya-mtsho, ইহার গাত্রবর্ণ লোহিত। ইনি চতুর্ভুজ। দুইটি হস্ত পরস্পর সংলগ্ন, নিম্নদিকের বাম হস্তদ্বয়ের একটিতে জপমালা এবং অপর হস্তে রক্ত পদ্ম। তিনি বজ্র পালঙ্কে অর্দ্ধোপবিষ্ট।

৭। চতুর্ভুজ—তিব্বতীয় নাম—s Pyan-ra-gzigs-zhal-gchigs-phy ag-bzhi (P. Che-re-sizhal Chik-chag-zhi) এই অবলোকিত শ্বেতবর্ণ, একমুখ এবং চতুর্হস্তবিশিষ্ট।

৮। ত্রিমঙ্গল অবলোকিতেশ্বর বা বিচারপতি অবলোকিতেশ্বর।

তিব্বতীয় নাম—s Pyan-ras-gzigs-hjig-rten-dn g-phyug (-gtsa-hkhor gsum-pa) (P. Che-re-si-jig-ten. wang-Chuha-tso-kho-rsum) ইহার গাত্রবর্ণও লোহিত।

ত্রিমণ্ডল অবলোকিতেশ্বরের দক্ষিণ হস্তে শ্বেতপদ্ম বাম হস্তে আশীর্ব্বাদ প্রদানোদ্যত, পরিধানে মণি-রত্ন-খচিত বস্ত্র ও অঙ্গভূষণ। ইনি দণ্ডায়মান ভাবে অবস্থিত। তাঁহার দক্ষিণ দিকে বজ্রপাণি এবং বামদিকে হয়গ্রীব দণ্ডায়মান।

৯। ধর্ম্মেশ্বর বজ্র—তিব্বতীয় নাম—s Pyan ras-g zigs-rdor-jeclhes d bang (P.—Che-re-si-derje chhe wang, ইহাঁর গাত্র-বণ শ্বেত, মস্তকোপরি অমিতাভ। ইনি দক্ষিণ হস্তদ্বারা বর প্রদান করিতে-ছেন—বাম হস্তের মধ্যম ও অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা একটি প্রস্ফুটিত কমল ধৃত, দক্ষিণ পদ সম্মুখের দিক প্রসারিত করিয়া ইনি পালঙ্কের উপর অর্দ্ধোপবিষ্ট। ইঁহার দক্ষিণ দিকে শক্তিরূপিণী তারা এবং বাম দিকে ভ্রিকুটি। সম্মুখ ভাগে Vasudhara-g zhon-men করাঞ্জলি করিয়া দণ্ডায়মান।

১০। শ্রীখেচর অবলোকিতেশ্বর।

তিব্বতীয় নাম—(s Pyan-ras-gzigs-dhal-iden-mkkha-spyod (p. Chere-si-pal-den-kha-cho) ইঁহার গাত্রবর্ণ শ্বেত, একমুখ এবং দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে বর প্রদান করিতেছেন, বাম হস্ত দ্বারা একটি শতদল ধৃত, ফুলটি কর্ণ পার্শ্বে প্রস্ফুটিত। রেশমী বস্ত্র ও অলঙ্কারে ইনি সজ্জিত। ইহার দক্ষিণ দিকে শ্যামবর্ণা তারা এবং বাম দিকে শ্বেতবর্ণা ভ্রিকুটী। সম্মুখভাগে পীতবর্ণা বসুন্ধরা করযোড়ে দণ্ডায়মানা।

১১। ত্রিমণ্ডল অমোঘবজ্র মহাকরুণা। তিব্বতীয় নাম - Thugs-rje chhen-pe-don-yod-rdrov-gtse hkh or-gsum-pa P.—Thuk-je-cheh bo-ton-dor-tso-Khorn sum। ইঁহার গাত্রবর্ণ

শ্বেত। ইঁহারও দক্ষিণ হস্তে বর, বাম হস্তে কমল, জপমলা, কমণ্ডলু ইত্যাদি। রেশমী বস্ত্রে এবং নানাবিধ অলঙ্কারে ইনি সুশোভিত। ইঁহার দক্ষিণ দিকে তারা মূর্ত্তি এবং বামদিকে ভ্রিকুটী মূর্ত্তি।

১২। সুখবতী—তিব্বতীয় নাম Tib.—s Pyan-vas-gzigs Su-Kha-wa-ti (P —Che-re-si-Sukha-wafi)

সুখবতী অবলোকিতের গাত্রবর্ণ শ্বেত; এক মুখ এবং ছয় হস্ত। ইঁহার ছয় হস্তেও বর, কমল, যষ্টি, কমণ্ডলু প্রভৃতি আছে। ইনি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পরিধানে মণি-রত্ন-খচিত রেশমী বস্ত্র, কুণ্ডল এলায়িত। তারা এবং ভ্রিকুটী দক্ষিণে ও বামে দণ্ডায়মানা।

১৩। অমোঘ ভবৃত্ত (Amogha Vavritha)

তিব্বতীয় নাম Tib.—s Pyan-ras-gzigs don-yod-mchhod-painor-bu (P—Che-re-si-ton-yod Chho-pai-norbu) ইঁহারও গাত্রবর্ণ শ্বেত এক মুখ ও দ্বাদশ হস্ত, ইনি মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান, দক্ষিণ পার্শ্বে বসুন্ধরা দেবী এবং বাম পার্শ্বে নাগরাজা নন্দ এবং উপানন্দ দ্বাদশ হস্তে কমল, বর, বেদ, শঙ্খ, কমণ্ডলু, জপমালা ইত্যাদি বিদ্যমান। কণ্ঠে কণ্ঠমালা, মস্তকে মুকুট, পরিধানে মণি-রত্ন-খচিত রেশমী বস্ত্র, গলে যজ্ঞোপবীত।

এতদ্ব্যতীত খেচরপাণি প্রভৃতি আরও অনেক অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি আছে।

অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী এবং তারা দেবীর পূজা যে দীপঙ্করের সময়েও আমাদের দেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল, তাহা দীপঙ্করের তিব্বতযাত্রা সম্বন্ধীয় বিবরণ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। যখন নাগাৎসু (Nag-tcho) দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তিব্বতীয় নরপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিক্রমশিলায় আগমন করেন, সে সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে অবলোকিতেশ্বর এবং তারা

দেবীর পূজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। নাগৎসুর প্রমুখাৎ তাঁহাকে তিব্বতের নৃপতি তিব্বতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন,--একথা দীপঙ্কর শুনিলে পর, তাঁহার তিব্বত যাওয়া উচিত কি অনুচিত, তৎ-সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য দেবী তারার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিব্বতের পথে যখন তুষারধবল হিমাদ্রিশৃঙ্গের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে দীপঙ্কর অগ্রসর হইতেছেন, তখন আমরা তাঁহার মুখে শুনিতে পাই—'বাস্তবিক হিমবত অবলোকি-তেশ্বর দেবের ধর্ম্মমতানুসরণকারীদের উপযুক্ত বাসস্থান।* ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, অবলোকিতেশ্বর দেবের পূজা বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল?

ওয়াডেল সাহেব খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে কোনও অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'ন নাই।

আমরা বিক্রমপুরে যে অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিটি প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা কতদিনের প্রাচীন তাহা নির্ণীত হয় নাই। তাহা না হইলেও, ইহা যে বহুদিনের প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি কোন কারণ আছে? এ পর্য্যন্ত যে কয়টি অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটির সহিতই এই মূর্ত্তিটির সম্পূর্ণরূপে সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান নাই। অন্য কোন মূর্ত্তির মধ্যেই সর্প চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই মূর্ত্তির শীর্ষোপরি সাতটি সর্প চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। (১) অন্যান্য অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির মধ্যে সর্প অঙ্কিত নাই বলিয়া এবং এইটিতে সর্প অঙ্কিত রহিয়াছে বলিয়া যে, ইহা অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি নহে, তাহা নয়, কারণ সর্পসমন্বিত অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিও হয় এইরূপ

* It is, indeed, true that Himavat is the province of Avalokitasvara's religious discipline. Indian Pandits in the Land of Snow page 62, 63 by Rai Sarat Chandra Das Bahadur, C. I. E, p. 74.

বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বহুল উল্লেখ আছে। (২) এই মূর্ত্তিটি উচ্চে আট ইঞ্চি, প্রস্থে ৩½ ইঞ্চ। শিরে কিরীট, গলে যজ্ঞোপবীত ও কণ্ঠাভরণ, কর্ণে অদ্ভুতাকৃতি কর্ণভূষা, ত্রিনেত্র, মস্তকের উপর সাতটি সর্প ফণা ধরিয়া আছে। মস্তকের উপরিস্থিত সর্ব্ববৃহৎ মধ্যবর্ত্তী সর্পটির উপরে ধ্যানী অমিতাভ মূর্ত্তি। অমিতাভ পদ্মাসন করিয়া ধ্যান করিতেছেন, তাঁহার নয়নদ্বয় নিমীলিত। দ্বাদশ হস্তের একটি হস্ত ভগ্ন, সে হাতখানাও অভগ্ন ছিল, কিন্তু ছোট ছোট ছেলেদের ক্রীড়নক রূপে অবলোকিতেশ্বর দেব বহুকাল বিরাজমান থাকায়, তাহাদিগের অত্যাচারে একটি হস্ত বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। অবলোকিতেশ্বর দেব বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি পুরুষ মূর্ত্তি। সেই শতদলের নিম্নাংশে আবার দু'টি পদ্মকোরক, পদ্ম কোরকের উভয় পার্শ্বে দু'টি পুরুষ মূর্ত্তি, উভয়ে করযোড়ে হাঁটু গাড়িয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট। ইহাদিগকে দেবযোনি বলিয়া অনুমিত হয়, কারণ পক্ষ রহিয়াছে। অবলোকিতেশ্বর দেবের পরিহিত বস্ত্র আজানুলম্বিত। তাঁহার সৌম্যশান্ত মুখশ্রী, নত নয়ন, হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। দ্বাদশ খানা হস্ত দ্বাদশ প্রকার দ্রব্যাদি ধারণ করিয়া আছে। প্রথম দু'খানা হস্ত খোলা ভাবে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর স্থাপিত, অবশিষ্ট হস্তগুলিতে ক্রমান্বয়ে সিংহ, কচ্ছপ, গ্রন্থ, জপমালা, পদ্ম, বেদ, গদা, ইত্যাদি ধৃত—সবগুলি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় না। কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া ইহার চিত্র ভাল হয় নাই।

(১) কিয়দ্দিবস হইল কলিকাতার মিউজিয়ামেও একটি দ্বাদশ হস্ত-বিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি বেহার অঞ্চল হইতে আনীত হইয়াছে। সেটি সেদিন দেখিতে গিয়াছিলাম। এই মূর্ত্তিটি আমার সংগৃহীত মূর্ত্তিটি হইতে অনেক বড়। দ্বাদশ হস্ত সর্পের ফণার নিম্নাংশ দৃষ্ট হয়, উর্দ্ধাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে আমার এই অবলোকিতেশ্বর

মূর্ত্তির সঙ্গে মিলে না, বহু পার্থক্য বিদ্যমান। এ মূর্ত্তিটির শীর্ষদেশ ও নিম্নাংশ ভগ্ন।

(*a*) Wassiljew "Der Buddhism 1860. Buddhism in Tibet by Schlagintweit page 54.

আমরা এখানে কারণ্ডব্যূহ হইতে অবলোকিতেশ্বর দেবের ধ্যানের উল্লেখ করিলাম, ধ্যানটি এই :—

"ওঁ নমো ভগবতে আর্য্যাবলোকিতেশ্বরায়। এবং ময়াং শ্রুতমে-কস্মিন সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিহরতিস্ম। জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্যা-রামে মহতাভিক্ষুসঙ্ঘেন......বোধিসত্বৈ মহাসত্বৈ স্তদ্‌যথা বজ্রপাণিনা রুপপাণিনা চ বোধিসত্বেন মহাসত্বেন। দশপাণিনা বজ্রাসনে চ বোধি-সত্বেন। দ্বাদশপাণিনা চ বোধিসত্বেন মহাসত্বেন। দশপাণিনা বজ্রাসনেন চ বোধিসত্বেন দ্বাদশপাণিনা চ বোধিসত্বেন মহাসত্বেন গুহাসনেন চ বোধিসত্বেন। আকাশগর্ভেণ চ বোধিসত্বেন মহাসত্বেন অনপায়িবৃতেন চ বোধিসত্বেন মহাসত্বেন। পদ্মপাণিনা চ বোধিসত্বেন মহাসত্বেন। সমন্তভদ্রেণ চ বোধিসত্বেন মহাসত্বেন ভৃকুটীমে দেন চ বোধিসত্বেন মহাসত্বেন।—"কারণ্ডব্যূহ (ধ্যান) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির অমুদ্রিত কারণ্ডব্যূহ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে এই ধ্যানটি উদ্ধৃত করা গেল।

আমি বিক্রমপুরস্থ সোনারঙ্গ গ্রামে এক গোঁসাই বাড়ী হইতে এই মূর্ত্তিটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

আজ এই মূর্ত্তি দৃষ্টে তাঁহাদিগকে মনে পড়ে, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সংসারের বন্ধনহইতে মুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কেমন শিল্পী তাঁহারা, যাঁহারা এমন করিয়া ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ডের মধ্যে আরাধ্যের, মানসমোহন মূর্ত্তি গড়িয়া ভাস্করসৌন্দর্য্যে ও ভক্তির মাধুর্য্যে বিশ্বদেবতাকে ক্ষুদ্র মূর্ত্তির মধ্যেও অসীম শক্তিময় করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের সেই মহতী কল্পনা ও ভক্তিকে ধন্য।

এই অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিটীর ন্যায় এরূপ সুন্দর ও ক্ষুদ্র মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই; ইহা সম্পূর্ণ রকমের নূতন মূর্ত্তি। ইনি কোন্ নামান্তর্গত অবলোকিতেশ্বর তাহাও এখন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই; বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ইত্যাদি কি এই অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই?

এই অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিকে দেখিতে দেখিতে আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন বর্ত্তমানের শ্মশানসদৃশ রামপালের মধ্যে বৌদ্ধ যতিগণের মধুর কণ্ঠনিঃসৃত ধর্ম্মসঙ্গীতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইত, যেদিন শীলভদ্র দীপঙ্কর প্রভৃতি মনীষিগণের দিগন্তবিশ্রুত জ্ঞানগরিমার বাণী সুদূর তিব্বত ও চীন হইতে বিদ্যার্থিগণকে আহ্বান করিয়াছিল। যাঁহাদের কীর্ত্তিগৌরব ইতিহাসের বক্ষে জীবিত রহিয়া আজ—আমাদিগকে আনন্দে উদ্ভাসিত করিতেছে, আজ সেই পুণ্যতীর্থ বিক্রমপুরের নগণ্য অধিবাসী আমি, আপনাদের নয়নসমক্ষে অবলোকিতেশ্বর দেবের মহিমা-মণ্ডিত চিরসুন্দর মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া অতীত গৌরবকাহিনীর পুণ্যস্মৃতিতে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আজ আমার নয়নসমক্ষে রামপালের শ্মশানদৃশ্য দূরে চলিয়া গিয়াছে, আজ দেখিতেছি সৌধমালাপরিশোভিত উজ্জ্বল আলোক-কণাবিচ্ছুরিত নগরীর নাগরিক সমৃদ্ধি ও জনসঙ্ঘের কলনাদের মধ্য দিয়া রামপালের সঙ্ঘারামে শত শত ভিক্ষুগণের মধুর কণ্ঠে অবলোকিতেশ্বর দেবের ধ্যানমন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে "ওঁ পদ্মেমণি হুঁ"। আর সেই একদিনের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি-প্রাপ্ত, ভক্তগণের চির-আরাধ্য দেব অবলোকিতেশ্বর আপনার জড়দেহ লইয়া কালের বিজয়-গৌরব ঘোষণা করিতেছেন।

সহঃ সম্পাদক।

কাশীরামের স্মৃতি-সমস্যা।

কবিবর রবীন্দ্র নাথ বলেন—"যাঁহারা বড় কবি তাঁহারা নিজের কাব্যেই নিজের তাজমহল তৈরি করিয়া যান। সে জন্য ত কাহাকেও চেষ্টা করিতে হয় না।" এ কথা খাঁটী সত্য। লোকে স্মৃতি রক্ষার জন্য কিছু করুক, আর নাই করুক, তাহাতে সে মৃত কবির বিশেষ কিছুই আসিয়া যায় না, তাহাও ঠিক। তবুও লোকে যাহা করে বা করিবার চেষ্টা করে, সে কেবল সেই মৃত কবির প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই করে।

এই কর্ত্তব্য প্রণোদিত হইয়াই বর্দ্ধমান কাটোয়ার কয়েকটী শিক্ষিত ভদ্রলোক বাঙ্গালা মহাভারতকার কাশীরাম দাসের জন্মভূমির ক্রোড়ে তাঁহার স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া মুদ্রিত পত্র প্রেরণ করেন। সে আজ কয় মাসের কথা। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ও পারিবারিক দুর্ঘটনায় এ পর্য্যন্ত আর সে সম্বন্ধে কোন খোজ খবর লইতে পারি নাই। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত দীনেশ চন্দ্র সেন, বি, এ মহোদয় লিখিত "প্রবাসী"তে প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠে অবগত হইলাম যে, স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠার এক বিষম সমস্যা বাধিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে লোকে কাশীরামের জন্মভূমি বলিয়া কোন স্থান নির্দ্দেশ করিত তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস লেখক সুপণ্ডিত শ্রীযুত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" প্রকাশিত হইবার পর হইতেই লোকে এক বাক্যে ইন্দ্রানী পরগণার সিঙ্গি গ্রামকেই কাশীরামের জন্মভূমির সম্মান প্রদান করিয়া আসিতেছে। তাই কাটোয়ার উদ্যোক্তাগণও

এই সিঙ্গি গ্রামেই কাশীরামের স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন এবং কি প্রণালীতে স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলে কাজটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র নিকট তাঁহারা সেই পরামর্শ চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। 'সাহিত্য পরিষৎ' আবার এ বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করিবার ভার শ্রীযুত দীনেশ চন্দ্র সেনের উপর অর্পণ করেন। এই সময় 'নবাবী আমলের বাঙ্গলার ইতিহাস' লেখক শ্রীযুত কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ভার প্রাপ্ত অধ্যক্ষ দীনেশ বাবুর নিকট এক তর্ক উপস্থিত করেন। তিনি বলেন "কাশীরামের জন্মভূমি সিঙ্গি গ্রামে নহে—সিদ্ধি বা সিদ্ধ গ্রাম। পণ্ডিত রাম গতি ন্যায়রত্ন মহাশয় সিঙ্গি নিবাসী কোন যুবকের অলীক কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া সিঙ্গি গ্রামকেই কবির জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করায় এই গোল বাধিয়াছে।" দীনেশ বাবু ও কালি বাবুর মধ্যে এই কথা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইয়াছে যে, ২০০ দুই শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত বহুসংখ্যক মহাভারত দৃষ্টি করিয়া এ সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। অধিকাংশ মহাভারতে যদি 'সিঙ্গি' গ্রাম লিখিত থাকে তবে সিঙ্গি গ্রামই কাশীরামের স্মৃতি চিহ্ন ক্রোড়ে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইবে—আর যদি 'সিদ্ধি বা সিদ্ধ' গ্রামের উল্লেখ থাকে তবে অবনত মস্তকে কালি বাবুর কথা মানিয়া লইয়াই কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু এখন সব চেয়ে কঠিন কাজ হইতেছে ২০০ দুই শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত মহাভারত সংগ্রহ করা। কোথায় কাহার নিকট এই সকল গ্রন্থ পাওয়া যাইবে তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা একজন বা দুই জনের সাধ্যায়ত্ত নহে।

কাটোয়াবাসিগণ এ শুভকার্য্যের উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া ইহা শুধু তাঁহাদের কার্য্য নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট এ বিষয়ের পরামর্শ চাওয়া হইয়াছে বলিয়া পরিষৎ যে একাকীই সব করিবেন এমন কোন কথা নহে। কিম্বা দীনেশ বাবুর উপর এ বিষয়ের ভার দেওয়া

হইয়াছিল বা কালি প্রসন্ন বাবু এই সম্বন্ধে তর্ক তুলিয়াছেন বলিয়া তাঁহারাই এ বিষয়ে দায়ী নহেন। কাশীরাম শুধু তাঁহাদের নন—কাশীরাম আমার, কাশীরাম তোমার, কাশীরাম বাঙ্গালার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত আপামর সাধারণ সকলের। তাই বলি—এস, আমরা সকলে মিলিয়া যে যেখান হইতে পারি ২০০ দুই শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত মহাভারত অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়া দিয়া এ সমস্যা মীমাংসার সাহায্য করি—আর সঙ্গে সঙ্গে কাশীরামের স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনের আংশিক গৌরব অর্জ্জন করিয়া কৃতার্থ হই।

শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেন।

যাজপুর।

কটক হইতে যাজপুর ৪৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা হিন্দুতীর্থ বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। যাজপুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর,—উড়িষ্যার সোমবংশীয় মহাশিবগুপ্ত যযাতি নামক নরপতি কর্ত্তৃক এই স্থানে উড়িষ্যার রাজধানী স্থাপিত হয়—এ নিমিত্তই প্রাচীন তাম্রশাসনে ও শিলালিপি ইত্যাদিতে ইহার নাম 'যযাতি' নগর দৃষ্ট হয়। বৈতরণী নদীর দক্ষিণকূলে যাজপুর নগর অবস্থিত। যাজপুরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক কিম্বদন্তী এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন কালে বৈতরণীর দক্ষিণতটে ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইহার নাম যজ্ঞপুর হয়, ক্রমশঃ ঐ যজ্ঞপুর শব্দ অপভ্রংশ হইয়াই যাজপুর হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এস্থানে মহকুমা হওয়ায় পূর্ব্ব গৌরব বৈভব

পৌরাণিক কিম্বদন্তী ও ইতিহাস।

একেবারে পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। মহারাজ যযাতিকেশরী নামক কেশরীবংশীয় নরপতি উড়িষ্যা জয় করিয়া ৫৭৪ খৃষ্টাব্দে যাজপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এস্থানে যজ্ঞক্ষেত্র, গদাক্ষেত্র, বিরজাক্ষেত্র, নাভিক্ষেত্র, প্রভৃতি বহু হিন্দুতীর্থ বিরাজিত আছে। পৌরাণিক কিম্বদন্তী এইরূপ যে, গয়াসুর যখন বিষ্ণুর চরণতলে দেহ বিস্তার করিয়াছিল, সে সময়ে তাহার মস্তক গয়াক্ষেত্রে এবং নাভিদেশ যাজপুরে সংস্থিত হয়—সেইজন্য ইহাকে নাভিতীর্থ কহে। আবার অপর পুরাণের মত এই যে, মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া যখন নানা স্থানে উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীদেহ খণ্ডিত হইবার সময় ভগবতীর নাভিদেশ পতিত হওয়ায়, ইহার নাম নাভিক্ষেত্রও হইয়াছে। যাজপুরে পূর্ব্বে বহু সুন্দর সুন্দর হিন্দু দেব দেবীর মন্দির ও বিগ্রহাদি ছিল, কিন্তু ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী বিখ্যাত কালাপাহাড়ের সহিত যাজপুরের নিকট তৎকালীন উড়িষ্যার নরপতি মুকুন্দদেবের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে উড়িষ্যার স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তমিত হয় এবং উড়িষ্যাবাসিগণ মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে। মহারাজা যযাতিকেশরীর ও তাঁহার পরবর্ত্তী অন্যান্য নৃপতিগণের বহু হিন্দু মন্দিরাদি কালাপাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন, এবং বহু হিন্দুবিগ্রহ খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া বৈতরণীর জলে বিসর্জ্জিত হইয়াছিল। কত ধর্ম্ম বিদ্বেষিগণের প্রবল নির্য্যাতন যে হিন্দু দেবমন্দির ও বিগ্রহাদির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—তাহা বিস্ময়ের বিষয় বটে, কিন্তু তথাপি এই প্রবল সত্যধর্ম্ম—ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া শুভ্রতুষারমুকুটমণ্ডিত হিমাদ্রির উচ্চ শৃঙ্গের ন্যায় আপনাকে অটল ও অচল ভাবে সেই অনন্তের মহান্ গৌরবময় পথপ্রদর্শকরূপে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কালাপাহাড়ের ভীষণ অত্যাচারের পর হইতেই প্রাচীন সৌন্দর্য্যশালিনী যাজপুর নগরী শ্রীভ্রষ্টা। বর্ত্তমান ডাকবাংলার নিকট সৈয়দ আলিবুখারির সমাধি স্থান, ইনি

কালাপাহাড়ের পাঠান সেনাপতি ছিলেন, কথিত আছে যে, একটী হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করিয়া এই সমাধিটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৈতরণীর তীরে

দেবমন্দির সমূহ।

এখানকার প্রসিদ্ধ দেবমন্দির বরাহনাথের মন্দির, অষ্টমাতৃকার মণ্ডপ ও বিরজা দেবীর মন্দির বিশেষ-রূপে উল্লেখযোগ্য। বৈতরণীর তটবর্ত্তী দশাশ্বমেধ ঘাট এস্থানের প্রাচীনত্বের বিশেষ নিদর্শন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, ব্রহ্মা এস্থানে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দশাশ্বমেধ ঘাট হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে বঙ্গদেশে যেরূপ বৈদ্যকুলোদ্ভব সেনবংশীয় রাজা আদিশূর কনৌজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজা যযাতিকেশরী দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট কনৌজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দশাশ্বমেধ ঘাট হইয়াছে। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট হইতে নগরের দক্ষিণ দিকে সোজাসুজি প্রায় ২॥ মাইল গমন করিলে বিরজাদেবীর

বিরজার মন্দির।

মন্দিরের নিকট পঁহুছিতে পারা যায়। ইহা একটী বিখ্যাত পীঠস্থান। মন্দিরাভ্যন্তরে পাষাণময়ী ক্ষুদ্রকায়া দেবী অবস্থিতা আছেন। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ১০০ × ৭০ফুট একটী পুরাতন পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে, ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড বা বিরজাকুণ্ড। বিরজাদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৪০০ চারি শত ফুট। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মন্দিরটিকে সোমবংশীয় নরপতিগণের সময়ে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করেন। যাজপুরের এ সকল দেব মন্দির সমূহের প্রাচীনত্ব অনুমান করা সুকঠিন ; কারণ চূণবালির গাঢ়তর আবরণ মন্দির গুলির উপর থাকায়—প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন ইত্যাদি দৃষ্টে ইহাদের বয়স অনুভব করা অসম্ভব। ফার্গুসন সাহেব বলেন "Jajepur, on the Bytarni, was one of the old capitals of the province, and even now contains temples which, from the square-

ness of their forms, may be old, but, if so, they have been so completely disguised by a thick coating of plaster, that their carriages are entirely obliterated, and there is nothing by which their age can be determined." (Fergusson's Indian and Eastern architecture P. 243.) বিরজাদেবী অষ্টভুজা এবং অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিতা। জগমোহন মণ্ডপে একটী হোমকুণ্ড ও উহার বহির্ভাগে প্রস্তর নির্ম্মিত চত্বরে বদ্ধ একটী যূপকাষ্ঠে প্রত্যহ পশুবলি হইয়া থাকে। মন্দিরের অনতিদূরে উত্তর ভাগের একটী কক্ষ মধ্যে ৫ পাঁচ ফুট ব্যাসের একটী কূপ নাভি-গয়া নামে প্রসিদ্ধ, যে স্থানে তর্পণ করিয়া পিতৃমাতৃ প্রভৃতির উদ্দেশে পিণ্ড ঐ কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হয়।

চণ্ডেশ্বরস্তম্ভ, কীর্ত্তিস্তম্ভ বা শুভস্তম্ভ।

বিরজাদেবীর মন্দির হইতে কিছুদূরে যাজপুরনগরের প্রায় এক মাইল দূরে চণ্ডেশ্বর নামক গ্রামে একটী স্তম্ভ আছে, ইহাকে কেহ চণ্ডেশ্বরস্তম্ভ, কেহ শুভস্তম্ভ, কেহ গরুড়স্তম্ভ কেহবা কীর্ত্তিস্তম্ভ কহিয়া থাকেন। স্তম্ভটি জঙ্গলা-কীর্ণ স্থানে বিদ্যমান আছে। বহুযাত্রী এই স্তম্ভটি দেখিতে আসে বলিয়া সম্প্রতি গ্রামবাসিগণ একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। স্থানটি বড়ই বিজন,—লোক সমাগম বিহীন। স্থানীয় লোকে ইহাকে 'সভাস্তম্ভ কহিয়া থাকে। উহা লম্বে প্রায় ৩৬ ফুট ১০ ইঞ্চ. স্তম্ভটির নিম্নভাগ হইতে ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত ৯ ফুট অবশিষ্টাংশ চূড়াদেশ। পূর্ব্বে ইহার উপরে একটি গরুড় মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, এখন স্তম্ভের উপরিস্থিত সেই গরুড় মূর্ত্তি চণ্ডেশ্বর গ্রাম হইতে প্রায় ১৷৷৹ মাইল দূরে এক ঠাকুর বাড়ীতে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার মূলদেশস্থ একটী ছিদ্র দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, পাঠানগণ দড়ি বাঁধিয়া টানিবার নিমিত্ত এই স্তম্ভে ছিদ্র কাটিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে ইহা ব্রহ্মার অশ্বমেধ যজ্ঞের স্তম্ভ,

আবার কেহ কেহ এইটিকে সোমরাজবংশীয় নৃপতিবর্গের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া কহেন। যে যাহাই বলুক, প্রকৃত ইতিহাস এ পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিতে পারেন নাই,—কখনও কেহ পারিবেন কিনা তাহাই—বিশেষ সন্দেহ স্থল। মুসলমানগণ এই স্তম্ভটিকে ধ্বংস করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কোন কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ইহার শিরোদেশস্থ শিল্প কার্য্যাদি দর্শনে ইহাকে বৌদ্ধসম্রাট অশোকের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমান অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। উহার উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত গরুড় মূর্ত্তি সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীযুগে বৈষ্ণব বংশীয় নরপতিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ মহাত্মা ফার্গুসন সাহেব এই স্তম্ভটীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,— " *There is one pillar, however, still standing * * * as one of the most pleasing examples of its class in India. Its proportions are beautiful, and its details in excellent taste; but the mouldings of the base, which are those on which the Hindus were accustomed to lavish the utmost care, have unfortunately been destroyed. Originally it is said to have supported a figure of Garuda—the Vahana of Vishnu and a figure is pointed out as the identical one. It may be so, and if it is the case, the pillar is of the 12th or 13th century." (Fergusson's Indian and Eastern architecture P. 432).
যাজপুরের নিকটস্থ নরপড়া নামক একটী গ্রাম আছে, সেস্থানেও একটী প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ সমাধি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামবাসিগণ ইহাকে মহারাজা যযাতিকেশরীর প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপ বলিয়া অনুমান করে,—এখনও ইহার প্রকৃত বিবরণ কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। যাজপুরের তিতুলামাল নামক গ্রামে আঠারনালার সেতুর গঠনাকৃতি একাদশ খিলান-যুক্ত একটী সেতু

দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাও অত্যন্ত প্রাচীন। কয়েক বৎসর হইল, যাজপুর মহকুমা হইতে প্রায় ১॥ মাইল পশ্চিমে একটী মাঠের মধ্য হইতে শাস্ত মাধব নামক এক বৃহৎ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি তিনখণ্ডে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শীর্ষদেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত ৯ ফুট ১॥ ইঞ্চ এবং উরু হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত ৭ ফুট ১১ ইঞ্চ লম্বা। এই মূর্ত্তির এক হস্তে পদ্ম এবং চূড়ার উপরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেকে পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। এক্ষণে এই মূর্ত্তিটি এবং ইহার সহিত আরও কয়েকটি মূর্ত্তি স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারীর মধ্যে রক্ষিত আছে।

শান্ত মাধব ও অগ্নীশ্বর।

যাজপুরের কিছুদূরে অগ্নীশ্বর নামক একটী প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত আছেন, স্থানীয় জনসাধারণে প্রতিদিন ইহার গাত্রের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমরা বরাহনাথের মন্দির যাজপুরের প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে বৈতরণী তটস্থ বরাহনাথের মন্দির ও অষ্টমাতৃকার মণ্ডপ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব, পূর্ব্বেই বিরজা দেবীর মন্দির ও দশাশ্বমেধ ঘাটের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই দেব মন্দির খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজা প্রতাপ রুদ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ স্থানে গো-দান করিলে আর বৈতরণী পারের ভয় থাকে না। এখন গো-দানের পরিবর্ত্তে মূল্য স্বরূপ পঞ্চমুদ্রা দান করিলে গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে। হায় রে বিশ্বাস! বরাহনাথের মন্দিরের পাদদেশেই বৈতরণীর তীরে দশাশ্বমেধ ঘাট অবস্থিত।

বরাহনাথের মন্দির।

বৈতরণীর অপর তটে অষ্টমাতৃকার মণ্ডপ অবস্থিত। এস্থানে আটটি পাষাণ নির্ম্মিতা দেবীমূর্ত্তি বিরাজিতা আছেন। এই মূর্ত্তি সমূহ সাধারণ মনুষ্যাকৃতি অপেক্ষা অনেকটা

অষ্ট মাতৃকার মণ্ডপ।

উঁচু, নীলবর্ণ প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত তাহাদের গঠন নৈপুণ্যের মধ্যে শিল্প-চাতুর্য্য অনুভূত হয়। ইন্দ্রানী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ব্রাহ্মণী, বারাহী, চামুণ্ডা ও ছায়া এই অষ্ট মূর্ত্তি মণ্ডপ মধ্যে অধিষ্ঠিতা আছেন। এতদ্ব্যতীত বৈতরণী নদীর তীরে কালী, শচী, বিমলা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, পার্ব্বতী প্রভৃতি বহু দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যাহারা পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতেন, তাঁহারা সকলকেই যাজপুরের এ সমুদয় দেব মন্দিরাদি দর্শন করিয়া যাইতেন, কিন্তু রেল হওয়ার পর হইতে এস্থানে যাত্রিসংখ্যা খুব কম হয়। যাহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাদের অবসর ও সুযোগ মিলিলে এ সকল হিন্দুর প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ অতি অবশ্য দর্শন করা উচিত।

পৌরাণিক মতে যাজপুর অত্যন্ত পৌরাণিক তীর্থ। মহাভারতেও লিখিত আছে যে, পঞ্চ পাণ্ডবগণ এস্থানে তীর্থোদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন * ইহাই পুরাণের বিরজাক্ষেত্র। কপিল সংহিতায় ও ব্রহ্মপুরাণে এস্থানের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে লিখিত আছে। স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

বিরজে যো মম ক্ষেত্রে পিণ্ডদানং করোতি বৈ।
স করোত্যক্ষয়াং তৃপ্তিং পিতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ॥
মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠা বিরজে যে কলেবরম্।
পরিত্যজন্তি পুরুষাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ॥ (ব্র পু ৪২ অ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই বিরজা ক্ষেত্রে পিণ্ডদান করে, সে ব্যক্তি তাহার পিতৃলোকের অক্ষয় সন্তোষ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। এবং যে ব্যক্তির এস্থানে মৃত্যু হয়, সে অনায়াসে মোক্ষলাভ করে। কপিল সংহিতায়ও এইরূপ খ্যাতি লিপিবদ্ধ আছে। অতএব তীর্থ হিসাবেও যাজপুরের প্রতিপত্তি কম নহে।

আমরা যাজপুর দর্শনান্তে আবার মাতৃভূমির শ্যাম স্নিগ্ধ স্নেহাঞ্চলে

* মহাভরত বন পর্ব্ব (১১৪ অধ্যায়)।

ফিরিয়া আসিলাম। উড়িষ্যার প্রাচীন হিন্দু কীর্ত্তি সমূহ দর্শনে হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা ভাষায় ব্যক্ত করার প্রয়াস বৃথা। ভারতের যাহা কিছু প্রাচীন এবং শিল্প কারুকার্য্যে সম্পন্ন তাহাই দেবোদ্দেশে নির্ম্মিত, ইহা অপেক্ষা ভারতবাসীর ধর্ম্ম প্রবণতার আর কি অধিক পরিচয় হইতে পারে জানি না। বর্ত্তমান সময়ে বাষ্পীয় শকটের অনুগ্রহে উড়িষ্যা অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে—বিশেষ উড়িষ্যা-ভ্রমণে বহু ব্যয়েরও প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই ইহা করায়ত্ব। উড়িষ্যাবাসীদিগকে উড়ে একজন্ত এই ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমরা নিজ জাতির সংকীর্ণতার পরিচয় দিলেও—এককালে যে ইহারা কতদূর উন্নত ও বীরজাতি ছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকবর্গ মাত্রই অবগত আছেন। উড়িষ্যাবাসীদিগকে ঘৃণা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তাহাদের যাহা আছে, তাহা আমাদের এই? একখণ্ড সামান্য প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে যে অপূর্ব্ব শিল্প-নিপুণতা ও মৌলিকতা সারা বাংলা দেশেও তাহা দুষ্প্রাপ্য। প্রাচীন ভারতের অতুল শিল্পৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার যে কত বৃহৎ কত উন্নত ও কত সমৃদ্ধিশালী ছিল, পাঠক! যদি তাহা অনুভব করিতে চাও, তবে উড়িষ্যায় যাও। যাহা দেখিবে তাহাতে বিমুগ্ধ হইবে। উড়িষ্যার একাম্রকাননের যে সমুদয় মন্দির জঙ্গলাকীর্ণ ও পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে যদি তাহার একটা বঙ্গদেশে থাকিত তাহা হইলে আমরা গৌরব অনুভব করিতাম। উড়িষ্যায় যাহা দেখিয়াছি তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়াছি। হায়! যাহারা এ সকল অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা আজ কোথায়? কত চিন্তা, কত অর্থব্যয় ও কত খ্যাতনামা শিল্পিগণের গৌরব বৈভব প্রতি মন্দিরের প্রতি কার্ণিসে প্রতি প্রস্তরগাত্রে খচিত তাহা কে বলিতে পারে? যাহারা উড়িষ্যার এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে হাণ্টার সাহেব ফার্গুসন সাহেব, চার্লিং সাহেব ও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের পুস্তকাবলী পাঠ করা উচিত, তাহা হইলে দর্শনের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যেরূপ প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি সমূহ এখনও বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা হিন্দু-মাত্রেরই দেখিবার এবং গৌরব করিবার স্থল। যুগযুগান্তের নানারূপ পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবের মধ্য দিয়া যে প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে তাহা দেখিতে কাহার না সাধ হয়? আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, একথা উড়িষ্যায় আসিলে সহজে যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, অন্যত্র কোথাও সেরূপ হয় না। আশা করি, যাহারা উড়িষ্যাদেশবাসীদিগকে ঘৃণা করেন, তাঁহারা ইহাদের প্রাচীন শৌর্য্য বীর্য্য ও ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব নিপুণতার কথা চিন্তা করিয়া সেই সংকীর্ণ বুদ্ধি বিস্মৃত হইবেন। যে জাতি আজ এত পতিত ও অবনত তাহাদের প্রাচীন ইতিহাসের গৌরব-কাহিনী-পাঠে জ্ঞানীও ব্যথিতের অশ্রুজল ও সহানুভূতি আসাই স্বাভাবিক ঘৃণা নহে।

শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

ছিয়াত্তর সালের মন্বন্তর।

—:*:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাজকর পরিশোধ করিয়া ও বণিক সম্প্রদায়ের সর্ব্বগ্রাসী লালসা হইতে অতি কষ্টে মুষ্টিমেয় শস্যের সংকুলান করিয়া ১৭৭০ খৃঃ বর্ষাকাল পর্য্যন্ত রোগ, যন্ত্রণা ও অনাহারের মধ্যেও যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহা-দিগের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। যে বিধির বিধানে, সুনির্ম্মল শরৎ আকাশে গাঢ়, ঘনকৃষ্ণ মেঘ উদয় হয়, আবার তাঁহারই শাসনে ঘোর

আঁধার কাটিয়া গিয়া, শুভ্রচন্দ্র শোভা পায়। যে মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য বঙ্গবাসী কাতর কণ্ঠে চীৎকার করিয়াছে, তিনমাসের মধ্যে কোন যাদু-মন্ত্রে জীবের জীবনমূল শস্যের নীরদবর্ণে বঙ্গের মলীন প্রান্তর আবার "শস্য শ্যামল" আখ্যা ফিরিয়া পাইল। কলিকাতার কৌন্সিলের সভ্যগণ "কোর্ট অব ডিরেক্টর" গণকে জানাইয়া পাঠান যে, বঙ্গের দুর্ভিক্ষ একান্তই অন্তর্হিত হইয়াছে; বঙ্গদেশে যে পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে দুর্ভিক্ষ বিদূরীত হইয়া শান্তি ও সাচ্ছন্দ পুনস্থাপিত হইয়াছে। আর বর্ত্তমান সময়ে প্রচুর পরিমাণে সুলভ মূল্যে ধান্য ক্রয় করিয়া, সিপাহীর জন্য সঞ্চয় করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় অকারণ উদ্বিগ্নতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে, সুতরাং বর্ত্তমান সুযোগ ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নয়, ইহাও ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করিলেন।

হায়! দুর্ভাগ্য ইংরাজ বণিক! তোমাদিগের স্বার্থ কি এতই প্রবল যে তাহার নিকট মনুষ্যত্ব, অভিজাত্য ও মমতা সমস্তই বন্যার মুখে কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যায়। তোমরা তোমাদিগের নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, যে অখ্যাতি রাখিয়া গেলে, যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া, বর্ত্তমান সময়েও সমস্ত ব্যাপার যথাযথরূপে "কোর্ট অভ ডিরেক্টর" গণের নিকট নিবেদন করিয়া, দরিদ্র বঙ্গবাসীর জন্য, অন্ন ভিক্ষা করিতে, যদি দেশের পীড়িত ব্যক্তিদিগের সেবা করিতে, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিতে, আর উৎপন্ন শস্য তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে কয়েকমাস ভোজন করিতে দিবার জন্য, তাহাদিগকে এক বৎসর দরিদ্রের ভীতকর রাজকর হইতে অব্যাহতি দিতে, তাহা হইলে বঙ্গ তাহার নষ্ট সম্পদ পুনঃ লাভ করিত, বঙ্গের জমিদারকুল তাহাদের সুখসম্পদ হইতে ভ্রষ্ট হইত না।—তাহা হইলে সমস্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে তোমাদিগের জন্য বা কৃতজ্ঞতার সুবর্ণ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা চিরদিন তাহাদিগের বংশধরের দ্বারা

পবিত্র প্রীতিপুষ্পে পূজিত ও ভক্তির সুবিমল অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া, জগতের ইতিহাসে তোমাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত। যাহা হউক, মন্বন্তর কাটিয়া গেল। ১৭৭১ খৃঃ প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হওয়াতে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ফসলের সঙ্গে সঙ্গে শস্যের মূল্য হ্রাস পাওয়াতে, কৃষকগণ সমুদয় ফসল বিক্রয় করিয়াও নির্দ্ধারিত রাজকর প্রদান করিতে পারিল না। ষোল আনা ফসল হইলে কি হয়? বণিকগণ মন্ত্রণা করিয়া চাউলের মূল্য চারিগুণ কমাইয়া দিল। দরিদ্র কৃষক পরিশ্রমান্তে উদ্বৃত্ত শস্য হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করতঃ যে কয়েকটী মুদ্রা সংগ্রহ করিল তাহা কোম্পানীর সিপাই আসিয়া দখল করিয়া বসিল। তারপর সুদ কষিয়া, গত বৎসরের প্রাপ্য রাজকরের উপর শতকরা দশ টাকা চাপাইয়া, সিপাহি জানাইয়া গেল যে, কোন নির্দ্ধারিত দিনে তাহাকে ঐ টাকা প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু সে কথা যাক্! আমরা বলিতে ছিলাম যে, ১৭৭১ খৃঃ আর কাহারও অন্নের ভাবনা রহিল না। কৃষকজননী নবান্নে তাঁহার মৃন্ময় পাত্র সাজাইয়া অন্নক্লিষ্ট পুত্রকন্যাগণকে ভোজন করাইল; আজ যেন মাতা অন্নপূর্ণা তাঁহার পুত্রকন্যাগণের অনশন সংবাদে ব্যথিত হইয়া কোন সুদূর স্থান হইতে এই নদী মালিনী বঙ্গভূমিতে আসিয়া প্রশস্ত নির্ম্মল আকাশের নিম্নে ধূসর প্রান্তরের মধ্যে তাঁহার শ্যামল অঞ্চল বিছাইয়া অন্নছত্র খুলিয়াছেন; বঙ্গবাসী এই অন্নছত্রে নিমন্ত্রিত হইয়া অবাধ আনন্দোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বঙ্গভূমিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের দ্বারা যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, প্রকৃতি যেন আপন হস্তে সে ক্ষতি সারিয়া লইতে সচেষ্ট! এক বৎসরের দুর্ভিক্ষের কঠোর তাড়নে বঙ্গদেশের বক্ষে যে কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল, সেই ক্ষত প্রকৃতি যেন আপনি সারাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! তাহা হইল কই? এই কয়েক মাসের মধ্যেই কৃষক প্রধান বঙ্গের এক তৃতীয়াংশ

লোক কালকবলে কবলিত। বাঙ্গালার পরিশ্রমী শিল্পীকুল নির্ম্মূল—সমগ্র বাংলার অর্দ্ধেকের উপর কৃষক মৃত। সুতরাং কে আর হল কর্ষণ করিয়া বাংলার অন্ন যোগাইবে? হতাদরে ও লোকাভাবে উর্ব্বর ক্ষেত্র সমূহ অকর্ষিত ভাবে পড়িয়া রহিল। রাজপ্রাসাদ পরিশোভিতা নগরী হইতে, কৃষকজননী সামান্য পল্লী পর্য্যন্ত, সমুদয় বাংলা জনশূন্য প্রায়। কৃষকগণ হয় মৃত না হয় জঠর জ্বালায় ঘর দ্বার ফেলিয়া পলাইয়াছে। তাহাদিগের গৃহ সংলগ্ন প্রশস্ত ক্ষেত্র সমূহ কর্ষণাভাবে মহা জঙ্গলের মধ্যে সভয়ে মস্তক লুকাইয়া রহিয়াছে। সরকারী কাগজে প্রকাশ যে এই নয় মাসের দুর্ভিক্ষে অন্ততঃ এক কোটী লোক অনাহারে অথবা রোগ-যন্ত্রণায় অকালে জীবন হারাইয়াছে। পাঠকগণ! আসুন এইবার আমরা দেখি, এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে বঙ্গবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য সরকার বাহাদুর কতটুকু স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একটী অবান্তর কথার উল্লেখ করিব। সেটী তৎকালীন বণিকসম্প্রদায় সম্বন্ধে সর্ব্বজন বিদিত কয়েকটী ঐতিহাসিক সত্য কথা।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে "কোর্ট অব্ ডিরেক্টর"গণ যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহাতে তাঁহারা সন্দেহ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতে বণিক সম্প্রদায়ের উচ্চ নীচ সকলেই বাংলা দেশে একচেটিয়া ব্যবসায় লিপ্ত থাকিয়া বঙ্গবাসীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে তৎকালীন ইংরাজগণ যে বাণিজ্য ব্যপদেশে, হয় স্বয়ং না হয় অনুগৃহীত ভারতবাসীর সাহায্যে, ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ সাধনে ব্যস্ত ছিলেন, একথা অস্বীকার করা চলে না। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণও একথা অস্বীকার করেন নাই। হুইলার সাহেব এইরূপে নিজমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

"The monopoly was bad; the conduct of the gomostas was worse. Native servants of European

masters generally inclined to be pretentious and arbitrary towards their own countrymen." It is easy to understand how they would conduct themselves in remote cities when invested with the emblence of authority and when the English name was regarded with awe.

"They assumed the dress of English Sepoys, lorded it over their country and imprisoned ryats and merchants and wrote and talked in an insolent tone to the nawab officers,"

কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ দরিদ্র রায়তগণকে অকথ্য ভাবে উৎপীড়ন করিত; তাহাদের পুত্র কন্যাগণের জন্য সঞ্চিত তণ্ডুলকণা বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিলে, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া কাছারী বাড়ী লইয়া যাইত ও তৎপরে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিত।

In every district and village and factory they bought salt, betelnuts, ghee, rice etc. They forcibly took away the goods of the ryats and obliged them to give for articles which were worth Rs. 5.

ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু তিনি যে স্বজাতি বাৎসল্যের বশীভূত হইয়া এক অলীক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, বরং আরব্য উপন্যাসের গল্পের মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব, তথাপি তাহা নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন যে, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ইংরাজ প্রভুর অজ্ঞাতে এই জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। তাঁহাদিগের কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগের প্রভুগণ দোষী হইতে পারেন না, এই কথা অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিতে বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু একথা কি সত্য? Verelst যে "Memorendum" প্রকাশ করেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইংরাজ কোম্পানীগণ ব্যবসা চালাইবার জন্য ভারতবাসিগণকে নিযুক্ত করিতেন; ভারতবাসিগণ প্রভুর আদেশে উক্তরূপ ব্যবসা চালাইত।

"But from what has been said of the characters of the people, who are employed directly or intermediately forced every thinking person must be sensible of one capital defect in our government the members of it devine their sole advantages from commerce carried on through block agents who again employ a numerous band of retainers."

ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। ইহা হুইলার সাহেবও অবগত ছিলেন। এই জন্য অজ্ঞাতসারে অন্যত্র তাঁহারও লেখনী হইতে সত্যকথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

"The servants of the company, from member of the council downwards, derived the bulk of their income from inland trade and their gomostas or agents, continued to oppress the people as in the days of Mirkasem.

ইহাঁদিগের বিষয় অনেক বলিবার আছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধ সংক্ষেপ করিবার জন্য এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে তাঁহাদিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া যে শত শত হতভাগ্য বঙ্গবাসী নীরবে অশ্রুপাত করিতে করিতে চিরপরিচিত বঙ্গভূমির উদার আকাশ অনন্ত ধূসর প্রান্তর ও স্বজন পরিবেষ্টিত সুখময় গৃহ হইতে চিরবিদায় লইয়া যে স্থানে দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার নাই, অনশনে ক্লেশ নাই, কলির সর্ব্বগ্রাসী লালসা নাই—সেই অমরধামে যাত্রা করিয়াছে ইতিহাসে তাহা সম্যক সন্ধান না রাখিলেও, উক্ত বণিকসম্প্রদায় যে এই লক্ষ লক্ষ নর নারীর বিফল মরণের জন্য দায়ী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

তুর্কজাতির উৎপত্তি।

সম্প্রতি তুরস্কে যে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি এক্ষণে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। সমগ্র মানবজাতির এক করুণ সহানুভূতি তুরস্কের রাজ্যচ্যুত সুলতান হামিদের উপর পতিত হইয়াছে—এরূপ স্থলে তুর্কজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আরবভাষার অত্‌রক্ * শব্দ হইতে তুর্কশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তুর্কজাতির উৎপত্তি বিষয়ক তিনটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রথমটী তুর্কীদের, দ্বিতীয়টী পারস্য ও আরববাসীদিগের এবং তৃতীয়টী চীন অধিবাসীদিগের দ্বারায় প্রচারিত হইয়াছে। তুর্কী ঐতিহাসিকগণ আপনাদিগকে তুর্কী স্থানের আদিম অধিবাসী এবং নোয়ার পুত্র ইয়াসিক্ বা জাফেটের সন্তান বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন।

পারসিক ঐতিহাসিকগণের মতে তুর্কজাতি পারস্যের সপ্তম সম্রাট ফ্রেডুনের তৃতীয় পুত্র তুরের বংশোদ্ভূত; অপর ঐতিহাসিকেরা তুর্কদিগকে আব্রাহামের সমসাময়িক পিসদাদ্ নামায় ষষ্ঠ সম্রাটের বংশসম্ভূত মনে করেন।

বাদসাহ্ ফ্রেডুন তাঁহার সমুদায় রাজ্য তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন। মাসারেক্ বা প্রাচ্যপ্রদেশ তুরের অংশে পতিত হয়। বাদশাহ্ তুরই তুর্কস্থানের মধ্যবর্ত্তী কাস্পিয়ান হ্রদের সন্নিকটে

* অত্‌রক্—যেমন 'কিসম' একবচনান্ত পদ—ইহার বহুবচনে 'অক্‌সম্' সেইরূপ 'তুর্ক' শব্দের বহুবচনে "অত্‌রক্" হয়। এই বহুবচনান্ত পদ আরবী ভাষায় ব্যবহৃত আছে। Vide Abaidulla's Arabic Grammar on "number".

'তুরাণ' নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতক তুর তাহার মধ্যম ভ্রাতা সামের সহিত মিলিত হইয়া আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর আইরিজিকে হত্যা করেন। আইরিজির পুত্র মানুসর পিতৃহন্তা তুরকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেন। এই ঘটনার অনতিকাল পরে বাদশাহ ফেদুনের মৃত্যুতে তুরাণ বা তর্কস্থান মানুসরের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইল।

মানুসরের রাজত্বের পঞ্চাশত্তম বর্ষে তুর্কস্থানের রাজা পাসাঙ্গার পুত্র আফ্রাসিয়াব তুরের মৃত্যুর প্রতিহিংসা লইবার জন্য দেশমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং মানুসরকে পরাজিত করিয়া জিহুন বা আমুনদকে পারস্য এবং তুর্কস্থানের সীমা নির্দ্ধারণ করেন। মানুসরের মৃত্যুতে তাহার পুত্র নডার্ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। নডার পিতৃগুণের সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন না। তাহার দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া আফ্রাসিয়াব্ চারি লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে নডার আফ্রাসিয়াবের হস্তে বন্দী হন ও পরে তৎকর্ত্তৃক নিহত হন। আফ্রাসিয়াব্ সমগ্র পারস্য দেশ জয় করিয়া তাঁহার পিতা পাসাঙ্গার অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন।

আফ্রাসিয়াবের এই নিষ্ঠুর হত্যাব্যাপারে পারস্যবাসিগণ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন ও তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষের অক্লান্ত সাধনায় পারস্যবাসীদিগের সিদ্ধিলাভ হইল—তাঁহারা দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিলেন। জননী জন্মভূমির মুখ পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন ও আফ্রাসিয়াবকে পারস্যদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করাইলেন। এই অপমান আফ্রাসিয়াব শীঘ্রই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন ও পারস্যদেশ পুনরায় আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। পারস্যদেশীয় একাদশ নৃপতি কৈকোবাদের রাজত্ব কালে আফ্রাসিয়াব্ পুনরায় পারস্যদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহার বিরোধী হইলেন। তিনি খ্যাতনামা

যোদ্ধা রোস্তামের নিকট পরাজিত হইলেন। পরবর্ত্তী দ্বাদশরাজা কৈকসর যিনি সলমনের সমসাময়িক ছিলেন তাঁহার রাজত্বকালে রোস্তাম আফ্রাসিয়াব্‌কে পুনরায় পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন এবং তুর্কস্থানের রাজধানী তুরাণ পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বহুমূল্য ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করেন। পারস্যের ত্রয়োদশ রাজা কৈকোদ্রু তুরস্কদেশ আক্রমণ করিবার জন্য ৩০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু এবারও জয়লক্ষ্মী তাঁহাদের বিরূপ হইলেন—তাঁহারা পরাস্ত হইলেন এবং তাঁহাদের সৈন্যাধ্যক্ষ গুদার্জ্জ-মাস্থানদারাণ দেশের দামাওয়ান্দ নামক পর্ব্বতে তুর্কদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন এবং রোস্তাম যথাসময়ে তাঁহার উদ্ধার সাধনে না আসিলে বোধ হয় সেই পার্ব্বত্য প্রদেশেই তাঁহার জীবলীলা শেষ হইয়া যাইত।

এই অবরোধ কালীন তুর্কীদের সাহস ও রণকৌশল দেখিয়া খাকন্‌ ও সাদোল নামক দুইজন রাজা তাহাদের সাহায্যার্থ যোগদান করিয়াছিলেন। এই খাকন্‌ নৃপতির নাম হইতে মোগল সম্রাট 'খাঁন' এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। পারস্যবাসীদিগের সহিত সমরে খাকন্‌ নিধন প্রাপ্ত হন। গুদার্জ্জ ইহার অব্যবহিত পরে ৪ দল তুর্কসৈন্যকে পরাজিত করিয়া ১ লক্ষ লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যান এবং এই ঘটনার কিছু-কাল পরে আফ্রাসিয়াব্‌ ঘাতক হস্তে বিনষ্ট হন।

পারস্য ঐতিহাসিক মীরকন্দ্‌* তুর্কজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ

* ঐতিহাসিক মীরকন্দের প্রকৃত নাম মহম্মদ এবন আমির খোয়ান্দ্‌ সা। তিনি ইতিহাসে মীরকন্দ্‌ নামে অভিহিত ছিলেন বলিয়া আমরাও তাঁহাকে উক্ত নামে অভিহিত করিলাম। ইনি বহুল পরিশ্রম ও আয়াসে নানাদেশের ইতিহাস হইতে সার সঙ্কলন করিয়া পারস্যভাষায় ৮৭৫ হিজরা (১৪৭১ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত সময়ের ৭ খণ্ডে সম্পূর্ণ এক সুবৃহৎ জগতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক ও ভৌগলিক টেক্সিরা মীরকন্দ লিখিত ইতিহাসের সার সংগ্রহ করিয়া উহার একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু পুস্তকখানিতে নানারূপ অসঙ্গতি ও অসম্বদ্ধ ছত্রের অভাব ছিল না, এমন কি, অনেক স্থলে লেখক রচয়িতার অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

D'Herbelot সাহেব তাঁহার Oriental Dictionaryতে তুর্কজাতির ইতিহাস

মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পারসিক ঐতিহাসিক ফদ্‌লোল্লা পূর্ব্বোক্ত মত কিন্তু পোষণ করেন না। ফদ্‌লোল্লা জেঙ্গীসখাঁর উত্তরাধিকারী গজনখাঁর আদেশানুসারে মোগল ও তাতারদের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন।

পারসিক ঐতিহাসিকগণের নিকট হইতে তুর্কীদিগের প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। তাহার কারণ তুর্কীদিগের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা তাহাদের ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের জাতিকে বড় করিয়া দেখিতেন ও তুর্কজাতির প্রতি তাহাদের বিশেষ অনাস্থা ছিল। তুর্কীদিগের নির্দ্দয়তার জন্যও তাঁহারা তাহাদিগকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। অধিকন্তু পারসিক ও তুর্কী-দিগের ভিতর বিবাদ বিসম্বাদ চিরকালই লাগিয়াছিল। এরূপস্থলে পারসিক ঐতিহাসিকদিগের নিকট ন্যায় বিচারের আশা করাই বিড়ম্বনা। আবার যে সকল ঐতিহাসিক তুর্কীনৃপতিদিগের রাজত্বে বাস করিতেন তাঁহারা অনেকস্থলে ভয়ে বা উহাঁদিগের মনোরঞ্জনার্থ তুর্কীদিগের কিংবদন্তীর উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া অথবা তাহাদিগের সকপোল-কল্পিত কাহিনী দ্বারা ইতিহাস রচনা করিয়া যান। বোধ হয় এই সকল কারণেই পারসিক ও তুর্কীদিগের লিখিত ইতিহাসে এত প্রভেদ।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় আফ্রাসিয়াব্ ৩১৪ শত বৎসর জীবিত ছিলেন। এই জন্য কোন কোন পারসিক ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন, আফ্রাসিয়াব্ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল না। ইহা পারস্য জয়ীদের উপাধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। আফ্রাসিয়াব বা ফারসিরাব শব্দের অর্থ পারস্য-বিজেতা।

সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ ও ভ্রমপ্রমাদ বিরহিত নয়। Stephen সাহেব টেম্বিয়ার লিখিত ইতিহাসের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও ভ্রমশূন্য নয়। অধিকন্তু এই পুস্তকখানিতে মুদ্রাকর প্রমাদের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়।

যাহা হউক পৃথিবীতে তুর্কীদিগের মধ্যে যত বড় বড় বংশ আছে, তাঁহারা সকলেই এই বিজয়ী আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। সেলজুক্ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সেলজুক্ নিজেকে আফ্রাসিয়াবের অধস্তন ৩৪ পুরুষ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন এবং ওটমান্ দেশীয় রাজারা আপনাদিগকে সেলজুকদিগের আত্মীয় বলিয়া প্রচার করেন ও সেই সূত্রে আপনাদিগকে আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলিয়া থাকেন। ওটমান্ দেশীয় নৃপতিরা পারসিকদিগকে পরাজিত * করিয়া আপনাদিগকে সাহস ও শৌর্য্যে আফ্রাসিয়াবের উপযুক্ত বংশধর বলিয়া গর্ব্ব করিতেন।

আবুলগাজর্খান তুর্কজাতির ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তুর্কদিগের খাঁ বংশের কথা লিখিতে ভুলেন নাই। তিনি নৃপতি আফ্রাসিয়াবের নাম একটীবারমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আফ্রাসিয়াবকে ওগাজর্খাঁর বংশধর বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে আফ্রাসিয়াবের ধমনীতে মোগল ও তাতারের রক্ত প্রবাহিত ছিল। আফ্রাসিয়াবের বীরত্বকাহিনী সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। বালাসাগণের খাঁ বংশীয় ইলাক নৃপতির বর্ণনাকালে তিনি তাঁহাকে আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। সত্যকথা বলিতে কি তুর্কজাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি বিষয়ক প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া বড়ই দুষ্কর। ইতিহাস ও কাহিনীর একত্র সম্মিলনে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল ঘটনার কোন্ অংশ সত্য, তাহা বাহির করাও সহজ সাধ্য নয়। তবে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, তুর্কনৃপতিগণের মধ্যে আফ্রাসিয়াব ওগাজ ও তুর্ক রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং আধুনিক তুর্কীদিগেরও কেহ কেহ তাহাদের বংশধর; কিন্তু ইহাদিগের সময়ও অলৌকিক কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অনেক কথায় আমরা কোনরূপেই বিশ্বাস

* D' Herb. P. 895. art. Touran. P. 66. art. Afrasial & p. 800 art. Selgiouk.

স্থাপন করিতে পারি না। মোজেস প্রদত্ত জাফেটের বংশতালিকায় আমরা তুর্ককে জাফেটের পুত্র বলিয়া দেখিতে পাই না এবং যখন আমরা দেখিতে পাই। খৃষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মোজেসের লিখিত বিবরণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তখন তুর্ককে জাফেটের বংশধর বলিয়া স্বীকার করিবার কোনই কারণ দেখি না।

চীন ঐতিহাসিকগণের মতে হূণ ও তুর্ক একই জাতি—উহারা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছিল। চৈনিক ঐতিহাসিকগণ তাহাদিগকে Hyong-nu (হূণ) এবং Tu-ki-uk (তুর্ক) বলিয়া অভিহিত করিতেন। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তুর্কীরা হূণ নামে অভিহিত হইত। তুর্কস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া যখন তুর্কীরা তাতার দেশে আপনাদিগের নূতন বাসস্থান স্থাপিত করেন, তখন 'হূণ' নাম পরিত্যাগ করিয়া 'তুর্ক' নাম গ্রহণ করেন। তাহারা কোরিয়ার পূর্ব্ব হইতে গেটের পশ্চিমভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড মরুভূমির নিকটবর্ত্তী স্থানে বসবাস করিয়াছিলেন *। হিয়বংশীয় শেষ চীন সম্রাটের পুত্র মটন্ এই হূণদিগের প্রথম 'তঞ্জু' অর্থাৎ সম্রাট ছিলেন। ওগাজখাঁর একজন পরবর্ত্তী নৃপতির রাজত্বকালে তুর্ক এবং তাতারগণ দুইটী বিভিন্ন 'তঞ্জুতে' (সাম্রাজ্যে) বিভক্ত হইয়াছিল। একদল উত্তর ও অপরদল দক্ষিণ হূণ নামে অভিহিত হইল; কিন্তু পারসিক ঐতিহাসিকগণ তাহাদিগকে মোগল এবং তাতার নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। উত্তর হূণদিগকে চীন অধিবাসীরা বহিস্কৃত করিয়া দিলে তাহারা পশ্চিমাভিমুখে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল; এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকে সেই সময়ে ইউরোপে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। দক্ষিণ হূণগণ তখন হইতেই 'তুর্ক'

* ভেন্-হেন্-তুম্-কো, কম্-মো, য়ে-তুম্ চি ভন্ সন্ তুম পো ফুই ফু (Ven-hyen-tum-kaw Kam-mo, Ye-tum chi van san tum pow foi fu)—Guigues "l'Origin des Huns & des Turks" নামক গ্রন্থে উল্লিখিত উক্তিটী উদ্ধৃত আছে।

নামে অভিহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তাহারা পূর্ব্বতাতারবাসী জুইজেন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া এরগানাকন পর্ব্বতে আশ্রয় লন। তখন হইতেই তাহারা শত্রু বিনাশের জন্য সৈন্য সংগ্রহ ও অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে লাগিল ও পরিশেষে তাহারা পূর্ব্বতাতারস্থ জুইজেনকে পরাস্ত করিয়া 'তুর্কস্থান' নামে এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে নিম্নলিখিত পুস্তক হইতে সাহায্য লইয়াছি :

Cahun ... de Tu Introduction a l'histoir de l'Asie : Tures et Mo ols, de origin.";

Chavannes (E.) 'Docu nts sur les Tou-Kiue (Turcs) occidenti;

Deguigues "Histoi enerale des Tu

Franke (O.) 'Beitraege aus Chinesischen Quellen zur Kennt is der Tuerkvoelker und Skythen Centr. siens.";

Julien (St.) 'Documents historiques sur les Tou-Keoue (Turcs .

Peisker (I.) 'Die aelt Beziehungen der Slaven zu Turkotatare und Germanen und ihre sozialgeschichtliche Bedeutung.":

Vambery (H.) ... (1) "Die primitive Cultur des Turko-tatarischen Volkes.";
(2) "Das Tuerkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen Beziehungen.";
(3) "The Turco-Tatars: an ethnographical sketch."

Kayne's Turks in India and Moodie's All about the Turks.

মেহের উন্নিসা ও শের আফগান।

—:০:—

(বিবাহের পূর্ব্বে) দিল্লী।

মেহের। খাঁ সাহেব! প্রতিবার মুসলমান অন্তঃপুরের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করা আপনার অন্যায়।

শের। আমি ন্যায় অন্যায় বুঝি না, তোমার মুহূর্ত্তের অদর্শন আমার অসহ্য।

মেহের। এই কথা পিতা শুনিলে কি বলিবেন?

শেঃ। আমি তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র, তাই যে ভয় করি না। আর—ভালবাসায় দোষ কি মেহের?

মেঃ। তা—সত্য, ভালবাসায় দোষ কি?

শেঃ। উপহাস করিও না। আমি কখনও দোষ ভাবিয়া তোমার নিকট আসি না। তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও আর আসিব না। আমি কেবলমাত্র তোমার একটী কথার ভিখারী, কেবল একটীবার বল, তুমি আমায় ভালবাস। এই শেষ ভিক্ষা।

মেঃ। এই তোমার শেষ ভিক্ষা? আর আসিবে না? তবে শোণ 'আমি তোমায় ভালবাসি'।

শেঃ। হয় হউক মিথ্যা, হয় হউক উপহাস,—তথাপি মধুর! সত্য বড় ভয়ানক! বড় প্রাণসংহারক! কিন্তু একবার বলিলে না আমায় ভালবাস না কেন?

মেঃ। এই তোমার শেষ ভিক্ষা? আমাকে বিশ্বাস করিলে না?

শেঃ। বড় তীব্র সুখের মদিরা! অমন তরল বহ্নি পান করিতে সাহস হয় না। অমন স্বপ্নে বিশ্বাস করিতে ভয় হয়।

মেঃ। তবে জানিও, ভালবাসি না।

শেঃ। বিশ্বাসযোগ্য বটে! তুমি আমায় ভালবাসিতে পার না।

মেঃ। তবে বোধ হয় আর একই প্রশ্নের উত্থাপনে বার বার লাঞ্ছিত হইতে হইবে না।

শেঃ। অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব মাধুরী! ঐ অসন্তোষের ভ্রূভঙ্গি কি মধুর! ঐ হাস্যময়ী জ্যোৎস্নার অঙ্কে বিরক্তি তমসার ছায়া বড় সুন্দর! সত্যই বলেছ মেহের, প্রণয়ীর ভিক্ষার শেষ নাই।

মেঃ। প্রণয়ী?

শেঃ। ঐ হাসি ভুবনসৌন্দর্য্যহারী! কিন্তু মেহের, মানুষের প্রাণ লইয়া খেলায় কি এতই সুখ? সহস্র পতঙ্গ ভস্ম করিতে দীপশিখার এতই আনন্দ? চন্দ্রে কি কেবল দীপ্তি? সুধা এক বিন্দুও নাই? রমণীর রূপলাবণ্যের পূর্ণশশী তুমি ভালবাসা—কি বুঝনা?

মেঃ। ভা—ল—বা—সা? মস্ত কথা, অর্থ কি?

শেঃ। প্রেম, অনুরাগ।

মেঃ। কথাগুলি কাব্যে অনেকবার পড়িয়াছি, কিন্তু জিনিষটা কি বুঝি না।

শেঃ। অমন পবিত্র স্বর্গের দ্রব্য এ সংসারে আর নাই। অমন সুন্দর আর কিছুই নাই। উহা জ্যোৎস্না অপেক্ষা নির্ম্মল, কুসুম অপেক্ষা কোমল, মদিরা অপেক্ষা মোহময়।

মেঃ। এমন জিনিস? কিন্তু সাহেব, রাজধানীতে তাহা মিলে না কি?

শেঃ। এ ব্যঙ্গ তোমার সাজেনা, তুমি রমণী-শ্রেষ্ঠা! আমার বলিবার ভ্রম হইয়াছিল মাত্র, প্রেম সামান্য জড় পদার্থের ন্যায় দেখা যায় না সত্য, কিন্তু উহা লুকাইয়া রাখিতে পারে না। উহার বিমল জ্যোতিঃ আপনিই ফুটিয়া পড়ে।

মেঃ। সেইটী—কি?

শেঃ। মানবের একটী উচ্চ বলবৎ প্রবৃত্তি মাত্র—মনুষ্য-হৃদয়ে অমন মধুর পুণ্যময় বৃত্তি আর নাই? কৈশোরে হৃদয়বৃন্তে উহার চারুমুকুল অঙ্কুরিত হয়, যৌবনসুখতপ্ত কিরণে তাহা ফুটিয়া উঠে, প্রৌঢ়হৃদয়ে উহার পূর্ণ বিকাশ।

মেঃ। আর বার্দ্ধক্যের অবসাদে তাহা ঝরিয়া যায়।

শেঃ। না মেহের,—প্রেমের পারিজাত-হার কখনও বিশুষ্ক হয় না। বার্দ্ধক্যেও প্রেম প্রবলহৃদয়ে যৌবনের উত্তাপ বহে। মেহের, প্রেম বিলাসের জ্বালাময়ী শিখা নহে। ভালবাসার স্রোতে জোয়ার আছে, ভাঁটা নাই।

মেঃ। সাহেব! সংসার কল্পনার প্রিয় ভূমি নহে, এখানে কবিত্ব এত সুলভ নয়।

শেঃ ইচ্ছা হয় উপহাস কর, কিন্তু যদি আমার কথায় বিরক্ত না হইতে, যদি ভালবাসিতে তবে বুঝিতে, ভালবাসিয়া কত সুখ, কত আনন্দ। তুমি আমায় ভালবাস না, না বাস, তথাপি তোমায় ভাল বাসিয়া সুখ, তোমার জন্য কাঁদিয়াও সুখ। তোমায় যদি আমি ভালবাসি তা'তে তোমার কি?

মেঃ। ইহাই কি সত্য? তুমি কি আমায় চাও না? তুমি কি আমার এই রূপরাশিতে মুগ্ধ নও? এই বাহুর কুসুম স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা কি তোমার নাই? তবে মিলনের এত আকাঙ্ক্ষা কেন? আমার একটী মাত্র কথা শুনিবার জন্য এত ব্যাকুল কেন? আমি ভাল বাসিতে জানি না, তোমার ইচ্ছা হয়, হৃদয়ে ধ্যান করিও। এই মাটীর শরীরের আদরের লাভ নাই। আমি তাহাতেই সুখী হইব, তুমিও বোধ হয় হইবে—কেন না, আমার সুখেই তোমার সুখ।

শেঃ। উপযুক্ত। কিন্তু মেহের, তোমার প্রাণ কিসে গড়া? লৌহে ইস্পাতের দাগ বসে, দর্পনে হীরকের রেখা পড়ে, কুসুম অঙ্কেও ক্ষুদ্রকীট

স্থান পায়, কিন্তু ঐ জ্যোৎস্নায় এত মান গর্ব্ব লুক্কায়িত, ঐ কোমল পরাগ মাঝে এত নিষ্ঠুরতা!

মেঃ। তুমি মনে কষ্ট পাইবে বলিয়া আমি অমন কথা বলি নাই, তবে যাহাকে ভালবাসা বলিলে তাহা বোধ হয় সংসারে নাই। মেহের এখনও প্রকৃত সুখ দুঃখ বিসর্জ্জন দিয়া কল্পনায় বিশ্বাস করিতে শিখে নাই!

শেঃ। তবে কি আছে মেহের?

মেঃ। কিছুই না। মেহের উন্নিসার হৃদয়ের ন্যায় সকল হৃদয়ই শূন্য।

শেঃ। যে পাণিগ্রহণ করিবে, সে বোধ হয় অন্যরূপ ব্যাখ্যা শুনিতে পাইবে।

মেঃ। না,—মেহের—শঠতা শিখে নাই। পিতা যাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, সেই আমার রূপ যৌবনের অধিকারী হইবে, তবে—ভালবাসিতে পারিব কিনা জানিনা। পারি ত—বাসিব, কিন্তু তাহাও বোধ হয় তোমার মতন পারিব না। এই সরলতার জন্য সে আমায় ভালবাসিতে পারে পারুক—নতুবা আমার আপত্তি নাই। বুঝি তোমার কথা মত কেহই ভালবাসিতে পারে না।

শেঃ। ছিঃ! সকলকে দোষ দিওনা।——

মেঃ। পুরুষের প্রাণ এত দুর্ব্বল? তবে রমণী পুরুষের দাসী কেন?

শেঃ। পূর্ব্বে জানিতাম ধরণীতুল্যা রমণীও বীরভোগ্যা—তাই—।

মেঃ। পূর্ব্বে থাকিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে রাজদণ্ড ও সমাজনীতি ঐ পবিত্র প্রেমের পথ রোধ করিতেছে। তবে সংসারে কামনার অতি তীব্র মোহময় আকর্ষণ আছে। মেহেরও এই কথা স্বীকার করে। উহাকে প্রেম বলিতে হয় বল, আপত্তি নাই, কিন্তু ঐ

অনলকুণ্ড কবিতা-কুসুম-গুচ্ছে সাজাইয়া কি লাভ? কামনার তীব্র রশ্মি, নিষ্কাম আবরণে রোধ করিতে পারিবে কেন? আর ঐ যে বীরত্বের কথা বলিলে, আমার মনে হয় উহা লজ্জাহীন দুঃসাহসিকের প্রাপ্য বটে—

শেঃ। অতি জঘন্য কথা।

মেঃ। অবশ্য! তোমরা আমাদের রূপের ভিখারী মাত্র, আমরা বিলাসীর হস্তচয়িত কুসুম মাত্র। আমাদের কামনা নাই, একথা বলিনা, কিন্তু তোমরা পুরুষ উহারই চরিতার্থতার পথে সহস্র বাধা দাও। আর আপনাদের সময় প্রেমের দোহাই দিয়া সারিয়া যাও, আমি এমন শাস্ত্রে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসিনী নই।

শেঃ। সে যাহাই হউক, কিন্তু মেহের, আমি যদি দরিদ্র না হইয়া দিল্লী সিংহাসনের ভবিষ্য অধিকারী হইতাম, তবে বোধ হয় আজ অন্যরূপ ব্যাখ্যা শুনিতাম।

মেঃ। সাহেব,—আমি এখনও কুমারী।

শেঃ। আমি মৃত্যুকে ভয় করিনা, কিন্তু বোধ হয় ইহা নিশ্চয় যে, তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ।

শ্রীমাখনলাল সেন।

কালাচাঁদের মঠ

ঐতিহাসিক চিত্র।

কালাচাঁদের মঠ।

[১]

পূর্ব্ব বা দক্ষিণ বাঙ্গালায় উত্তর পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতের ন্যায় কোন বিশেষ প্রাচীন কীর্ত্তি বর্ত্তমান নাই। ইহার একমাত্র কারণ অনেকে অনুমান করেন যে, বাঙ্গালার এই দুই অংশে পর্ব্বত নাই, সেই জন্ম এই দুই প্রদেশে পাথরে গড়া কোন মন্দির, প্রাসাদ বা দুর্গের ভগ্নাবশেষ যে কাল জয় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহার সম্ভাবনাও নাই। পাথরে গড়া দেবমূর্ত্তি,—কয়েকটি শিবলিঙ্গ ছাড়া তার বেশী কিছু বড় প্রাচীন পাওয়া যায় না; তবে সম্প্রতি বিক্রমপুরে পাথরের অতি প্রাচীন হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও সৌর প্রতিমা আবিষ্কৃত হওয়ায়, অনেকের ঐ ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিক্রমপুরে দেবপ্রতিমাই অনেক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐ সকল প্রতিমা যে প্রস্তর-নির্ম্মিত মঠমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই, কোথাও পাথরের সৌধাঙ্গ আবিষ্কৃত হয় নাই।

নিম্নবঙ্গে যাহা কিছু প্রাচীনকীর্ত্তি এখনও কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া ক্ষতবিক্ষত দেহে ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে, তাহার অধিকাংশই ইষ্টকালয়। এই সকল ইষ্টকালয়ের মধ্যেও খুব বেশী

প্রাচীন কালের কোন সৌধমঠমন্দির যে কোথাও আছে, তাহা জানা যায় নাই। আজ আমরা যে প্রাচীন মঠের ছবি ও বিবরণ প্রকাশ করিলাম, যতটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহা যে চারিশত বৎসরেরও অধিককাল দাঁড়াইয়া আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায়। মঠটি নামে মঠ হইলেও একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত আর কিছু নহে। ইহার শিল্প-সৌন্দর্য্য, গঠন-পারিপাট্য বা অন্য কোন বিশেষত্ব নাই; কেবল ইহার প্রাচীনত্ব এবং ইহার সহিত বাঙ্গালা-দেশের একটি প্রাচীন বংশের ইতিহাস জড়িত থাকায়, ইহার বিবরণ লিখিতে আমরা প্রলুব্ধ হইয়াছি। মঠটির নাম 'কালাচাঁদের মঠ' বা 'রায় কালাচাঁদের মঠ'।

দক্ষিণডিহী গ্রাম পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের নওয়াপাড়া ও ফুলতলা ষ্টেশনের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। নওয়াপাড়া হইতে কয়েক মাইল এবং ফুলতলা হইতে কয়েক মাইল গেলে এই গ্রাম পাওয়া যায়। এই গ্রামে এখানকার বহুকালের প্রাচীন জমীদার রায়চৌধুরী মহাশয়দিগের ভিটায় এই মঠ এখনও দাঁড়াইয়া আছে। মঠটির এখন যে অংশ বর্ত্তমান আছে, তাহাতে কোন খোদিত লিপি নাই। ছিল কি না তাহাও জানা যায় না; তবে চারিদিকে জঙ্গলের মধ্যে ভাঙ্গা ইষ্টকরাশি অনুসন্ধান করিলে, কিছু পাওয়া যায় কি না কে জানে। মঠের চৌতারা বা অধিষ্ঠানবেদী অনেকটা মাটিতে বসিয়া গিয়াছে, তাহা খুঁড়িয়া বাহির করিলেও কিছু পাওয়া যায় কি না, তাহা বলা যায় না। মঠের যতটুকু আছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহা একটি সু-উচ্চ, এক গুম্বজবিশিষ্ট বাঙ্গালা-মন্দির ছিল। চূড়া একটি ছিল কি পাঁচটি ছিল, তাহা আর এখন বলিবার উপায় নাই, কারণ মধ্যচূড়ার চারিদিকে যে ছোট ছোট চারিটি চূড়া চারিটি কোণে থাকে, তাহার ভিত্তিস্থান পর্য্যন্ত ধসিয়া গিয়াছে

মধ্যচূড়ার ভিত্তি গুম্বজের কতকাংশ এখনও বর্ত্তমান। ইহার গাত্রে ভিতরে বা বাহিরে বালিচুণের আর সম্পর্ক নাই। চতুর্দ্দিকের দেওয়াল-গুলি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কোথাও কোথাও বালিচুণের আবরণের কিছু কিছু দেখা যায়। সম্মুখের দ্বারের খিলান পড়িয়া গিয়াছে, এক পার্শ্বের থামের কতকটা আছে। চৌতারা ঠিক আছে তবে বালিচুণ বড় কোথাও নাই। মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ি ভগ্নাবস্থায় সামান্যই আছে। চৌতারার চারিদিকে লতাপাতা ও ফুলকাটা পোড়া ইট দিয়া সাজান বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা বড় বেশী নহে এবং শিল্পও খুব উৎকৃষ্ট নহে। মন্দিরের গুম্বজের অধিকাংশ পড়িয়া যাওয়াতে ইহাতে আর দেবপ্রতিমা রাখিবার উপায় নাই। ইহার চৌতারার উচ্চতা এখন ২॥ হাত হইবে এবং চৌতারার উপর হইতে গুম্বজের মাথা পর্য্যন্ত উচ্চতা আনুমানিক ৮।১০ হাত হইবে সুতরাং অনুমান করা যায় যে, যখন চূড়া বর্ত্তমান ছিল তখন ইহার উচ্চতা ভূমি পৃষ্ঠ হইতে ২৪।২৫ হাত ছিল। রায়চৌধুরী মহাশয়দিগের বংশের ঠাকুর 'কালাচাঁদ' বা 'রায় কালাচাঁদ' নামক শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই এই মঠে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে বিগ্রহ এখন মঠের পশ্চাতে উমাকান্ত রায়-চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর এক কুঠারিতে আছেন।

রায়চৌধুরী বংশ এক সময়ে ধনে জনে মানে বহু সম্মানিত ও বহু-গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন। এখন তাঁহাদের ধন জন কিছুই নাই, বহু-শাখা বংশাভাবে লোপ হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ডিহীতে এখন যে দুই চারি ঘর রায়চৌধুরী আছেন, তাঁহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাঁহারা এই ধ্বংসপ্রায় মঠের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনাদের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া, নিত্য দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করা ভিন্ন আর এখন কিছুই করিতে পারেন না। মন্দিরটির যতটুকু এখনও আছে, তাহাও রক্ষা করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত। তাহার চতুর্দ্দিকে এবং সর্ব্বাঙ্গে যে জঙ্গল

হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার করাইয়া রাখিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই, কাজেই স্মৃতির অবশেষটুকুও দিন দিন ধ্বংসের গর্ভে চলিয়া যাইতেছে।

রায়-চৌধুরী মহাশয়দিগের বংশবিবরণ একটু আলোচনা না করিলে এই মন্দিরটি যে চারিশত বর্ষেরও অধিককালের পুরাতন, তাহা প্রমাণ করিবার আর এখন কোন উপায় নাই। এই রায়-চৌধুরী মহাশয়েরা রাঢ়ীয় শ্রেণীর গুড়গ্রামী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। খুলনা জেলায় হলদা পরগণার অন্তর্গত মহেশপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ গুড় চৌধুরীগণ এই বংশেরই এক শাখা। পাঠান রাজত্বকালের প্রথম হইতেই এই বংশ এই প্রদেশে ভূস্বামী হইয়াছিলেন। কিরূপে ইঁহারা জমীদার হন, তাহার কতকগুলি কিম্বদন্তী ভিন্ন এখন আর অন্য কোন প্রমাণ নাই।

বহুদিন হইতে একটি জনপ্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, মহারাজ বল্লালসেন যখন বঙ্গেশ্বর, তখন তাঁহার পুত্র কুমার লক্ষ্মণসেন তাঁহারই প্রতিনিধিরূপে পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতেন। বিক্রমপুরই তাঁহার রাজধানী ছিল। কুমার লক্ষ্মণসেন যখন বিক্রমপুরে ছিলেন, তখন তাঁহার পত্নী পশ্চিমবঙ্গে মহারাজ বল্লালের রাজধানীতেই রাজপ্রাসাদে থাকিতেন। রাজপ্রাসাদে রাজা ও রাজান্তঃপুরিকাগণের পূজার জন্য দেবমন্দির ছিল। সকলে এখানে নিত্য পূজা করিতে যাইতেন। কুমার লক্ষ্মণ-সেনের পত্নী বিদুষী ছিলেন এমন কি সংস্কৃতে কবিতাদি রচনা করিতে পারিতেন। একদিন বর্ষাকালে, তিনি স্নানের পর দেবমন্দিরে পূজাপাঠ সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়, স্বামীবিচ্ছেদে কাতর হইয়া দেবমন্দিরের এক প্রাচীরগাত্রে নয়নাঞ্জন দ্বারা একটি শ্লোক লিখিয়া রাখিয়া আসেন। ইহার পর মহারাজ বল্লাল পূজা করিতে আসিয়া এই শ্লোক দেখিতে পান,—

"পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদাঃ।
অদ্য কান্তো কৃতান্তোহ বা দুঃখশান্তিং করোতু মে॥

'অবিরত বৃষ্টি পড়িতেছে, ময়ূরময়ূরী আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আজ হয় কান্ত না হয় কৃতান্ত আসিয়া আমার দুঃখ দূর করুন।'—মহারাজ বল্লাল ইহা পাঠ করিয়া অনুসান্ধানে জানিতে পারিলেন যে লেখিকা কে? তখন তিনি নাবিক কৈবর্ত্তগণকে ডাকাইয়া বলিলেন যে আজ যে ব্যক্তি রাত্রি প্রভাত না হইতে কুমার লক্ষ্মণ সেনকে রাজধানীতে আনিয়া দিতে পারিবে, সে যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। সূর্য্যনামে একজন মাঝি স্বীকার করিয়া কথামতে কার্য্যনির্ব্বাহ করিল। মহারাজ বল্লাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া কয়েকখানি গ্রাম দান করিলেন। এই সকল গ্রাম তাহার নামানুসারে 'সূর্য্যদ্বীপ' নামে স্বতন্ত্র একটি প্রগণ (পরগণা) বলিয়া গণ্য হইল। এই সুজদীয়া (সূর্য্যদ্বীপ) পরগণা এখনও যশোর ও খুলনা জেলায় বর্ত্তমান আছে। (১) সূর্য্য মাঝির বংশধরেরা উত্তরকালে

(১) কৈবর্ত্তগণ পূর্ব্বে দুই শাখায় বিভক্ত ছিল,—হালিক (হেলে) ও জালিক (জেলে)। হালিক কৈবর্ত্তেরা আবার দ্বিবিধ জীবিকা অবলম্বন করিয়াছিল। একদল 'হলচালন' অর্থাৎ কৃষিকার্য্য করিয়া 'চাষী-কৈবর্ত্ত' নামে বিখ্যাত হয় এবং অপর দল 'জল-চালন' অর্থাৎ নৌকা বাহিয়া 'মাঝি কৈবর্ত্ত' নামে খ্যাত হয়। এতদ্ভিন্ন জালিকেরা মৎস্যজীবী ছিল। ইহাদের কাহারই স্পৃষ্ট জলাদি উচ্চজাতির গ্রহণীয় ছিল না। কেহ কেহ বলেন মহারাজ বল্লালের পুরস্কারে হালিকগণ (চাষী ও মাঝি কৈবর্ত্তেরা) জল-আচরণীয় শূদ্রমধ্যে গণ্য হইয়াছে। কৈবর্ত্তের যাজক ব্রাহ্মণগণ বর্ণ ব্রাহ্মণ ইঁহারা আপনাদিগকে 'ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ' বলিয়া আখ্যাত করেন। কৈবর্ত্তরাজ দাশরাজ-কন্যা সত্যবতী সম্পর্কে ব্যাস কৈবর্ত্তের দৌহিত্র সুতরাং তিনি যে মাতৃকুলের জন্য একদল ব্রাহ্মণ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবযোগ্য কথা বটে, কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য বর্ণ-ব্রাহ্মণের ন্যায় অনাচরণীয়। কেহ কেহ বা কৈবর্ত্তের জাতিসংস্কারের কৃতিত্ব নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু তাহা ভ্রম ; কারণ বাঙ্গালার যে সকল স্থানে কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকার ছিল না, সে সকল স্থানেও চাষী-কৈবর্ত্তেরা জলচল জাতি হইয়া গিয়াছে; পশ্চিম দক্ষিণ বা উত্তর ভারতে তাহা নহে। কিম্বদন্তীর গল্পটি যাহাই হউক মহারাজ বল্লালসেনের দ্বারাই যখন স্বর্ণ গোচ্ছেদনের অছিলায় স্বর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব নষ্ট হইয়াছিল এবং শ্রাদ্ধের দানগ্রহণজন্য কতকগুলি কুলীন ব্রাহ্মণের পাতিত্যবিধান হইয়াছিল তখন যে কোন কারণেই হউক চাষীকৈবর্ত্তগণের শুদ্ধিবিধান তাঁহারই কৃতকর্ম্ম বলিলে বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

'জেলে রাজা' নামে খ্যাত হন এবং একে একে হলদহ, মহেশপুর, যোগিনীদহ, সুলতানপুর এই পাঁচ পরগণার অধীশ্বর হন। সূর্য্য মাঝির অধস্তন ৫ম পুরুষ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া 'সুলতান' গ্রহণ করেন এবং 'সুলতানপুর' পরগণার নাম সম্ভবতঃ এই রাজা সুলতান মাঝি হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। কথিত আছে এই সুলতান মাঝিকে নষ্ট করিয়া গুড় বংশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ জেলে রাজার রাজ্য অধিকার করেন। এই ব্রাহ্মণের পরিচয় এইরূপ :—

কাশ্যপগোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের আদি পুরুষের নাম দক্ষ। দক্ষের চৌদ্দ পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ধীর। আদিশূরের পুত্র ভূশূর তাঁহাকে বাসার্থ 'গুড়' নামক গ্রাম দান করেন। এই গুড়গ্রাম এখনও বর্ত্তমান, মুরশিদাবাদ সহর হইতে ছয়ক্রোশ পশ্চিমে মুরশিদাবাদ জেলাতেই উহা অবস্থিত। ধীরগুড়ের পরে তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ রঘুপতি আচার্য্য। তিনি শেষদশায় দণ্ডী হইয়া কাশীবাস করিয়াছিলেন। কাশীতে তিনি নিজের পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিবলে তখনকার দণ্ডিসমাজে সর্ব্বোচ্চ সম্মানলাভ করেন। সমগ্র দণ্ডিসমাজ ইঁহাকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া সম্মানের চিহ্নস্বরূপ একটি স্বর্ণনির্ম্মিত দণ্ড প্রদান করেন। ইহা হইতেই ইনি 'কনকদণ্ডী' নামে খ্যাত হন। কেহ কেহ বলেন, রঘুপতি উত্তরকালে 'কনকদণ্ড গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, এজন্য জ্ঞাতিগণের মধ্যে 'কনকদণ্ডী' পরিচয়ে বিশেষিত হইতেন। এই রঘুপতির পুত্র রমাপতিই সম্ভবতঃ জেলে রাজা সুলতান মাঝিকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার রাজত্ব অধিকার করেন। এই অনুমানেরও কারণ আছে,—

মহারাজ বল্লালসেনের কৌলীন্য ব্যবস্থার সময়ে ধীর গুড়বংশীয় শরণি গুড় শ্রোত্রিয় মধ্যে সুসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর মহারাজ বল্লাল সেনের পৌত্রেরই সময়ে পশ্চিম বঙ্গে সেনরাজ্য লোপ হয়। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করিয়া বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের

প্রতিষ্ঠা করেন। (১) শরণি গুড়েরও পৌত্র ভবদত্ত গুড়ের নামের সঙ্গে 'বামন খাঁ'—এইরূপ মুসলমানী উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। 'খাঁ' শব্দের অর্থ ক্লান্তিবোধহীন বীর। কাজেই অনুমান হয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বা দ্বিতীয় পাঠান শাসনকর্তার নিকট এই ব্রাহ্মণ কোনরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, আর সেই জন্য 'খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণে খাঁ উপাধি লাভ করায় দেশের লোকে তাঁহাকে বিশেষিত করিবার জন্য সম্ভবতঃ 'বামন খাঁ' বলিত অথবা মুসলমান আমীরের স্বজাতীয় খাঁ সাহেবদিগের সমান মর্য্যাদায় একজন ব্রাহ্মণকে পাইয়া সামান্যতঃ তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় উচ্চারণে 'বাহ্মন খাঁ' বলিতেন। ইহার যে কোন কারণেই হউক ভবদত্ত খাঁ সাধারণতঃ 'ভবদত্ত বামন খাঁ' নামেই পরিচিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। সে কালে উপাধির সহিত জায়গীর দেওয়া হইত। ভবদত্তও উপাধির সহিত জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাদের জমীদারীর সূত্রপাত।

ভবদত্ত খাঁর পুত্র কার্ত্তিক গুড় 'পণ্ডিত' খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুপতি 'আচার্য্য' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরেরা উত্তরকালে "কনকদণ্ডীগুড়" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রঘুপতি বৃদ্ধবয়সে কাশীতে গিয়া দণ্ড্যাশ্রম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত দণ্ডী তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক একটী কনক অর্থাৎ স্বর্ণদণ্ড প্রদান করেন। কেহ কেহ বলেন, এই ঘটনা হইতে তাঁহার 'কনকদণ্ডী রঘুপতি আচার্য্য' এই নাম হয়। তাঁহার

(১) সম্প্রতি গোবিন্দপাল দেবের রাজত্বকালের দুইটি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা জানা গিয়াছে যে বক্তিয়ার খিলজির বাঙ্গালা জয় কালে মহারাজ লক্ষ্মণসেন জীবিত ছিলেন না। সুতরাং এতদিন ইতিহাসে ১৭ জন মুসলমানসেনার ভয়ে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ মহারাজ লক্ষ্মণসেন আহার ত্যাগ করিয়া পাদুকা না লইয়াই জগন্নাথে পলাইয়া গিয়াছিলেন, ইত্যাকার যে কলঙ্ক কথা প্রচারিত আছে, তাহা একান্ত ভুল ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

দণ্ডাশ্রমের নাম কি জানা যায় না। আবার কেহ কেহ বলেন, রঘুপতি 'কনক দণ্ড' বা 'কনকদাঁড়' গ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার বংশ 'কনকদণ্ডী' নামে খ্যাত হইয়াছে।

যাহাহউক এই রঘুপতি আচার্য্যের পুত্র রমাপতিই সম্ভবতঃ জেলে রাজা সুলতান মাঝিকে নষ্ট করিয়া তাঁহার বিস্তীর্ণ জমীদারী অধিকার করেন। রমাপতির চারি পুত্র প্রেমানন্দ, সর্ব্বানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও অমৃতানন্দ সরস্বতী। অমৃতানন্দ সন্ন্যাসী ও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন তাঁহার রচিত প্রত্যক্ষসংগ্রহ নামক গ্রন্থ আছে। রমাপতির কনিষ্ঠ গণপতি ও মহানন্দ নামে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। অমৃতানন্দও এক মহানন্দের শিষ্য কিন্তু এই গণপতি কিনা তাহা জানা যায় না। রমাপতির পুত্র জ্ঞানানন্দের জয়কৃষ্ণ নামে এক পুত্র হয়, তিনি পরিণত বয়সে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করেন। ইঁহার পর হইতে এই বংশে চতুর্থাশ্রম অবলম্বনের প্রথা পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায় এবং রাজন্যোচিত উপাধি আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। জয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর দুই পুত্র নাগর রায় ও দক্ষিণানাথ রায়চৌধুরী। ইঁহারা দুই ভ্রাতায় জেলে রাজার জমীদারী ব্যতীত সুজল ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী চিঙ্গটিয়া পরগণার অধিকার করেন এবং তাহার দক্ষিণদিকে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই পরগণার মধ্যে এখনও 'উত্তরাডিহী' ও 'দক্ষিণাডিহী' নামে দুইটি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি গ্রামই বর্ত্তমান মধ্যবঙ্গ রেলপথের নওয়াপাড়া ও ফুলতলা ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী, কেহ কেহ বলেন নাগরনাথ ও দক্ষিণানাথ উভয়ে রাজ্যবিভাগ করিয়া লইয়া উভয়ে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ডিহী স্থাপন করেন।

নাগরনাথ রায় ও দক্ষিণানাথ রায় চৌধুরীর রাজ্য-বিভাগ অবলম্বন করিয়া যে, উত্তরডিহী ও দক্ষিণডিহীর নামকরণ হয় নাই, তাহার বিরুদ্ধে একটা ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে। দক্ষিণডিহী গ্রামেই 'নাগর রায়ের হাট-

খোলা:” নামে একটা স্থান এখনও ভৈরবের তীরে পড়িয়া আছে। কথিত আছে, নাগর রায় এই স্থানে একটি বৃহৎ হাট বসাইয়াছিলেন। এখন সেখানে হাট হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ ভূভাগ এখনও নাগর রায়ের অতীত কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। নাগর রায় জমীদারী বিভাগ করিয়া যদি উত্তরডিহীতে আপনার অংশের ডিহী বা কাছারী স্থাপন করিতেন, তাহ হইলে হাটও অবশ্য দক্ষিণডিহীতে না হইয়া উত্তর ডিহীতেই হইত ; কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন এ বিভাগের কল্পনা ঠিক নহে। তবে যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে বিভাগের পূর্ব্বে নাগর রায় এই হাট স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাহইলে, বলিবার আর কিছু থাকে না ; কিন্তু তাহা হইলেও, আবার আর একটি কথা বিবেচ্য আছে। বর্ত্তমান নলডাঙ্গার রাজবংশের আদি পুরুষ ভবদেব রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যুত্থিত হন। তাঁহার বহুপূর্ব্বে নলডাঙ্গার রাজবংশে অধিকৃত যশোহর জেলার অনেক স্থান যে গুড়চৌধুরিগণের অধিকারে ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। এইরূপ সিদ্ধান্তের একটু কারণও আছে। আজকাল নলডাঙ্গার জমীদারী ‘পশ্চিম ডিহী’ ও ‘পূর্ব্বডিহী’ এই উভয় ভাগে বিভক্ত। পশ্চিমডিহীর জমীদারী এক্ষণে নড়ালের রায়বংশের অধিকৃত। এই ডিহী নামে আরও দুইটী গ্রাম এই সকল গ্রামের নিকট আছে,—বেভাগদী অর্থাৎ বিভাগডিহী এবং ধোপাদী বা ধূপডিহী। এই সকল ডিহী নামক বিভাগ দেখিয়া মনে হয় যে বহুপূর্ব্বে কোন এক বিস্তীর্ণ জমীদারীর সুশাসনের জন্য পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—এই চারি ডিহীতে বিভক্ত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, নাগর রায় ও দক্ষিণারায়ের সময়েই যদি এই বিভাগ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে, অন্যায় হয় না, কারণ তাঁহাদের হস্তে তখন, চিঙ্গাটীয়া, হুজদীয়া, হুলদহ, সুলতানপুর, মহেশপুর, যোগিনীদহ প্রভৃতি বড় বড় পরগণা কয়টি ছিল। নাগরনাথ বড় রায় নামে প্রসিদ্ধ ও নিঃসন্তান ছিলেন।

দক্ষিণানাথ ভৈরবতীরে এক মৃন্ময়ী দক্ষিণাকালিকা দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই কালিকা দেবীর স্থান 'কেয়াতলার কালীবাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই কালীস্থান এখনও বর্ত্তমান আছে এবং সিকির হাটখোলার ধারে নদীতীরে 'সিকির হাটের কালীবাড়ী' নামে খ্যাত। 'সিকির হাট' অর্থে 'সিকি' অর্থাৎ চারি আনী জমীদারীর (হুগলীর ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তির) অন্তর্গত হাট।

নাগর নাথের 'রায়' ও দক্ষিণানাথের 'রায়চৌধুরী' উপাধি ছিল। কোন নবাবের নিকট ইঁহারা এই উপাধি পান, তাহা জানা যায় না। দুই ভ্রাতার বিবিধ উপাধি দেখিয়াও অনুমান করা যায় যে, দুই ভাইই নবাবসরকারে বিভিন্ন কর্ম্মে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণানাথের চারিটী পুত্র ও এক কন্যা হয়;—কামদেব, জয়দেব, রতিদেব, শুকদেব ও রত্নমালা। এই চারি ভ্রাতাই বিস্তীর্ণ জমীদারীর অধিকারী হন এবং রত্নমালার বিবাহের পূর্ব্বে দক্ষিণানাথের স্বর্গলাভ হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তোফি।

সম্রাট কণিষ্ক।*

যে ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মার কষ্টসংগৃহীত ও সযত্নরক্ষিত পবিত্র বুদ্ধাস্থি লইয়া আজ সমগ্র সভ্য জগতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে ইউ-চি বংশীয় সেই স্বনামধন্য সম্রাট কণিষ্ক দ্বিতীয় কদ্‌ফিসের পরে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। দ্বিতীয় কদ্‌ফিসের ন্যায় কণিষ্কের শাসনদণ্ডও যে উত্তর পশ্চিম

* Vincent Smith's Early History of India guide অবলম্বনে লিখিত।

ভারত এমন কি বিন্ধ্যাচলের সানুদেশ পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, জনপ্রবাদও তাঁহার সময়ের স্মৃতিস্তম্ভ ও উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহ অবিসংবাদেই তাহা প্রমাণ করিতেছে। সুদূর কাবুলদেশ হইতে গঙ্গা-তীরবর্ত্তী গাজীপুর পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের অনেক স্থলেই, কণিষ্ক ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর নামাঙ্কিত মুদ্রা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তাঁহারা এই বিশাল ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য করিয়াছেন, অনেকের ইহাই বিশ্বাস।

উত্তর সিন্ধুদেশও কণিষ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি যেরূপ বীর ছিলেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে সিন্ধুনদের সঙ্গমস্থান পর্য্যন্ত জয় করাও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে তৎ-প্রদেশে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারদ-নরপতিগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, কণিষ্কের বীর প্রতাপের নিকট তাঁহারা স্রোতমুখে তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল তাহা কেহই জানেনা। তিনি কাশ্মীর রাজ্য জয় করিয়া তাহা স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। চির-বসন্ত-বিরাজ-মানা কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া কণিষ্ক এতদূর মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন যে, সেখানে তিনি অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ ও কণিষ্কপুর নামক একটী জনপদ স্থাপন করিয়া তদ্দেশপ্রীতির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কালের কঠোর অত্যাচারে সে স্মৃতিস্তম্ভগুলি জীর্ণ ও ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সেই বিশাল জনপদ বর্ত্তমানে কণিষপোর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়া, এখনও তাঁহার বিজয়-গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

প্রবাদ ইহাও বলে যে কণিষ্ক প্রাচীন রাজধানী পাটলিপুত্রের রাজাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার রাজধানী হইতে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ যতি অশ্বঘোষকে বলপূর্ব্বক নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ রাজা রাজড়া ও সাধু সন্ন্যাসীদিগকে লইয়া প্রায়ই এইরূপ গল্প শুনা যায় কিন্তু

এ সমস্ত প্রবাদের মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে তাহা একমাত্র ভগবান জানেন।

পুরুষপুরে কণিষ্কের রাজধানী ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম পেশোয়ার। পেশোয়ারের অবস্থান বড়ই সুন্দর। আফগান পর্ব্বত হইতে ভারতের সমতল ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রশস্ত বর্ত্মপার্শ্বে ইহা এখনও গর্ব্বোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান আছে। কণিষ্ক ভগ্ন ও নষ্টপ্রায় স্তূপ হইতে বুদ্ধ দেহাবশেষ সংগ্রহ করেন এবং রাজধানী পুরুষপুরে একটী বৃহৎ স্তূপ ও বিহার নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে ঐ সংগৃহীত বুদ্ধদেহাবশেষ যত্নে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া দেন। এই বিহার ও স্তূপের স্থাপত্য কৌশল এত সুন্দর ও সম্পদশালী হইয়াছিল যে, ইহাকে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য বস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হইত না।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক সঙ্যুন এস্থান পরিদর্শন করেন। তাহার পূর্ব্বে একবার নয়, দুইবার নয় তিন তিন বার ঐ স্তূপ ও বিহার অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, তবে সুখের বিষয় তখন দেশে ধর্ম্মপ্রাণ শাসন কর্ত্তার অভাব ছিল না সুতরাং প্রত্যেক বারই, অগ্নিদাহের পর কোন না কোন ধার্ম্মিক শাসনকর্ত্তার যত্নে ও অর্থে উহা পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। পেশোয়ারের লাহোর দরজার বহির্ভাগস্থিত 'শাহ-জিকি ঢেড়ি' নামক স্থানে এখনও এই সমস্ত স্তূপ ও বিহার প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন দৃষ্ট হয়

খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী পর্য্যন্তও এই সমস্ত বিহারে বৌদ্ধগণের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইত। মগধের রাজা বীরদেব এই-বিহারস্থিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পাদমূলে বসিয়াই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের সর্ব্বনাশকারী গজনবী সুলতান মামুদ এবং তাহার পরবর্ত্তী দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণের ফলেই ঐ সমস্ত বিহারের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হইয়াছে।

অসমসাহসী কণিষ্কের রাজ্য জয়ের আকাঙ্ক্ষা শুধু ভারতের চতুঃ-সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে নাই। তিব্বতের উত্তর ও পামীরের পূর্ব্বস্থিত কাসগর, তারখন্দ ও খোতান নামক প্রদেশত্রয় জয় করাই তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। এই রাজ্য ত্রয়ের শাসন কর্ত্তাগণ চীন সম্রাটের সামন্ত রাজন্যরূপেই নিজ নিজ রাজ্য শাসন সংরক্ষণ করিতেন। কণিষ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন কর্ত্তা কদ্‌ফিস্ নব্বই খৃষ্টাব্দে এই রাজ্যগুলি অধিকার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে সংঘর্ষে কৃতকার্য্য হওয়া দূরের কথা তিনি পরাজিত হইয়া চীন সম্রাটকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সমগ্র ভারতে ও কাশ্মীর প্রদেশে নিজ আধিপত্য দৃঢ় স্থাপিত করিয়া তাঘদুম্বাস পামির নামক গিরিবর্ত্ম পথে কণিষ্ক এক বিপুল বাহিনী চালনা করিয়া নিজ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়াছিলেন। কণিষ্ক যাহা করিয়া গিয়াছেন, ভারতের বর্ত্তমান কোন শাসনকর্ত্তাই সে কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হয়েন না। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কদ্‌ফিস্ যে কার্য্যে অকৃত-কার্য্য হইয়াছিলেন কণিষ্ক তাহাতে সাফল্যলাভ করেন।

দ্বিতীয় কদ্‌ফিস্ চীন সম্রাটকে কর দিতেন কিন্তু কণিষ্ক নিজরাজ্য চীন সম্রাটের অধীনতাপাশ হইতে শুধু মুক্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না অধিকন্তু সম্রাটকে বশীভূত রাখিবার উদ্দেশ্যে সম্রাটের অধীনস্থ সামন্ত রাজন্যবর্গের প্রত্যেক রাজ্য হইতেই প্রতিভূস্বরূপ এক একজনকে আনিয়া নিজরাজ্যে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। এই প্রতিভূদিগের মধ্যে স্বয়ং চীন সম্রাটের অন্যতমপুত্র যুবরাজ হাম‍ও একজন ছিলেন। রাজকীয় প্রতিভূদিগকে কপিশ প্রদেশে আবদ্ধ রাখা হয়। এখানে যুবরাজ হাম একটী বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিভূদিগকে তাঁহাদের পদোচিত সম্মান ও গৌরব প্রদর্শন করিয়া কণিষ্ক স্বীয় উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ভিন্ন ভিন্ন কালে

তাঁহাদের বাসের জন্য উপযুক্তস্থান নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতাপে রৌদ্রতপ্ত সমতলক্ষেত্র বাসের অনুপযোগী হইয়া উঠিত বলিয়া শুধু প্রতিভূদিগের বাসের জন্যই কণিষ্ক কাবুলের অদূরবর্ত্তী কপিশা পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী মনোরম মঠ প্রস্তুত করিয়াদেন। দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে চীনরাজকুমার এই মঠের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কতকগুলি বহুমূল্য মণি মুক্তা দান করিয়া যান। এই নিঃস্বার্থ দানের ফলেই মঠের শ্রমণগণ যুগ যুগান্তর ধরিয়া, রাজকুমারের গুণগান করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই।

সপ্তম শতাব্দীতে অন্যতম প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ এই মঠ পরিদর্শন করিতে আসেন। তিনি মঠের দেওয়ালে চীনাবাস পরিহিত চীনরাজকুমার ও তাঁহার অনুচরবর্গের মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ শ্রমণগণ তখনও উপকারক চীন রাজকুমারের উদ্দেশ্যে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতি উদ্দীপ্ত রাখিয়াছিলেন। রাজকীয় প্রতিভূগণের শীতাবাসের জন্য পূর্ব্ব পাঞ্জাবের স্থান বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ছিল। চীনদেশীয় রাজকুমারের বাস হেতু কালে ঐ মঠ 'চীনাপটি' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। বর্ষাকালে তাঁহারা কোথায় বাস করিতেন তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রবাদ চীনরাজ কুমারের সহিতই এদেশে চীনের প্রসিদ্ধ ফল ন্যাসপাতি ও পিচফল আমদানী হইতে থাকে। ইহার পূর্ব্বে ভারতে এ দুইটী ফলের নামও কেহ জানিত না।

চীনাপটি মঠের শ্রমণগণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন ধারা হীনায়ণ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন তাই অনেকে মনে করেন যে চীনরাজকুমারও এ শ্রেণীর একজন ছিলেন।

চীন রাজকুমার আদৌ বৌদ্ধ ছিলেন কি না সে বিষয় লইয়া মতভেদ আছে। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলে তিনি দেশ হইতে আসিবার পূর্ব্বেই বৌদ্ধ ছিলেন না, এখানে আসিয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ

করিয়াছিলেন, এ সত্য জানিবার জন্য স্বতঃই লোকের একটা কৌতূহল হয়।

সপ্তম শতাব্দীর চীন পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণ পাঠে জানা যায় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারকগণ খৃঃ পূঃ ২১৭ অব্দের পূর্ব্বে চীনদেশে আগমন করেন। ইতিহাসাভিজ্ঞ অধ্যাপক তেরিন ডি—লাকন—পেরি (Prof. Terrin de-Lacon-perie) এ বাক্যে আস্থা স্থাপন করিলেও সাধারণতঃ ইহা অবিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। খৃঃ পূঃ তিন শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সমস্ত বৌদ্ধ প্রচারকগণ সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাঁহারা দক্ষিণ ও পশ্চিমে গিয়াছিলেন পূর্ব্বদেশে আদৌ পদার্পণ করেন নাই। ইউ—চি—দিগের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে ভারত ও চীনের মধ্যে কোন প্রকার জানা শুনা ছিল, ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৬৪ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাট মিংটি ভারতবর্ষ হইতে কয়েক জন বৌদ্ধ প্রচারক আহ্বান করিয়া চীন দেশে লইয়া যান। ওয়াসিল জিউ (Wassiljew) এ কথা উড়াইয়া দিলেও, অনেক লেখকই ইহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ইঁহারাও বলেন যে বৌদ্ধ প্রচারকগণ ঐ সময়ে চীন দেশে গিয়াছিলেন তাহা ঠিক; কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব সেখানে সীমাবদ্ধ ছিল সুতরাং তখন তাঁহারা বিশেষ কোন কাজ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ২০০ শত খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে সম্রাট হোয়ানটির (Hwanti) রাজত্ব কালেই চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসার লাভ করে। এই সময়ে চীনাগণ দলে দলে নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধের সংখ্যা ও বল বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যধিক প্রসার সম্রাট কণিষ্কের খোতান জয়ের প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং রাজকুমার হাম যে ভারত আগমনের পূর্ব্বে দেশে থাকিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, ইহা অসম্ভব

বলিয়া মনে হয়। তিনি ভারতে থাকা কালীনই বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং দেশে ফিরিয়া গিয়া উৎসাহসহকারে নবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, অভিজ্ঞদের ইহাই অনুমান।

কণিষ্কের নবধর্ম্মে দীক্ষা ও ঐ ধর্ম্ম প্রচারকল্পে তাঁহার উৎসাহ উত্তম বিষয়ক বিবরণের সহিত অশোকের বিবরণের এমত সাদৃশ্য লক্ষিত হয় যে এ বিবরণের কতটুকু প্রকৃত ঘটনা আর কতটুকুই বা সেই প্রাচীন প্রবাদের প্রতিচ্ছায়া, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অশোক যেমন নিজ জীবনের অনেক ঘটনা স্মৃতিস্তম্ভ ও শিলাগাত্রে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কণিষ্কের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই পাওয়া যায় না; সুতরাং কোন কোন ধর্ম্ম পুস্তকে 'যুদ্ধে অথবা মনুষ্য রক্তপাত হেতু অনুতাপগ্রস্ত হইয়া কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন'—এ কথা উল্লেখ থাকিলেও অনেকেই কিন্তু এ বিবরণটি অশোকের জীবনের ঘটনা-বিশেষের প্রতি-ধ্বনি বলিয়া মনে করেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অশোক নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু ছিলেন একথা বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। কণিষ্কের সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প গুজবের অভাব নাই। কণিষ্কের ধর্ম্ম বিশ্বাস পরিবর্ত্তনের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তাঁহার সময়ের নানা আকার ও নানা প্রকারের বুদ্ধ মূর্ত্তি অঙ্কিত মুদ্রা সমূহ।

কণিষ্ক ঠিক কোন্ সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে তিনি যে কিছু দিন রাজত্ব করিবার পর নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। কণিষ্ক একটী বৌদ্ধ ধর্ম্ম সভা আহ্বান করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মেতিহাসের মতে ইহাই কণিষ্কের রাজত্বের সর্ব্বপ্রধান স্মরণীয় ঘটনা। সিংহলের ইতিহাসকারগণ কিন্তু এ সভার কথা স্বীকার করেন না। সম্ভবতঃ তাঁহারা এ সংবাদ অবগতই

ছিলেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৌদ্ধ সভার ন্যায় কণিষ্কের আহূত এ সভার অধিবেশন-স্থান নির্দ্দেশে ও কার্য্যাবলীর বিবরণে নানাপ্রকার অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

কোন কোন অভিজ্ঞের মতে, কণিষ্কের আহূত ধর্ম্মসভায় বুদ্ধের উক্তিসমূহ সঙ্কলিত ও সংশোধিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, না, তাহা নহে—এখানে 'ত্রিপিটকের টীকা টীপ্পনী সঙ্কলন করা হইয়াছিল মাত্র। দুই একজন ঐতিহাসিক—কণিষ্কের ধর্ম্ম-সভার কথা উল্লেখ না করিলেও অনেক লেখকই ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। হুয়েন সাঙ্ শুনিয়াছিলেন যে, এই সভায় উপস্থিত নানা দেশীয় প্রবীণ বৌদ্ধ পণ্ডিতবর্গের অভিমতানুসারে কণিষ্ক বুদ্ধের উক্তিসমূহ তাম্রফলকে ক্ষোদিত করিয়া, কোন স্তূপনিম্নে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, পারসইকা (Persoika) নামক কোন সাধুর পরামর্শেই কণিষ্ক এই ধর্ম্মসভা আহ্বান করেন এবং বসুমিত্র নামক প্রসিদ্ধ যতি এই সভায় অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। সম্রাট কণিষ্কের রাজত্ব ১৫০ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়; সুতরাং তিনি যে ২৫।৩০ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা স্বতঃই অনুমান করা যাইতে পারে।

মুসো শিল্ভেন্ লেভি প্রকাশিত উপাখ্যান পুস্তকে কণিষ্কের শেষ জীবন সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। ইহার মূলে কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে।

সে গল্পটি এই—

সম্রাট্ কণিষ্কের মার্থা নামক জনৈক তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন মন্ত্রী ছিলেন। একদিন তিনি কণিষ্ককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—প্রভু, আপনার এই ভৃত্যের পরামর্শ মত কাজ করিলে, আপনি সমগ্র জগৎ জয় করিতে সমর্থ হইবেন, সকলেই আপনার বশ্যতা স্বীকার করিবে এবং অষ্টদিকই আপ-

নার ছত্রতলে আশ্রয় লইবে। আমার পরামর্শের বিষয় একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, কিন্তু এ কথার বিন্দুবিসর্গ কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।

সম্রাট্ উত্তর করিলেন,—আচ্ছা, আমি তোমার পরামর্শমত কার্য্য করিব ?

সম্রাটের সম্মতি পাইয়া মন্ত্রী প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে-আহ্বান করিয়া, বিপুলবাহিনী সজ্জিত করিয়া, চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রাজসৈন্য যখন যেদিকে গিয়াছে, তদ্দেশবাসিগণ তখনই শিলাহত ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায় তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। এইরূপে রাজসৈন্য পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ তিনদিকই জয় করিয়া ফেলিল; কিন্তু উত্তর প্রদেশে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না।

অনন্তর সাম্রাট্ বলিলেন,— আমি তিন দিক জয় করিয়াছি; কিন্তু উত্তরদেশ কিছুতেই আমার বশীভূত হইল না। কোন ক্রমে যদি আমি এই প্রদেশ জয় করিতে পারি, তবে আর কখনও আমি অন্য কাহারও বিরুদ্ধে অভিযান করিব না। কিন্তু এই উত্তরপ্রদেশ কি উপায়ে বশীভূত করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

সম্রাটের এই উক্তি শুনিয়া, তাঁহার প্রজাবর্গ গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, আমাদের রাজা উত্তরোত্তর অধিক অর্থলোভী, নিষ্ঠুর ও অবিবেচক হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহার এরূপ বারংবার যুদ্ধযাত্রা ও সৈন্য চালনায় তাঁহার ভৃত্যবর্গের অধিকাংশই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। অথচ রাজা কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছেন না। অধুনা তিনি সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য লাভ করিবার দুরাশায় উন্মত্ত। তিনি আমাদের আত্মীয়-[illegible]কে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া, আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন [illegible] দূরদেশে পাঠাইতেছেন। আমাদের আর সহ্য হয় না। আইস

আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার বধ সাধনা করি—তাহা হইলে, পরিণামে আমরা সুখী হইব।

প্রজাবর্গের যে পরামর্শ সেই কাজ। সম্রাট এই সময়ে পীড়িত ছিলেন। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে উত্তরচ্ছদে আবৃত করিয়া তাঁহার শ্বাস রোধ করিয়া ফেলিল। রুগ্ন সম্রাট সে বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না—অকালে তাঁহার জীবন শেষ হইল।

যে শাসনকর্ত্তা দুষ্টমন্ত্রগণের কুপরামর্শে অন্যায় নির্ব্বন্ধ বা শূন্যগর্ভ 'প্রেসটিস্' বজায় রাখিবার জন্য প্রজাসাধারণের মত পদদলিত করিয়া দেশে নিয়ত অত্যাচার ও অবিচারের মাত্রা বৃদ্ধি করেন। তাঁহার এরূপ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

মেগাস্থেনিস্ ও সিলাকিউস্-দুহিতা।

[কথিত আছে যে, সেকেন্দর সাহের (Alexander the Great) মৃত্যুর পরে চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম এসিয়ার গ্রীক অধিপতি সিলাকিউসের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। আর গ্রীক বা যবন রাজপ্রতিনিধি খ্যাতনামা মেগাস্থেনিস যে চন্দ্রগুপ্তের সভায় বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।]

মেগাস্থেনিস্। এ স্থান আপনার কেমন লাগিতেছে ?

সিলাকিউস-দুহিতা। নিতান্ত অপরিচিত। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট জগতের মত কুহেলী মাখা। এ স্থানের ফল পুষ্প, বৃক্ষলতা, পর্ব্বত প্রান্তর, সমস্তই যেন দুর্জ্ঞের রহস্যপূর্ণ। উহাদের সাদৃশ্য যেন কোথাও দেখি নাই। অধিবাসীরা যেন আরও রহস্যপূর্ণ, ইহাদের আচার ব্যবহার, পোষাক

পরিচ্ছদ সমস্তই নবীন। প্রতি প্রভাতে কি যেন একটা রহস্য লইয়া দিনগুলি উপস্থিত হয়; প্রতি সন্ধ্যায় আরক্ত জ্যোতি ক্লান্তহৃদয়ে কি যেন একটা অস্ফুট কাহিনী রাখিয়া যায়। চতুর্দ্দিক হইতে যেন একটা অপরিজ্ঞাত অভিনবত্বে আমাকে পীড়ন করিয়া তুলিয়াছে। এই নূতনত্বের মধ্যে একটা পরিচিত পদার্থ খুঁজিয়া ক্লান্ত হইতেছে। একমাত্র আপনিই পরিচিত, তাই আপনার সঙ্গে কথা কহিয়া সুখী হই। অথবা ডাকিয়াছি বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

মে। আমিও আপনার সঙ্গে কথা কহিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হই। আমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া আর আমাকে লজ্জিত করিবেন না।

সিলা-দুহিতা। আপনি বোধ হয় আমারই মত ব্যাকুল হইয়াছেন?

মে। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সমস্ত সত্য; আমিও আপনার ন্যায় চির অপরিচিতের মধ্যে পড়িয়া বড় কাতর হইতাম. তবে এখন যেন অনেকটা সহ্য হইয়া গিয়াছে। আর মাতৃভূমি ছাড়িয়া দূরদেশে থাকিলে, মন সহজেই অপ্রফুল্ল হয়। প্রবাসীর জীবনে সত্যই সুখ বড় অল্প। তবে এই অপরিচিত রাজ্যের মধ্যে যেন কতকগুলি পরিচিত পদার্থের সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। যেন বহুদিনের বিস্মৃত সুখ স্বপ্নের মত ঐ চিত্রে জাগিয়া উঠিয়াছে; চাহিয়া চাহিয়া কখন কখনও বিস্ময়ে মুগ্ধ হই।

সি-দুহিতা। সে কি, মাতৃভূমির সাদৃশ্য?

মে। হাঁ, রাত্রি অন্ধকারময় আকাশে ক্ষীণ জ্যোৎস্নার ন্যায় জন্মভূমির ছায়া!

সি-দুহিতা। এ কল্পনামাত্র। কোথা সে প্রকৃতির রঙ্গস্থল? কোথা সেই প্রস্তরময় উপকূলে বিলোড়িত জলধির রঙ্গ ভঙ্গ; কোথা তার তরঙ্গে তরঙ্গে জলদেবীর ললিত গীতধ্বনি? কোথা সে হরিৎপুষ্পিত প্রান্তর? কোথা সেই বনদেবী-রক্ষিত মধুময় দ্রাক্ষাকুঞ্জ! কোথা সেই মেখলায় মেখলায় গৌরব-কাহিনী লেখা ধূমল পাহাড়? কোথা সেই গর্ব্বোন্নত

সিডার পাইনের বনস্পতি-শোভা? কোথা সেই আইভী, লরেল— ব্রততী-মণ্ডিত পুষ্পোদ্যান? কোথা বা সেই বিহঙ্গের পরিচিত কলতান?

মে। ভারতও সুন্দর,—আর ঐ সমুদায়ও এখানে একান্ত দুর্ল্লভ নয়।

সি-দু। তবে কোথা সেই উৎসবপূর্ণ সুন্দর নগর? কোথা সে উন্মুক্ত নক্ষত্র-খচিত আকাশ-তলে বিস্তীর্ণ রঙ্গমঞ্চ? কোথা সে কুঞ্চিতা-লক যুবকবৃন্দের অশ্বচালনা? কোথা সে বিচার-মন্দির? কোথা সে তুষার-রূপিণী কুমারীদিগের উৎসব-গীতি? কোথা সৌন্দর্য্যের মহিমাময়ী সম্রাজ্ঞী ভীনাস্? কোথায় গ্রীসের সমর-সঙ্গীত, কোথা তার মধুর ভাষা? কোথা তার অবাধ কল্পনা, হাস্য কলতান? কোথা তার চিত্রশিল্পের অনন্ত শোভা সম্পৎ? এত প্রভেদ আর কোথায় দৃষ্ট হয়? তবে ভারতবাসীরা সজ্জন ও ধীর সত্য। ইহাদের স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে অনেক সান্ত্বনা জন্মে। কিন্তু এ নির্ব্বাসিত জীবনে সুখ কোথায়?

মে। সম্রাজ্ঞি! আপনি কল্পনায় উত্তেজিত হইয়া যে চিরসুন্দর মাতৃভূমির চিত্র সম্মুখে ধরিলেন, তাহা সত্যই মনোরম। সত্যই আপন জন্মভূমির সাদৃশ্য কেহ কোথাও খুঁজিয়া পায় না। সেই স্থানে এমন একটা জিনিষ আছে, যাহা আর কোথাও নাই। সে স্থানের সামান্য ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত প্রিয়। তবে আমি এই ভারতে থাকিয়া, ভারতবাসীর সঙ্গে মিশিয়া, মনে করি, যেন ভারতবাসী ও গ্রীক্ কোন এক দেবজননীর সন্তান! পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরোধ যেন অস্বাভাবিক। ইয়োরোপ-বাসীর ভারতবাসীর প্রতি ঘৃণা আমার মতে ভাতৃদ্বেষ বলিয়া মনে হয়।

সি-দু। কিসে?

মে। আমি একথা ঠিক বুঝাইতে পারিতেছি না। তবে মনে মনে একটু অনুমান করিতে পারি। আমি যদিচ হিন্দুর ভাষা জানিনা,

তথাপি অনেক সময় তাদের শব্দ শুনিয়া মনে হয়, স্বদেশের কথা শুনিতেছি। বিশেষ আমি দেখিয়াছি হিন্দুরা এপোলো ও হারকিউলিসের * পূজা করে। বেকাস † দেবতার ছায়াও দেখিতে পাই; বোধ হয় বসন্তাগমনে ভারত-রমণী মদনোৎসবে ভিনাসের ‡ উপাসনাও করে। আরও অনেক আচার ব্যবহার মিলিতে দেখি।

সি-হ্ন। একি আপনার কল্পনা মাত্র নহে?

মে। হইতে পারে, কিন্তু ভারত আসিয়ার গ্রীস সভ্য। জানিনা পূর্ব্ব না পশ্চিম হইতে জগতে প্রথম আলোক ফুটিয়াছে।**

সি-হ্ন। বুঝিলাম, ভারতের সৌজন্যে আপনি গ্রীকচরিত্র ভুলিতেছেন।

শ্রীমাখন লাল সেন।

বিদ্যারত্নের 'বেয়াদবী'।

কোন ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"তীক্ষ্ণবিষা ব্যালীসম সতত দংশয় হে।
যদি মোহ-পরমাদে নাথ! তোমাতে ঘটায় সংশয় হে॥"

আহা, অতি সত্য কথা! ভক্তের সর্ব্বার্থসার, জীবনসর্ব্বস্ব, হৃদয়নিধি ভগবানের প্রতি, যদি কোন বহির্ম্মুখ ব্যক্তি 'মোহপরমাদে' কোন সংশয়কর অপূর্ব্ব উক্তির উদ্ভাবনা করে, তবে তাহা ভক্তের হৃদয়ে যে কিরূপ সুবিষম বিষদাহ প্রদান করে, তাহা ভক্ত ভিন্ন অন্যে আর কি

* শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম

† বেকাসের সঙ্গে মহাদেবের কিছু সাদৃশ্য আছে।

‡ ভিনাস্ সংস্কৃতের রতি নহে, তবে প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

** পোকক্ সাহেব বলেন, গ্রীস ভারতের একটি উপনিবেশ (ইণ্ডিয়া ইন্ গ্রীস নামে বই দেখুন।)

বুঝিবে? আর কি বুঝিবে? আজি কালি কালমাহাত্ম্যে অতিবিজ্ঞের অত্যুর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে, নিত্য নূতন নূতন কত যে অপূর্ব্ব উদ্ভাবনার আবির্ভাব হইতেছে, তাহা সামান্য বুদ্ধির সম্পূর্ণ ধারণাতীত। চিরদিন যাহা অসম্ভব বলিয়াই বিদিত ছিল, কালে কালে বিনশ্বর মানবের বিদ্যাবুদ্ধির 'বিশালতা' প্রযুক্ত তাহাও সম্ভব হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন যাহা কিছু, তাহাই অর্ব্বাচীন যুগের কুসংস্কার-কলুষিত অসভ্য পূর্ব্বপুরুষগণের উক্তি বা যুক্তি বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে নবযুগের নব্য সভ্যগণের অভিনব আবিষ্কারই আপ্তবাক্যরূপে পরিগৃহীত হইতেছে। ধন্য কাল! ধন্য তোমার অলঙ্ঘনীয় শক্তি! ধন্য তোমার মহিমা!

সম্প্রতি মান্যবর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহোদয়-সম্পাদিত বঙ্গভাষার অপূর্ব্ব ও অতি প্রয়োজনীয় "ঐতিহাসিক চিত্র" নামক মাসিক পত্রিকায় পঞ্চম পর্য্যায়ের আষাঢ় সংখ্যায়, অনৈক গুপ্ত বিদ্যারত্ন-প্রণীত একটি দীর্ঘদেহ অপূর্ব্ব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পাণ্ডিত্যবহুল প্রবন্ধের নাম— "শঙ্করের মুণ্ডক-ভাষ্য।" এই প্রবন্ধে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিদ্যার গভীরতা যে অতলস্পর্শ তাহা বেশ বুঝা যায়। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিমাণ-দণ্ডে ইহার সহস্রাংশের একাংশও পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা তাঁহার সমকক্ষ, তাঁহারাই এই বিশাল বিদ্যা-সাগরের তল ও কূলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। ইহার উত্তাল তরঙ্গমালা ও প্রলয়মূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়া, আমাদিগকে দূর হইতেই প্রণাম করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়।

ইহাতে, বিদ্যারত্ন মহাশয়,—"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্।"—ইহা যে অতিভক্তের অতিশয়োক্তিপূর্ণ অযথা স্তুতিবাদ মাত্র,—ব্যাস, শঙ্কর, ব্যাস, বসিষ্ঠ ও বাল্মীকি প্রভৃতি সেকালের বনচারী, ফলমূলাহারী, শুভ্রকেশ, শুভ্র-শ্মশ্রু মুনিঋষিগণ যে অভ্রান্ত, মতিভ্রমশূন্য বা পূর্ণ ছিলেন না এবং অতি ও অসঙ্গত ভক্তিদ্বারা কেবল অর্ব্বাচীন সাধারণ

লোকেই যে তাঁহাদিগকে মাথায় তুলিয়া অতি বড় করিয়া দিয়াছে ;—ইহাই বিশেষরূপে বুঝাইয়াছেন। পরিশেষে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"এই অতি ও অসঙ্গত ভক্তিতেই স্বর্গের ভারত রসাতলে গেল। আমরা হিন্দেনে পরিণত হইলাম!" ইহাতে, তাঁহার প্রধান প্রতিপাদ্য,—শঙ্করের (শঙ্করাচার্য্যের মুণ্ডকভাষ্যের) বহুস্থলে বড় বড় ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ ; শঙ্কর পাঠশালার ছাত্র হইলে, শিক্ষকগণকর্ত্তৃক বেত্রাঘাত বা কর্ণমর্দ্দন প্রাপ্তির উপযুক্ত রাশি রাশি ভ্রম-ভ্রান্তি ইহাতে রাখিয়া গিয়াছেন। এই অভিনব প্রবন্ধে, বর্ত্তমান বিদ্যারত্ন মহোদয় সেই সকল ভুলভ্রান্তিই সদর্পে প্রতিপাদন ও সংশোধন করিয়া, তাণ্ডবনৃত্যে দিগ্‌বিদিক্ কম্পিত করিতেছেন।

তা, করুন। শুধু শঙ্করের কেন, তিনি শঙ্করের পিতার পিতার তস্য পিতার সহস্র সহস্র ভ্রম-প্রমাদ আবিষ্কার করিয়া, বড় বড় মহাভারত রচনা করিয়া, লম্ফঝম্ফ প্রদান করতঃ ধরাবক্ষ ছিন্ন করিয়া ফেলুন। দিগ্বিদিকে তাঁহার মহতী বিদ্যাবুদ্ধির অভ্রভেদী বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হউক। প্রতিবাদ করা দূরের কথা, আমরা তাহাতে কর্ণপাতও করিব না,—ফিরিয়াও চাহিব না। কারণ তিনি জ্ঞানী—পণ্ডিত, তাঁহার তাঁহাতে অধিকার আছে। কিন্তু, যখন তিনি "আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর" লইতে যাইবেন ; জন্মান্ধ হইয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বস্তুর উপর সংশয়ের আরোপ করিয়া, ভ্রান্ত ও শুষ্ক তর্কযুক্তির অবতারণা করিবেন ; অনধিকার চর্চ্চায়, নির্লজ্জের ন্যায় বদনব্যাদান করিবেন ;—তখনই আমাদের আপাদমস্তক অগ্নিবৎ হইয়া উঠিবে। তাঁহার সে 'বেয়াদবী' আমাদের সম্পূর্ণ অসহ্য।

তিনি প্রবন্ধে শঙ্করের মুণ্ডকভাষ্যের অনেক ভুলভ্রান্তি দেখাইয়াছেন। হইতে পারে, শঙ্কর তাঁহা অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অনেক নিকৃষ্ট ছিলেন ; তাঁহার ন্যায় এত গভীর বিদ্যাবুদ্ধি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই ; সুতরাং

ভাষ্যে অনেক ভুল করিয়া গিয়াছেন; এবং অদ্য তাঁহার দ্বারা শঙ্করের সেই ভ্রমপ্রমাদসমূহ আবিষ্কৃত ও সংশোধিত হইয়া, গ্রন্থখানি এতদিনে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল। আমরা যখন 'জ্ঞানী' বা পণ্ডিত নহি, তখন ইহার সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিতে আমরা কখনই যাইব না। সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার নীরস বিদ্যা ও জ্ঞানের 'বড়াই' লইয়া, অভ্রান্ত, স্বর্গীয় ভক্তিমার্গকে অনধিকারে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে কলুষিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তখনই আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। তিনি সদর্পে শঙ্করের ভাষ্যকে অপদার্থ ও শতমুখী-প্রয়োগার্হ আবর্জ্জনামাত্র প্রতিপন্ন করিয়া, উপসংহারে বলিতেছেন—"যে দেশের লোকেরা বিশ্বাস করিতে অবনতকন্ধর যে ভগবতী রামপ্রসাদের বেড়া বান্ধিয়া দিতেন, সে দেশে এ মুণ্ডকভাষ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে!" উঃ কি দর্পের কথা! কি অহঙ্কারপূর্ণ উক্তি! কি বিদ্যামত্ততা! কি আত্মম্ভরিতা! কি দাম্ভিকতা! কি ধৃষ্টতা!—ধিক্ লেখক!—শত ধিক্ তোমাকে!!

ভক্তি—শ্রদ্ধা ভক্তি যে কি অদ্বিতীয়, অব্যক্ত ও অমূল্য বস্তু; ইহা যে কি দেবভোগ্য অমৃত অপেক্ষাও দেবদুর্ল্লভ মহামৃত; ইহাতে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এবং দৈব ও মানুষ সর্ব্ববিধ শক্তিকেই নিমেষ মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে সক্ষম, কি যে অচিন্তনীয়, অনন্ত মহাশক্তি নিহিত আছে;—তাহা, ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ, ব্যাস, বলি, অম্বরীষ, পরাশর, বসু, দাল্‌ভ্য, অর্জ্জুন শ্রীমন্ত এবং মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতির পুণ্যময় পবিত্র চরিত্রগাথা আলোচনা করিলেই, বিশিষ্টরূপ বোধগম্য হয়। এই সকল পুণ্যশ্লোক, প্রাতঃস্মরণীয়, ভগবৎ-সদৃশ ভক্তমণ্ডলীর, ভক্তির অনন্ত শক্তির এক একটি উদাহরণ পাঠ করিলে, পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত এবং বিস্ময়ে হৃদয় বিহ্বল হইয়া যায়। প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাসের অনন্ত শক্তি ও অপার মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া, অজস্র প্রেমাশ্রুধারায় পরিস্নাত হইতে হয়,

এবং এই বিবিধ প্রলোভনপূর্ণ সমগ্র সংসার বিস্মৃতির অতল সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া, সকল বন্ধন ও সকল আকর্ষণ শতখণ্ডে ছিন্নভিন্ন করিয়া, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় 'উধাও' হইয়া ঐ মহামৃত আস্বাদন করিতে—ঐ মহাপথের পথিক হইতে—প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে!

একমাত্র ভক্তির নিকটেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ পরাজিত। ভক্তে সুদৃঢ় ভক্তিসূত্রের মহা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, ভক্তাধীন ভগবান্ প্রতিনিয়তই ভক্তের সন্নিহিত ও প্রত্যক্ষীভূত। শ্রীপদ্মপুরাণে আছে—

"সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেণ স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দরূপ; সুতরাং অধোক্ষজ (অচক্ষুর্বিষয়) হইয়াও নিজশক্তিপ্রভাবে ভক্তগণের নয়নগোচর হন।

শ্রীবাসুদেবোপনিষদে তিনি স্বয়ংই বলিতেছেন—

"মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্।
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্॥"

আমার আদ্যন্তমধ্যবিবর্জ্জিত, অদ্বয়, অব্যয়, স্বপ্রভ (স্বপ্রকাশ) ও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—এইরূপ ভক্তিদ্বারা জানিতে পারা যায়।

সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীশ্রীগীতাতেও তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥"

"হে পার্থ! যে পুরুষের অন্তর্গত এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, যাহার দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত আছে, সেই চৈতন্যমাত্র পুরুষ (অর্থাৎ আমি) একমাত্র ভক্তি দ্বারাই লব্ধ হইতে পারেন।"

ইহাতেই তিনি স্থানান্তরে আরও বলিয়াছেন—

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা, ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

"যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন, তিনি আমাতেই বিরাজ

করেন এবং আমিও (ভগবান্‌ও) তাঁহাতেই (ভক্তেতেই) প্রকাশিত থাকি। ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন বস্তু। অথবা ভক্ত, ভগবান্ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আদিপুরাণে তিনি স্বয়ংই প্রকাশ করিতেছেন—

"মম ভক্তা হি যে পার্থ! ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ।
মদ্ভক্তস্তু তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

হে পার্থ! যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত, তাঁহারা আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত নহেন; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার ভক্তোত্তম।

শ্রীমদ্ভাগবতেও তিনি বলিয়াছেন—"আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।"

একমাত্র ভক্তের নিকটেই ভগবান্ কল্পতরু। ভক্তাধীন, ভক্তবৎসল ভগবান্, ভক্তের সর্ব্ববিধ কায়ক্লেশ ও দুঃখদুর্গতি দূর করিবার জন্য, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, তাঁহাকে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পরমানন্দ ও পরাশান্তি প্রদান করিয়াছেন। শুধু "বেড়া বান্ধিয়া দেওয়া" কেন, তাঁহার চরণের কণ্টকটি পর্য্যন্ত মোচন করিতেও সর্ব্বদা উদ্যতহস্ত!—অহো, তাঁর যে অপার মহিমা—অনন্ত করুণা!—তিনি প্রিয়তম ভক্তগণের সহিত সতত একত্র অবস্থান করিয়া, তাঁহাদের সহিত বিবিধ মানবীয় লীলাখেলা করিয়া, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা প্রেমপুলকিত রাখিবার জন্য, এবং সেই দেবদুর্ল্লভ মহামৃতের আস্বাদনে মাতোয়ারা করিয়া রাখিবার জন্য, তাঁহাদের অভিলাষ মত, তিনি স্বেচ্ছায় কাহাকেও সখা, কাহাকেও সখী, কাহাকেও মাতা ও পিতা পর্য্যন্ত বলিয়া সম্বোধন করিয়া, তাঁহাদের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি পার্থের রথে সারথি হইয়াছেন; গোচারণে গমন করিয়া, গোপবালকগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছেন; বালসুলভ ক্রীড়াবশে তাহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়াছেন; তিনি বিশ্বপিতা হইয়াও, পুত্রভাবে পিতা নন্দের বাধা মস্তকে ধারণ করিয়াছেন;

নিদারুণ ভব-বন্ধনের মোচনকর্ত্তা হইয়াও, জননী যশোমতীর হস্তে বন্ধন গ্রহণ করিয়াছেন: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বন্দনীয় হইয়াও, ভক্তোত্তম ভৃগুমুনির পদপ্রহার অবধি সহাস্যবদনে সহ্য করিয়াছেন; তিনিই শ্রীমন্তের মশানে মাতৃরূপে আবির্ভূতা হইয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। ভক্তি যে কি বস্তু, তাহা গীতচ্ছলে কোনও ভক্তের মুখে তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন—

"আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
শুদ্ধ ভক্তি দিতে কাতর হই (গো)।
আমায় যেবা পায়, তারে কেবা পায়,
সে যে সেবা পায়, হয়ে ত্রিলোক জয়ী॥
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই,
মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই।
ভক্তির কারণে পাতাল ভবনে
বলির দ্বারে দ্বারী হয়ে রই॥
শুদ্ধ ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে,
গোপ গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে।
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে
পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই॥"

কত বলিব? তাঁর এই অনন্ত ভক্ত-প্রিয়তার পরিচয় কত দিব? আর দিবই বা কি প্রকারে? কিন্তু, এ সকল কথা শুনিয়া, হয় তো অনেক অতিবিজ্ঞই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, সক্রোধে বলিয়া উঠিবেন—"এ সকল কি কথা? এ তো অমূলক উপন্যাসের অলীক কল্পনা মাত্র, অথবা অতি ভক্তের অতিশয়োক্তিপূর্ণ পুরাতন 'পচা' উপকথা মাত্র!—তজ্জন্যই, তাহাদের সহিত বাদানুবাদ নিতান্ত গর্হিত ও মূর্খতা পরিচায়ক হইলেও এবং শ্রীশ্রীগীতার ভগবদুক্তি ("ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং") অনুসারে তাহাদের বুদ্ধিভেদ সম্পূর্ণ অন্যায় হইলেও, সেই সকল বিশ্বাস-বিহীন,

নাস্তিক, বহির্ম্মুখ ব্যক্তিবর্গের অবগতির জন্য, আরও দু'একটি অদূরবর্ত্তী অতীতকালের উদাহরণ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বহুদিবসের কথা নহে, অনেকেই অবগত আছেন,—বিখ্যাত বিষ্ণুপুর রাজ্য যখন দুর্দ্দান্ত বর্গীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন তদানীন্তন ভক্তশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপুরপতির প্রতিষ্ঠিত দেবতা ৺শ্রীশ্রীমদনমোহন জী, দল ও মাদল নামক সুপরিচিত ভয়ঙ্কর কামানদ্বয়ের প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্‌গমে স্বহস্তে শত শত শত্রুকে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন। এই দল, মাদল ও ৺মদনমোহনজী অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইতিহাস-খ্যাত ভরতপুরাধিপতি ভগবদ্‌ভক্ত মহাবীর রণজিৎ, যখন বণিক ইংরেজগণের সহিত মহাসমরে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন সে স্থলেও এইরূপ অনেক অপূর্ব্ব দৈব ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, ইহকালসর্ব্বস্ব পরকাল-অবিশ্বাসী বিধর্ম্মী ইংরেজগণও বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া, গ্রন্থাদিতে (See Thrunton's East Indian gazette) অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতি অল্প দিন হইল, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, সম্পূর্ণ নিরক্ষর হইয়াও, জগন্মাতা চিৎশক্তি ভগবতীর শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তির বলে, কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া, জগৎসংসারকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও অনেক ভাগ্যবানই প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কেবল তিনিই নহেন, তাঁহার ন্যায় অনেক মহাত্মাই, এই ভূস্বর্গ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়া, ভক্তির অনন্ত শক্তির সহস্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন। দেশদেশান্তরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত অদ্যাবধি তাঁহাদের সেই অমানুষ শক্তি ও গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া, প্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্ত হয়েন। অদ্যাপি এই সকল ঈশ্বরজানিত মহা-পুরুষ ভারতে নিতান্ত দুর্ল্লভ নহেন।

প্রিয় পাঠক! ভাই! এই অপরিণতবয়স্ক, অকৃতবিদ্য, অল্পবুদ্ধি যুবকের সঙ্কীর্ণ সহস্র অভাবপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডারে আর অধিক কি আশা কর? বঙ্গসাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন, ভক্তগণের অতি সম্মান ও সমাদরের বস্তু,

সত্যঘটনামূলক অখ্যায়িকাপূর্ণ "ভক্তমালের" ন্যায় গ্রন্থসমূহ পাঠ কর; বহুদর্শী, প্রবীণ ও প্রাচীন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট অনুসন্ধান কর; দেশদেশান্তরে অনন্ত প্রকৃতিপটে কালভুক্তাবশিষ্ট উজ্জ্বল চিত্রাবলী পরিদর্শন কর এবং চিরপবিত্র পুণ্যময় দুর্গম তীর্থক্ষেত্রাদি পর্য্যটন কর; অথবা অপাপবিদ্ধ 'অসভ্য' পল্লীভবনের পর্ণনিকেতনে গমন কর;— অদ্যাপি, এই 'সুসভ্য ইংরেজী' যুগেও, এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত তোমার প্রত্যক্ষীভূত হইবে। অথবা, তাহারই বা আবশ্যকতা কি? ভাই! তুমিও ত ইচ্ছা করিলেই স্বয়ং ইহার উদাহরণ স্থল হইতে পার। কলিকাল বলিয়া ভীত হইও না; তাঁহার নিকট কি আর কালাকাল আছে? তিনিই যে কালের কাল মহাকাল; তিনি যে সকল কালে সকল সময়েই সমভাবে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। সকলই আছে; নাই কেবল আমাদেরই বিশ্বাস ও ভক্তি। অদ্যাপি, সেই ভক্তবৎসল ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সহিত বিবিধ লীলাখেলা করিয়া, তাঁহাদিগকে ধন্য করেন। তোমার সহিত আমি যেমন কথা কহিয়া থাকি, তাঁহাদের সহিত তিনিও সেইরূপ আলাপ করিয়া থাকেন। 'শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে' আছে—

"নিত্যাব্যক্তোপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।"

আরও, 'শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে' উজ্জ্বলবর্ণে লিখিত রহিয়াছে—

"চেদদ্যাপি দিদিক্ষেরন্ উৎকণ্ঠার্ত্তা নিজপ্রিয়াঃ।
তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ॥
কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে॥"

যদি কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকণ্ঠার্ত্তা হইয়া অদ্যাপি তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে সেই কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভিলাষমত লীলা দর্শন করাইয়া থাকেন। কোন

কোন ভাগ্যবান্ ভাগবতোত্তম (ভক্তশ্রেষ্ঠ) প্রেমবিবশ হইয়া অদ্যাপি ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে দর্শন করিয়া, জন্ম সার্থক করেন। ইহা ধ্রুব সত্য। এইরূপ কাতরতার সহিত তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিলে, আজিও সকলেই তাঁহার দর্শনলাভ করিতে সক্ষম।

আর বলিবার কি আছে? যাঁহারা প্রেমিক—ভক্ত, তাঁহাদিগকে আমার ন্যায় ব্যক্তির কোনও কথাই এ সম্বন্ধে বলিবার আবশ্যকতা নাই। এ সকল কথা, এই অতি দীর্ঘ বচনপরম্পরা, তাঁহাদের জন্য অবতারিতও হয় নাই। এই মহাপণ্ডিত বিদ্যারত্নের ন্যায় বিদ্যামদমত্ত মোহান্ধগণের জন্যই যত কিছু বাক্যব্যয়। শুদ্ধা ভক্তিতে, শুষ্কজ্ঞানে ও প্রেমিকভক্তে, অবিবেকী পণ্ডিতে যে স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য, এই পাণ্ডিত্যাভিমানী মূঢ় নাস্তিকগণকে তাহাই বুঝাইবার জন্য যত প্রয়াস ও শ্রমস্বীকার। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছিলেন—"শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে। ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করলে আমার একটি অবস্থা হয়। তখন পরণের কাপড় প'ড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ করে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি, বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তাহ'লে তাকে খড় কুটো মনে হয়।" তিনি ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া আরও একস্থলে বলিয়াছেন—"জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে। তার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ। সে সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকে। ভক্তের ভিতর একটানা নয়; জোয়ার ভাঁটা হয়। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস ক'ত্তে ভাল বাসে—কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে—যেমন জলের ভিতর বরফ 'টাপুর' 'টুপুর' 'টাপুর' 'টুপুর' করে।" বিদ্যার ও জ্ঞানের অহঙ্কারে এই অবিবেকী পণ্ডিতগুলোর 'পেট্' পরিপূর্ণ তাই তাহাদের বিশ্বাস এত কম; তাহারা যাহা তাদের প্রত্যক্ষ, শুদ্ধ তাহাই বিশ্বাস করিতে "অবনতকন্ধর"; একমাত্র পূর্ণ পরমব্রহ্ম এবং

তৎশক্তিপ্রতিভাত তৎস্বরূপ তত্ত্ব ব্যতীত, ব্যক্তিমাত্রেরই বুদ্ধি ভ্রম, প্রমাদ (অসাবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়-মান্দ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তির অপূর্ণতা) এই চতুর্ব্বিধ দোষযুক্ত হওয়ায় এবং তাহাদের প্রত্যক্ষাদিও নির্দ্দোষ না হওয়ায়, প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে শব্দই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা এই শ্রেণীর পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করিতে চাহেন না। ইঁহাদের স্বভাবই এক অদ্ভুত ভাবের। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন—"শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? * * * * * পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়? কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখে আর টাকায়। শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে! কেবল খুঁজ্‌চে কোথায় মড়া জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া!"

"কাকভূষণ্ডী প্রথমে রামচন্দ্রকে অবতার ব'লে মানে নাই। শেষ যখন সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌লে যে, রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিল, রামের শরণাগত হলো। রাম তখন তাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেল্লেন। ভূষণ্ডী তখন দেখে যে, সে তার গাছে বসে রয়েছে! অহঙ্কার চূর্ণ হলে তবে কাক ভূষণ্ডী জান্‌তে পার্‌লে যে, রামচন্দ্র দেখতে আমাদের মত মানুষ বটে, কিন্তু তাঁরই উদরে ব্রহ্মাণ্ড। তাঁরই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সমুদ্র পর্ব্বত; জীব, জন্তু, গাছ ইত্যাদি।" সেইরূপ আমাদেরও এই অহঙ্কারমত্ত কাকভূষণ্ডী, ভাগবতোত্তম ভগবান্ রামপ্রসাদের ভগবতী যে বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। নিজে তো নারাজ বটেনই; অধিকন্তু, যাঁহারা 'অবনতকন্ধরে' বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে নিতান্ত অধঃপতিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অসভ্য ও মূর্খ বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস।

তাঁহার বিশ্বাস তাঁহারই থাকুক্; আমরা তজ্জন্য কাতর নহি। কিন্তু,

পাণ্ডিত্যের 'তগ্‌মা' আঁটিয়া, তিনি ডঙ্কানিনাদে তাঁহার সেই অন্ধ বিশ্বাসই ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রচার করিতে যাওয়াতেই আজ আমাদের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়াছে! সেই আঘাতের দারুণ জ্বালাতেই, আজ আমাদিগকে এত কথা কহিতে বাধ্য করিয়াছে। পণ্ডিতজি! ক্ষমা করিবেন। আশা করি, ভবিষ্যতে আপনার অক্ষয় জ্ঞান-তূণ হইতে আর এরূপ 'চোকা' 'চোকা' বাণ বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে বিদ্ধ করিয়া ব্যথিত করিবেন না। যদি অভাগ্য ভারতের পরম সৌভাগ্যবশতঃ, আপনি শঙ্করব্যাসাদি অপেক্ষাও বিদ্যাবুদ্ধিতে এতই নৈপুণ্যতা লাভ করিয়াছেন, তবে সেকালের অসভ্যগণের রচিত পুরাতন 'পচা' গ্রন্থ নিচয়ের ভ্রম প্রমাদ আবিষ্কারে আপনার অমূল্য জীবন ক্ষয় না করিয়া, আমাদের মতে, ভারতের দীন, সাহিত্যভাণ্ডারে, কালিদাসের 'শকুন্তলা', ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' বা অন্যান্য বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থরত্নের ন্যায় চিরোজ্জ্বল দু' একটি অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করুন। বহুকালের পর, অন্ধকারময় ভারত, কালিদাসাদি নবরত্ন অপেক্ষাও উজ্জ্বলতম রত্নের আবির্ভাবে, পুনরায় স্বর্গের আলোকে শতগুণ বিভাসিত হউক্। আমরা দেখিয়া ধন্য হই।

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়।

"সেকালের ঢাকা।"*

—০:০—

সপ্তদশ শতাব্দীতে নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে ঢাকায় চাউল এক টাকায় আট মণ বিক্রীত হইত। তখন দাম, দামড়ি, কড়ি, সিক্কা † প্রভৃতি মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ক্রমে এই বাজার দরের বৃদ্ধি হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তীকালে মুর্শিদকুলি খাঁর সময় টাকায় চারি মণ চাউল বিক্রীত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুনরায় ঢাকায় সুভিক্ষ দেখা দেয়। সরফ-রাজ খাঁর শাসন সময় ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় চাউলের মণ পুনরায় ৫ দাম (দুই আনার সমান) হইয়াছিল।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশব্যাপী মহা দুর্ভিক্ষের আরম্ভ হয়। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এতদঞ্চলে সাধারণ চাউল টাকায় ১২ সের বিক্রীত হইত। এই দুর্ভিক্ষে এ জেলার বহু লোক অন্নাভাবে স্ত্রীপুত্র বিক্রয় এবং আত্মবিক্রয় করিয়া উদরপালনের চেষ্টা করিয়াছে।

মনুষ্য বিক্রয়ে দলিল সম্পাদন হইত। এই সকল দলিল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ঐ সময় এক একটি মানুষ ২৲ ৩৲ হইতে ৭৲ ৮৲ পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হইত। এই দুর্ভিক্ষ সময় অবস্থাপন্ন লোক বহু দীঘি পুষ্করিণী ও ইষ্টকালয় প্রস্তুত করাইয়া বহু লোকের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দরিদ্র লোক পেটের জ্বালায় তখন কেবলমাত্র আহার পাইয়াই মজুরি করিত।

১৭৮৭-৮৮ সনে পুনরায় এ জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে টাকায় ⁄৪ সের মাত্র চাউল বিক্রীত হইয়াছিল।

* "ঢাকা বিবরণ" মুদ্রিত হইতেছে।

† ৮ দামড়ি=১ দাম। ৪০ দামে=১ সিক্কা টাক

সেকালে দেশে অর্থের অভাব ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় ব্যতীত জিনিষের তেমন অভাব হইত না। অর্থাভাবে এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যাইত। অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে ফসল নষ্ট না হইলে, টাকার অভাব তখন কেহ অনুভব করিত না। যুগী বস্ত্র বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে ধান চাউল গ্রহণ করিত। কৃষক ও তাহার কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে তৈল লবণ মৎস্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিত। সরকারী রাজস্ব প্রদান ও তদনুরূপ গুরুতর কার্য্য ব্যতীত নগদ মুদ্রার প্রয়োজন প্রায় হইত না। ভৃত্যের বেতন, গুরু মহাশয়ের বেতন প্রভৃতি ক্ষেত্রের ধান্য দ্বারাই প্রদত্ত হইত। নাপিত, ধোপা, পুরোহিত প্রভৃতির কার্য্যের জন্য পৃথক পৃথক ভূমির বন্দোবস্ত ছিল।

তৎকালে ধনী সম্প্রদায়ের ব্যাপারাদিতে কিরূপ ব্যয় হইত, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য ময়মনসিংহ জেলার কোন জমিদার পরিবারের শত বৎসর পূর্ব্বের একটি ব্যাপারের ব্যয়তালিকা উদ্ধৃত করা গেল। ময়মনসিংহ ঢাকার পার্শ্ববর্ত্তী জেলা; সুতরাং এই তালিকা হইতে মোটামোটি তৎকালীন দেশের অবস্থা কতক পরিমাণে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সন ১২১১

হিসাব জিনিষ খরিদ হাট সাহাগঞ্জ।

তেরিখ ২৮শে জ্যৈষ্ঠ।

আসামী—	জিনিস—	রোপৈয়া—কৌড়ি—	আসামী—	জিনিস—	রোপৈয়া—কৌড়ি
হরিদ্রা	/২	।৶০	ডিঙ্গাকলা	১ ছড়ি	৸৶০
সিন্দূর	১ দফা	৶১০	মরিচ	/২ সের	।৶০
চূণ	/২॥ সের	/১০	মাষ কলাই	/৫	১।৵০
পান	২০ কুড়ি	১॥০	মসলা	১ দফা	৵১০
তামাক	/১	/০	দোই	/৭॥ সের	৶১০

আসামী—	জিনিস—রোপৈয়া-	কৌড়ি—
লবণ	/৭ সের	৪।৵৹
চিনি	,,	।/১৹
আমলি	/২॥ সের	৶১৫
ভার	৫ টা	৵১৹
কাছলা	২ টা	৵৹
পাতিল	৫ টা	/১৭॥
× ×	২ টা	/১৹
তেজপাতা	১ দফা	/৹
টিকিয়া	১ দফা	/৹
বাঁশ	১ দফা	১৸৹
পাট	১৹ সের	৶১৫
সন্ধক লবণ	,,	।৵৹
ডিম	১ দফা	/৹
ছিকর	১ দফা	৫২॥
লঙ্ক	॥ তোলা	।৹
সাদা কাগজ	১॥ দিস্তা	।৹
শুপারি	।৹ সের	৫॥৵৹
মৎস্য	১ টা	৶৹

আসামী—	জিনিস—রোপৈয়া—	কৌড়ি
মটুকের রাংচা	১ দফা	৶৹
× ×		।৵৹
নাও কেরেয়া × ×		
আয়না মাল		॥৹
কেবলা পাটুনি		।৶৹
ভুয়ারিয়া পাটুনি		৵৹
		২১॥/৹
সাবেক পাপনা ইত্যাদি		১৲৶৫
বাদ কৈফিয়ৎ ফেরত		॥৵৹
		২৩৸৵৫

কাপড়—	রোপৈয়া—	কৌড়ি—
গুনি	১ জুর	৸৹
(অস্পষ্ট)	৩ থান	১৸৶৹
পাচ হাতি	১ থান	৹
গামছা	১ থান	/৫
গজি	১ থান	॥/১৹
এক পাট্টা	১ থান	॥৶৹
পাগোড়ি পটকা	৪ গাছ	৸১৹
		৫৲৫

এই সময় টাকায় সোওয়া তিন কাহনের অধিক কড়ি পাওয়া যাইত ফর্দ্দের লিখিত ২৩৸৵৫ কড়ি ৭৲ টাকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল সুতরাং এই ব্যাপার ১২৲ টাকায় সম্পন্ন হইয়াছিল।

চাউল, চিড়া, তৈল প্রভৃতির ব্যয় এই ফর্দ্দে নাই। এই সকল দ্রব ক্রয় হইয়া থাকিলেও এই ব্যাপারে ২০৲ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে টেলার সাহেব "Topography of Dacca" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ঐ সময়ের দ্রব্যের মূল্য ও সাধারণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদির যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা দ্বারাও ৬০।৭০ বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে।

দরিদ্র হিন্দুর বিবাহ-ব্যয়।		দরিদ্র মুসলমানের বিবাহ-ব্যয়।	
ব্রাহ্মণ	১৲	কাজি	॥০
বাদ্যকর	।০	বর কন্যার কাপড়	৩৲
বর কন্যার কাপড়	২৲	নাপিত	।০
শাঁখা ও অন্যান্য অলঙ্কার	২৲	চিরুণী প্রভৃতি	।০
চিরুণী ও সিন্দূর	।০	অলঙ্কার (লাক্ষার চুড়ি)	॥০
ধোপা	।০	ভোজনব্যয়	২৲
নাপিত	।০	বাদ্যকর ও অন্যান্য খরচ	৩৲
ভোজন-ব্যয়	২৲	বরকন্যার মুকুট	॥০
অন্যান্য ব্যয়	১৲		১০৲
বর কন্যার মুকুট	১৲		
	১০৲		

দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়

হিন্দু—		মুসলমান—	
নূতন বস্ত্র	॥০	কবরপ্রস্তুতকারক	৸০
জ্বালানি কাষ্ঠ	১।০	কাপড় বাঁশ প্রভৃতি	১৲
ঘৃত, চন্দন, বাঁশ	।০	মোল্লা	।০
	২৲		২৲

দরিদ্র হিন্দুর শ্রাদ্ধ।	
ব্রাহ্মণ	১৲
কাপড়	১৲
চাউল দাইল	২৲
ব্রাহ্মণ ভোজন	১৲
তৈজস পত্র	১৲
নাপিত	।০
ধোপা	।০
বিবিধ	॥০

দরিদ্র মুসলমানের ৪র্থ ফতেহা।	
মোল্লা	১৲
খাদ্য	।০
তাম্রপাত্র প্রভৃতি	১৲
দরিদ্র বিদায় (কড়ি)	।০
১ম, ২য় ও ৩য় ফতেহার খরচ	২॥০
	৫৲

টেলার সাহেবের ব্যয়-তালিকা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। টেলার লিখিয়াছেন, "ঐ সময় ঢাকা জেলায় সাধারণ একটি মজুরের ভোজনে দৈনিক ১২॥ আড়াই পয়সা মাত্র ব্যয় হইত; দুইজন চারিজন একত্রে বাস করিলে গড়ে প্রতিজনের খরচ ১২॥ অপেক্ষাও কম পড়িত। ঐ সময় ঢাকায় কোন সরাই বা হোটেলখানা ছিল না। আগন্তুক লোক আখড়ায় ভোজন করিত। সহরের বহু সম্ভ্রান্ত আফিসের কর্ম্মচারীরাও আখড়ায় খাইয়া কার্য্য করিতেন। ঢাকা সহরে তখন অনেক আখড়া ছিল। আখড়ায় প্রতিজনের রোজ খোরাকী এক আনা করিয়া দিলেই দুই বেলা ডাল ভাত উদরপূর্ণ করিয়া খাওয়া যাইত। সুতরাং তখন ২৲ দুই টাকায় ৬০।৭০ জন লোক সাধারণভাবে ভোজন করিতে পারিত—ইহা অতিশয় উক্তি নহে।

১৮৬৫ সনে এ জেলায় চাউল বেশ সস্তা ছিল। ঐ সনে উৎকৃষ্ট চাউল প্রতি টাকায় ১৪ সের, আতপ চাউল ৩০ সের ও সাধারণ চাউল টাকায় এক মণ ছিল। ঐ সনে উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা

যায়। ক্রমে এ জেলা হইতে বহু চাউল উড়িষ্যায় প্রেরিত হয়। ১৮৬৬ সনে একেবারে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় এ জেলায়ও ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর ক্লো সাহেব লিখিয়াছেন ঐ সময় সাধারণ লোক এক বেলা খাইত এবং বহু লোক চিনা কাওন খাইয়া দিনযাপন করিত। অনেক ভদ্র পরিবারেরও এইরূপ শোচনায় অবস্থায় দিন অতিবাহিত হইত। কেহ কেহ বার্লি, সাগু ও ফল মূল খাইয়া থাকিত। এই সময় ঢাকার স্থানে স্থানে অন্নছত্র স্থাপন করিয়া অনেক সহৃদয় লোক দরিদ্র ভিখারীদিগকে অন্নদান করিতেন।

গণি মিঞা সাহেব দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখিয়া ভিখারী প্রতি পালনের জন্য "লঙ্গরখানা" স্থাপন করিয়াছিলেন। এই লঙ্গরখানায় বহু দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট লোক প্রতিপালিত হইয়াছিল।*

সে বৎসর বৃষ্টিমাত্র ২৯-৪২ ইঞ্চি হইয়াছিল।

পাঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও এ জেলায় চাউলের মণ দেড় টাকা ছিল। তখন সাধারণভাবে থাকিতে গেলে জন প্রতি মাসে ২।০ টাকার অধিক ব্যয় হইত না। ১৮৭১ সনে ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর ৫ জন লোক-সমন্বিত ধনী পরিবারের মাসিক ব্যয় দুগ্ধ ঘৃত সহ ২ পাউণ্ড ৬ পেন্স (তৎকালীন ২০।০) অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করিয়াই এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন।

হণ্টার সাহেব এই তালিকার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, এইরূপ জনসংখ্যাযুক্ত (৫ জন) গৃহস্থ পরিবারে ইহা অপেক্ষাও অনেক অল্প ব্যয় পড়িত। গৃহস্থ চাউল, দাইল, তরিতরকারি, রশুন, পিয়াজ,

* ১৮৬৬ সনের এপ্রিল মাসে খাজে আবদুলগণি বাহাদুর (পরে নবাব বাহাদুর) দরিদ্রদিগের ভরণপোষণ জন্য এই "লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব বদরওয়াজা মহল্লায় এই আশ্রম স্থাপিত ছিল।

লঙ্কা, তামাক, শুপারি সকলই নিজ ক্ষেত্রে উৎপাদন করে। মৎস্যও অবসর কালে প্রায় প্রতিদিনই ধরিয়া আনে।

তিনি এইরূপ গৃহস্থ পরিবারের মাসিক ব্যয় তাহাদের ক্ষেত্রে উপার্জ্জিত জিনিসের মূল্য ধরিয়াও ১০৲ টাকার অধিক অনুমান করেন না। হণ্টার সাহেবের প্রদর্শিত হিসাব পরে প্রদত্ত হইবে।

শ্রীকেদার নাথ মজুমদার।

ময়মনসিংহ

সুসঙ্গ রাজবংশের কথা।

বঙ্গদেশে সুসঙ্গের প্রাচীন রাজবংশ অনেকের নিকটেই পরিচিত। এই সুসঙ্গ রাজ্য ময়মনসিংহ জেলার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এই বংশে বর্ত্তমান মহারাজা মুকুন্দচন্দ্র সিংহ বি, এ বাহাদুর মহাশয়ের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষে রাজা রামকৃষ্ণ সিংহ আনুমানিক ১৮৮১-৮২ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবাবধি তাঁহার প্রকৃতি অতি উচ্ছৃঙ্খল ও স্বাধীন ছিল। তিনি কৈশোরেও অকুতোভয়ে সেই ভয়াল হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর গারো পাহাড়ে সর্ব্বদাই শিকার ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত থাকিতেন। পরিণত বয়সে পূর্ব্বনিয়মানুযায়ী জমিদারীর সনন্দ গ্রহণার্থ মোগল রাজধানী দিল্লীতে গমন করিয়া বাদসাহ আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে সনন্দ লাভ করেন। দিল্লী অবস্থান কালে রাজা রাম সিংহ অস্ত্র-চালনা-কৌশলে বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া ৭০০ শত মুন্সবদারী * ও ৩০০ সোওয়ারের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছু দিন তথায় অবস্থান করিলে, রাজা রাম সিংহের হৃদয়ে স্বাধীন হইবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে; অবিলম্বে কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি স্বীয় রাজধানী দুর্গাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন

* সাধারণতঃ সৈন্যের অধিনায়ককে বুঝায়।

করেন। রাজধানীতে আসিয়াই তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন ও তাহাদের সুশিক্ষার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এমন কি মোগলের হস্ত হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করিবার জন্য কয়েকটী কামানও দুর্গাপুরে স্থাপিত হইল। স্বাধীন হইবার আশা ক্রমশঃই মুক্তপক্ষ বিহগের ন্যায় তাঁহাকে উচ্চতর পথে প্রধাবিত হইতে প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। রাজা রাম সিংহ সম্রাটের দেয় নজরানা ও আগরকাষ্ঠ (অগুরু) বন্ধ করিয়া নিজকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সংবাদ অধিক দিন বাদশাহের অবিদিত রহিল না। বাদশাহ ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা নবাব মুর্শিদ-কুলী-খাঁকে তৎকালীন আদেশ প্রেরণ করিলেন যে, "সুসঙ্গের বিদ্রোহী রাজা রামকৃষ্ণ সিংহকে সত্তর বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে আনয়ন করতঃ বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত কর!" মুর্শিদ-কুলী-খাঁ অবিলম্বে বাদসাহের আদেশ প্রাপ্ত মাত্র সুসঙ্গে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সৈন্যদল সুসঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইলে রাজা নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, প্রবল মোগলশক্তিকে আর বাধা দিতে সাহসী হইলেন না। সৈন্যগণ রাজা রাম সিংহকে ধৃত করিয়া বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিলে, মুর্শিদ কুলী-খাঁ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এক ওমরায়ের কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। সেই অবধি তিনি রাজ্যাধিকার হইতেও বঞ্চিত হইলেন। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের সহিত রাজার নামেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল। রাজা রামকৃষ্ণ সিংহ "আবদুল রহিম" নামে অভিহিত হইলেন। কিছু কাল পরে রাম সিংহ নবপরিণীতা স্ত্রী সহ সুসঙ্গ উপনীত হইলে হিন্দু মহিষী জাতিচ্যুত স্বামীর সহিত একত্র বাস করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু উচ্চমনা রাম সিংহ ইহাতে কোন আপত্তি না করিয়া ভরণপোষনার্থে কয়েকটী গ্রাম লইয়া মহাদেও গ্রামে বাস করিতে

থাকেন। লোকনাথ ঘোষ মহাশয় The Modern History of the Indian chiefs Rajas, Zeminders etc. পুস্তকে লিখিয়াছেন :— Ramkrishna who was shortly after deposed by the Mahomedan Government, and out-casted by his co-religionists on account of his marriage with a mussalman woman কালক্রমে রাজা রাম সিংহের রহিমিয়া নামে এক পুত্র ও তারা বিবি নাম্নী এক কন্যা জন্মে।

রাজা রাম সিংহ রাজত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেও প্রজাগণ তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ ভয় ও ভক্তি করিত। তিনি সময় সময় প্রজাবর্গের উপর শাসন পরিচালনাও করিতেন। কিছু দিন অতিবাহিত হইলে মুসলমান পত্নীর প্ররোচনায় রাজা রাম সিংহ পূর্ব্ব পত্নীর গর্ভজাত পুত্র রণসিংহ ও মুসলমান পত্নীর গর্ভজাত পুত্র রহিমিয়ার মধ্যে রাজত্বের এক বিভাগ পত্র প্রস্তুত করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন। এই বিধান অনুসারে কুমার রণসিংহ ।৵০ আনা ও রহিমিয়ার ॥৵০ আনা পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। রাজা রাম সিংহের মৃত্যুর পর রহিমিয়া ॥৵০ আনা অংশের জন্য দাবি করিলে, এই বিধান শাস্ত্রসঙ্গত নয় বলিয়া রণ সিংহের পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইল। রহিমিয়া অবিলম্বে ॥৵০ আনা অংশের জন্য মুর্শিদাবাদ হুজুরা সেরেস্তায় নালিশ রুজু করিলেন। নবাব এই বিচার ভার সুসঙ্গ পাহাড়ে দশা আদালতের কাজি সাহেবের হস্তে ন্যস্ত করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। কাজির বিচারে রণসিংহ পৌতৃক সম্পত্তির অধিকার হইতে একেবারেই বঞ্চিত হন। রহিমিয়া দশ আনার স্থলে ষোল আনার অধিকারী সাব্যস্থ হইলেন। রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ।

"রহিম ইয়ার ... ... বাদী।
রণসিংহ ... ... প্রতিবাদী।

দাবী মুল্কে সুসঙ্গময় পাহাড় ও গড় আগর।

যে হেতুক মুল্কে সুসঙ্গের রাজতক্তের হক্ মালিক রাজা রামসিংহ স্ব-ইচ্ছায় বহাল তবিয়তে পবিত্র ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান সরামতে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলে সেই ধর্ম্ম-পত্নী গর্ভে রহিম ইয়ার জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং রহিম ইয়ার মুল্কে সুসঙ্গের রাজতক্তের হক্ মালিক বটে।

যে হেতুক রাজা রামসিংহ স্ব-ইচ্ছায় বহাল তবিয়তে পবিত্র ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিহিত বিধান মত আবদুর রহিম নাম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় রাজ-ধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহার হিন্দু স্ত্রী (প্রতিবাদীর গর্ভ-ধারিণী) তাহাকে অপমানিত করিয়া রাজধানীর বাহির করিয়াছেন। সুতরাং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এইরূপ অবৈধ ব্যবহার জন্য হিন্দু-শাস্ত্র অনুসারেও রাজামজকুরের সেই স্ত্রী পরিত্যজ্যা। পরিত্যজ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পিতার স্বত্বে হক্দার হইতে পারে না।

অতএব আদেশ হইল যে—

হাল রোজ হইতে মুল্কে সুসঙ্গের বিস্তৃত রাজত্বময় পাহাড় কড়ি বাড়ী ও মহাল ময় গর আগরের মালিকী যাহা রাজা রামসিংহ ওরফে আবদুল রহিমের হক্দার ছিল, তাহা তাহার ধর্ম্ম পত্নীর গর্ভজাত রহিম ইয়ার প্রাপ্ত হইলেক। ইতি” *

মুল্কে সুসঙ্গের সিংহাসন লইয়া হিন্দু ও মুসলমান ওয়ারিশদ্বয় যখন দশার আদালতে বিচারপ্রার্থী, সেই সময় সুযোগ পাইয়া রাজা রামসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরসিংহ স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে একেবারে দিল্লীতে গমন করেন। দিল্লীতে বীর সিংহের কোন পরিচিত বন্ধু ছিলনা। বীর সিংহ বহু চেষ্টায় রাজা যশোবন্ত রাওয়ের শরণাপন্ন

* জীর্ণ কাগজ হইতে সন তারিখ উদ্ধার করা যায় নাই।

হইলেন। যশোবন্ত তাহার কার্য্য উদ্ধার করিতে প্রতিশ্রুত হন। সময় বুঝিয়া মূল্যবান উপঢৌকন সহ যশোবন্ত রাও বীর সিংহকে লইয়া বাদসাহ সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় দিল্লীর সিংহাসনে স্তিমিত প্রদীপ সাহ আলম প্রতিষ্ঠিত। রাজা যশোবন্ত রাও বাদসাহ সমীপে বলিলেন, "আবেদন কারীর ভ্রাতা রাজা রামকৃষ্ণ সুসঙ্গ মুল্কের অধিকারী ছিলেন। তিনি কালগ্রস্ত হওয়ায় সুসঙ্গের জমিদারি সনন্দের জন্য ইনি প্রার্থী।" বাদসাহ পূর্ব্ব ঘটনাবলী কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং বীর সিংহকে জমিদারী সনন্দ প্রদান করিলেন।

দিল্লীশ্বরের তখন ইংরেজ বণিকদিগের আবদার রক্ষা করাই একমাত্র কর্ম্ম হইয়া দাড়াইয়াছিল। প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা বাদসাহের আম হুকুমও অনেক সময় অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিতেন। সুবাদারগণই সুবার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। বীরসিংহ বাদসাহের সনন্দলাভ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। বীর সিংহ চারিদিকেই এই সকল প্রতিকূল বাধাবিঘ্ন দূরীকরণ মানসে পর-ওয়ানা সহ মুর্শিদাবাদ আসিলেন। মুর্শিদাবাদ পৌছিয়া নবাব দরবারে হাজির হইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। এই সময় সুসঙ্গের উকীল কৃপারামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। কৃপারাম সুসঙ্গের সকল ঘটনাই অবগত ছিলেন। তিনি রাজা বীর সিংহের অভীষ্ট অনায়াসে সাধন করিয়া দিবেন বলিয়া বাদসাহ প্রদত্ত পর-ওয়ানা খানা গ্রহণ করিলেন। বীরসিংহ অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। কৃপারামের মনোগত ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। কৃপারাম সনন্দ খানা লইয়া বীরসিংহকে আর ফিরাইয়া দিলেন না। সনন্দ হস্তগত করিয়া কৃপারাম রণ সিংহকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এইরূপ :—

কৌশলে কার্য্যসুনির্ব্বাহ করা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বীরসিংহ বাহাদুর

ইতিমধ্যে দিল্লী দরবার হইতে যে পর-ওয়ানা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা কৌশলে হস্তগত করিয়া ফেলা গিয়াছে। তিনির সাকুল্য উদ্যম বিফল হইলেক। অদ্য তারিখে বাহুল্যাধিক্যে কেবল পর-ওয়ানা সহীমোহরী পাঠান গেলহ। বিস্তারিত পর পর নিবেদন হইবেক ইতি।

মোতালকে মুর্শিদাবাদ কাজির দেউরী।

সেবকাধম সেবক—

শ্রীকৃপারাম দেও উকীল।

এই আকস্মিক ঘটনার পর বীরসিংহ ক্রোধে ও ক্ষোভে উন্মত্ত প্রায় হইয়া পুনর্ব্বার সনন্দ লাভার্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। কাজির বিচারের পর রণসিংহ মুর্শিদাবাদ হুজুরী সেরেস্তায় সুবিচারের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নবাব সুজাউদ্দিন পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা অনুসারে রণসিংহের অনুকূলেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। রণসিংহ মোকদ্দমায় জয় লাভ করিয়া ১৭২৫ খৃঃ যে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৪নং পরওয়ানা—

মনশুরউল—মুল্ক সুজাউদ্দিন সরফরাজ খাঁ বাহাদুর

ফত্তর জঙ্গ বাদসাহে মহম্মদ সাহা।

মুৎসুদ্দিয়ান, কাননগোয়ান, চৌধুরীয়ান, কবোরিয়ান, জামদারান, (বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ) পং নসরৎসাহী ওরফে সুসঙ্গ সরকার বাজুহায় ও পং হোসেন প্রতাপ সরকার সিলেট জায়গীর নবাব সম সমউদ্দৌলা সুবেদার বাঙ্গালা। তোমরা সকলে অবগত হও যে সুসঙ্গের জমিদার রামসিংহ ওরফে আবদুল রহিম তাহার ৭০০ মুনসবদারী ও ৩০ সোওয়ার ইস্তাফা করিয়াছে তাহার পুত্র রণসিংহকে উক্ত পদে স্থলবর্ত্তী করা হইয়াছে। উক্ত মুৎসুদ্দিয়ান প্রভৃতি সকলে তাহার নিকট সরকারী সমস্ত কার্য্য

সতর্কতার সহিত নির্ব্বাহ করিবা এবং উক্ত জমিদারের কার্য্যের সহায়তা করিবা এবং সরকারী সমস্ত কার্য্য ভাল রকম নির্ব্বাহ করিবা। ১১৪৩ হিজরী ৬ মহের রমজান।

শ্রীশৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

কেদার রায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জর্জ্জরিতা নিপীড়িতা শত অত্যাচারে
কাঁদেন নীরবে শুধু; কাঁদিত যেমতি
একাকিনী শোকাকুলা শ্রীরাম-দয়িতা
আঁধার কুটীরে বসি। কি ভীষণ দৃশ্য!
দেখ রে চাহিয়ে; শত গ্রন্থি জীর্ণ শীর্ণ
মলিন বসন তিতিয়ে অজস্র ধারে
ঝরিতেছে রক্ত-স্রোত মাতৃ-দেহ হ'তে।
বিলাস প্রমত্ত মন! দশ মাস শুধু
ছিলে মাতৃ-গর্ভে, পাঁচটি বরষ মাত্র
স্নেহের জননীবক্ষে করেছিস্ খেলা,
কিন্তু এই বঙ্গভূমি রঙ্গভূমি তোর
চিরজীবনের। এই চারু বক্ষোপরি
করিয়ে শয়ন অনন্ত তিমির গর্ভে
রবে চির দিন; রহিয়াছে যথা তোর
পিতৃপিতামহগণ মিশিয়ে অনন্ত
বালুকার সাথে। স্বর্গাদপি গরীয়সী
সেই স্নেহময়ী মাতা দলিতা লাঞ্ছিতা
নিত্য শত অত্যাচারে। আর তুমি রাণী
বিলাস শয়নে হের প্রেমের স্বপন
ধিক্ রে তোমায়!" হেনকালে ধীরে ধীরে
বীরেন্দ্র কেদার প্রশান্ত সাগর সম
প্রশান্ত হৃদয় উল্লাসে উৎফুল্ল আঁখি
সহাস্য বদনে বিলাস ভবনে পাশ
অগ্রসর ক্রমে ক্রমে কমলার পানে।
দূর হতে দেখে তার উল্লাসে মাতিয়ে
ছুটিলা কমলাবতী চারু চন্দ্রাননী
পড়িলা বক্ষেতে তার বাহু জড়াইয়া
সহকারে ধরে যথা মাধবী বেষ্টিয়া।
তখন কেদার রায় বীর চূড়ামণি
রাণীর চিবুক ধরি বলেন আদরে।
"শুনেছ কমলাবতি! শুনেছ সংবাদ
প্রতাপ-আদিত্য নাম যশোর ঈশ্বর
প্রতাপে প্রতাপ সম সংগ্রামে দুর্ব্বার
জান কি তাঁহারে? সেই বীর শ্রেষ্ঠ আজি

মোগলের অধীনতা করি অস্বীকার
মোগলের প্রাপ্য কর করিয়ে আবদ্ধ
উড়ায়ে দুর্গের চূড়ে গৌরব কেতন,
বঙ্গের স্বাধীন রাজা জানায়ে সকলে
রাখিল বঙ্গের মান। বঙ্গ জননীর
আজি কি সুখের দিন! বল শুনি প্রিয়ে
আজি এই শুভদিনে, এ শুভ সংবাদ
শুনি কোন্ হতভাগ্য বঙ্গের সন্তান
নাচেনা উল্লাসে মাতি ভাসিয়ে আনন্দে
কে আছে পাষণ্ড হেন দীন বঙ্গভূমে
কাঁদেনা পরাণ যার জননীর তরে?
যদি থাকে, সেও আজি এ শুভ সংবাদে
দুই বিন্দু অশ্রুজল আনন্দে মাতিয়ে
ফেলিয়াছে জননীর শুভ কামনায়।
প্রতাপ! প্রতাপ! তুমিই জগতে ধন্য
তুমিই মায়ের বট প্রকৃত সন্তান।"
বলিতে বলিতে বীর হইলা নীরব।
দুই বিন্দু অশ্রু জল বহি গণ্ড স্থল
বীরের প্রশস্ত বক্ষে প'ড়ল গড়ায়ে।
আনন্দে আপ্লুত হেরি নিজ প্রাণেশ্বরে
স্বরূপে হাসির রেখা কেদাররমণী
গরবে বলিলা তায়। "স্বামি প্রাণেশ্বর!
সত্যই প্রতাপ আজি ধন্য ধরাতলে
সত্যই প্রতাপ বটে মায়ের সন্তান।
বিধর্ম্মি-চরণ-তলে নিত্য বিদলিতা
জননী জনমভূমি উদ্ধারের তরে
সুতেজ সাহস গর্ব্ব দেখায় প্রতাপ
স্থাপিল কীর্ত্তির স্তম্ভ আহা কি সুন্দর!
অভ্রভেদী চূড়ে উড়ে যশের কেতন।
প্রভু, কমলাবল্লভ! প্রতাপ হইতে
প্রতাপ মহিষী আজি কত ভাগ্যবতী?
কি আনন্দ আজি তাঁর গর্ব্বিত হৃদয়ে?"
নীরবিলা বামা, স্থলপদ্ম সম যেন
গর্ব্বিত বদনে শোভা দিল অপরূপ।
উৎসাহ প্রফুল্ল নেত্রে আনন্দে কেদার
নিরখিলা পত্নী সুখছটাবিমণ্ডিত
কনক অচল যথা ভানুর কিরণে।
কহিলা কেদার রায় নৃপতি তখন—
"কমলে! কমলে! জীবন সর্ব্বস্ব মোর!
বুঝেছি—বুঝেছি তব হৃদয়ের ভাব,
যে গরবে গরবিণী প্রতাপ-মহিষী
যে সুখে নাচিছে আজি অন্তর তাঁহার
সে গরবে গরবিণী হইবারে সাধ
হৃদয়ে হয়েছে তব বড়ই প্রবল।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী

নাদির সা।

ঐতিহাসিক চিত্র

নাদির শাহার আক্রমণ।

শাহানশাহা আরঙ্গজেব বাদশাহার দেহ ত্যাগের পর হইতে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব রবি ভারতাকাশে অস্তমিত হইতে আরব্ধ হয়। বাবর, আকবর ও আরঙ্গজেবের প্রতিষ্ঠিত বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অবশেষে ধ্বংস মুখে নিপতিত হইয়া যায়, অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণে বারংবার নিপীড়িত হইয়া ক্রমে অন্তঃসার শূন্য হইয়া উঠে। এবং পরিণামে আসমুদ্র হিমালয় হইতে তাহার অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য মুছিয়া যায়। দেশীয় ও বৈদেশিক জাতিগণের পরস্পর সংঘর্ষণে ভারতে যে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহাই সেই জীর্ণ শীর্ণ মোগল সাম্রাজ্যকে দগ্ধ করিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া ফেলে। সেই ভস্মরাশি বক্ষে করিয়া আজিও দিল্লী ও আগরা তাহার পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

আরঙ্গজেবের রাজত্ব কালেই ভারতের অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুতগণের রণহুঙ্কারে তাঁহার ন্যায় দুনিয়ার বাদশাহাকেও সন্ত্রাসিত হইতে হইয়াছিল। তাহার পর তাঁহার দেহাবসান ঘটিলে ক্রমে ভারতে শিখগণ আপনাদের পরাক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণও এক সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা করে। তদ্ভিন্ন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃগণ স্বাধীনভাবে এক একটি

ক্ষুদ্ররাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হন। আবার ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিগণও ভারতে আপনাদিগের এক একটি স্বাধীন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য নানাপ্রকার আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়। ভারতের এইরূপ অন্তর্বিপ্লবের সময় পারস্য হইতে এক প্রবল রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইয়া আফগানিস্থান অতিক্রমের পর পশ্চিম ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া দিল্লী নগরীর রাজপথ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। সেই রুধির প্রবাহে ভাসমান হইয়া সাজহানের সাধের ময়ূরাসন ভারতবর্ষ হইতে চিরদিনের জন্য চলিয়া যায় এবং দিল্লী-রাজ কোষে সঞ্চিত রত্নরাজিও অনন্ত কালের জন্য অদৃশ্য হয়। ক্রমে মোগল বাদসাহগণের বংশধরগণ খদ্যোতের ন্যায় ক্ষীণালোক বিকীরণ করিতে করিতে দিগন্ত ক্রোড়ে চির-বিলীন হইয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই রুধির-প্রবাহের একটি সামান্য চিত্র প্রদানের ইচ্ছা করিতেছি।

আসিয়ার পশ্চিম প্রান্তস্থিত কাস্পীয়ান সাগরের তীরে একটি বালক শৈশবে মেষের দল চরাইয়া বেড়াইত, সুবিস্তৃত কাস্পীয়ান সাগরের ন্যায় বিশাল কাল সমুদ্রও অনন্ত বলিয়া তাহার শিশু হৃদয়ে আন্দোলন উপস্থিত হয়। কাস্পীয়ানের তরঙ্গের ন্যায় তাহার হৃদয়েও নানা তরঙ্গ উঠিত। উচ্চাশা যখন তাহার হৃদয়কে প্রতিনিয়ত আঘাত করিতে থাকে, তখন সে সামান্য মেষ পালকের কার্য্য ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হয়। আপনার অমানুষিক বীর্য্য ও পরাক্রম দেখাইয়া ক্রমে ক্রমে সে পারস্য বাদসাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং তাঁহার সেবকরূপে তমাস্প কুলিখাঁ আখ্যা গ্রহণ করিয়া সাধারণের পরিচিত হইয়া উঠে। যে সময়ে সে মেষের দল চরাইয়া কাস্পীয়ান সাগরের তীরে আপনার ভবিষ্যতের আলোকময় চিত্র নিজ হৃদয়ে অঙ্কিত করিতেছিল, সে সময়ে সে বুঝিতে পারে নাই যে, পারস্যের রাজলক্ষ্মী অলক্ষিত ভাবে স্বীয় কিরণ ছটায় তাহার সেই চিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে ছিলেন এবং

পারস্যের রাজ-সিংহাসন তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য আপনার বক্ষ বিস্তার করিতেছিল। সে আরও বুঝিতে পারে নাই যে, দিল্লীর ময়ূরাসনও আপনার মণি মাণিক্য খচিত অঙ্কে তাহাকে স্থাপন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। মানুষ বুঝিতে সক্ষম হউক না হউক কাল তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, সেই কালপ্রভাবে তমাস্প কুলিখাঁ পারস্যের সাহ বংশকে পদদলিত করিয়া নাদির সাহা আখ্যা লইয়া পারস্যের রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং কৃতান্ত দূত তুল্য স্বীয় কাজলা বাশী * সৈনিকগণের সাহায্যে অর্দ্ধ আসিয়া অধিকারের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। কিরূপে কান্দাহার কাবুল প্রভৃতি জনপদ অধিকার করিয়া তিনি পশ্চিম ভারতবর্ষ ও অবশেষে মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রুধিরাপ্লুত করিয়া তুলেন আমরা এক্ষণে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতেই মোগল সাম্রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যগণের স্বার্থসিদ্ধি ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার জন্য মোগল সাম্রাজ্য অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। ঐ সকল অমাত্যগণের মধ্যে অনেকে এরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন যে দিল্লীর বাদশাহেরা তাঁহাদের ক্রীড়নক হইয়া উঠে, ও বাদশাহগণ তাঁহাদের হস্তে ক্রীড়া পুতুলরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবল সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বলিয়া নহে, বাদসাহগণ প্রধান প্রধান সকল অমাত্যের ভয়ে আপনাদের আদেশ ও শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহসী হইতেন না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মহম্মদ সাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের

* কাজলা বাশী অর্থে লোহিত মস্তক।

অনুগ্রহে তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের হস্ত হইতে স্বাধীন হওয়ার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইয়া উঠে। উভয় ভ্রাতাকে ধ্বংস করিয়া মহম্মদ শাহা অবশেষে স্বাধীন ভাবে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু তথাপি তিনি অমাত্যদিগের হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের পর আসফজা নিজাম উল্‌মুলক ও সাদত আলি খাঁ নামক অমাত্যদ্বয় প্রধান হইয়া রাজ্যমধ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াসী হন। নিজাম উল্‌মুলক দাক্ষিণাত্যের ও সাদত অলি খাঁ অযোধ্যার শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া প্রবল হইয়া উঠেন। অন্যান্য অমাত্য দিগের সহিত তাঁহাদের তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না, এই সময়ে কামার উদ্দীন খাঁ উজির, সামস উদ্দৌলা খাঁ দুরাণ আমীর উলওমরা পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বুরহান উলমুলক নামক আর একজন অমাত্যও ঐ সময়ে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। তিনি প্রথমে অযোধ্যার, পরে মালবের শাসন কর্তার পদে নিযুক্ত হন, অমাত্যগণের দ্বেষ-হিংসা ও সাম্রাজ্য মধ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য রাজ্য মধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। নাদির সাহ অনেক দিন হইতে ভারতবর্ষের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন, এবং এরূপও কথিত আছে যে, নিজাম উলমুলক ও সাদত খাঁর প্ররোচনায় তিনি ভারত সাম্রাজ্য আক্রমণে সাহসী হইয়াছিলেন।

পারস্য হইতে বহির্গত হইয়া নাদির সাহা প্রথমে কান্দাহারে উপস্থিত হন, তথাকার অধিবাসিগণের রক্তে তাঁহার সৈনিকগণ আপনাদের শাণিত কৃপাণ ও বসুন্ধরা রঞ্জিত করিয়া নাদির সাহার বিজয় নিশান অনুকূল বায়ুভরে উড়াইয়া দেয়। কান্দাহারের পর হইতেই মোগল সাম্রাজ্য আরম্ভ হয়। কারণ তৎকালে কাবুল প্রদেশও মোগল সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভূত ছিল, নাদির সাহ কান্দাহারের জয়ের পূর্ব্বে ইস্পাহান সম্রাট মহম্মদ শাহার নিকট আলি সর্দ্দার খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে দূতরূপে প্রেরণ করেন, মহম্মদ সাহার সহিত সন্ধি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মহম্মদ শাহা তাহাতে মনোযোগী না হওয়ায়, তিনি কান্দাহার হইতে মহম্মদ খাঁ তুর্কমান * নামক আর একজন দূতকে পাঠাইয়া দেন। তুর্কমান ভারতবর্ষ হইতে আর ফিরিয়া যান নাই, ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নাদির সাহা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। কান্দাহার হইতে কাবুল প্রদেশে উপস্থিত হইলে আফগানেরা নাদির সাহাকে বাধা প্রদান করে। এই সময়ে কাবুলের শাসন কর্ত্তা নাসির খাঁ পেসোয়ারে অবস্থিতি করিতেছিলেন তিনি অর্থাভাবে সৈনিক দিগকে বেতন না দেওয়ায় তাহাদিগকে বাধ্য রাখিতে পারেন নাই, পুনঃ পুনঃ মহম্মদ শাহকে অর্থের জন্য লিখিয়া তিনি অবশেষে বিরক্ত হইয়া উঠেন। আফগাণেরা নাদির শাহাকে বাধা প্রধান করিয়া কোনরূপ কৃত কার্য্য হইতে পারে নাই, তিন খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করিয়া আটক নদীর তীরে উপস্থিত হন, পরে তাহা পার হইয়া ভারত বর্ষে আগমন করেন। নাসিরখাঁ নাদির শাহার হস্তে পতিত হইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিতে বাধ্য হন।

আটক পার হইয়া নাদির শাহা মুলতান ও লাহোর প্রদেশ বা বর্ত্তমান পাঞ্জাবে উপস্থিত হন, এই সময়ে মুলতান ও লাহোর প্রদেশ নবাব সাহেব আজুদ উদ্দৌল্যা জাকেরিয়া খাঁ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল। আজুদউদ্দৌল্যা নাদির শাহার সৈন্যের সহিত পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু বিশাল পারসিক বাহিনীর নিকট তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্য সামান্য তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া যায়। আজুদ অবশেষে নাদিরের সহিত

* তাজকিরা নামক গ্রন্থে ও মুতাক্ষরীণে দ্বিতীয় দূতের নাম মহম্মদ খাঁ তুর্কমান আছে। কিন্তু বায়ানি ওয়াকক গ্রন্থে মহম্ম খাঁ আফশার আছে। Elliats' History of India vol vIII p 76-126.

সন্ধি করিতে বাধ্য হন, নাদির অনুগ্রহ পূর্ব্বক লাহোরকে রুধিরাপ্লুত করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন।

আটকের নিকট নাদির শাহার আগমন শুনিয়া সম্রাট মহম্মদ শাহ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন। তিনি স্বীয় সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নিজাম উলমূলক ও আমির উল ওমরার প্রতি ভারার্পণ করিলেন। অমাত্যগণ প্রথমতঃ শালমার বাগানের নিকট শিবির সন্নিবেশ করেন। তাঁহারা যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য এক কোটি টাকা রাজকোষ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অসংখ্য কামান পারসিক কাজলা-বাশীদিগের ভীতি উৎপাদনের জন্য সজ্জিত হয়। অমাত্যগণের অধীন সৈন্যগণ ব্যতীত তাঁহাদের সাহায্যের জন্য পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রদত্ত হইয়াছিল।* এইরূপে মোগল সৈন্যগণ পারসিকগণের আক্রমণের বাধা প্রদানের জন্য সজ্জিত হইতে থাকে। নাদির শাহার লাহোর অতিক্রমণের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া মোগল সৈন্য কর্ণাল নামক স্থানে উপস্থিত হয়। যদিও সম্রাট মহম্মদ শাহ নিজাম উলমুলক ও আমির উলওমারার প্রতি এই যুদ্ধের ভারার্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের পরস্পর বিদ্বেষের জন্য মোগল সৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে পারে নাই। একজন যেরূপ বন্দোবস্তের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন, আর একজনের তাহাতে অমত হইত, এইরূপে উভয়ে উভয়ের মতের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেন*। সে যাহা হউক বিপক্ষ পক্ষ সম্মুখবর্ত্তী জানিয়া অবশেষে তাঁহারা পারসিক সৈন্যের বাধা প্রদানে সচেষ্ট হইলেন। স্বয়ং সম্রাট মহম্মদ শাহা আসিয়া

* রস্তম আলির তারিখি হিন্দীর মতে মোগল সৈন্যের পরিমাণ দশ লক্ষ ছিল, তন্মধ্যে লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, অবশিষ্ট পদাতিক, কামান ও অসংখ্য ছিল। (Elliats History of India vol vIII pp 60—61

* What ever plan was suggested by the khan Duran was opposed by Nizam ulmulk, and *vice veria*.". (Tarikhi Hindi. Elliot, vol vIII)

তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। নিজাম উলমুলকের আদেশে মোগল সৈন্যগণ অঙ্গুরীয় আকারে ব্যূহ বদ্ধ হইল, কিন্তু পারসিক বাহিনী চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা মোগলদিগের আহার্য্য দ্রব্যাদি ও কাষ্ঠ প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, তজ্জন্য মোগল সৈন্যগণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, বুরহান উলমুল্ক নাদির শাহার সৈন্য গণকে বাধা প্রদান করিতে গিয়া আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়েন ও তাহাদের হস্তে বন্দী হন। নাদির শাহা তাঁহাকে আপন পক্ষভুক্ত করিয়া লন। আমীর উলওমরা বুরহান উলমুল্কের বন্দী হওয়ার কথা শুনিয়া পরাক্রমসহকারে বিপক্ষবাহিনী মথিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় রণকৌশল প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই, তথাপি তাঁহার বীরত্বে পারসিকগণ সে দিবস জয়লাভ করিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় সে দিবস উভয় পক্ষকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে হয়। পরদিবস আমীর উল ওমরা নূতন উদ্যমে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু সে দিবস তিনি আত্মবিসর্জ্জন দিয়া জগৎকে প্রভুভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যান।

আমীর উল ওমরার আত্মবিসর্জ্জনের পর উভয় পক্ষ মধ্যে এক চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। মহম্মদ সাহা তাঁহার মৃত্যুতে ভগ্নোৎসাহ হন, আবার নাদির সাহাও বুরহান উলমুলকের নিকট হইতে আমীর উলওমরার ন্যায় শত শত বীরের কথা শুনিয়া চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। অবশেষে নিজাম উলমুলকের পরামর্শানুসারে সম্রাট মহম্মদ সাহা স্বয়ং নাদির সাহার শিবিরে উপস্থিত হন। শাহা তাঁহাকে যথোচিত সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করেন। পরে উভয়পক্ষ মধ্যে সন্ধির কথা স্থিরীকৃত হইলে সম্রাট মহম্মদ শাহা নাদির শাহাকে লইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন।

উভয় শাহা দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করিয়া কেল্লামধ্যে অবস্থিতি করিতে থাকেন। এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, কেল্লার একদিকে মহম্মদ

শাহাকে অবস্থানের জন্য নাদির শাহ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন, এবং স্বয়ং দেওয়ানী খাশে অবস্থিতি করেন। নাদির মোগল সম্রাটকে বন্দীরূপে তাঁহার নিজের আহার্য্য হইতে কতক খাদ্য ও পানীয় পাঠাইয়া দেন, শুক্রবার বা জুমা দিবসে খোদবা বা প্রার্থনায় নাদিরের নাম এবং পর-দিবসে মহম্মদ শাহার নাম পঠিত হয়। এইরূপে দুই এক দিন অতিবাহিত হইলে দিল্লীমধ্যে এক জনরব প্রচারিত হয় যে, নাদির সাহের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কেহবা বলিতে লাগিল যে তাঁহার মৃত্যু স্বাভাবিক, আবার কেহ কেহ ইহাও বলিতে লাগিল যে কেল্লার কোন প্রহরিণী তাহাকে হত্যা করিয়াছে।* এই সংবাদে দিল্লীর অধিবাসি-গণ নাদির সাহার সৈন্যদিগকে সহসা আক্রমণ করিয়া তাহাদের প্রায় প্রায় পাঁচ হাজার * লোককে নিহত করিয়া ফেলে, নাদির এই সংবাদে যার পর নাই বিচলিত হইয়া অধিবাসিগণকে হত্যা ও দিল্লী নগরী লুণ্ঠনের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

পারসিক সৈন্যগণ নাদির শাহার আদেশ পাইয়া আপনাদের সহচর-গণের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য অধিবাসিগণের রক্তে দিল্লীর রাজপথ রঞ্জিত করিতে আরম্ভ করিল। যেখানে যে কোন ভারতবাসী পারসিকদিগের চক্ষের সমক্ষে পতিত হয় অমনি তাহাদের শাণিত কৃপাণ ভারতবাসীর রক্তপানের জন্য বিদ্যুদ্‌বেগে ধাবিত হইতে থাকে. ক্রমে ক্রমে দিল্লীর রাজপথ ছিন্নমুণ্ড, ছিন্ন দেহ ও রুধিরস্রোতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই রুধির ধারা রাজপথ হইতে ক্রমে নগরীর গৃহে গৃহে ও অন্তঃপুরমধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কি আমীর, কি

* Some said that he had died of a natural death, and some, as if to cover Mahmed shah, said that he had been killed by a almac woman " (Mutagherin vol I.)

তারিখি হিন্দীর মতে ৫ হাজার মুতাক্ষরীণের মতে ৭ হাজার এবং বাঙ্গালি ঔরাককের মতে প্রায় ৩ হাজার সৈন্য নিহত হয়।

ওমরা, কি মধ্যবিত্ত সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণ রুধির ধারায় প্লাবিত হইয়া উঠিল, ছিন্ন মুণ্ড ও ছিন্নদেহের স্তূপে দিল্লীর অধিবাসিগণের গৃহপ্রাঙ্গণ পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিল। তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারগণ উন্মত্ত সৈনিক-গণের হস্তে যারপর নাই লাঞ্ছিত হইতে লাগিল, এবং অনেক রমণী গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পারসিকদিগের শিবিরে নীত হইল। এই রুধির প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর প্রধান প্রধান স্থানে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল, চাঁদনীচক, ফলের বাজার, দরীবা বাজার এবং জুম্মা মসজীদের নিকটস্থ গৃহসকল ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহার পর সমস্ত ধনরত্নও লুণ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়, রাজপথাস্থিত বিপণিসমূহ হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় অট্টালিকা পর্য্যন্ত সমস্তই লুণ্ঠনভয়ে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, বস্ত্র, সোনারূপার বাসন, হীরা, জহরত, স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রা এমন কি হয় হস্তী পর্য্যন্ত নাদির শাহার করতলগত হইয়া পড়িল, দিল্লীর রাজ-কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া অধিবাসিগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ডার পর্য্যন্ত সমস্তই লুণ্ঠিত হইয়া গেল, নরহত্যায়, অগ্নিদাহে ও লুণ্ঠনব্যাপারে মোগল সাম্রাজ্যের বিরাট রাজধানী সামান্য পল্লীর ন্যায় হইয়া উঠিল। দিল্লীর শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া নাদির সাহ নিজে অবশেষে স্বীয় সৈন্য-গণকে হত্যাকাণ্ড হইতে নিরস্ত হওয়ার জন্য আদেশ দেন। ঐতি-হাসিকেরা বলিয়া থাকেন যে এই হত্যাকাণ্ডে প্রায় লক্ষ লোকের শোণিতপাত হইয়াছিল, এবং প্রায় অশীতি কোটি মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল।* তৈমুরের আক্রমণের পর হইতে প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বৎসরের মধ্যে দিল্লীর এমন দুর্দ্দশা আর ঘটে নাই, ১৭৩৮

* বায়ানি ওয়াকেের মতে কেবল ২০ হাজার মাত্র অধিবাসী নিহত হয়। তারিখি হিন্দীতে লক্ষ লোকের কথা আছে, বায়ানি ওয়াকে ৮০ কোটি মুদ্রার কথা লিখিত আছে, তাজ কিরাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ কোটি মুদ্রার কথা আছে। তাহার মতে ৬০ লক্ষ টাকা, বহু সহস্র আশরফি এক কোটি টাকার সোণা রূপার বাসন, ৫০ কোটি টাকার হীরা জহরত ও কোটি টাকা মূল্যের ময়ূরাসন লুণ্ঠিত হয়।

খৃঃ অব্দে নাদির শাহা দিল্লীর যে দুর্দ্দশা ঘটাইয়া যান, তাহার আর পূরণ হয় নাই, কারণ তাহার পর অল্প দিনের মধ্যেই মোগল রাজলক্ষ্মী দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দিল্লীর রাজকোষ হইতে অধিবাসিগণের সামান্য গৃহ পর্য্যন্ত লুণ্ঠনভয়ে প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, বাস্তবিক তৈমুরের আক্রমণের পর হইতে সার্দ্ধ তিনশত বৎসর দিল্লীর রাজকোষে যে সমস্ত হীরা জহরত, মণি মাণিক্য সঞ্চিত হইয়াছিল, নাদির সাহা সমস্তই স্বীয় করতলগত করিয়া ফেলেন, তদ্ব্যতীত সাজাহানের সাধের ময়ূরাসনও তিনি দিল্লী হইতে পারস্যে লইয়া যান। ময়ূরাসনের অন্তর্দ্ধানের পর হইতেই মোগল রাজলক্ষ্মী ধীরে ধীরে দিল্লী ও ভারতবর্ষ হইতে চিরদিনের জন্য যে কোন্ অনিশ্চিত স্থানে চলিয়া যান, এ পর্য্যন্ত তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই, মোগল সাম্রাজ্য তদবধি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধ্বংস মুখে নিপতিত হয়. বাদসাহের কোষ শূন্য করিয়া নাদির শাহ ওমরাহগণের নিকট হইতেও অনেক অর্থ গ্রহণ করেন, যদিও ঐ ঘটনার অল্পদিন পরে সাদত খাঁর মৃত্যু হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রতিনিধি আবদুল মনসুর খাঁ ২ কোটি টাকা দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন. উজির কামারউদ্দীন খাঁর দেওয়ান রাজা মজলিস রায় উজিরের পক্ষ হইতে স্বয়ং এক কোটি টাকা ও অনেক হীরা জহরত দিয়াও নিষ্কৃতি পান নাই, তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করায় তিনি অবশেষে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হন, ইতিমাদ্দোলা৷ কিন বাহাদুর ৩০ লক্ষ টাকা ও অনেক হস্তী ও হীরাজহরত প্রদান করেন। নিজাম উলমুলককেও তাহাই দিতে হয়। বুরহান উলমুল্কের এক কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তিও নাদির সাহা হস্তগত করেন। তদ্ব্যতীত অনেক আমীর ওমরা বহুসংখ্যক অর্থ প্রদান করিয়া কোনরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন শেষ হইলে নাদির শাহা অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া পারস্যাভিমুখে যাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন কিন্তু দিল্লী পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে তিনি মোগল বংশের সহিত এক বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যার পর নাই উৎসুক হইয়া পড়েন। নাদিরের অনুরোধ ও আদেশক্রমে তাঁহার পুত্র নাসির মির্জার সহিত সাজাহানের পুত্র মোরাদবক্সের এক কুমারী কন্যার বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। বলা বাহুল্য এই বিবাহব্যাপার মহা ধুমধামেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার পর নাদির সাহ মহম্মদ শাহকে অভ্যর্থনা করিয়া দিল্লী হইতে বিদায় লন ও তাঁহাকে কিছুকাল শান্তিভোগের অবসর প্রদান করেন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে নাদির শাহার আক্রমণের পর হইতে মোগল রাজলক্ষ্মী দিল্লী ও ভারতবর্ষ হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হন। বাস্তবিক ইহার পর হইতে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ গৌরবচ্ছটা ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতে আরম্ভ হয়। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যগণ স্বাধীন ভাবে এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যস্থাপনে উদ্যোগী হওয়ায় মোগল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। মহারাষ্ট্রীয়েরা এক বিরাট্ সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রয়াসী হন। ভারতের অন্যান্য জাতিও আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হয়। অবশেষে নাদির শাহার ন্যায় আর এক ভয়াবহ বহিরাক্রমণে মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ভারতবর্ষ হইতে মুছিয়া যাইবার উপক্রম হয়। ইতিহাস-পাঠকমাত্রকে বোধ হয় আমেদ আবদালীর আক্রমণের নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। তাহার পর ভারতাকাশে ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মীর কিরণচ্ছটা প্রতিফলিত হইলে মোগলমহিমার শেষালোক ভারতবর্ষ হইতে চিরনির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

সম্পাদক।

মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার শাসন প্রণালী।

পূর্ব্বকথা।

দিগ্‌বিজয়ী আলেকজেন্দর পশ্চিম ভারতের কতকাংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ভারত হইতে প্রত্যাগমন করিলে গ্রীকেরা আপনাদিগকে সমৃদ্ধিশালী ভারতের অধিপতি ভাবিয়া কতটা গর্ব্বমুগ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু মেসিদন পতির গমনের পর তিন বৎসর কাল অতীত হইতে না হইতেই ভারতবাসী তাহাদের অধীনতা শৃঙ্খল দূরীকৃত করিয়া আবার সগৌরবে আপনার বিজয় কাহিনী গাইতে আরম্ভ করে! এসিয়ার অন্যান্য প্রদেশে দৃঢ় ভাবে আসন বিস্তারে সমর্থ হইয়াও যখন গ্রীকেরা ভারত করতলগত রাখিতে পারে নাই তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে ভারত নৈসর্গিক ধনের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্যেও অন্যান্য দেশাপেক্ষা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

মধ্য ও পশ্চিম এসিয়াধিপতি গ্রীকবীর সিলিউকস নিকেটর যখন ভারত পুনরধিকার করিবার জন্য বিপুল উদ্যমের সহিত সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন, তখন মৌর্য্য পতি চন্দ্রগুপ্ত মগধের গৌরবোজ্জ্বল সিংহাসনে বসিয়া ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে ছিলেন। মৌর্য্যপতি সিলিউকসের অভ্যর্থনার জন্য যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন, তাহাদের সঙ্গে প্রায় পঞ্চ বর্ষকাল যুঝিয়াও সিলিউকস্ যখন ভারতাধিকারের কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না, অধিকন্তু পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে হীনবল হইয়া পড়িলেন, তখন বাধ্য হইয়া গ্রীকবীর বর্ত্তমান আফগানিস্থান রাজ্য মগধেশ্বরকে দান করিয়া অতিদীন ভাবে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। এই

বিখ্যাত সন্ধির ফলে গ্রীকরাজ দুহিতা ভারতেশ্বরের পদসেবার্থ মগধে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সিলিউকসের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইলে, মিগাস্থিনিস্ গ্রীকরাজদূতরূপে মগধ রাজ সভায় গৃহীত হয়েন। কয়েক বৎসর ভারত রাজের সহিত অবস্থান করিয়া তিনি ভারতের শাসন প্রণালী বেশ দক্ষতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তাহার যে একটি প্রতিচিত্র সংকলন করেন, তৎপাঠে ভারতের সমৃদ্ধি, বীর্য্য ও রাজনীতিজ্ঞতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। তাঁহার সে মূলচিত্র অধুনা লুপ্ত হইলেও তৎ পরবর্ত্তী গ্রীক লেখকদিগের রচনা মধ্যে তাহার অধিকাংশই রক্ষিত হইয়াছে। সেই সকল অংশ যত্ন সহকারে ভিন্ন করিয়া লইয়া বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরাও সে চিত্র যতদূর সম্ভব অবিকৃত ভাবে সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকদিগকে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল পূর্ব্বমূর্ত্তির এক দিক্ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পর হইলাম।

রাজধানী।

ভারতের পুণ্য রাজধানী পাটলীপুত্র আজ মৃত্তিকা-গর্ভে চির সমাধি-গ্রস্ত। আধুনিক পাটনা ও বাঁকিপুর যে স্থলে বিরাজ করিতেছে, ঠিক সেই স্থলেই প্রাচীন পাটলীপুত্রের অধিষ্ঠান ছিল।(১) তখন শোণ নদ এই স্থলে পুণ্যসলিলা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া নগরটিকে পরম

(১) ভৌগোলিক কানিংহাম সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন যে,বিশ্রুতকীর্ত্তি পাটলীপুত্র নদীগর্ভে চিরসমাধি লাভ করিয়াছে ; কিন্তু অধুনা পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহার ধারণা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। (২) দুই দিক্ হইতে দুই স্রোতস্বতী আসিয়া মিলিত হওয়ায় নগরটিকে অন্তরীপের ন্যায় বোধ হইত। নগরটি চতুষ্কোণাকৃতি ও তাহার দৈর্ঘ্য সার্দ্ধ চতুঃক্রোশ ও প্রস্থ ঊনৈক ক্রোশ ছিল। তাহার চারিদিকে শাল কাষ্ঠের প্রাচীর ও সেই প্রাচীর ভেদ করিয়া চতুঃষষ্টি প্রবেশদ্বার ছিল। প্রত্যেক দ্বারে কয়েকটি করিয়া স্তম্ভ বিরাজ করিত। ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বসাকল্যে পঞ্চশত সত্তর হইবে। প্রাচীরের বহির্ভাগে জলপূর্ণ একটি বিস্তৃত ও গভীর পরিখা ছিল। শোণ নদের জলে তাহা সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত।

রাজপুরী।

এক বিশাল উদ্যানের মধ্যে সুরম্য রাজপুরী অধিষ্ঠিত ছিল। (৩) সেই উদ্যানে নানা জাতীয় বৃক্ষগুল্মাদি বিরাজ করিত। উদ্যান মধ্যে কতকগুলি সুন্দর সরোবর ছিল, নানাবিধ মনোরম মৎস্যে সে সমুদয় সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত।

রাজপুরীটি প্রধানতঃ শালাদি কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কারুকার্য্যে ও সৌন্দর্য্যে তাহা পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে গ্রীকদিগের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাহাদিগের যে সমস্ত সুন্দরতম পুরী ছিল, সে সকলও এই রাজপুরীর নিকট হীনতা স্বীকার করিত। ইহার স্তম্ভগুলির সমস্তই স্বর্ণের গিল্টি করা। সেই

(২) বহুদিন হইল, নদী দুইটি সরিয়া যাইয়া এক্ষণে পাটনা হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তরে দানাপুরের সৈন্যাবাসের নিকটেই মিলিত হইয়াছে। আধুনিক সঙ্গম ক্ষেত্রে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় হরিহর ছত্রের মেলা বসিয়া থাকে।

(৩) বাঁকিপুর ও পাটনার মধ্যবর্ত্তী রেলপথের দক্ষিণে কুমারাহার নামক একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের ক্ষেত্রাদি খনন করিতে করিতে শাল কাষ্ঠের প্রাচীরের কোন কোন অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানেই পূর্ব্বে রাজপুরী বিদ্যমান্ ছিল বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

গিল্টি করা স্তম্ভগুলিতে স্বর্ণের কত লতাপাতা এবং রজতের নানাপ্রকার পক্ষী অঙ্কিত ছিল।

রাজসভা।

রাজসভাটি বিশেষ জাঁকজমক ও আড়ম্বর পূর্ণ ছিল। তথায় যে সকল পান পাত্রাদি ব্যবহৃত হইত, তৎসমুদায়ই সুবর্ণ-নির্ম্মিত। এই সকল পাত্রের অনেক গুলি চারিহস্ত পর্য্যন্ত প্রশস্ত ছিল বলিয়া শুনা যায়। আজকাল যেমন 'টেব্‌ল্-চেয়ার' আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তখনও তাহাদের ব্যবহার ছিল, শুনা যায়। রাজসভায় যে সকল 'টেব্‌ল্' ছিল, সে গুলি বেশ দক্ষতার সহিত সুবক্রীকৃত হইয়াছিল। সে সমুদয়ে নানাপ্রকার বহুমূল্য পদার্থ ও কেদারা গুলিতে বহুমূল্যের প্রস্তরাদি অতীব সৌন্দর্য্যের সহিত খচিত ছিল। ভারতীয় তাম্রের প্রস্তুত নানাবিধ পাত্রও তথায় বহুল পরিমাণে বিরাজ করিত। সভার চারিদিকে জরির কাজ করা বস্ত্রাদি সজ্জিত ছিল।

রাজকথা।

রাজা সাধারণতঃ অন্তঃপুরেই বাস করিতেন। কিন্তু প্রজাদের অভিযোগ ও আবেদনাদি স্বকর্ণে শুনিবার জন্য তিনি প্রায় প্রত্যহই একবার প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হইতেন। প্রজাদের তিনি সন্তানবৎ পালন করিতেন। তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তার ভার কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত করিয়াই তিনি কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না। কর্ম্মচারীরা ঠিক্‌ভাবে প্রজাপালন করিতেছে কিনা, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। যখন তিনি দরবারে বসিয়া রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন, সেই সময় চারি জন সংবাহক তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মর্দ্দনে নিরত থাকিত।

রাজা প্রায় প্রত্যহই পূজার্থ দেবমন্দিরে গমন করিতেন। তখনও প্রজারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিত।

যখনই রাজা কোন কার্য্যোপলক্ষে কোন প্রকাশ্য স্থলে গমন করিতেন,

তখন প্রায়ই মুক্তাময় ঝালর-শোভিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত পাল্কীতে করিয়া বাহির হইতেন। তখন তাঁহার পরিধানে স্বর্ণখচিত বেগুণে বর্ণের সূক্ষ্ম মস্‌লিন্ বস্ত্র শোভা পাইত। নিকটবর্ত্তী কোন স্থলে যাইতে হইলে রাজা অশ্বপৃষ্ঠেই গমন করিতেন। গন্তব্য স্থল দূরবর্ত্তী হইলে স্বর্ণালঙ্কার-শোভিত গজরাজ তাঁহার পুণ্যদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইত।

রাজপ্রীতি।

পশুদিগের যুদ্ধক্রিয়া দর্শন রাজার একটি প্রিয় কার্য্য ছিল। বৃষে বৃষে, মেষে মেষে, গজে গজে, গণ্ডারে গণ্ডারে এবং অন্যবিধ জন্তুগণ সকলে যখন পরস্পরে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইত, তখন তাঁহার আনন্দের আর অবধি থাকিত না। মনুষ্যে মনুষ্যে মল্লযুদ্ধ ও অসিক্রীড়া দেখিতেও তিনি সমধিক কৌতূহল পরবশ ছিলেন।

আজকাল 'ঘোড়দৌড়' যেমন রাজা প্রজা সকলেরই সমধিক আগ্রহের দৃশ্য, তৎকালে 'ষাঁড়দৌড়' দেখিবার জন্য তদ্রূপ রাজ্যবাসী সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তখন কেবল 'ষাঁড়দৌড়' নহে, 'গাড়ীদৌড়ও' হইত। এক একটি অশ্ব ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া বৃষ সমভাবে থাকিয়া এক একটি গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইত। এইরূপ অপরূপ মিশ্রিত বাহনদিগের দৌড় বাস্তবিকই কৌতুকাবহ। (৪)

শিকার প্রিয়তা।

সর্ব্ববিধ আমোদের মধ্যে শিকারই রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর ছিল। (৫) অতীব জাঁক জমকের সহিত তিনি শিকারে বহির্গত হইতেন।

(৪) পরিব্রাজক দিগের গাড়ী টানিবার জন্য আজকালও ভারতের স্থানে স্থানে দ্রুতগামী বৃষের নিয়োগ হইয়া থাকে; কিন্তু ষাঁড়দৌড়, অধুনা কোথাও হয় কিনা জানি না। সম্ভবতঃ অন্য বহুবিধ ক্রীড়ার ন্যায় এই ক্রীড়াও একেবারে লুপ্ত হইয়া থাকিবে।

(৫) প্রিয়দর্শী অশোক ২৫৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রাজাদিগের শিকার করিবার প্রথা রহিত করেন।

সেই সময় বহুসংখ্যক নারীরক্ষী সশস্ত্র হইয়া তাঁহার পার্শ্বরক্ষা করিত। (৬) যখন কোন অবরুদ্ধ স্থলে বা 'ঘেরা জায়গায়' শিকারে ব্যাপৃত হইতেন, তখন তিনি সাধারণতঃ মঞ্চে আরোহণ করিয়া শরাঘাতে পশ্বাদি শিকার করিতেন; কিন্তু সে শিকার উন্মুক্ত প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হইলে, হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়াই তিনি তৎকার্য্য সাধনে রত হইতেন।

যে পথ দিয়া রাজা গমন করিতেন, রাজ পুরুষেরা পূর্ব্বাহ্ণে রজ্জু দ্বারা তাহা চিহ্নিত করিয়া রাখিতেন। সেই চিহ্নিত পথে প্রবেশ করিবার অধিকার কাহারও থাকিত না। যদি কেহ কোন ক্রমে প্রবেশ করিত, তবে সে স্ত্রীলোক হইলেও, তাহাকে ক্ষমা করিবার রীতি ছিল না, মৃত্যু তাহাকে অন্যলোকে বহন করিয়া লইয়া যাইত।

রাজকীয় জীবন তৎকালে আদৌ নির্ব্বিঘ্ন ছিল না। শান্তিশীল ভারতবাসীর রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াও তিনি নিয়ত শান্তিভোগ করিতে পাইতেন না। তাঁহার জীবন নাশের জন্য কয়েকবার কতকগুলি ষড়যন্ত্র হইয়াছিল এজন্য তিনি দিবা নিদ্রা ত যাইতেনই না, অধিকন্তু রাত্রিতেও কোন গৃহে দ্বিরাত্রির অধিক শয়ন করিতেন না। বোধ হয় রাজজীবন রক্ষার জন্য ও রাজ শত্রুদিগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার অভিলাষেই চিহ্নিত পথ-প্রবেষ্টার ঐরূপ দণ্ড বিহিত হইয়া থাকিবে।

রাজসৈন্য।

রাজসৈন্যের সংখ্যা অসংখ্য ছিল বলিলেও চলে। ইহারা সকলেই বেতন ভোগী স্থায়ী সৈন্য ছিল। চন্দ্রগুপ্তের একটিও 'মিলিসিয়া' সৈন্য

(৬) নারীরক্ষীরা সকলেই ক্রীত দাসী ছিল। তাহারা বিদেশ হইতে ক্রীত হইয়া এদেশে আনীত হইত। রাজার দেহরক্ষার ভার তাহাদের উপর পড়িয়াছিল। কেবল শিকার যাত্রার সময় নয়, অন্তঃপুরে অবস্থান কালেও তাহারা রাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিত।

(৭) ছিল না তাঁহার সৈন্যেরা সাধারণতঃ অধিক বেতন ভোগ করিত। যুদ্ধের অশ্ব ও অস্ত্র শস্ত্রাদি, পোষাক ও আহার্য্য প্রভৃতি যখনই কিছু তাহাদের প্রয়োজন হইত রাজসরকার তখনই তাহা সরবরাহ করিতেন। নন্দরাজ মহাপদ্মের অশীতি সহস্র অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, আট সহস্র রথ ও ছয় সহস্র রণহস্তী ছিল। চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যেশ্বর হইয়া ইহাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করেন। তাঁহার অধীনে ত্রিশ সহস্র অশ্ব, ছয় লক্ষ পদাতিক, নয় সহস্র হস্তী ও এতদ্ব্যতীত রথও ছিল। এই সমস্ত সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত।

প্রত্যেক অশ্বারোহীর হস্তে দুইটি করিয়া বর্শা থাকিত। বিস্তৃত-ফলক অসি পদাতিক দিগের প্রধান অস্ত্র ছিল; এতদ্ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে হয় একটা বর্শা নয় তীর ও ধনুক থাকিত। ধনুর এক শীর্ষ ভূমিতে স্থাপন করিয়া বাম পদ দ্বারা চাপ দিয়া তাহারা তীর নিক্ষেপ করিত। সেই তীর এরূপ তীব্র গতিতে যাইতে যে, ঢাল কিম্বা বক্ষকবচ তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিত না, সে সমস্ত ভেদ করিয়া তাহা শত্রুকে আহত করিত।

কোন কোন রথ দ্বিঅশ্ব, কোন কোনটা চতুরশ্ব কর্ত্তৃক বাহিত হইত। সারথি ব্যতীত আরও দুইজন যোদ্ধা সেইরথে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। হাস্তিপৃষ্ঠে মাহুত ব্যতীত আরও তিনজন তিরন্দাজ সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করিত। চন্দ্রগুপ্তের রথ সংখ্যা কত ছিল, জানা যায় না। তবে তাহা মহাপদ্মের রথসংখ্যা অপেক্ষা অধিক না হইলেও অন্ততঃ যে সমান ছিল, তাহা ধরিয়া লইতে বোধ করি কোন দোষ নাই। সংখ্যা যদি সমানই

(৭) যে সকল সৈন্য চিরকাল রাজার বেতন গ্রহণ করিত না, অথচ দেশে কোন বিপৎপাত হইলেই রাজার আজ্ঞাধীন হইয়া দেশ রক্ষায় তৎপর হইত, তাহাদিগকেই মিলিসিয়া সৈন্য বলে। এরূপ ভাবে দেশরক্ষা করিতে অগ্রসর হইবার জন্য যে তাহারা বিশেষ বাধ্য, এমন নহে। আপৎকালে রাজার সাহায্য করা না করা তাহাদের ইচ্ছাধীন।

ধরিয়া লওয়া যায়, তবে দেখা যায় যে, তাঁহার আট সহস্র রথ বা চতুর্ব্বিংশ সহস্র তিরন্দাজ ছিল। তাঁহার নয় সহস্র হস্তী অর্থে ছত্রিশ সহস্র গজারোহী সৈন্য ছিল। সুতরাং তাঁহার অধীনে ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী, ছত্রিশ সহস্র গজারোহী ও চতুর্ব্বিংশতি সহস্র রথী অর্থাৎ সর্ব্ব সাকল্যে ছয় লক্ষ নবতি সহস্র সৈন্য তাঁহার রাজ্যরক্ষার জন্য সর্ব্বদাই তৎপর থাকিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অপরাপর সহচরও যে কত ছিল, তাহার সংখ্যা নাই।

এই বিপুল সৈন্যদিগের পরিচালনার জন্য চন্দ্রগুপ্তের রীতিমত একটি 'ওয়ার অফিস্' বা 'রণ বিভাগ' ছিল। ত্রিশ জন বিশেষজ্ঞ সচিব এই বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহারা ইহার ছয়টি উপবিভাগ করেন। প্রতি উপবিভাগে পাঁচজন করিয়া সচিব কর্ত্তৃত্ব করিতেন। বিভিন্ন উপবিভাগের উপর বিভিন্ন কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল।

প্রথম উপবিভাগ—রণপোতাধ্যক্ষের সহযোগে রণপোত সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। (৮)

দ্বিতীয় উপবিভাগ—সৈন্যদিগের অস্ত্রশস্ত্রাদি ও আহার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিতেন।

তৃতীয় উপবিভাগ ——পদাতিক সৈন্যের

চতুর্থ উপবিভাগ—— —অশ্বারোহী সৈন্যের

পঞ্চম উপবিভাগ———রথিবর্গের এবং

ষষ্ঠ উপবিভাগ ———গজারোহীদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন।

অন্তঃশাসন।

মিউনিসিপালিটি ভারতবর্ষে নূতন আমদানী নহে। বহু প্রাচীন কালেও তাহা আধুনিক মিউনিসিপালিটি সমূহ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল।

(৮) চন্দ্রগুপ্তের যে বহুসংখ্যক রণপোতও ছিল তাহা এই উপবিভাগের সৃষ্টি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

এখন মিউনিসিপালিটি যে সব কার্য্য করেন, সে সব কার্য্য ত' তাহার ছিলই, অধিকন্তু আরও কত নূতন বিষয় ইহার কার্য্যান্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতের পল্লীসমূহে আজও পঞ্চায়েৎ প্রথার যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা সেই প্রাচীন মিউনিসিপালিটিরই লুপ্তবিশেষ মাত্র।

চন্দ্রগুপ্তের শাসনাধীনে পাটলীপুত্রের অন্তঃশাসন কিরূপ ছিল, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া গিয়াছে। রণবিভাগ যেমন ত্রিশ জন সচিব দ্বারা পরিচালিত হইত, নগরের অন্তঃশাসনের ভারও তদ্রূপ ত্রিশ জন সচিবের উপর ন্যস্ত ছিল। কার্য্যের সৌকর্য্যের জন্য তাঁহারাও এই অন্তঃশাসন বিভাগের ছয়টি উপবিভাগ করিয়াছিলেন। প্রতি উপবিভাগের উপর পাঁচ জন করিয়া সচিব কর্তৃত্ব করিতেন।

প্রথম উপবিভাগ—শিল্পাদি সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিতেন। যাহাতে শিল্পজাত পণ্যে কোনরূপ 'ভেজাল' না দেওয়া হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাও এই উপবিভাগের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। শিল্পীদের রক্ষার ভারও ইহার কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যক্তি শিল্পীর হস্ত কিম্বা চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত।

দ্বিতীয় উপবিভাগ—ভিন্ন দেশাগত প্রবাসী ও পরিব্রাজকদিগের তত্ত্বাবধান করা এবং বর্ত্তমান কালে য়ুরোপে বিভিন্ন দেশের কন্সালেরা যে যে কার্য্য করেন, সেই সব কার্য্যও ইহার কর্ত্তব্যান্তর্ভুক্ত ছিল। যাহাতে বিদেশীরা উপযুক্ত বাসস্থান পাইতে পারে, সর্ব্বদা বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, এবং প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের সাহায্য পাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা এই উপবিভাগের কর্ত্তব্য ছিল। বিদেশীদের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লক্ষ্য করা হইত। মৃত বিদেশীদের ভদ্রতার সহিত সমাধিস্থ করা হইত। মৃত ব্যক্তির কোন ধন-সম্পত্তি থাকিলে উপবিভাগ তাহা তাহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিতেন। (১)

(১) উপবিভাগের সৃষ্টি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে,বাণিজ্য ব্যপদেশে বহু বিদেশী তখন পাটলীপুত্রে আগমন ও বাস করিতেন।

তৃতীয় উপবিভাগ—প্রজাবর্গের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা এই উপবিভাগের কার্য্য ছিল। প্রজাবর্গের সংখ্যাদি জানিবার জন্য ও কর সংগ্রহের ও স্থাপনের সুবিধার জন্য রাজসরকার এই কার্য্যে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। (১০)

চতুর্থ উপবিভাগ—প্রধান প্রধান বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করা এই উপবিভাগের কার্য্য ছিল। এই উপবিভাগই 'বাটখারা' প্রভৃতির ওজন ঠিক্ করিয়া দিতেন ও বণিক্‌দের নিকট হইতে 'লাইসেন্স টাক্স' আদায় করিতেন। যে বণিক একাধিক দ্রব্যের ব্যবসায় করিত, তাহাকে দ্বিগুণ কর দিতে হইত।

পঞ্চম উপবিভাগ—দেশের কারখানায় যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইত, সেই সকল দ্রব্যের তত্ত্বাবধান করা এবং পুরাতন পণ্যাদি হইতে নূতন পণ্যাদি যাহাতে পৃথক্ করিয়া রাখা হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা এই উপবিভাগেরই কর্ত্তব্য ছিল। কেহ কর্ম্মচারীদের ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিলে বা আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিলে, উপবিভাগ কর্ত্তৃক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত।

ষষ্ঠ উপবিভাগ—দ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়া গেলে, তাহার মূল্যের অতি সামান্য অংশ শুল্কস্বরূপ গ্রহণ করা এই উপবিভাগের কার্য্য ছিল। কোন বিক্রেতা এই শুল্ক প্রদানে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিলে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত। (১১)

(১০) এই প্রথা ভারতবর্ষের নিজস্ব। য়ুরোপীয়েরা ভারতের যাহা কিছু ভাল, তাহাকেই অনুকরণ জাত বলিয়া ভারতের গৌরব হ্রাসের চেষ্টা পাইয়া থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁহারা মূক। কারণ এইপ্রথা সম্প্রতি য়ুরোপে প্রচলিত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেখানে এই প্রথা বিদ্যমান ছিল না।

(১১) এইরূপ কর ভারতবর্ষে পূর্ব্বাপর বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু চন্দ্র গুপ্ত ইহার সংগ্রহ বিষয়ে যেরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে কখনও বিদ্যমান ছিল না। C. F. V. A. Smith's Early History of India.

এই সকল কার্য্য সম্পাদন ব্যতীতও এই অন্তঃশাসন বিভাগের আরও কতকগুলি কার্য্য ছিল। সহরের যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা, বাজার, মন্দির, বন্দর প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানগুলির সংস্কার করা ও তাহাদের রক্ষার বন্দোবস্ত করা এই বিভাগেরই কর্ত্তব্য ছিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ইয়ুরোপ, চীন, সিংহলবাসী এবং মুসলমানদিগের লিখিত প্রাচীন পুস্তক সমূহ

(অ) ইয়ুরোপীয়দিগের প্রাচীন পুস্তক সমূহ।—

প্রসিদ্ধ গ্রীক্ সম্রাট্ সিকন্দর (আলেক্জাণ্ডার দি গ্রেট) খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। উহার কিছু মাত্র বৃত্তান্ত আমাদিগের দেশে লিখিত নাই, কিন্তু উহার সবিস্তার বিবরণ ইউরোপীয় লেখকদিগের পুস্তকে বিদ্যমান আছে। এবং আমাদিগের ইতিহাসের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট আরও অনেক কথা উহাদিগের পুস্তক হইতে অবগত হওয়া যায়। উক্ত পণ্ডিতদিগের পুস্তক গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই প্রধান।

(১) হিরোডোটস্— প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক হিরোডোটস্ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এক বৃহৎ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে পারস্য সম্রাট প্রথম দারা খৃঃ পূঃ ৫০০ শত অব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পঞ্জাবের পশ্চিম অংশ স্বায়ত্তীকৃত করেন; উহার বৃত্তান্ত ইহাতে প্রাপ্ত

হওয়া যায়; এবং আমাদিগের ইতিহাসের সহিত সংসৃষ্ট অন্য কয়েকটী ঘটনার উল্লেখও এই পুস্তক হইতে উপলব্ধ হয়। উক্ত রচনা হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়, সে সময় এই দেশ অত্যন্ত ধনাঢ্য ছিল এবং দারার সাম্রাজ্যের বিংশতি প্রদেশের মধ্য হইতে কেবল পশ্চিম পাঞ্জাবেরই রাজস্ব সুবর্ণ দ্বারা প্রেরিত হইত (অবশিষ্ট অংশ রজত দ্বারা)। হিরোডোটসের পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) কেসিয়াস্ (Ktesias)—ইনি পারস্য সম্রাট আতর্জর্ক্সীসের (Artaxerxes emon) চিকিৎসক ছিলেন। ইনি খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দের নিকটে ভারতবর্ষ বিষয়ক ইণ্ডিকা নামক পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন, উহা এখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না কিন্তু খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কোটিয়স্ নামক পণ্ডিত উহার যে সংক্ষিপ্ত সার রচনা করেন উহা এবং অন্যান্য প্রাচীন লেখকগণ উক্ত ইণ্ডিকার যে যে অংশ স্ব স্ব পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার ইংরাজী অনুবাদ ম্যাক্‌ক্রীণ্ডল্ মহোদয় ইণ্ডিয়ান আণ্টিকোয়ারীর দশমভাগে (২৯৬—৩১৪ পৃঃ) মুদ্রিত করিয়াছেন। উক্ত লেখক প্রায় শ্রুত বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্য উক্ত পুস্তক বিশেষ উপযোগী নহে।

(৩) মেগাস্থিনিস্—সারিয়ার গ্রীক্ সম্রাট সেলিউকস্ কর্ত্তৃক মৌর্য্য বংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস্ নামক যে পণ্ডিতকে রাজদূতরূপে নিযুক্ত করেন, তিনি পাটলীপুত্রে (পাটনা) অবস্থিতি করিয়া ভারতবর্ষ বিষয়ে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগের নিকটবর্ত্তী সময়ে ইণ্ডিকা নামক পুস্তক রচনা করেন। ইহা দেশের ঐ সময়কার অবস্থা জানিবার পক্ষে অপূর্ব্ব পুস্তক। কিন্তু এসময় উহার সামান্য অংশ মাত্র (অন্য লেখকগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়া) উপলব্ধ হয়। উহাও আমাদিগের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের জন্য বিশেষ উপযোগী। উহার হিন্দি অনুবাদ "ইতিহাস" মুদ্রিত হইয়াছে।

(৪-৮) এরিয়ান, (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ) কর্টিয়াস্, রুফস্, প্লুটার্ক (খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী) ডায়োডোরস্ (খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী) এবং ক্রনৃটিনাস্—সম্রাট সিকেন্দরের বিবরণ ভিন্ন ভিন্নরূপে উনিশজন পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত হয়। তাহাদিগের পুস্তকগুলি আধার রূপে গ্রহণ করিয়া উক্ত পঞ্চ ঐতিহাসিক তাঁহার ভারতবর্ষের আক্রমণের একটি বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং আমাদের ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই পঞ্চ পণ্ডিতের পুস্তক সমূহে এরিয়ানের পুস্তক সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়. এরিয়ান্ ইণ্ডিকা নামক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকও লিপিবদ্ধ করেন। উহাও বিশেষ উপযোগী। ম্যাক্‌ক্রীণ্ডল মহোদয় উক্ত পঞ্চ পণ্ডিত লিখিত সিকন্দর কর্তৃক ভারত অভিযান বৃত্তান্তের ইংরাজী অনুবাদ "দি ইন্‌ভেশন অব ইণ্ডিয়া, বাই আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট" (The Invasion of India by (Alexander the Great) নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৯) পেরিপ্লস্ অব দি ইরিথ্রিয়ন্‌সি—একজন গ্রীক্ বণিক (ইহার নামের কোনই অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে এই পুস্তক লিপিবদ্ধ করান। ইহা হইতে ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিষয়ক বৃত্তান্ত কিছু কিছু অবগত হওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা ভারতবর্ষের সমস্ত সমুদ্রতট পরিভ্রমণ করেন, এইরূপ অবগত হওয়া যায়। ইহার ইংরাজী অনুবাদ ম্যাক্‌ক্রীণ্ডল মহোদয় ইণ্ডিয়ান্ অ্যাণ্টিকোয়ারির অষ্টম ভাগে (১০৭-১৫১ পৃঃ) মুদ্রিত করিয়াছেন। (১)

(১০) টলেমি—খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে মিশর দেশের

(১) এই সময়ে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলের সমগ্র সমুদ্র ইরিথ্রিয়নসি (Erythreasea) নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

আলেকজান্দ্রিয়া নগর নিবাসী গ্রীক্ পণ্ডিত টলেমি ভূগোল বিষয়ক এক প্রকাণ্ড পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে ভারতবর্ষের কয়েকটি নদী নগর প্রভৃতির নাম এবং উহার অক্ষাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ক্ষত্রপ-বংশের রাজা চষ্টন (অন্ধ্রভৃত্য) সাতবাহন বংশীয় পুলুমাই প্রভৃতি তদানীন্তন রাজন্য বর্গের নামেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি অলেকজাণ্ড্রিয়াতেই অবস্থিতি করিয়া যাত্রী এবং নাবিকদিগের শ্রুত বৃত্তান্ত এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তক সমূহের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতবর্ষের ভূগোল লিখিয়াছেন, ইহাতে তন্নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অনেক পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার রচনারূপ মানচিত্র প্রস্তুত হইলে মহানদী শ্যামে, হিমালয় তিব্বতের উত্তরে এবং গঙ্গা চীনে স্থাপন করিতে হয়। ইহা সত্ত্বেও উক্ত পুস্তক হইতে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের কতক সহায়তা লাভ হয়। উক্ত পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল মহোদয় ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়রীর ১৩ শ ভাগে (৩১৩—৪১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন।

(১১) মার্কোপোলো—ভিনিস্ নগরের প্রসিদ্ধ যাত্রী মার্কোপোলো ১২৯৪ খৃঃ অব্দের সমীপে দক্ষিণে আগমন করেন। তাঁহার যাত্রা পুস্তকে (২য় খৃঃ) তথাকার যে বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও উপ-যোগী। কারণ তিনি স্বয়ং দেখিয়া উক্ত দেশের অবস্থা বর্ণন করিয়া-ছেন। তাঁহার যাত্রা পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ কর্ণেল হেন্‌রী ইয়ুল কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

(১২) নিকোলো ডিকাউন্টি—ইটালি দেশবাসী নিকোলো প্রায় ১৪২০ খৃঃ অঃ বিজয় নগরে অবস্থিতি করেন। তিনি উক্ত নগর এবং তথাকার রাজা (দ্বিতীয়) দেবরাজের যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া-ছেন, তাহা বিজয়নগরের যাদবদিগের ইতিহাসের পক্ষে উপযোগী। উহার ইংরাজী অনুবাদ রবার্ট সিউয়েল মহোদয়ের এ ফরগটন এম্পায়ার (A Forgotten Empire) নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৩) ফরণাও নুনিজ—এই পর্ত্তুগীজ ইতিহাস লেখক খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে বিজয় নগরের যাদব রাজ্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। ইহা হইতে তথাকার প্রথম রাজবংশের ইতিহাসের অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। উহার ইংরাজী অনুবাদ উপরিলিখিত এ ফরগটন্ এম্পায়ার (A Forgotten Empire) নামক পুস্তকের শেষভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৪) ভিন্ন ভিন্ন লেখক—সময়ে সময়ে অনেক ইউরোপীয় লেখক স্ব স্ব পুস্তকে এতদ্দেশ সম্বন্ধীয় যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া ম্যাক্‌ক্রীণ্ড্‌ল মহোদয় এন্ সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া য্যাজ্ ডিস্‌ক্রাইব্ড বাই আদার ক্লাসিক্যাল্ রাইটার্স (Ancient India as described by other classical writers) নামক ইংরাজী পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, এখানি বিশেষরূপে উপযোগী।

উপরিলিখিত ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের পুস্তকের এক প্রধান অসুবিধা এই, যে তাঁহাদিগের লিখিত স্থান এবং ব্যক্তিবর্গের নাম সমূহের অনেক গুলির যথাযথ নির্ণয় বড়ই কঠিন।

(আ) চীন বাসীদিগের পুস্তক সমূহ—চীনে প্রাচীনকাল হইতে ইতিহাস লিখিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় তথায় ইতিহাস-সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইতে এবং তীর্থ-যাত্রার্থ ভারতবর্ষে আগত চৈনিক যাত্রীর ভ্রমণ পুস্তক হইতে এবং তথাকার (বৌদ্ধ) ধর্ম্ম পুস্তক হইতে আমাদিগের দেশের ইতিহাস-সম্বন্ধীয় অনেক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১) ঐতিহাসিক পুস্তক সমূহ—চীনের ঐতিহাসিক পুস্তক সমূহ হইতে মধ্য এসিয়া খণ্ডের শাসক শক, কুষণ (তুর্ক), হূন্ প্রভৃতি ভারতবর্ষে স্ব স্ব অধিকার সংস্থাপক জাতির বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কয়েকটী ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। চীনের ইতিহাস

লেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সুমাচিন। ইনি খৃঃ পূঃ ১০০ অব্দের সমীপে স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এম্ চেভান্নিস্ (M chavannes) নামক ফরাসী পণ্ডিত ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। উক্ত পণ্ডিত মেময়র (Memoir) নামক ফরাসী পুস্তকে চীনের অন্যান্য ঐতিহাসিক পুস্তকের সার সঙ্কলন করিয়াছেন। এসিয়াটিক্ জর্নল্ (Asiatic Journal) নামক ফরাসী পত্রিকাও চীনের ঐতিহাসিক পুস্তকের আধারে ভারত-বর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সংসৃষ্ট বিষয়ে কয়েকটী রচনা মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অল্পসংখ্যকই ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে।

(২) ফাহিয়ান্—প্রসিদ্ধ চৈনিক যাত্রী ফাহিয়ান ৩৯৯ খৃঃ অব্দে তীর্থ-যাত্রা মানসে চীন হইতে বহির্গত হন এবং গঙ্গার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ও সিংহলে অবস্থান করিয়া ৪১৪ খৃঃ অব্দে চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ সময়ে গুপ্ত-বংশীয় (দ্বিতীয়) চন্দ্রগুপ্ত (নর্ম্মদা নদীর উত্তরের সমগ্র দেশ) উত্তর ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন। ইঁহার প্রধান উপাধি বিক্রমাদিত্য ছিল। ফাহিয়ান্ তাঁহার রাজ্যে প্রায় ছয় বৎসর অবস্থান করেন। তিনি স্বীয় যাত্রা সম্বন্ধীয় 'ফোকোকী' নামক পুস্তকে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান রাজধানী পাটলীপুত্র (পাটনা) তথাকার ঔষধালয় প্রভৃতি এবং তাঁহার বিস্তৃত রাজ্যের অধীন অনেক স্থানের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উহা হইতে উক্ত রাজ্যের বাস্তবিক অবস্থার স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। উক্ত পুস্তকের দুইটী ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধ্যাপক জেম্স ল'গের (James Lugge) অনুবাদই বিশেষ উপযোগী।

(৩) সংযূন্ ও হ্বীসাং—এই দুই যাত্রী প্রায় ৫১৮ খৃঃ অব্দে এদেশে আগমন করেন। ইহাঁদিগের যাত্রা পুস্তক হইতে কয়েকটী উপযোগী বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। উহার ইংরাজী অনুবাদ স্যামুয়েল বীল্ (Samuel Beal) মহোদয় হুয়েন্ সাংয়ের যাত্রা পুস্তকের উপক্রমণিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

(৪) হুয়েন্ সাং—প্রসিদ্ধ চৈনিক যাত্রী হুয়েন্ সাং ৬২৯ ও ৬৪৫ খৃঃ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন এবং তিনি যে যে স্থানে গমন করেন, তথাকার বৃত্তান্ত স্বীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত পুস্তক 'সীয়ুকী' নামে প্রসিদ্ধ। সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষে দুইজন প্রবল রাজা ছিলেন। নর্ম্মদার উত্তরস্থিত কনৌজের বৈশ্যবংশীয় রাজা হর্ষ (হর্ষবর্দ্ধন) এবং দক্ষিণের সোলংকী (দ্বিতীয়) পুলকেশী। তন্মধ্যে হর্ষের সহিত তিনি কয়েকমাস অবস্থিতি করেন। উক্ত পুস্তক হইতে এদেশের সে সময়কার অবস্থা, অধিবাসিবর্গের রীতি নীতি, ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি অনেক উপযোগী বিষয় ব্যতীত অশোক, কণিষ্ক, মিহিরকুল, হর্ষ (হর্ষবর্দ্ধন), পুলকেশী প্রভৃতি কয়েকজন রাজার, অনেক পণ্ডিতের ও তাঁহাদিগের পুস্তকের এবং অনেক রাজ্যের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল সম্বন্ধে ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর পুস্তক নাই।

উক্ত অমূল্য পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ স্যামুয়েল বীল্ মহোদয়ের বুদ্ধি রেকর্ড অব দি ওয়েস্টার্ণ ওয়র্লড (Buddhist Record of the western world) নামক (দুই খণ্ডের) পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে এবং ওয়াটার্স নামক পণ্ডিত উক্ত বিষয়ে আরও যে দুই খণ্ড প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাও অতি উৎকৃষ্ট। (Waters on quan chuang's Travels).

(৫) হুয়েন্ সাংয়ের জীবন চরিত্র—হুয়ুইলি এবং য়েন্তসাং নামক শ্রমণদ্বয় (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) একত্রে পূর্ব্বোক্ত হুয়েন্ সাংয়ের জীবন চরিত্র রচনা করেন। উহাদিগের মধ্যে হুয়ুহলি হুয়েন সাংয়ের শিষ্য ছিলেন। এই পুস্তকও আমাদিগের ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহার ইংরাজী অনুবাদ উপরি লিখিত স্যামুয়েল বীল্ মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

(৬) ইৎসিং—এই চৈনিক যাত্রী ৬৭১—৬৯৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত

ভারতবর্ষের নানা অংশে এবং মলয় উপদ্বীপে অবস্থিতি করেন। ইহার "নন-হৈ-চি-কুই-নে-ফাচুয়ন" নামক পুস্তক অস্মদ্দেশীয় বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মাচরণ বিষয়ক জ্ঞান সম্পাদন পক্ষে অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এবং উহা হইতে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার অনুসন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তকের ৩৪ শ প্রকরণে এতদ্দেশের পঠন পাঠন রীতির বর্ণনা দেখিবার যোগ্য। এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ জাপানী পণ্ডিত টাকাকুসু প্রকাশ করিয়াছেন।

উপরি লিখিত যাত্রিগণ ব্যতীত অন্যান্য অনেক চৈনিক যাত্রী এদেশে আগমন করেন। উহাদিগের নামাদির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু তাহাদিগের যাত্রা সম্বন্ধীয় পুস্তকের অস্তিত্ব বিষয়ক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না।

চীনবাসী-দিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক হইতে আমাদিগের দেশের (এতদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য) অনেক প্রাচীন পুস্তকের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং অনেক গ্রন্থকার ও ধর্ম্মাচার্য্যদিগের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় এবং যে সমস্ত পণ্ডিত চীনে প্রত্যাবর্তন করিয়া সংস্কৃত ভাষার পুস্তক সমূহের চৈনিক ভাষায় অনুবাদ অথবা তৎকার্য্যে সহায়তা প্রদান করেন তাহাদিগের নাম ও সময় বিদিত হওয়া যায়। এতদ্বিষয়ে বুনিয়ান ন্যাঞ্জিওর (Bunyin Nanjio) ক্যাটালগ্ অব্ দি বুদ্ধিষ্ট ত্রিপিটক (Catalogue of the Buddhist Tripitak) পুস্তক বিশেষ উপযোগী।

(ই) তিব্বতীয়দিগের পুস্তক—তিব্বতের পুস্তক সমূহের বিশেষরূপ অনুসন্ধান অদ্যাপি হইয়া উঠে নাই। তথাপি যে গুলির অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে আমাদিগের দেশের অধুনা দুর্লভ এরূপ অনেক প্রাচীন পুস্তক সমূহের এবং গ্রন্থকর্ত্তাগণের নাম অবগত হওয়া যায়। কুন্দজন (তারানাথ) নামক তিব্বতীয় শ্রমণ 'ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম্ম' নামক পুস্তক ১৬০৮ খৃঃ অব্দে লিপিবদ্ধ করেন। উহাতে আমাদিগের

দেশের ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞাতব্য ঘটনা সমূহের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিফ্‌নর্ (Schiefner) নামক জর্ম্মণ পণ্ডিত উক্ত পুস্তকের জর্ম্মণ অনুবাদ করিয়াছেন।

(ঈ) সিংহল বাসীদিগের পুস্তক সমূহ—সিংহলের সহিত ভারত-বর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বশতঃ তথাকার ঐতিহাসিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক হইতে আমাদিগের দেশের ইতিহাসের কিছু কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ পুস্তক সমূহের মধ্যে প্রধান গুলি নিম্নে লিখিত হইল।

(১) দ্বীপবংশ—সিংহলের ইতিহাস বিষয়ক এই পুস্তকখানি প্রায় ৩০০ খৃঃ অব্দে পালী ভাষায় রচিত হয়। ইহাতে ভারতবর্ষের মৌর্য্য-বংশীয় রাজাদিগের এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। ইহার ইংরাজী অনুবাদ ওল্‌ডেন্‌বার্গ (Oldenberg) প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) মহাবংশ—পালী ভাষায় লিখিত এই পুস্তকখানিতে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্তের সিংহলের ইতিহাস উপনিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকখানিও রাজ তরঙ্গিণীর ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ সময়ে লিখিত। ইহার প্রথম খণ্ড ৪৫৬ এবং ৪৭৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে মহানামন্ নামক পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের জন্য এই পুস্তকখানি উপরিলিখিত দ্বীপবংশ অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী, কারণ ইহাতে শিশুনাগ এবং মৌর্য্যবংশীয় রাজাদিগের সময়কার ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েরও কিছু কিছু বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। জর্জ্জ টর্ণর (George Turnour) ইহার প্রথম খণ্ডের এবং বিজয় সিংহমুডেলিয়র অবশিষ্টাংশের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন।

(৩) মিলিন্দ পঞ্হো (মিলিন্দ প্রশ্ন)—পালী ভাষায় এই পুস্তকে প্রতাপশালী গ্রীক সম্রাট মিলিন্দ (মিনাণ্ডার = Menander) এবং বৌদ্ধ স্থবির নাগসেনের প্রশ্নোত্তর গ্রথিত আছে। ইহা হইতে মিলিন্দের জন্মস্থান, রাজধানী, প্রতাপ, পাণ্ডিত্য এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ প্রভৃতি

অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। এই পুস্তক হইতে ভারতবর্ষের গ্রীক্ শাসন কর্ত্তাদিগের ইতিহাস সংকলনের কিছু কিছু সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেক্রেড্ বুক্‌স অব্ দি ইষ্ট (Sacred Books of the East) নামক গ্রন্থমালার ৩৫ শ খণ্ডে ইহার ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

বল্লাল-কাহিনী।

(অতি লোভের প্রতিফল।)

রজনী দ্বিতীয় প্রহর। গৌড়রাজধানী সুষুপ্তির শীতল অঙ্কে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। কর্ম্মকোলাহল নীরব হইয়াছে। প্রায় সকলেই দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, বিশ্রাম সুখ লাভ করিতেছে। এমন সময় রাজপথ অতিবাহিত করিয়া, একটি ক্ষুৎপিপাসাতুর পথশ্রান্ত পথিক, ধীরে ধীরে একটি গৃহস্থের রুদ্ধ দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে করাঘাত করিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন,—"বাটীতে কে আছ গো? দ্বারে একটী ক্ষুধাতুর অতিথি ব্রাহ্মণ।" গৃহে পুরুষ কেহই ছিলেন না; যিনি গৃহস্বামী তিনি কোনও কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীই এক্ষণে গৃহের কর্ত্রী। তিনি সামান্য গৃহস্থের স্ত্রী; সারাদিন গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়া, এক্ষণে আহারান্তে গভীর নিদ্রায় মগ্না ছিলেন। দ্বারে করাঘাত শব্দেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং "দ্বারে একটী ক্ষুধাতুর অতিথি ব্রাহ্মণ।" এই কথা শ্রবণমাত্রই তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলেন; অগ্নি এবং শলাকাযোগে দীপ প্রজ্বলিত করিলেন

এবং অঙ্গের বস্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন।

পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—এ কিরূপ হইল? এত রাত্রিতে একটী অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিকে, একটী রক্ষকবিহীনা রমণী কিরূপে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন? কিন্তু ইহা তাঁহাদের জানা উচিত যে, এই সুসভ্য ইংরাজী-যুগের ন্যায় তৎকালে * এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে পাপের প্রসার এতদূর বর্দ্ধিত হয় নাই; সুতরাং আজি কালিকার ন্যায়, তখন ব্যক্তিমাত্রই এত অবিশ্বাসের পাত্রও ছিলেন না। বিশেষতঃ বর্ণগুরু ভূদেবতা ব্রাহ্মণগণ তখনও আপন আসন দৃঢ় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া, ব্রাহ্মণমাত্রেই সকলের পরমারাধ্য, পরমপূজ্য ও প্রত্যক্ষ-দেবতাস্বরূপ ছিলেন। কি সাম্রাজ্যাধিপতি নরপতির রাজ অন্তঃপুরে, কি গৃহস্থের পরিজন-পরিবৃত প্রাঙ্গণতলে, কি ভিক্ষাজীবী দরিদ্রের পর্ণকুটীরে,—সর্ব্বস্থলেই তাঁহাদের দ্বার অবারিত ছিল। অধিকন্তু অতিথিসেবা তৎকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত; যে কোনও ব্যক্তিই হউন, অভ্যাগতজন সর্ব্বত্র অভীষ্টদেব গুরুর ন্যায় সেবা ও সম্মানের প্রাপ্ত হইতেন। "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ"—ইহা তখন বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই। প্রিয়তম জীবন পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া, সকলে অতিথি সৎকার করিত। অতিথি বিমুখ হইলে, তাঁহাদের সর্ব্ব ধর্ম্ম পণ্ড হইবে,—ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থগণের ইহাই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল।

ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী ভক্তিভরে গললগ্নবাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, এবং পদরজ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে উপবেশন জন্য একখানি আসন প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ উপবেশন করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, —"মা, ইহা কি ব্রাহ্মণের বাটী?" রমণী নতবদনে

* খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর ঘটনা লইয়া এই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ লিখিত।

উত্তর করিল—"হাঁ বাবা, ইহা ব্রাহ্মণের বাটী; আমি আপনার কন্যা।"

অনন্তর রমণী তাঁহাকে পাদোদক এবং পানীয়োদক প্রদান করিয়া, হস্তপদ ধৌত করিবার জন্য অনুরোধ করতঃ, দ্রুতপদে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গৃহে আজ কিছুই নাই; একমুষ্টি তণ্ডুলেরও অভাব; অর্থাদিও তাঁহার নিকট কিছুই নাই। তাঁহার স্বামী, যাইবার সময়, তাঁহাকে কেবল মাত্র একটি দিবসের খরচ দিয়া গিয়াছিলেন, কারণ, তিনি পরদিবসেই প্রত্যাগমন করিবেন। কিন্তু, বুদ্ধিমতী রমণী তজ্জন্য চিন্তিত বা বিচলিত হইলেন না; তিনি অতীব ক্ষিপ্রকারিতার সহিত, একটি পেট্‌রা উন্মোচন করিয়া, একটি সুবর্ণনির্ম্মিত অপূর্ব্ব ধেনু বাহির করিলেন; এবং, তাহা বস্ত্রমধ্যে লুকাইত রাখিয়া, হস্তে একটি পাত্র গ্রহণ করিয়া গৃহের বাহির হইলেন। তাঁহার গৃহের পার্শ্বেই মণিদত্তনামক এক সুবর্ণবণিক প্রতিবাসী ছিল। ব্রাহ্মণপত্নী তাহার গৃহদ্বারে গমন করিয়া, তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন এবং সেই স্বর্ণ-ধেনুটি বন্ধক রাখিয়া পঞ্চবুটিকা (১ পয়সা) মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলেন; কারণ, রাত্রে দোকানদারগণ ধারে জিনিষ প্রদান করিতে সর্ব্বত্রই অসম্মত।

তড়িদ্‌গমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, ব্রাহ্মণগৃহিণী অতীব তৎপরতার সহিত যথাসাধ্য খাদ্যাদি প্রস্তুত করতঃ, ব্রাহ্মণকে সম্পূর্ণ পরিতোষের সহিত উদর পরিপূর্ণ করিয়া আহার করাইলেন। ব্রাহ্মণ পরিতৃপ্ত হইয়া, সেই স্থলেই রাত্রি যাপন করিয়া, প্রত্যূষে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(২)

পরদিবস গৃহস্বামী গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ইঁহার নাম কুন্দন আচার্য্য। ইনি গৃহিণীর মুখে গত রজনীর সমস্ত ঘটনা অবগত হইলেন। ব্রাহ্মণ, পত্নীর বুদ্ধিমত্তার জন্য তাহার অনেক প্রশংসা

করিলেন এবং গৃহাগত অতিথি যে বিমুখ হন নাই, তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে তিনি, তাঁহার পত্নীর আনীত দ্রব্যের যথানির্দ্দিষ্ট মূল্য গ্রহণ করিয়া, মণিদত্তের বিপণীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি মণিদত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন——"ভাই, কল্য তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। এক্ষণে, এই তোমার দ্রব্য মূল্য গ্রহণ করিয়া, আমার স্বর্ণধেনুটি প্রত্যর্পণ কর।" এই স্বর্ণধেনুটি ওজনে ১০৮ তোলা ছিল; ইহার মূল্য ১৬০০৲ টাকা *। গৌড়াধিপতি সম্রাট বল্লাল সেন, যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া, সার্ব্বভৌম সম্রাট উপাধি ধারণ করেন, তখন তিনি এতদুপলক্ষে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে এক একটি এই স্বর্ণধেনু দান করিয়াছিলেন। বণিক দেখিল, এই ধেনুর মূল্য তাহার প্রদত্ত দ্রব্য অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক। সুতরাং, তাহার পক্ষে এরূপ একটি বহু মূল্য দ্রব্যের লোভ সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। লোভের মত মানবের মহাশত্রু আর দ্বিতীয় নাই। সে এই লোভের কুহকেই মুগ্ধ হইয়া, সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, ব্রাহ্মণের নিকট গত রজনীর তাবৎ ঘটনাই অস্বীকার করিল। ব্রাহ্মণ হতাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া, বন্ধুবান্ধবগণের সহিত পরামর্শ করতঃ রাজদ্বারে মণিদত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলেন।

সম্রাট বল্লাল সেন পাত্র মিত্র অমাত্যাদি সহ রাজদরবারে উপবিষ্ট হইয়া, মণিদত্তকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। অল্প কালমধ্যেই অভিযুক্ত মন্দভাগ্য মণিদত্ত রাজসভায় নীত হইল। সম্রাট তাহার ত্রাসসঙ্কুচিত মূর্ত্তি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

* এখনকার হিসাবে আরও অনেক অধিক। তখন এক তোলা স্বর্ণের মূল্য ১৬৲ টাকা ছিল; এখন ২৫৲ টাকা।

"মণিদত্ত, তুমি কি তোমার প্রতিবাসী কুন্দন আচার্য্য মহাশয়ের পত্নীর নিকট হইতে একটি স্বর্ণধেনু গচ্ছিত রাখিয়াছিলে ?

মণিদত্ত নতমস্তকে, জড়িতকণ্ঠে ও কম্পিতকলেবরে উত্তর করিল——

"না মহারাজ ! আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ব্রাহ্মণ আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে।"

"বটে !—আচ্ছা, তোমার গৃহ হইতে যদি উঁহার স্বর্ণধেনুটি বাহির হয় ?"

"তাহা হইলে, আমি—আমি মহারাজের নিকট সর্ব্ববিধ শাস্তিই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

সম্রাট বণিকের দুষ্টতায় ও চতুরতায় যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইলেন। বণিকের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল—ব্রাহ্মণ কখনই মিথ্যাবাদী নহে, বণিকই প্রকৃত অপরাধী। তিনি তৎক্ষণাৎ বণিকের গৃহ অনুসন্ধানের আদেশ প্রদান করিয়া, বিশ্বাসী রাজকর্ম্মচারিগণকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা বণিকের গৃহে প্রবেশ করিয়া, প্রতি স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও কথিত মত স্বর্ণধেনু প্রাপ্ত হইলেন না। অবশেষে অনেক পরিশ্রমের পর, একটি অতীব প্রগুপ্ত ও সঙ্কীর্ণ স্থানে একটি স্বর্ণের ঢেঁপা প্রাপ্ত হইলেন। তাহাই সত্বর সম্রাটের সম্মুখীন করা হইল।

সম্রাট সেই স্বর্ণঢেঁপাটি প্রাপ্ত হইয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। বণিকের চাতুর্য্য প্রকাশ হইতে আর বিলম্ব রহিল না। তিনি জানিতেন, যে স্বর্ণধেনুগুলি ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকটির ওজন ১০৮ তোলা ছিল; এবং তাহাতে অষ্টধাতু ও অলক্তকমিশ্রিত স্বর্ণ মিশ্রিত ছিল। এক্ষণে, এই স্বর্ণঢেঁপাটি যে ব্রাহ্মণের স্বর্ণধেনুটিরই রূপান্তর মাত্র, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য, তিনি নগরের স্বর্ণকারগণকে

আহ্বান করিলেন। কিন্তু, এই অবকাশে মণিদত্তকে রক্ষা করিবার জন্য নগরস্থ সমস্ত সুবর্ণবণিক একত্রিত হইয়া, উৎকোচ দ্বারা স্বর্ণকারগণকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। স্বর্ণকারগণ রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া, সম্রাটের আদেশানুসারে স্বর্ণচেঁপাটি পরীক্ষা করিল; এবং সুবর্ণবণিকগণের উপদেশ মত, ইহার ওজন যে ঠিক ১০৮ তোলা, বা ইহাতে যে আর অন্য কোনও দ্রব্য মিশ্রিত আছে, তাহা তাহারা কেহই স্বীকার করিল না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী সম্রাট বল্লাল সেন তাহাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রই নখদর্পণে দেখিতে পাইলেন; তাঁহার নিকট কিছুই অপরিজ্ঞাত বা গুপ্ত রহিল না। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, গোপনে কাশীধাম হইতে স্বর্ণকার আনয়ন করিলেন। এবং তাহাদিগকে অতীব সতর্কতার সহিত রক্ষা করিলেন, যেন নগরের কোনও ব্যক্তি তাহাদের সহিত কোনও পরামর্শ করিতে না পায়।

পুনরায় বিচারসভা আহূত হইল। সম্রাট আসন গ্রহণ করিয়াই, সর্ব্ব প্রথমে মণিদত্তের বিচার আরম্ভ করিলেন। তিনি সর্ব্বসমক্ষে কাশীনিবাসী স্বর্ণকারগণকে আহ্বান করিয়া, সেই স্বর্ণচেঁপাটি পরীক্ষার্থ প্রদান করিলেন। সকলেই বিচারফল পরিদর্শন জন্য উৎকর্ণ ও উৎকণ্ঠিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। মণিদত্ত যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ আসন্নমৃত্যু অজের ন্যায়, একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, কম্পিতকলেবরে ভাবী বিপদের আশঙ্কায় প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল; এবং, কৃতকর্ম্মের জন্য আপনাকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। স্থানীয় সমস্ত স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকারগণও রাজাজ্ঞায় সভাক্ষেত্রে আনীত হইয়া, আসন্ন রাজদণ্ডের বিবিধ কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া শঙ্কিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল। সভাস্থল নিস্তব্ধ নীরব।

পরীক্ষা শেষ হইল। কাশীনিবাসী স্বর্ণকারগণ করজোড়ে বিনীত ভাবে নিবেদন করিল —— "মহারাজ, আমরা অতি সাবধানতার সহিত

বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—এই স্বর্ণঢেঁপার ওজন ১০৮ তোলা এবং ইহাতে অষ্টধাতু ও অলক্তক সংযুক্ত স্বর্ণাংশ মিশ্রিত আছে।"

সকলেই বিস্মিত ও চমকিত হইলেন; এই স্বর্ণঢেঁপাই যে ব্রাহ্মণের স্বর্ণধেনুর রূপান্তর মাত্র তৎপক্ষে আর কাহারও কোনও সন্দেহই রহিল না। সকল রহস্যই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল। মহামতি গৌড়াধিপ সন্তুষ্ট হইয়া বৈদেশিক স্বর্ণকারগণকে আশাতীত পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। তিনি মণিদত্ত ও তাহার সহযোগী স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকারগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"রে সুবর্ণকীটগণ, তোদের অসাধ্য কিছুই নাই! তোরা অতীব নিকৃষ্ট জাতি! বিষ্ঠার কৃমি অপেক্ষাও তোরা অধম!—অদ্য হইতে তোরা সকল সমাজেই অস্পৃশ্য ও ঘৃণিত হইয়া অবস্থান করিবি! তোদের ছায়ামাত্রও যাহাদের অঙ্গসংলগ্ন হইবে তাহারাও অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইবে!" * অনন্তর, তিনি নগরপালগণকে আদেশ করিলেন—"অতি সত্বর, এই পাপিষ্ঠগণের মস্তকমুণ্ডন করিয়া, আমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও এবং ইহাদের সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত কর।"

রাজাদেশ অচিরেই প্রতিপালিত হইল। এই অতিলোভী ব্রহ্মস্বাপহারী পাপিষ্ঠগণ স্বকর্ম্মের প্রতিফলস্বরূপ জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, বঙ্গদীর দক্ষিণাংশে প্রস্থান করিল। এক্ষণে, ইহারা "সোণার বেনে" ও "স্যেকরা" নামে পরিচিত। এবং সমাজে অতীব ঘৃণিত। কুন্দন আচার্য্য

* অনেকে বলেন কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া বল্লাল "সোনার বেনিয়া" ও "স্যেকরা"গণকে পতিত করিয়াছিলেন। বল্লালচরিত্র আলোচনা করিলে, তাঁহার প্রতি এ দোষারোপ নিতান্ত অমূলক বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার ন্যায় সার্ব্বভৌম সম্রাটের এ প্রকার নীচপ্রকৃতি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা ইহা সহজেই জানা যায়।

সেই স্বর্ণচেঁপা এবং মণিদত্তের সম্পত্তি হইতে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইয়া, ন্যায়পরায়ণ সম্রাটের জয় ঘোষণা করিতে করিতে সানন্দে গৃহে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য, এই সুবিচারে একপক্ষে কুন্দন আচার্য্য এবং অন্যান্য সাধু ব্যক্তিগণ যেমন সন্তুষ্ট হইলেন ; পক্ষান্তরে "স্যেকরা" ও "সোণার বেনিয়া"গণ সেইরূপ সম্রাটের প্রতি যারপর নাই অসন্তুষ্ট ও জাতক্রোধ হইল। ইহার ফলে, সাধুচরিত্র সম্রাট বল্লালকে শীঘ্রই এমন একটি ঘটনায় জড়িত হইতে হইল, যে যাহার জন্য তাঁহার পবিত্র চরিত্র একটি কলঙ্ক চিহ্নে ইতিহাসে চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।

প্রিয় পাঠক ! অপেক্ষা করুন, পরপ্রবন্ধে ইহাই আমাদের বক্তব্য। অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ক্রমশঃ—

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়।

কয়েকটি কথা।

আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসকে জীবিত রাখিতে হইলে, আমাদের দৃষ্টিশক্তি ও অনুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তিটাকেও জাগাইবার চেষ্টা না করিলে কখনও তাহাতে কৃতকার্য্য হইব না। পাশ্চাত্য দেশ সমূহের প্রতি ক্ষুদ্র গ্রামেরও ইতিহাস আছে, আর আমাদের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের সম্বন্ধেই আমরা কতটুকু জানি ! দেশ-প্রীতি কেবল বক্তৃতায় ও কবিতায় নিবদ্ধ থাকিবে, এ কেমন কথা ? কাব্যে স্বদেশ-প্রীতির যতটা আস্ফালন দেখিতে পাই প্রকৃত স্বদেশ-জননীর পূজার প্রাঙ্গণে সে সকল ভক্তের পূজার অর্ঘ্য কই, তাহা ত দেখিতে পাই না ! আমাদের কিছুই নাই—তা আর কি তথ্যই সংগ্রহ করিব !

এ সব কথা আমরা মানিতে চাহি না। আসুন আমরা প্রকৃতভাবে দেশকে ভালবাসিতে শিখি,—কোন্ নিবিড় জঙ্গলাভ্যন্তরে কোন্ অর্দ্ধভগ্ন শিব-মন্দির আজ মৃতপ্রায়, কে তাহা স্থাপন করিয়াছিল? অই যে বড় দীঘীটি কেইবা খনন করিয়াছিল? এমনি করিয়া নিজ নিজ ঘরের কথা—পল্লীর কথা—মঠ-মন্দিরের কথা যাহার যতটুকু সাধ্য সংগ্রহ করিতে থাকুন্, কালে তাহাই ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের স্বর্ণ মন্দির নির্ম্মাণের প্রচুর মাল মস্‌লা হইয়া দাঁড়াইবে। দেশের কথা ফেলিয়া যাহারা জুলু বা ক্যামস্কটকার ইতিহাস লইয়া নাড়া চাড়া করেন, তাঁহাদের দ্বারা সাহিত্য বল, সমাজ বল, কিছুরই তেমন উপকার হয় না।

'ঐতিহাসিক চিত্রের' প্রধান উদ্দেশ্য দেশের ইতিহাসে প্রতি দেশের লোককে আকর্ষণ করা, দুঃখের বিষয় এখন পর্য্যন্ত এ মহৎ বিষয়ে তাদৃশ সাফল্য লাভ চিত্রের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ইহা দেশের পক্ষে বিশে সুলক্ষণ বলিয়া মনে করি না। এই বিস্তৃত বাঙ্গালা দেশে বহু শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাসস্থান, তবু কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ আমরা পাই না। ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় নহে।

প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ বাস, গ্রাম, মহকুমা, জেলা প্রভৃতি স্থানের ধর্ম্ম, সমাজ, জনপ্রবাদ, রীতি-নীতি, সাহিত্য, কৃষি, ক্রীড়া-কৌতুক, মঠ, মস্‌জিদ্, দেবায়তন ইত্যাদির বিবরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের চিত্রাদি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে নিজেও যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন, তৎসহ দেশেরও একটী মহোপকার সাধন করিতে পারিবেন। আমরা সে সকল চিত্র এবং বিবরণ আনন্দের সহিত 'ঐতিহাসিক চিত্রে' প্রকাশ করিব। বর্ত্তমান সংখ্যায় দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্ত-নগরের মন্দির-চিত্র প্রদত্ত হইল। দিনাজপুর হইতে কান্তনগর ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই সুন্দর মন্দিরটির ১৭০৪ খৃঃ অঃ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া

১৭২২ খৃঃ অঃ নির্ম্মাণ পরিসমাপ্ত হয়। মন্দিরটি ইষ্টক নির্ম্মিত—এইরূপ সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন মন্দির বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গলা দেশে অতি অল্পই বিদ্যমান আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালীজাতির আচার, পদ্ধতি, রীতিনীতি প্রভৃতি ইহার গাত্রেস্থিত মূরতসমূহ দ্বারা ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। মন্দিরটি নবচূড়া বিশিষ্ট। সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ কাউসন সাহেব এই মন্দির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—"it is a nine towred temple, of considerable dimensions, and of a pleasingly picturesque design." এই মন্দির মধ্যে কান্তজী নামক বিগ্রহ স্থাপিত আছেন,—'কান্তজী' ঐ অঞ্চলের বিশেষ জাগ্রত দেবতা, তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। আশা করি, আগামী সংখ্যায় দিনাজপুরবাসী আমাদের কোন গ্রাহক 'কান্তনগরের' এই মন্দিরের ও 'কান্তজী' বিগ্রহ সম্পর্কিত জনপ্রবাদ এবং প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া একটী বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিবেন।

সহঃ সম্পাদক।

আকবর ও যোশী

খোসরোজ।

আকবর। আরও রূপ চাই। বাদশাহের পিপাসা এখনও মিটে নাই। জগতের সমস্ত রূপ বাদশাহের অন্তঃপুরে স্তূপীকৃত কর, অনন্তগগনে সেই দীপ্তশিখা জ্বলিয়া উঠুক। ফুলরাশির স্থায় রূপরাশি পদতলে ছড়াছড়ি যাউক। এ ক্ষুধিত ভ্রমরের পিপাসা এখনও মিটে নাই, পেয়ালা ভরিয়া পুষ্পাসব লইয়া আইস। ফোয়ারায় ফোয়ারায় সুধার উৎস

উঠুক। দিল্লীর ধূলিকণা পর্য্যন্ত সুবর্ণময় করিয়া দেও। কুঙ্কুম কস্তুরী সমীরণে ভাসিয়া বাদশাহের বিলাস কথা গাহিয়া বেড়াক। সঙ্গীত, আরও মধুর, আরও মধুর তোল ; সপ্তম লহরীতে অপ্সরা কণ্ঠ ডুবাইয়া দেও। হাসির তরঙ্গ তোল, ঐ কিরণ সমুদ্রে মত্ত মরালের ন্যায় ভাসিয়া যাই। ঐ মদালস নয়নের প্রত্যেক কটাক্ষে প্রেমের মূর্চ্ছনা উঠুক।—

(অন্য মনে যোগী বাইয়ের সম্মুখে অগ্রসর হওন।)

কে তুমি রূপসী ?

যোগী। আমি হিন্দু।

আকবর। যথেষ্ট পরিচয় !

যোগী। ইহার অপেক্ষা গৌরবসূচক পরিচয় জানি না।

আ। ভাল, সে পরিচয় তোমার দিতে হইবে না, অন্যে তোমাকে তোমার উপযুক্ত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

যো। অপরাধ মার্জ্জনা হয়, আপনার কথা বুঝিলাম না।

আ। বুঝ নাই, তবে শুনিবে ? আমি তোমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

যো। উন্মাদের অপরাধ মার্জ্জনীয়, আমিও তোমাকে ক্ষমা করিলাম।

আ। আমি আকবর।

যো। মিথ্যা কথা। আমি হিন্দুস্থানের অধিপতিকে প্রবীণ বলিয়াই জানি।

আ। এই দেখ রাজপাঞ্জা। না, তোমার পুষ্পমণ্ডিত মস্তক উত্তোলন কর, সম্রাজ্ঞীর নতজানু শোভা পায় না। হাসিও না, আমি সত্যই তোমার রূপে মুগ্ধ।

যো। অভাগিনীর স্বামী এখনও জীবিত।

আ। রাজ আজ্ঞায় তাহা আর থাকিবে না।

যো। শুনিয়া সুখী হইলাম।

আ। উপহাস করিতেছ কেন? আমার অন্তঃপুরে তো আরও হিন্দু-নারী আছে।

যো। সে হিন্দুস্থানের দুর্ভাগ্য,—আর তাহারা কি আপনাদের স্বামী বিসর্জ্জন দিয়া বাদশাহের সম্মুখে বিলাসের উজ্জ্বল মদিরা ধরিয়াছে।

আ। রাজ কোষাগার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি।

যো। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুস্থানের অধিপতি হিন্দু-নারীর চরিত্র অবগত নহেন।

আ। ভাল, বাদশাহের অপ্রতিহত বল পায়ে ঠেলিবে কি করিয়া?

যো। এই আকবরই সমগ্র ভারতবর্ষে ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত! একথা শুনিয়া ভারতবাসী কি বলিবে?

আ। এই উদ্যানের বৃক্ষ লতার ভাষা নাই। কে জানিবে?

যো। তবে তুমি পাপকে ঘৃণা কর না, তুমি ভয় কর এক মাত্র পাপের প্রকাশ।

আ। তাহাই হউক। দীপশিখার প্রোজ্জ্বল চুম্বনে মৃত্যু আছে বলিয়া কবে পতঙ্গ নিবৃত্ত হয়? আর অঞ্চল-তাড়িত ভ্রমরের ন্যায় এই বিক্ষত হৃদয়কে বার বার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে বিপর্য্যস্ত করিও না। ঐ তুহিন-প্রতিমা আপন হৃদয়তাপে বিগলিত করিব।

যো। এই তরবারি ফলকে তোমার প্রেম-কাহিনী তোমারই হৃদয়ে লিখিয়া দিব। এ শক্তিপদে রক্তজবা চাই।

আ। আমায় ক্ষমা কর।

যো। তোমার মৃত্যুতে এত ভয়? ভাল আমিই মরিয়া তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

আ। না ভগ্নি। আমার শিক্ষা হইয়াছে। মানুষ মাত্রেরই দুর্ব্বলতা আছে, আমারও আছে, আমাকে ক্ষমা কর।

যো। এ শিক্ষা বিপদের।

আ। না, আজ বুঝিলাম, আজও হিন্দুর গর্ব্ব কিসে।

যো। কি সে?

আ। সে তার সাধ্বী রমণী।

শ্রীমাখনলাল সেন।

নিয়ার্কস।

যেদিন ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান ও নেবুক্যাড্‌নেজারের (Nebuchadnezzar) দেব-মন্দির দণ্ডকারণ্যের সেগুনকাষ্ঠে নির্ম্মিত হইত, * সেদিনের কথা স্মৃতি ও কাহিনীর সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আলোক ও অন্ধকারের সন্ধিস্থলে উষালোকে অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় ভাসিতেছে। হারকিউলিসের এই ভারতবর্ষ হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ প্রদানের কথা এখন অলীক কল্পনামাত্র। † হিন্দুর বেদ, তন্ত্র, পুরাণ, সাহিত্য, বৌদ্ধের পিঠক, মন্দিরদ্বার, পর্ব্বত গুহা, সমাধি মঠ ও কীর্ত্তিস্তম্ভের শিলালিপি, তাম্র ও স্বর্ণফলকের অনুশাসন এবং রাজচক্রবর্ত্তিগণের মুদ্রালিপি হইতে ভারতের যে অতীত ইতিহাস সঙ্কলন করা যায়, তাহা সমর্থনের জন্য আমাদিগকে বিদেশীয়দিগের শরণাপন্ন হইতে হয়। শুভক্ষণে জুলিয়াস সিজার তরবারী হস্তে শ্বেতদ্বীপে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে যুগযুগান্তর-সঞ্চিত শিল্প, বাণিজ্য, সভ্যতা, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি প্রবাহ ভগীরথানুবর্ত্তিনী কলুষ বিনাশিনী জাহ্নবীধারার ন্যায় ব্রিটনদিগকে উদ্ধার করিতে

* In the ruins of Mugheir, ancient Ur, of the Chaldees, built by Ur, Ea, (or Ur, Bagash) the first king of united Babylonia, who ruled not less than 3000 years B. C, was found a piece of Indian teak &c.
Sayce, Hibbert Lectures for 1887 and Ragozin, Vedic India p 305.

† Megasthenis Fragm LVIII and Mc Crindle's Translation of Arrian's Indika, p. 201.

গিয়াছিল। সেইদিন হইতে জাতিগণনায় ব্রিটনের স্থান, সেইদিন হইতে ব্রিটিশ ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠার আরম্ভ। আর পাশ্চাত্য জগতের কল্যাণের জন্য শুভক্ষণে মাকিডোনিয়াপতি দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আলোকসুন্দর (সেকেন্দরশাহ) ভারতের গৌরবশ্রীতে আকৃষ্ট হইয়া সিন্ধুতীরে আসিয়া শিবির নিবেশ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে বিদেশীয়েরা ভারতের রীতি-নীতি, সভ্যতা, শিল্প, বাণিজ্য ও জলস্থলের বর্ণনার জন্য লেখনী ধারণা করিল। সেইদিন হইতে গ্রীক, চীন, আরবী, ফারসী, ফরাশী, পর্টুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজী ও দিনেমার ভাষায় ভারতের কাহিনী অতি আদরণীয় উপাদেয় সামগ্রী হইল।

৩২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সেকেন্দর ভারতে আসিয়াছিলেন। সে আজ বহু দিনের কথা। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দ্বাবিংশ শতাব্দী বহিয়া গিয়াছে, পল পল করিয়া ২ হাজার ২ শত ৩৬০ বৎসর আজ যায় যায়। তখন আর্য্যগণ সমগ্র ভারতের একছত্র অধিস্বামী। তখন মগধ সাম্রাজ্যের গৌরব-পতাকা আর্য্যাবর্ত্তের উপরিভাগে পত পত শব্দে উড্ডীয়মান হইতেছিল। কতস্তর মানবজীবন স্তূপাকারে একত্র করিলে সেইদিনে উপনীত হইতে পারা যায়!

সেকেন্দরের সঙ্গে যাঁহারা ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ওনেসিক্রিটসের (Onesikritos) স্থল বর্ণনা ও নিয়ার্কসের (Nearkhos) জলপথের বিবরণ ঐতিহাসিক হিসাবে অতিশয় মূল্যবান্। ভিন্‌সেণ্ট বলেন যে, নিয়ার্কসের সমুদ্র-যাত্রা ইউরোপ ও এসিয়ার দূরবর্ত্তী প্রদেশের মধ্যে যাতায়াত ও পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিল *। সুতরাং ইহা গৌণভাবে ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপনের দূরবর্ত্তী কারণ·

* "It * * was * * the primary cause, however remote, of the British establishments in India."
Dr Vincents' Commerce and Navigation of the Ancients in the Indian Seas.

স্বরূপ। ভাস্কোডা গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া কালিকটে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে এই পথেই ফেরঙ্গদেশীয়েরা ভারতের পণ্যসম্ভার গ্রহণ করিত। এই পথেই ভিনিশীয় বণিক্ জগাদ্বখ্যাত পর্য্যাটক মার্কোপোলো স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া ছিলেন। এই পথে আসিয়া ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রথম উদ্যোগী বণিক রাল্ফ ফিচ (Ralph fitch) ভারতের রাজশ্রী দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সম্রাট্-শিরোমণি আলেক্জাণ্ডারের অনুসান্ধৎসা এবং অসমসাহসিক গ্রীক বীর নিয়ার্কসের অধ্যবসায়ের ফল আজ সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ সম্ভোগ করিতেছে।

এই সাগর যাত্রার বিবরণ নিয়ার্কস স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়ান। (Arian) তাহা সঙ্কলিত করিয়া নিজের আইওনিক ভাষায় লিখিত ভারত বিবরণের (Indika) অন্তর্ভুক্ত করিয়া ছিলেন। প্রাচীনকালে গ্রীকেরা ভারতের সম্বন্ধে নানাপ্রাপ্ত ধারণা পোষণ করিত। লোক মুখে এই অদ্ভুত দেশের যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্পগুজব শুনিত বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া তাহাই গলাধঃকরণ করিত। ইরাটোস্থিনিসের (Eratosthenes) সময় হইতে প্রাণিতত্ত্ববিদ্ প্লিনি (Pliniy)র কাল পর্য্যন্ত এইরূপ কল্পনা ও ঘটনার অদ্ভুত মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের (Megasthenes) উপন্যাসপূর্ণ বর্ণনাই তাহার নিদর্শন। নিয়ার্কস সর্ব্বপ্রথম কল্পনাপ্রিয়তা পরিহার করিলেন এবং সত্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সমুদ্রযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পত্রস্থ করিলেন। ভৌগোলিক ষ্ট্রাবোর (Strabo) ন্যায় দুর্ম্মুখ সমালোচককেও বাধ্য হইয়া বলিতে হইয়াছিল ভারতের জন্য তিনি নিয়ার্কসের নিকট ঋণী। কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বাগ্জাল অপূর্ব্ব।

* কেহ কেহ অনুমান করেন নিয়ার্কস স্বয়ং কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। নিয়ার্কসের ডায়ারি এরিয়ানের স্বকপোলকল্পিত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

"Generally speaking, the men who have written upon Indian affairs were a set of liars. Deimakhos holds the first place in the list, Megasthenes comesnent, while one Sikritos and Nearkhos, with others of the same class, stammer out a few words of truth."

নিয়ার্কসের প্রতিও ষ্ট্রাবো বিদ্রূপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। অথচ ভারতের কথা লিখিবার কালে তিনি নিয়ার্কস-কেই প্রধান প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।*

আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে হার্দ্দোইন (Hardouin) এবং হিউএট্ (Huet) মাত্র দুইটী বিষয়ে নিয়ার্কসের প্রতি অলীকোক্তি (mendacity) দোষারোপ করিয়াছেন। প্রথমতঃ একস্থলে নিয়ার্কস সিন্ধু-নদীর পরিসর ২০০ ষ্ট্যাডিয়া † বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ মানানায় (২৫০—১৭´ উত্তরাক্ষ) নবেম্বর মাসে দক্ষিণদিকে ছায়া পড়িয়াছিল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এরিয়ানই সঙ্কলনকালে নিয়ার্কসের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

এরিয়ানলিখিত ইরিথ্রিয়ান সাগর (Periplus of the Erythræan Sea) প্রদক্ষিণ নামক গ্রন্থের সহযোগে নিয়ার্কসের জলপথবর্ণনা প্রাচীন পাশ্চাত্য জাতিদিগের সহিত ভারতের বাণিজ্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই জলপথ বাহিয়া আসিয়া মেসোপোটেমিয়া, সীরিয়া, ফিনী-শিয়া, মিশর ও আরববাসিগণ শিল্পজাত পণ্য দ্রব্যাঙ্কিত ভারত-সভ্যতা-বার্ত্তা ভূমধ্য ও লোহিত সাগরতীরে নগরে নগরে প্রচার করিত। লোহিত সাগরের প্রবেশদ্বার (প্রণালী) কে গ্রীকেরা ইরিথ্রা (Erythra) বলিত। এই জন্ম আফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত তৎকাল পরিজ্ঞাত এসিয়া-

* "Indeed Strabo himself, while he censures Nearchus &c, made use of his authority without scruple." Dr. Smith's Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, p. 1147.

† 1 stadia—600 Gk ft—625 Roman ft—606¾ Eng. ft.

তীরকেই ইরিথ্রিয়ান কূল (Erythrian coast) আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল।

সৈন্যগণের অনিচ্ছাবশতঃই হউক, আর যে কারণেই হউক পঞ্চনদ-ভূমি চুম্বন করিয়াই গ্রীকবীরকে ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ফিলিপ নামক জনৈক গ্রীক সেনাপতিকে তাঁহার ভারতীয় অধিকৃত প্রদেশের সুবাদার (Satrap) নিযুক্ত করিয়া সেকেন্দর বিতস্তা (Hydaspes বা Jhilam) নদীতীরে বহুসংখ্যক অর্ণবযান সংগ্রহ করিলেন, এবং সঙ্গীয় সৈন্যগণের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নৌচালনায় পারদর্শী ফিনিফিয়ান্, কিপ্রিয়ান, মিশরবাসী ও গ্রীক্‌দিগকে নৌসেনা নিযুক্ত করিলেন। ক্রীটদ্বীপ নিবাসী আণ্ড্রোটিমস্ কুমার নিয়ার্কস্‌কে নৌবহরের নেতৃত্ব পদে বরণ করিলেন এবং তাঁহার বন্ধু ওনেসিক্রিটস্ (Onesikritos)কে স্বীয় পোতের পরিচালক (Pilot) নিযুক্ত করিলেন।* এই অভিযানে প্রায় ৩৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ম্যাকিডোনিয়াবাসী। সাইপ্রাস এবং পারস্যেরও কেহ কেহ ছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডারের পুত্র ক্রেটারসের (Krateros) ও নাম ইঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

* নিয়ার্কস বলিয়াছেন অভিযানের নেতা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সেকেন্দর তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। যখন এক এক করিয়া প্রধান প্রধান সকলের নাম অযোগ্য বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান হইল, তখন নিয়ার্কস স্বয়ং এই বিপদসঙ্কুল অভিযানের ভারগ্রহণে সম্মত হইয়া সম্রাটকে বলিলেন—

I, then, O king, engage to command the enpedition, and, under the divins protection, will conduct the fleet and the people on board safe into Persia, if the sea he that way navigable, and the undertaking within the power of man to perform.

সম্রাট প্রথমতঃ তাঁহার প্রিয়বন্ধু নিয়ার্কসের জীবন বিপদাপন্ন করিতে অসম্মতির ভাণ করিলেন। কিন্তু নিয়ার্কসের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সেকেন্দর তাঁহার সাহস ও প্রভুভক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে admiralএর পদে বরণ করিলেন। নিয়ার্কসের নিয়োগ-বার্ত্তা প্রচারিত হইলে নৌসেনাগণের মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়াছিল।

সমস্ত প্রস্তুত হইলে সম্রাট দেবতার অর্চনা করিলেন, পিতৃপুরুষের আরাধনা করিলেন, বিতস্তা (Hydaspes—Jhelam), চন্দ্রভাগা (Akesines-Chenab), সিন্ধুনদ এবং সমুদ্রের উদ্দেশে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া বলিপ্রদান করিলেন এবং ক্রীড়া, কৌতুক, ব্যায়াম প্রভৃতি উৎসবের আয়োজন করিলেন। তৎপর প্রায় ২০০০ নৌসেনা বক্ষে লইয়া পোতবাহিনী ভাসমান হইল। উভয়তীরে গ্রীক চমূশ্রেণী ক্রেটারস (Krateros) ও হেফিষ্টিয়নের (Hephaestion) অধীনে তরীসমূহের রক্ষী হইয়া অগ্রসর হইল। সেকেন্দর স্বয়ং প্রায় ৮০০০ বাছাই-করা সৈন্য সঙ্গে রাখিলেন। সতরপ ফিলিপ আর একদল সৈন্যসহ চেনব নদীতীরে প্রেরিত হইল। এই সময় সম্রাটের সঙ্গে মোট প্রায় ১ লক্ষ ২০ সহস্র সৈন্য ছিল।* পোতসংখ্যা প্রায় ১৮০০। ইহার মধ্যে কতক যুদ্ধোপযোগী লম্বা ছিপ, কতক গোল সওদাগরী মাল চালানী কিস্তী, এবং অশ্ব ও খাদ্যসামগ্রী বহন জন্য কতকগুলি গাধাবোট ছিল।

এত সাজসজ্জা করিয়া তবে বীর সেকেন্দর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পঞ্চনদের জলপথ তত সহজ সুগম হয় নাই। পথিমধ্যে তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ বিবাদ করিতে হইয়াছিল। অনেক দুর্দ্ধর্ষ জাতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। মাল্লী (মালব) দিগের সহিত সমরে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। তিনি যুদ্ধে আহত হইয়া ভূপতিত হইলে তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর বীর পেঙ্কেষ্টস্ (Penkestos) ও লিওন্নেটস্ (Leonnatos) আপনাদের চর্ম্ম (ঢাল) দ্বারা সম্রাটকে রক্ষা করিয়াছিলেন ইহার বিস্তৃত বিবরণ এরিয়ান স্বতন্ত্রভাবে এটিক (Attic) ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।† ক্রমশঃ

শ্রীরসিকলাল রায়।

* Plutarch says that In reforming from India Alexander had 12,000 foot and 15,000 cavalry.

† Arrians Anabasis.

চীনের উৎসব চিত্র।

শ্রীব্রজে ... থ বন্দে ... কর্ত্তৃক সংগৃহীত

ঐতিহাসিক চিত্র

রাজা মজলিস রায়।

হিন্দু বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির জন্য চির প্রসিদ্ধ। এই বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির জন্য হিন্দু আত্মোৎসর্গ করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। হিন্দু যখন হিন্দু রাজত্বের শান্তিময় ছায়াতলে বাস করিত, তখন ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছে, হিন্দুর পুরাণ, ইতিহাস এই বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির অনন্ত উদাহরণ বক্ষে করিয়া আজিও লোক সমাজে তাহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। হিন্দুর পরবর্ত্তী ইতিহাসও একেবারে নীরব নহে, রাজপুত মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ ইতিহাস বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির অপার্থিব দৃষ্টান্তে আপনাদের পৃষ্ঠা যেরূপ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, জগতের অন্য জাতির ইতিহাস সেরূপ উজ্জ্বলতর কিনা বলিতে পারিনা। ফলতঃ প্রভুর জন্য আত্মোৎসর্গ হিন্দুর যে একটি সহজাত গুণ একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

হিন্দু রাজত্বের পর মুসলমানের সহিত সম্বন্ধ হইয়াও হিন্দু বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইতে ক্রটি করে নাই। পাঠান রাজত্বে হিন্দুর সহিত মুসলমানের মিলন তাদৃশ ঘনিষ্ঠ না হইলেও সে সময়ে হিন্দু বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছে। তাহার পর মোগল রাজত্বকালে হিন্দু মুসলমানের মহামিলন সংঘটিত হইলে হিন্দু বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির দৃষ্টান্তে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। পাঠান রাজত্বের

মহিমা লোপ করিয়া যে সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল, সে সময়ে রাজপুত বীরদিগের অসি-ঝনৎকারে বাবর সাহকেও কম্পিত হইতে হইয়াছিল। মহারাণার অমানুষিক পরাক্রমে বাবর সাহ চমৎকৃত হইয়া হিন্দুর সহিত মিলন সংঘটনে উদ্যোগী হন। বাদসাহ হুমায়ুনও পিতার পথানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" আকবর বাদসাহের উদার নীতি হিন্দু মুসলমানকে এক অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। হিন্দু বীরগণ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া কাবুল হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের যে সহায়তা করিয়াছিল, ভারতের ইতিহাসেও সেকথা অদ্যাপি উজ্জ্বলভাবে লিখিত আছে। সেই সময়ে হিন্দু যেরূপ প্রভুভক্তি ও রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহার তুলনা জগতে অতি বিরল বলিয়াই বোধ হয়। পরবর্ত্তী মোগল বাদসাহগণও হিন্দুর নিকট হইতে ঐরূপ প্রভুভক্তি ও রাজভক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। এমন কি, যে আরঙ্গজেব বাদসাহ হিন্দু-বিদ্বেষী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তিনিও হিন্দুর বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তিতে বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাই বলিতেছি মুসলমান রাজত্বকালেও হিন্দু বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও হিন্দুর প্রভুভক্তি বা রাজভক্তির দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বস্তুতঃ হিন্দু চিরদিনই প্রভুভক্ত ও রাজভক্ত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা হিন্দুর সেই অপার্থিব বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। সাধারণে দেখিতে পাইবেন যে, হিন্দু-সন্তান ব্রাহ্মণ-সন্তান স্বীয় মুসলমান প্রভুর জন্য কিরূপে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাদির সাহের কৃতান্ত-দূতসম পারসিক সৈন্যগণ যে সময়ে দিল্লীর রাজপথ হইতে গৃহপ্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত শোণিত ধারায় প্লাবিত করিয়াছিল, এবং অগ্নিদাহে ভারতের বিরাট রাজ-

ধানীকে হতশ্রী করিয়া রাজকোষ হইতে সামান্য গৃহস্থের ধনরত্ন পর্য্যন্ত সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, সেই সময়ে সকলেই আপনাপন ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ আমীর ওমরাহগণ আপনাদের বহু-পুরুষ-সঞ্চিত মণি-মাণিক্য রক্ষার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, আপনাদের জীবন ও স্ত্রী-পুত্র-পরিবার রক্ষার জন্য সেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা বিশেষরূপ ফলবতী হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্দ্দান্ত পারসিক সৈন্যগণের হস্ত হইতে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধনরত্ন রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও, নাদির সাহের হস্ত তাঁহাদের সকলেরই নিকট প্রসারিত হইয়াছিল। দিল্লীর যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত রাজকোষ লুণ্ঠন ও মণিমাণিক্য-খচিত-ময়ূরাসন করতলগত করিয়াও নাদির সাহের অর্থ-লালসা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্য-বর্গের নিকট হইতে তিনি অপরিমিত অর্থ দাবী করিয়া বসেন। অমাত্যবর্গও সাহের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন নাই। সকলেই মস্তক অবনত করিয়া আপনাদের ধন-ভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি আনিয়া নাদির সাহের পদপ্রান্তে ন্যস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে সময়ে নাদির সাহ দিল্লী নগরী রুধিরপ্লাবিত করেন, সেই সময়ে সম্রাট্ মহম্মদসাহ দিল্লীর ময়ূরাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের পর কামার উদ্দীন খাঁ তাঁহার উজীরী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কামার উদ্দীন একজন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে স্বীয় দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাজা মজলিস রায়। মজলিস রায় সারস্বত-ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত। লাহোর নগর তাঁহার নিবাসস্থান ছিল। কামার উদ্দিন মজলিস রায়ের বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় দেওয়ান নিযুক্ত করেন। মজলিস রায় সেই বিশ্বস্ততার যে জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আমরা এইমাত্র উল্লেখ করিলাম, কামার উদ্দিন খাঁ মজলিস রায়ের বিশ্বস্ততার জন্যই তাঁহাকে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কারণ উজীর তাঁহার বিদ্যাবত্তার বিশেষরূপ পরিচয় পান নাই। মজলিস রায় লেখাপড়ায় তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি এক খানি পত্র পর্য্যন্ত লিখিতে জানিতেন না। তিনি উজীরী সেরেস্তার কর্ত্তা ছিলেন বটে, অথচ সরস্বতী দেবী তাঁহার নিকট হইতে যেন দূরে অবস্থান করিতেন। তবে লক্ষ্মী দেবী তাঁহার প্রতি কিছু অনুগ্রহ বিতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। কামার উদ্দীন খাঁ, মজলিস রায়ের বিদ্যাবত্তা পরীক্ষার জন্য একদিন তাঁহার সমক্ষেই মজলিস রায়কে কোন একটী বিষয় লিখিতে উপদেশ দেন। গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবরে মজলিস রায় প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন বটে, কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের উজীর তাঁহার দেওয়ানের হস্তাক্ষর দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। উজীর দেওয়ানকে বলিলেন, "রাজা মজলিস রায়, তুমি এরূপ দেবাক্ষর প্রভাবে কিরূপে ভারত সাম্রাজ্যের উজীরী লাভ করিলে?" দেওয়ানই উজীরের দক্ষিণ হস্ত বলিয়া কামার উদ্দীন তাঁহারই উজীরী প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন। উজীরের কথা শুনিয়া মজলিস রায় উত্তর দিলেন, "প্রভু! 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং' বিধাতা আমার ললাটে এই উচ্চপদ লিখিয়া দিয়াছিলেন, কাজেই সরস্বতী দেবীর অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইয়াও আমি মোগল সাম্রাজ্যের উজীরের দেওয়ানী লাভ করিয়াছি।" বাস্তবিক মজলিস রায় সরস্বতী দেবীর অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইলেও ভাগ্যগুণে যে উচ্চপদে আরূঢ় হইয়াছিলেন, তাহা অনেক শিক্ষিত ও বিদ্বান্ ব্যক্তিরও ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি নিজে সেরেস্তার সমস্ত কাগজপত্র লিখিতে সমর্থ না হইলেও তাঁহার অধীন মুহুরি ও মুন্সীগণ তৎসমুদয় সম্পন্ন করিতেন। মজলিস রায়ের সদ্ব্যবহারে সকলে তাঁহার প্রতি এরূপ প্রীত ছিলেন

যে, উজীর অনেক দিন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার দেওয়ান একপ্রকার নিরক্ষর। কেবল মজলিস রায় বলিয়া নহে, নিরক্ষরতা অনেক প্রধান ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াও জগতে তাঁহাদের গৌরব প্রচারের বাধা জন্মাইতে পারে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মোগল-কেশরী আকবর বাদশাহ ও ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

সরস্বতী দেবীর কৃপাপাত্র না হইলেও মজলিস রায় লক্ষ্মী দেবীর যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, সেই অনুগ্রহের সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি আরও স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত পুরুষ রাজ-কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অল্পই দৃষ্ট হইত। দীন-দরিদ্রের কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহার ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবার জন্য তাঁহার অর্থ প্রতিনিয়ত ব্যয়িত হইত। অনেক সন্ন্যাসী ফকির মজলিস রায়ের প্রদত্ত শীতবস্ত্রে গাত্র আবৃত করিয়া দিল্লীর রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাঁহার ঔষধালয় হইতে যে কত রোগী ঔষধ ও পথ্য পাইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ফলতঃ বিপন্নকে সাহায্য, রোগীকে ঔষধ পথ্য দান, সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করাই মজলিস রায়ের নিত্য ব্রত ছিল। সেই মহাব্রতের জন্য তিনি যে অনন্ত পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহারই ফলে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। সেই সঙ্গে তাঁহার বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। যে সময়ে নাদির সাহ সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্যগণের নিকট হইতে ধনরত্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে উজীর কামার উদ্দীন খাঁ আপনার সমস্ত সম্পত্তি রাজা মজলিস রায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া কোনরূপে নিষ্কৃতি-লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন, নাদির সাহের নিকট সে সংবাদ গুপ্ত ছিল না, তিনি তাহা অবগত হইবামাত্র মজলিস রায়কে ধরিয়া বসিলেন। রাজকোষ হইতে সামান্য গৃহস্থের ধন রত্ন পর্য্যন্ত যাঁহার কঠোর হস্তে

নিপতিত হইয়াছিল, রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্য যাঁহার চরণতলে আপনাদের মণিমাণিক্য আনিয়া উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, ভারত সাম্রাজ্যের উজীরের ধন সম্পত্তি তিনি যে ভূগর্ভে নিহিত থাকিতে দিবেন, ইহা কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না। কাজেই তিনি মজলিস রায়ের নিকট হইতে উজীরের ধন-সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

মজলিস রায় নাদির সাহের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে উজীরের সমস্ত ধন-সম্পত্তি বাহির করিয়া দিতে বলেন। মজলিস রায় উত্তর দেন, "সাহান সাহ উজীর অত্যন্ত বিলাসী ও মদ্যপায়ী, সমস্ত অর্থ তিনি ব্যয় করিয়া ফেলেন। তাঁহার কিছুমাত্র অর্থ সঞ্চিত নাই।" নাদির সাহ এই উত্তরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মজলিস রায়কে শাস্তি দিবার জন্য ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মজলিস রায় যখন বুঝিলেন যে, অর্থগৃধ্নু নাদিরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের কোনই উপায় নাই, তখন তিনি নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে নগদ এক কোটি টাকা ও অনেক হীরা-জহরত লইয়া উপস্থিত হন ও নাদিরের নিকট ব্যক্ত করেন যে, উজীর যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা সাহার নিকট আনিয়া উপস্থাপিত করিলাম। অন্যান্য আমীরগণের পরামর্শক্রমে নাদির মজলিস রায়ের কথায় বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া তাঁহাকে যার পর নাই কষ্ট প্রদান করিতে আরম্ভ করেন, এমন কি তাঁহার একটি কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। যন্ত্রণায় কাতর হইয়াও সেই প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান স্বীয় প্রভুর ধন-রত্নের কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না. নাদির সাহ তাঁহাকে আরও কষ্ট প্রদানের ভয় প্রদর্শন করিলে তিনি সাহের পারসীক সৈন্যদিগকে লইয়া নিজের আবাসে উপস্থিত হন ও একখানি শাণিত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা আত্মহত্যা সম্পাদন করেন। নাদির সাহ এই সংবাদ অবগত হইয়া যারপর নাই বিস্মিত হন এবং সেই প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানের বিশ্বস্ততার

ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে থাকেন। হিন্দুর প্রভুভক্তি দেখিয়া তিনি বাস্তবিকই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যদিও তিনি প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত পারসীক সৈনিকগণের সাহায্যে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, তথাপি এরূপ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত তিনি পূর্ব্বে কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। মজলিস রায়ের মৃত্যুতে দিল্লীতে হাহাকার পড়িয়া যায়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া কঠোর পারসীক সৈনিকগণেরও হৃদয় বিচলিত করিয়া তুলে।

এইরূপে মজলিস রায় স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিয়া প্রভুর ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। যে বিশ্বস্ততার জন্য উজীর কামার উদ্দীন খাঁ তাঁহাকে দেওয়ানী প্রদান করেন, তিনি সেই বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া জগতে হিন্দুর প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পারসীক সৈনিকের অস্ত্র-ঝনৎকারে, নাদির সাহের কঠোর তাড়নায় ও শাস্তিতে তিনি প্রভুর এক কপর্দ্দকের কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। উজীরের সমস্ত সম্পত্তি তাঁহারই নিকট ছিল, কিন্তু তিনি তাহা স্পর্শ না করিয়া অর্থলোভী পারস্য রাজের অর্থলালসা মিটাইবার জন্য আপনার ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীয় হৃদয়ও উন্মুক্ত করিয়া জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুসন্তান বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির জন্য স্বীয় জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। ইহাই হিন্দুর হিন্দুত্ব। যখন হইতে হিন্দু এই সমস্ত অপার্থিব গুণ স্বার্থ সিদ্ধির পঙ্কিল সলিলে ভাসাইয়া দিবে, তখন হইতে জগতে হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ পাইবে। আশা আছে, হিন্দু-সন্তানগণ অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইলেও আপনাদের এই সমস্ত দেব-দুর্ল্লভ গুণ বিসর্জ্জন দিবে না, তাহাদের মহাপুরুষগণের চরিত পাঠ করিয়া হিন্দু চিরদিনই যে হিন্দুত্বের পরিচয় দিবে, একথা বোধ হয় সাহস সহকারে বলা যাইতে পারে।

সম্পাদক।

পূর্ব্ববঙ্গের রাজবংশ।

—:*:—

পুঁঠিয়া।

মুসলমান রাজত্বকালে রাজসাহী বিভাগের বিস্তৃতি, অনেক বৃহৎ ছিল। তৎকালে এই ভূভাগের কোন স্থানই রাজসাহী বলিয়া পরিচিত ছিল না। প্রাচীন কালে এই বিভাগ প্রকৃত বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাজসাহীর উত্তরে দিনাজপুর ও বগুড়া; পূর্ব্বে বগুড়া ও পাবনা; দক্ষিণে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ; পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ। রাজসাহীর বর্ত্তমান আয়তন পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬২ মাইল দীর্ঘ এবং ৫০ মাইল প্রশস্ত। রাজসাহী পদ্মার তীরে অবস্থিত। বাঙ্গালার বহু প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সহিত রাজসাহীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

পুঁঠিয়ার রাজবংশ এ জেলার অতি প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত ঘর। পুঁঠিয়া সদর ষ্টেসন হইতে নাটোর যাইবার মধ্য পথে অবস্থিত। এই রাজবংশের প্রধান তালুক লস্করপুর (১) পদ্মার দুই তীরে অবস্থিত।

জনশ্রুতি আছে যে, এক সময় পুঁঠিয়াতে এক আশ্রম ছিল তাহাতে বৎসাচার্য্য নামে এক নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। তন্ত্র, জ্যোতিষ ও অন্যান্য বহু শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার বিষয়-বাসনা একেবারেই ছিল না। তিনি ধন-জনে বীতস্পৃহ ছিলেন।

এক সময় বাঙ্গালার সুবাদার, দিল্লীর সিংহাসনের অধীনতা পাশ হইতে বাঙ্গালা প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে এক বিদ্রোহ ঘোষণা

(১) বর্ত্তমানে সমুদায় লস্করপুর পুঁঠিয়া রাজবংশের হাতে নাই, নানাকারণে হস্তান্তরিত হইয়াছে। লস্করপুর ব্যতীতও ইঁহাদের অন্যান্য জমিদারী কম নহে।

করেন। দিল্লীশ্বর এই বিদ্রোহীর সমুচিত শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন (৩)। নবাব-সৈন্য আসিয়া বৎসাচার্য্যের আশ্রম-সন্নিকটে শিবির:সন্নিবেশিত করেন। সেনাপতি, লোক মুখে বৎসাচার্য্যের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে অভিলাষী হন। যথাসময়ে আচার্য্যের দর্শন লাভ করিয়া সেনাপতি তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার উপ-দেশানুসারে বিদ্রোহী সুবেদারকে বশীভূত করিতে সক্ষম হন।* সেনাপতি নিজ কার্য্য শেষ করিয়া প্রত্যাগমন কালে আচার্য্যের পর্ণ কুটীরে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহাকে দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে কিছু সম্পত্তি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অর্থ-বিরাগী আচার্য্য ঘৃণার সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু সেনাপতির বিশেষ আগ্রহে তৎপুত্র পীতাম্বর তাহার সঙ্গে দিল্লী গমন করিলেন। তাঁহারা দিল্লী আসিয়া শুনিলেন বরেন্দ্রভূমির জায়গীরদার লস্কর খাঁর (১) মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং এই শুভ সুযোগে সেনাপতি পীতাম্বরকে সম্রাট্ সমীপে পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্রাট গেয়াস উদ্দীন তগলক (১৩২১—২৫) তাঁহার গুণগ্রামের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে লস্কর খাঁর জায়গীর "লস্করপুর" প্রদান করিলেন। কিছু দিন পর পীতাম্বর কালগ্রাসে পতিত হইলে, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বর এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন।

নীলাম্বরের পুত্র আনন্দরাম বঙ্গের সুবাদার ফকিরুদ্দিন কর্ত্তৃক রাজো-পাধি লাভ করেন (২) এই বংশ রাজোপাধি ও বিপুল সম্পত্তির অধিকারী

(১) আলাইপুর লস্কর খাঁর আবাস বাটী ছিল। পদ্মার দক্ষিণ তীরে আলাইপুর অবস্থিত।

(২) মহারাণী শরৎসুন্দরী—৪৩ পৃঃ।

(৩) After some tim es the subadars conspired against the Emperor, and determined to withhold the rents. For the purpose of checking their insubordination, the Emperor sent a General with suitable force. *Calcutta Review* 1873.

হইলেও, বহু বৎসর পর্য্যন্ত বৎসাচার্য্যের সদাচার ও যোগনিষ্ঠা প্রচলিত ছিল এবং সেইজন্য ইঁহার পুত্র রতিকান্তকে দেশস্থ লোকে "ঠাকুর" উপাধিতে অভিহিত করেন। বাঙ্গালার সুবাদারও ঐ উপাধি অনুমোদন করেন। বর্ত্তমান সময়ও পুঁঠিয়ার রাজবংশকে সাধারণে ঠাকুর বংশ নামে অভিহিত করিয়া থাকে। বৎসাচার্য্যের পাদুকা যুগল, পুঁঠিয়া রাজধানীতে আজও সসম্মানে পূজিত হইয়া থাকে। এই কাষ্ঠ পাদুকা প্রায় ১৬ ইঞ্চি লম্বা।

রতিকান্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামচন্দ্র সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি রাজধানীতে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। রামচন্দ্রের তিন পুত্র—নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, জয়নারায়ণ। রামচন্দ্র পরোলোক গমন করিলে জ্যেষ্ঠ নরনারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। নরনারায়ণের সময় নাটোর বংশের আদিপুরুষ কামদেব বারৈহাটী পরগণার তহসীলদার নিযুক্ত হন।

দর্পনারায়ণের সময় কামদেবের পুত্র রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদে পুঁঠিয়া রাজ সরকারের উকীলের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই রঘুনন্দনই নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় আনন্দনারায়ণ পুঁঠিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সহিতই লস্করপুরের বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্তে লস্করপুরে জমা ১৮৯৫৬২।০ ধার্য্য হয়। আনন্দ রামের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে রাজেন্দ্র নারায়ণ "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই রাজেন্দ্র নারায়ণ পুঁঠিয়ার চারি আনা অংশের রাজা।* রাজেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে তাজপুর নিবাসী হরি নাথ সান্যালের কন্যা সূর্য্যমণির বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পকাল পরেই রাজা

* যাহাকে সাধারণতঃ চারি আনা বলা যায় তাহা বাস্তবিক ১৩—ক্রান্তি অংশ।

পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার বিধবা পত্নী সূর্য্যমণি পতির সম্পত্তির অধিকারিণী হন। সূর্য্যমণি একজন বুদ্ধিমতী এবং রাজ-কার্য্যে সুপটু ছিলেন। ১২১৪ বঙ্গাব্দে তদীয় বংশধর জগৎ নারায়ণ পরগণা পুখুরিয়ার (ময়মনসিংহ জেলায়) কালিগ্রাম, কালিসাকা, কালিহাটা (রাজসাহী) ভবানন্দ দিয়াড় (নদীয়া) এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র জমিদারী ক্রয় করেন। এইরূপে জগৎ নারায়ণ বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হন। তিনি বিশাল সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেও সৎকর্ম্মান্বিত, মহানুভব, পরোপকারী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি কাশীতে গঙ্গার ঘাট বাঁধাইয়া দেন, অতিথি-শালা নির্ম্মাণ করেন। রোগীকে পথ্য, শীতার্ত্তকে বস্ত্রদান, দরিদ্রকে অন্ন দান তাঁহার দ্বারে অবারিত ছিল। ১২১৬ বঙ্গাব্দে ইনি বংশানুক্রমিক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১২২৩ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে তাঁহার পুণ্যময় জীবন অনন্তের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়ে। তাঁহার বিধবা পত্নী রাণী ভুবনময়ী পুঁঠিয়াতে শিবস্থাপনা করেন। এই উপলক্ষে বহুব্রাহ্মণ নাখেরাজ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জগন্নারায়ণের পৌত্র যোগেন্দ্র নারায়ণ বাঙ্গালা ১২৪৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সে পিতৃ হীন হইলে, সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হয় এবং তিনি "ওয়ারডস্ ইনষ্টিটিউসনে" বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। কিন্তু নানা কারণে ও সাংসারিক চিন্তায় বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা ১২৬২ সালের বৈশাখ মাসে যোগেন্দ্র নারায়ণ পুঁঠিয়া নিবাসী ভৈরবনাথ সান্যালের সাড়ে পাঁচবৎসরবয়স্কা কন্যা শ্রীমতী শরৎসুন্দরীর পাণি গ্রহণ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই যোগেন্দ্র নারায়ণের মাতা দুর্গা সুন্দরী পরলোক গমন করেন। এদিকে গৃহে শরৎসুন্দরী অভিভাবক-শূন্যা।

(১) শরৎসুন্দরীর জীবনী লেখকের মতে যোগেন্দ্রনারায়ণ বৎসাচার্য্য হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ পর জন্ম গ্রহণ করেন।

অবশেষে ১২৬৭ সালে যোগেন্দ্র নারায়ণ স্বহস্তে জমিদারীর ভার গ্রহণ করিয়া সুশীলা পত্নীর সহবাসে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। যোগেন্দ্র নারায়ণ রাজ্য ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই প্রজারা নীলকরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতেছিল; তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির পর তাহারা রীতিমত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যোগেন্দ্র নারায়ণ তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, প্রজা রক্ষার জন্য প্রাণপণে সাহায্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে নীলকরের হস্ত হইতে প্রজার কষ্ট মোচন করিতে পারিলেন বটে, কিন্তু নিজেকে আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। অতিরিক্ত চিন্তায় ও পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। যৌবনের প্রারম্ভে ১২৬৯ বঙ্গাব্দে ২৯শে বৈশাখ তারিখে ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

যোগেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর সময় তাঁহার ত্রয়োদশ-বৎসর-বয়স্কা পত্নী শরৎসুন্দরীর হস্তে এই বিশাল পুঁঠিয়া রাজ সরকারের ভার অর্পিত হইল। রাণী শরৎসুন্দরী পঞ্চদশ বৎসর বয়সে ১২৭২ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ হইতে সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। তৎপর ১২৭৩ সালে মাঘ মাসে যতীন্দ্র নারায়ণকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ১২৮৭ সালে ফাল্গুন মাসে দত্তকের বিবাহ হয়। দত্তকের পত্নীর নাম রাণী হেমন্ত কুমারী দেবী।

দেবী শরৎসুন্দরী বঙ্গীয় রমণী কুলের শিরোভূষণ। ইঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র, পবিত্র দেবভাব, দানশীলতা ও সহানুভূতি জগজ্জনের আদর্শ। নারী চরিত্র কতদূর উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে; মানবীয় কুপ্রবৃত্তিনিচয় ধর্ম্মচর্চ্চার মহীয়সী শক্তিতে কতদূর পর্য্যন্ত নিস্তেজ হইতে পারে, এই দেবী তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও আহার, বিহার, ভোগ-বিলাসকে পদতলে দলিত করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য, পরোপকারের জন্য আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই উনবিংশশতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বিপুল সংঘর্ষে বঙ্গীয় ললনাগণ ভোগ-

বিলাসে অনুক্ষণ নিরত রহিয়াছেন, কিন্তু সেই সময় পবিত্র-চরিত্রা দেবী শরৎসুন্দরী পূর্ণ-যৌবনা অতুল বৈভবের অধীশ্বরী হইয়াও প্রাচীন ভারত মহিলাগণের আদর্শরূপিণী লক্ষ্মী ছিলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ২৫শে ফাল্গুন এই লক্ষ্মীস্বরূপিণী শরৎ সুন্দরী কাশীধামে দেহত্যাগ করেন।

মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবদ্দশায় ১২৯০ সালে তাঁহার দত্তক পুত্র কুমার যতীন্দ্র নারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্য ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু হায়! সেই বৎসর ফাল্গুন মাসেই দুর্জ্জয় কাল, ছয় মাসের গর্ভবতী পত্নীকে ফেলিয়া তাঁহাকে অকালে হরণ করিল। ১২৯১ সালের আষাঢ় মাসে রাণী হেমন্তকুমারী এক কন্যারত্ন প্রসব করেন। কুমার যতীন্দ্র নারায়ণের পরলোক গমনের পর মহারাণী তাঁহার পুত্রবধূকে সমাদরে নিকটে রাখিতেন, কিন্তু এই সময় পুত্রবধূ ও তাঁহার মধ্যে মনান্তর ঘটাইবার জন্য একদল লোক জুটিল। মহারাণী তাহা জানিতে পারিয়া পুত্রবধূ-বয়ঃ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে সম্পত্তি পরিচালনের চেষ্টা করেন এবং স্বয়ং তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন। তীর্থ-পর্য্যটন-ক্লেশে ও নানা অনিয়মে তিনি শয্যাগত ও কাতর হইয়া পড়েন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন টেলিগ্রামে খবর প্রাপ্ত হন যে, সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যাইবে না। তাঁহার কাশী প্রাপ্তির পর তাঁহার পুত্রবধূ রাণী হেমন্তকুমারী দেবী স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হন।

রাণী হেমন্ত কুমারী অল্প বয়সে এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলে বহু আত্মীয় স্বজন আসিয়া যোগ দিল এবং নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের উপায় খুঁজিতে লাগিল। এই সময় যোগেন্দ্র নারায়ণের মাসীর পুত্র জয়নাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি সম্পত্তির দাবী করিয়া এবং দত্তক অসিদ্ধ বলিয়া রাজসাহীর জজ আদালতে নালিশ উপস্থিত করে কিন্তু আদালতে দত্তক পুত্র সিদ্ধ হইল। এই মোকদ্দমার পর হইতেই স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। রাণী নিজহস্তে কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন।

পুঁঠিয়া-রাজবংশ

বৎসাচার্য্য —
তাম্বর
নীলাম্বর
*অনন্তরাম (আনন্দরাম)
পুষ্করাক্ষ
রতিকান্ত
রামচন্দ্র ঠাকুর (পুঁঠিয়ারাজ)
রূপনারায়ণ
দর্পনারায়ণ
নরনারায়ণ
জয়নারায়ণ
প্রেমনারায়ণ
নরেন্দ্রনারায়ণ
ভূপেন্দ্রনারায়ণ
জগন্নারায়ণ মহিষী রাণী ভুবনময়ী
হরেন্দ্রনারায়ণ
যোগেন্দ্রনারায়ণ মহিষী মহারাণী শরৎসুন্দরী
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ মহিষী হেমন্তকুমারী
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার
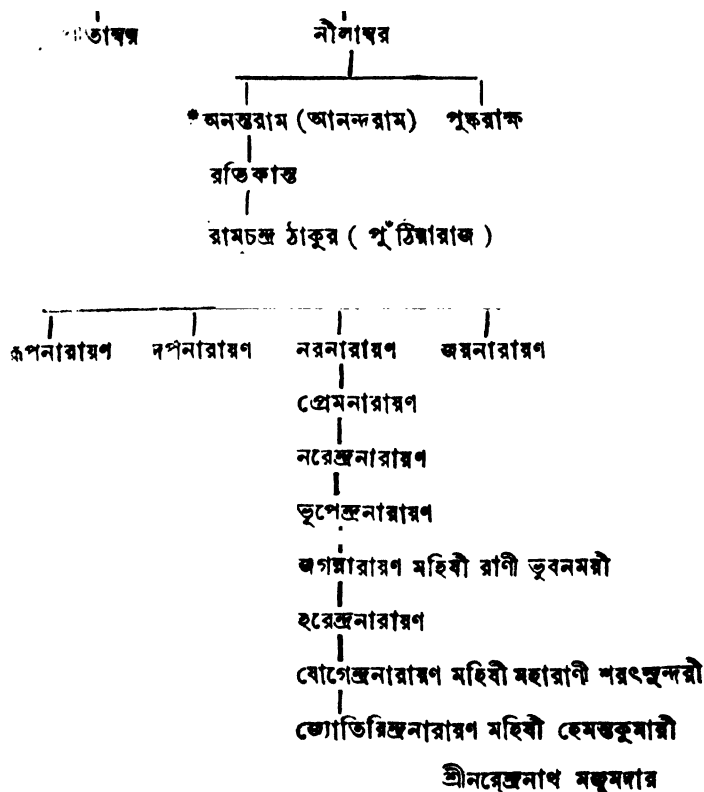
চীনের উৎসব।

বহু প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ও চীনে সভ্যতার আলোক প্রথম জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই আলোকে আজিও জগতের কত জাতি আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রাচীন সভ্য জাতিদ্বয়ের মধ্যে চীনেরা বড়ই আমোদ ও উৎসবপ্রিয় এবং তাহাদের উৎসবগুলিও বেশ কৌতূহলপ্রদ। এই প্রাচীন জাতির উৎসবগুলি আমরা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

লণ্ঠনোৎসব—(Sai-teng—Feast of the Lanterns)

এই আড়ম্বর-বিশিষ্ট উৎসবের প্রধান অংশ প্রথমমাসের পঞ্চদশ দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। চীনেরা এই উৎসবকে 'লণ্ঠনোৎসব' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। উৎসবের পূর্ব্বরাত্রে রাজপ্রাসাদ হইতে ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা নাগরিকগণকে 'কল্য এই উৎসব সমাধা হইবে' জ্ঞাপন করা হইয়া থাকে; এই ঘণ্টার প্রথমধ্বনির সহিত প্রাসাদ এবং দুর্গপ্রাচীর হইতে বহুসংখ্যক গোলাগুলি বর্ষণ হইয়া থাকে। এই সময় তুরী, বড় বড় কাড়া-নাকড়া ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রাদিও বাজিয়া থাকে। রাজ্যের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বড় বড় নগরে এইরূপে এই উৎসব-সংবাদ বিঘোষিত হইয়া থাকে। পরদিন সর্ব্বত্র আলো প্রজ্বলিত করা হইয়া থাকে; অসংখ্য নানাবর্ণের লণ্ঠন বৃক্ষগাত্রে, পথিমধ্যে, গৃহস্থের বাটীতে বাটীতে ঝুলান-হইয়া থাকে ও এই সময় দুর্গ, মন্দির, জাহাজ, হস্তী প্রভৃতি জীবজন্তু-বিশিষ্ট নানারূপ আতসবাজী পোড়ান হয়। দীপমালার আলোক ও আতসবাজির অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করে। দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীত-বাদ্যের দ্বারা দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করা হইয়া থাকে।

দর্শকবৃন্দের আনন্দধ্বনি এবং মন্দির ও মঠাদি হইতে তুরী-নিনাদ ও ঘণ্টার শব্দ ধ্বনিত হইতে থাকে।

Isbrante Ides সাহেব একবার চৈনিকদিগের এই উৎসবের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, এক লক্ষ লোক যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হয়, সেইরূপ ভীষণ গোলমাল পিকিং নগরে শ্রুত হইয়া থাকে। Le Compte বলেন যে, রাজ্যের সর্ব্বত্র এই উৎসবের সময় সাধারণতঃ যে লণ্ঠন * জ্বালান হয়, তাহার সংখ্যা ন্যূনকল্পে দশ লক্ষ হইবে। এই উৎসবের সময় সমস্ত কার্য্য বন্ধ থাকে। অসংখ্য দেব-মূর্ত্তির মিছিল রাজপথ দিয়া চলিয়া যায় এবং পুরোহিত ও সন্ন্যাসীরা গন্ধ-পাত্র ও গীতবাদ্যের সহিত তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। পরদানসীন পদস্থা রমনীগণকে এই উৎসবে পিকিং নগরীর রাস্তা দিয়া অশ্বারোহণে গমন করিতে দেখা যায়। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা রেশম অথবা কাল ফিতা ইত্যাদি দ্বারা বেণী দীর্ঘ করিয়া অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া গর্দ্দভারোহণে গমন করেন। সম্ভ্রান্ত মহিলারা লঘু দ্বিচক্র-বিশিষ্ট একাশ্ব-যানে গান গাহিয়া বাজনা বাজাইয়া বা ধূমপান করিতে করিতে গমন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে এক একজন দাসী গমন করিয়া থাকে। চীন রমণীরা এই উৎসবে এরূপ মহার্ঘ বেশভূষা পরিধান করেন যে, তাঁহাদের মিতব্যয়ী স্বামী বেচারীদিগকে সম্বৎসরের অন্যান্য খরচ কমাইতে বাধ্য হইতে হয়। (১)

* চীনেরা অতি সুন্দর সুন্দর লণ্ঠন প্রস্তুত করে। এই সকল লণ্ঠন কাচ, রেশম, কাগজ, শৃঙ্গ প্রভৃতি নানাদ্রব্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক একটী চীনদেশীয় লণ্ঠনের মূল্য ৭০০ টাকা পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। ইহাতে চীনদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশের সর্ব্বত্রই তাহাদের এরূপ নানারকমের বহু উৎসব প্রচলিত আছে এবং এই সকল উৎসবে সমগ্র জাতি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া থাকে।

"অনুসন্ধান"——৩১শে আষাঢ়——১২৯৯ দ্রষ্টব্য।

(১) Vide Martini Martini Sinica Historia ; ·Navaretta ; Nouveaux Memoires sur e' Etat present de la Chine—Louis le Compte ; & Du Halde.

এই উৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কোন একজন দুশ্চরিত্র সম্রাট্ তনয় দিনমানকে রাত্রিতে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিয়া এবং সূর্য্যালোক ও চন্দ্রালোকের আবশ্যকতা দূর করিবার জন্য প্রাসাদ অসংখ্য লণ্ঠনদ্বারা সজ্জিত করিয়াছিলেন। (২) এই উৎসবও আমাদিগের 'দেওয়ালী' উৎসবের মত।

নববর্ষোৎসব (Ywen-ji বা Sin-nyen—New year's Festival)—বৎসরের শেষ দিনের সন্ধ্যাকালে প্রত্যেক পরিবারই বলি দিয়া দেবতার পূজা করিয়া থাকে এবং পানোৎসব ও আমোদ-আহ্লাদে (Song-nyen-kyung) পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়া থাকে। বর্ষের প্রথম দুই দিন ভোজ, গান, বাদ্য, নর্ত্তন, বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট উপহার প্রেরণ করা ও অন্যান্য ক্রীড়া কৌতুকে এই উৎসব সুসম্পন্ন করা হইয়া থাকে। এই উৎসব বৎসরের শেষ মাস হইতে পর বৎসরের প্রথম মাসের ২০শে তারিখ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে তাহাদের সমস্ত কার্য্য, আদালত, এমন কি রাজ্যের সর্ব্বত্র ডাক পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে, এবং এই উৎসবে রাজ্যের প্রায় সমস্ত লোকই আমোদ-আহ্লাদে সময় অতিবাহিত করে। (৩) অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা পটকা (P'hao-cho) আতসবাজী ইত্যাদি বাজী পোড়াইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া থাকে। পরদিন প্রাতঃকালে পোড়ান বাজীর অবশিষ্ট অংশ রাস্তায় এরূপভাবে পড়িয়া থাকে যে, পদব্রজে চলিয়া যাওয়া ভার

(২) Vide Encyclopaedia Metropolitana—Vol. XIX—Page 569.

(৩) Vide Nouvelle Relation de la Chine—G. de Magaillans ; Nouveaux Memoires sur l' Etat present de la Chine—Louis le Compte ; Brevis Relatio de numero Chistianorum apud Sinas—Martini ; Embassy from the East India Company of the United Provinces to the Grand Tartar Cham, Emperor of China—Nieuhoff—(Englished by J. Ogilby) —Description Geographique, Historique, Chronologique, Politique, et Physique de l' Empire Chine, &c.—Par. J. B. du Halde and Samnel Kidd's China.

হইয়া পড়ে। এই উৎসবের সময় সমস্ত হিসাব-নিকাশ সমাধা করিয়া ফেলিতে হয়, এবং ইহা না করিলে পাওনাদার ঋণীব্যক্তির গৃহের দরজা পর্য্যন্ত খুলিয়া লইয়া যায়। (৪) নববর্ষোৎসবের দিন প্রত্যেক লোক উত্তম পোষাক পরিধান করে, দ্বারদেশে লাল কাগজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ঝুলাইয়া থাকে ও বন্ধু-বান্ধবদিগের বাটীতে আনন্দ প্রকাশ করিতে গমন করে। এই উৎসবের সময় প্রত্যেক লোকই নূতন জুতা পরিধান করিয়া থাকে ও বাটীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ লণ্ঠনদ্বারা সুসজ্জিত করে।

দার্শনিক পণ্ডিত কন্‌ফিউসিয়াসের স্মরণার্থ দুইটী উৎসব।

কন্‌ফিউসিয়াসের (কংফুচি)* সম্মানের জন্য দুইটী উৎসব প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটী বসন্তকালে ও অপরটী শরৎকালে সম্পন্ন হইয়া থাকে। একটী প্রকাণ্ড হলঘর মধ্যে এই দার্শনিক পণ্ডিতের প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। প্রতি বৎসর তাঁহার স্মরণোদ্দেশে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। চীনদিগের সম্রাট্ "কাংহি" ইহা একপ্রকার সাকার মূর্ত্তির উপাসনা বলিয়া প্রজাবৃন্দকে 'কন্‌ফিউসিয়াসের' মূর্ত্তির সকাশে উৎসবাদি করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। পূজার পরিবর্ত্তে তিনি একটী মেজের উপর দার্শনিক পণ্ডিতের নাম ও প্রশংসা-সূচক বাক্যাবলী খোদিত করিয়া দেন; এক্ষণে এই উৎসবে তাঁহার প্রশংসালিপির নিকট লোকেরা জানু পাতিয়া যতক্ষণ না মস্তক ভূমি স্পর্শ করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা নয়বার সাষ্টাঙ্গে পতিত হয়। পরে মদ্য, খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূলাদি সম্বলিত নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া দেয়।

(৪) Vide The Popular Encyclopedia—Vol. III—P. 313.

* "চীনের ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে দার্শনিক পণ্ডিত কন্‌ফিউসিয়াসের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে—লেখক।

সর্পাকৃতি তরী—Dragon Boats।

পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিবসে (সাধারণতঃ জুনমাসে) চীনেরা লম্বা লম্বা সঙ্কীর্ণ তরী সকল নির্ম্মান করিয়া নদীতে ভাসাইয়া থাকে। এই সকল তরীর দাঁড়বাহকদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত ইহাদিগের ভিতর একটা কাড়া-নাকড়া লইয়া অনবরত বাদ্যধ্বনি করা হইয়া থাকে। ইংরাজদিগের যেরূপ Oxford ও Cambridgeএ Boat race হইয়া থাকে ও আমাদের দেশে 'বাজ' খেলা যেরূপ, এই উৎসবেও ঠিক সেইরূপ তরীর race হইয়া থাকে।

Fang-Fong-Tsang (ফ্যাঙ্গ্-ফোঙ্গ্-সঙ্গ্)

নবম মাসের নবম দিবস চীনদিগের ঘুড়ী উড়াইবার প্রশস্ত দিবস। এই সময়ে তাহারা তাহাদিগের চিন্তা ও দুঃখ বাতাসের গতিতে উড়াইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত নানাবর্ণে রঞ্জিত ঘুড়ী উড়াইয়া থাকে; চীনদিগের বিশ্বাস, এইরূপ কার্য্য করিলে তাহাদের চিন্তা ও দুঃখ অপহৃত হইবে। চীনদিগের মধ্যে এই উৎসব সম্বন্ধে এইরূপ একটী প্রবাদ-বাক্য স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

"সে আজ কতদিনের কথা তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে না" পুরাকালে কোন এক সময় জনৈক ধার্ম্মিক চীন স্বপ্নে জানিতে পারে যে, সেই নবম মাসের নবম দিনে, তাহাদের উপর এক অজ্ঞাত বিপদ পতিত হইবে। সেই নবম দিন আসিতে আর দুই দিন মাত্র তখন বাকী ছিল, বেচারী অজ্ঞাত আশঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িলেন। ঐ দিবস আসিবার পূর্ব্বে কোন এক নিকটবর্ত্তী গিরিকন্দরে গিয়া সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নির্দ্দিষ্ট দিন অতিবাহিত হইলে, তিনি গৃহে ফিরিয়া দেখেন, তার গৃহ-পালিত সমস্ত পশুগুলি মরিয়া আছে। এই

ঘটনার পর হইতে ঐ দিনকে চীনেরা আজ পর্য্যন্ত 'অমঙ্গল দিন' বলিয়া মনে করে এবং সকলে গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে ঘুড়ী উড়ান উৎসবে দিনাতিপাত করিয়া থাকে।

শিশুর 'হাতে-খড়ি' উপলক্ষে উৎসব।—

৬ বৎসর বয়সের সময় শিশুর 'হাতে-খড়ি' হয়। হাতে-খড়ি একটী মহোৎসবের দিন।* আমাদিগের দেশের ন্যায় চীনেও শুভদিন দেখিয়া বালকগণের বিদ্যারম্ভ হয়।

জন্মদিনোপলক্ষে উৎসব।—ছেলেদের জন্মদিন একটী প্রধান আমোদ আহ্লাদ করিবার সময়। তৃতীয় দিবসে নব-প্রসূত সন্তানকে যথাবিধি স্নান করাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। শিশুর পিতামহী বা অন্য কোন অভিভাবিকা বিতরণার্থে নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া হংস ডিম্ব সকল গৃহস্থের বাটীতে প্রেরণ করিয়া থাকেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাহার শৈশবাবস্থার নাম-করণ হইয়া থাকে; কিন্তু কন্যাদের ঐরূপ কোন নামকরণ হয় না। তাহারা প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিংশতিবৎসর বয়ঃক্রমকালে যুবকদিগের পুনরায় নামকরণ (Tsa) হইয়া থাকে। প্রত্যেক পরিবারবর্গের মধ্যে একটি সাধারণ পদবীও (Sing) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রেতলোকের উদ্দেশে উৎসব। (Feast of the Manes)

চীনদিগের শেষ ঋতুর (Ts'hing-ming-tsye) প্রারম্ভে মৃত ব্যক্তির সমাধির উপর মৃত মৎস্য, পক্ষী, শূকর, ভেড়া প্রভৃতি দ্রব্য সজ্জিত করিয়া মৃতের প্রীত্যর্থে রক্ষিত হয়। এই সময় সমাধি সকলের সংস্কার হইয়া থাকে। উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে জানাইবার জন্য স্মারক-লিপিও খোদিত হইয়া থাকে।

* শ্রীযুক্ত ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিকের "চীন ভ্রমণ" ১৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অকবরস্থ ব্যক্তিদের আত্মার সদ্গতির জন্য উৎসব।—অকবরস্থ ব্যক্তিদের আত্মার সদ্গতির জন্য চীনেরা Shao-i-tse or Fang-shwei-teng সম্পন্ন করিয়া থাকে। চীনদিগের বিশ্বাস, যাহাদিগকে কবরস্থ করা না হয়, তাহাদিগের প্রেতাত্মা মানুষের নানাবিধ ক্ষতি করিতে পারে ও তাহাদিগের আত্মার সদ্গতি ও আপন আপন পরিবারবর্গকে প্রেতাত্মাদিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য সপ্তম মাসের প্রথম হইতে পঞ্চদশ দিবসব্যাপী (Yu-lan-shing-hwei) এক উৎসব সমাধা করিয়া থাকে। এই সকল প্রেতাত্মাদিগের সদ্গতির নিমিত্ত নানা-বর্ণ-রঞ্জিত কাগজের পোষাক পোড়ান হইয়া থাকে এবং চীনেরা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকে ও (Fo ও Tao-tseর) পুরোহিতবর্গকে মহাভোজ প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ করিলে তাহাদিগের বিশ্বাস, প্রেতাত্মা সহজেই 'আনন্দ-রাজ্যে' উপনীত হইতে পারে ও তাহাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে সক্ষম হয় না।

জলমগ্ন ব্যক্তিদের আত্মার সদ্গতির নিমিত্ত তাহারা পূর্ব্বোক্তরূপ অনুষ্ঠান করে ও আলোকমালায় সজ্জিত নৌকারোহণে উচ্চৈঃস্বরে 'জলদেবতার' স্তব করিয়া থাকে।

মৃত আত্মীয়দিগের মঙ্গলার্থ উৎসব।—চৈনিকদিগের সপ্তম মাসের প্রথম দিবসে (আগষ্ট মাসে) মৃত আত্মীয়বর্গের সদ্গতির নিমিত্ত চীনেরা একটী উৎসব করিয়া থাকে। বড় বড় মাদুরের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ঝাড়-লণ্ঠন প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করে এবং উহার মধ্যে মৃত আত্মীয়দিগের ও 'যমরাজের' (Yen Wang) মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করিয়া থাকে। মৃত ব্যক্তিদের সদ্গতির জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাহাদিগের মৃত আত্মীয়দিগকে স্বর্গের 'আনন্দ-রাজ্যে' যাইবার জন্য পূজা ও রাশি রাশি কাগজের পোষাক পোড়ান হইয়া থাকে। এই উৎসবে

তাঁহাদিগের ব্যবহারার্থ খাদ্যদ্রব্য ভারে ভারে সজ্জিত করিয়া রাখা হয়।

কথিত আছে, স্ত্রী-বিয়োগকাতর কোন এক যুবা যমরাজকে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া নরক হইতে আপনার স্ত্রীকে আনয়ন করিতে গিয়া (চীনদিগের মনোভাবের অত্যন্ত উপযোগী) আপনার জননীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই উৎসব চীনেরা সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস, এই উৎসব সম্পন্ন করিলে তাহাদিগের মৃত আত্মীয়দিগের আত্মার সদগতি লাভ হইবে। * বর্ত্তমান সংখ্যায় এই উৎসবের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

বাসন্ত বিষুবোৎসব।—২৩শে মার্চ্চ এই প্রসিদ্ধ উৎসব চীনেরা সমারোহে সম্পন্ন করিয়া থাকে। মদ্যপানে বিরত থাকিয়া ও সংযমী হইয়া সম্রাট্ স্বয়ং এই উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। তিনি বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মাঠে গিয়া স্বহস্তে লাঙ্গলের দ্বারা খানিকটা মৃত্তিকা খনন করেন ও সেইস্থানে প্রথমে বীজ বপন করেন। চীনদিগের বিশ্বাস, সম্রাট্ কর্ত্তৃক প্রথম ভূমি কর্ষিত হইলে ধরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সন্তুষ্ট হইবেন ও তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে শস্য দিবেন। পরে 'ধরিত্রী দেবীর' মন্দিরে একটী গরু উৎসর্গ করিয়া দেয় এবং ঐ গরুর অনুরূপ একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেবীর সম্মুখে আনা হয়; পরে উহা ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লোকজনদিগের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে।

বিষুবোৎসব ও অয়নান্তোৎসব।—T'hyen বা 'সর্ব্বনিয়ন্তার মন্দিরকে 'আকাশের বেদী' (The Altar of the sky—T'hyen-t'han) বলিয়া চীনেরা অভিহিত করিয়া থাকে। ইহা দেখিতে 'ধরিত্রীর

* "China"—By John Francis Davis, Bart., K. C. B., F. R. S. &c., Late Her Majesty's Plenipotentiary in China and Governor and Commander-in-Chief of the Colony of Hong Kong—Vol I—p. 354.

মন্দিরের' স্থায় (Temple of Earth—Ti-t'han)। পিকিং সহরে এই মন্দির অবস্থিত। 'সর্ব্বনিয়ন্তা' ঈশ্বরের উদ্দেশে চীনেরা বৎসরের মধ্যে দুইবার দুই প্রধান উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। প্রথম উৎসবের নাম বিষুবোৎসব ও দ্বিতীয়টীর নাম অয়নান্তোৎসব। প্রথমটী দক্ষিণ অয়নান্তের সময় (Tong chi) ও শেষটী উত্তর অয়নান্তের সময় (Hya-chi) সম্রাট্ কর্তৃক মহাসমারোহে সংসাধিত হইয়া থাকে। এই উৎসবদ্বয়ে তিনি স্বয়ং দেবতার প্রীত্যর্থে মৃত গরু, শূকর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির অর্ঘ প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত উৎসবের স্থায় সম্রাট্ স্বয়ং ইহাতে ব্রতী থাকেন না, তিনি অর্ঘ প্রদান করিয়া চলিয়া যাইলে তাঁহার অনুমতি অনুসারে তাঁহার নিয়োজিত কোন একজন রাজকুমার আসিয়া সূর্য্যের সম্মানার্থ, তাতার প্রদেশের ঠিক উত্তরদিকে অবস্থিত, 'সূর্য্যের মন্দিরে' (Ji-t'han) সূর্য্যদেবের উপাসনা ও ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া থাকেন। জল বিষুব (T'hsyeu-fen) কালে নগরের পশ্চিম উপকণ্ঠে অবস্থিত 'চন্দ্রদেবের মন্দিরে'ও (Ywei t'han) ঠিক সূর্য্য উপাসনার মতই 'চন্দ্রদেবেরও' উপাসনা হইয়া থাকে। রাজকুমার ও অন্যান্য পুরোহিতদিগকে এই দুই সময়ে সংযমী ও শুদ্ধান্তঃকরণের সহিত এই উৎসবের কার্য্য সমাধা করিতে হয়। এই প্রধান উৎসবের তিন দিন পূর্ব্ব হইতে সম্রাট্ স্বয়ং এই কার্য্যে উৎসাহ দেখাইয়া থাকেন। প্রত্যেক পুরোহিতগণকে পূজার দিন অনশনে থাকিতে হয়। খাঁটী সুবর্ণ পাত্র এই পবিত্র উৎসবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র দেবমন্দিরে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয়। অর্ঘ প্রদানের সময় সম্রাট্ স্বয়ং "সর্ব্বনিয়ন্তা আদিদেবকে" (Supreme Spirit—Shang-ti) সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

বসন্তোৎসব।—চীনদিগের নববর্ষের প্রারম্ভে সূর্য্যদেব, যখন কুম্ভ

রাশিতে(১) প্রবেশ করেন, তখন তাহারা কৃষিকার্য্যের উপর তাহাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। প্রত্যেক রাজধানীর প্রধান কর্ম্মচারী রাজকীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া "বসন্তদেবের" অভ্যর্থনার্থ সদলবলে রাজবর্ত্ম দিয়া গমন করিয়া থাকেন। নানা বেশভূষায় ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত বালক-বালিকারা সজ্জিত শিবিকারোহন করিয়া মিছিলের সহিত যাত্রা করে। এই সময় বালক-বালিকারা চীনদিগের পৌরাণিক ব্যক্তিগণের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। মিছিলের সহিত গীতবাদ্যও হইয়া থাকে। চীনদিগের "বসন্তদেব" একটি অদ্ভুত দৃশ্য। সুবৃহৎ কর্দ্দম-নির্ম্মিত মহিষের মূর্ত্তিই 'বসন্তদেবের' মূর্ত্তি। মহিষেরা কর্দ্দমাক্ত জলাশয়ে থাকিতে ভালবাসে এবং কর্দ্দমাক্তস্থানে শস্য প্রচুর পরিমাণে অল্প আয়াসে পাওয়া যায় বলিয়া তাহারা মাটীর মহিষ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। জনতা এই মহিষ স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়। আমাদিগের দেশে জগন্নাথদেবের রথরজ্জু ধরিতে যেরূপ লোকের আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, চীনদিগের এই মূর্ত্তির অঙ্গস্পর্শ করিতেও সেইরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। জনতা যখন রাজকর্ম্মচারীর নিজ প্রাসাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তিনি 'বসন্তদেবের পুরোহিত'-রূপে কৃষিকর্ম্মের উন্নতির জন্য সকলকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে উপদেশ দেন, কারণ চীনদিগের মতে, কৃষি-কর্ম্মের উন্নতিতে জাতীয় উন্নতি। পরে 'বসন্তদেবের' মূর্ত্তিকে তিনবার চাবুকদ্বারা আঘাত করেন। আঘাতান্তে তিনি চলিয়া যাইলে জনতার প্রত্যেক লোক লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া মহিষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয়। এই মূর্ত্তির ভিতর ফাঁপা; উহার ভিতর নানাপ্রকার ছোট ছোট মূর্ত্তি থাকে। সেই সকল মূর্ত্তির অংশ বিশেষ

(1) 15° of Aquarius—(The Commencement of the Chinese Civil year).

পাইবার জন্য সকলেই যত্নবান হয়।* প্রাচীন ইজিপ্টদেশের 'বৃষোৎ-সব' (Worship of Apis) ও কতকটা এইরূপ ছিল।

প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ হওয়ায় চীন সম্রাটের জন্মদিনোপলক্ষে উৎসব ও অন্যান্য উৎসব এই প্রবন্ধে স্থান পাইল না। বারান্তরে উহার আলোচনা করা যাইবে। চীনদিগের বিবাহকালীন উৎসব 'চীনে বিবাহ-প্রথা' শীর্ষক প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করা হইয়াছে। (১)

এই উৎসবগুলি হইতে আমরা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ দেখিতে পাই, চীনেরা প্রকৃতির পূজায় বিশেষ মনোযোগী। বাসন্তবিষুবোৎসবে মহা-প্রতাপশালী সম্রাট্ স্বয়ং মৃত্তিকা খনন করিয়া বীজবপন করিয়া প্রকৃ-তির পূজা করিতেছেন। হলকার্য্যকে চীনেরা ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া মনে করে না। প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের ন্যায় তাহারা হলকার্য্যে আত্মশ্লাঘা বোধ করে। কালক্রমে যখন চীনের অধিবাসীরা অলস হইয়া এই কার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে লাগিল, সম্রাট্ স্বয়ং তখন তাহাদের অগ্রণী হইয়া দেখাইয়া দিলেন, শস্যোৎপাদন ঘৃণিত কার্য্য নয়। বসন্তোৎসবে প্রধান রাজকর্ম্মচারী 'বসন্তদেবের' প্রীত্যর্থে পুরোহিত হইয়া পূজা করিয়া থাকেন; শুধু তিনি পূজা করিয়াই ক্ষান্ত হন না, কৃষি কর্ম্মের উন্নতির জন্য তিনি নাগরিক লোকদিগকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে বলেন ও ঐ বিষয়ে বক্তৃতাও করিয়া থাকেন। বিষুব ও অয়-নান্ত উৎসবে সর্ব্বত্রয়ের মূল কারণ সূর্য্যদেবের ও চন্দ্রদেবের পূজা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ চক্ষু মেলিয়াই মানব সূর্য্যদেবের কিরণচ্ছটা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়—পরে জ্ঞানের উন্মে-ষের সহিত জানিতে পারে, সূর্য্যকিরণ না হইলে কোন দ্রব্যই পাওয়া যায়না, তখন মানবপ্রাণ স্বতঃই সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া থাকে।

* Davis' "China"—Vol. I.—Page 351.

(১) "মানসী"—মাঘ—১৩১৬ দ্রষ্টব্য।—লেখক।

আদিম মানব প্রকৃতিতে যাহা কিছু শক্তিমান দেখে, তাহারই নিকট প্রথমে মস্তক নত করিয়া থাকে ও ভক্তির সহিত তাহার পূজা করিয়া থাকে। জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত যখন জানিতে পারে, শক্তিমান কোথা হইতে শক্তি পাইল? তখন প্রকৃতি পূজায় মনে আর শান্তি পায় না। তখন শক্তিমানের পশ্চাতে যে মহাশক্তি বিরাজ করিতেছেন, মানব সেই মহাশক্তির——বিশ্বস্রষ্টার চরণতলে পড়িয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে। চীন দেশের এই দুই উৎসব হইতে আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির পূজা করিয়া প্রকৃতির নিয়ন্তা ও স্রষ্টা 'সর্ব্বনিয়ন্তার' পূজা চীনেরা করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা চীনদিগকে মৃত মহাপুরুষদিগের পূজা করিতে দেখিতে পাই। মৃত মহাত্মার সম্মান সকলদেশে সকলেই দেখাইয়া থাকে—চীনদেশেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আজিও চীনেরা দার্শনিক পণ্ডিত 'কন্‌ফিউসিয়াসের' উদ্দেশে মহাসমারোহে উৎসব করিয়া থাকে। প্রথমে যখন মহাপুরুষ পূজার সৃষ্টি হয়, তখন পৌত্তলিকতার নামগন্ধ তাহাতে ছিল না। ক্রমশঃ এই উৎসব মূর্ত্তিপূজায় পরিণত হইতে দেখিয়া চীন-সম্রাট্ 'কাংহি' 'কন্‌ফিউসিয়াসের' মূর্ত্তি-পূজা উঠাইয়া দিয়া তাহারস্থলে তাঁহার নাম মার্ব্বেল প্রস্তরে অঙ্কিত করিয়া পুষ্পাদির দ্বারা সজ্জিত করিয়া তাহার জন্য বাৎসরিক প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, মৃত মহাত্মার সম্মান যে যে ভাবেই করুক না কেন, জাতীয় জীবন গঠনের ইহা যে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, তাহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। চরিত্র গঠন করিতে হইলে, সম্মুখে আদর্শের আবশ্যক। মৃত মহাত্মাদের জীবনই আমাদিগের চরিত্র গঠনের আদর্শস্থল।

চীনেরা মৃত মহাত্মাদিগের পর আপনাদিগের আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশে হিন্দুদিগের শ্রাদ্ধাদির ন্যায় উৎসব করিয়া থাকে। হিন্দুরা

যেরূপ মৃতের সদ্গতির নিমিত্ত গয়া প্রভৃতি স্থানে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ চীনেরা মৃত আত্মীয়দিগের সদ্গতির জন্য উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত যে সকল মৃতের কবর হয় নাই, তাহাদিগের জন্যও সাধারণ উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে। এই উৎসব মৃত অশরীরীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। চীনদিগের বিশ্বাস, যাহাদিগের কবর হয় নাই অথবা যাহাদিগের অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদিগের আত্মা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না এবং তাহাদের আত্মা এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়। মনুষ্যের উপর সেই সকল প্রেতাত্মাদিগের ক্ষমতা অসীম। ইহাদিগের প্রীত্যর্থে চীনেরা একত্র মিলিত হইয়া উপাসনাদি করিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ নিরবচ্ছিন্ন আমোদের জন্যও চীনেরা কয়েকটী উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকে। 'নববর্ষোৎসব' সভ্যজগতের কোথায় অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাত' দেখিতে পাই না। চীনেরাও এই উৎসব খুব সমারোহে সম্পন্ন করিয়া থাকে। জন্মদিন উপলক্ষে ও বালকবালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসের সময় 'হাতে-খড়ি' উৎসবে ও 'লণ্ঠনোৎসবে' তাহারা আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই সকল উৎসব উপলক্ষে চীনেরা বেশ মিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়া থাকে। চীন রমণীদিগের 'লণ্ঠনোৎসব' ব্যতীত কোন উৎসবেই চীনেরা অধিক অর্থব্যয় করেনা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিয়ার্কস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভারত হইতে পারস্য পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূলবর্ত্তী জনপদ আবিষ্কার করিতে গ্রীক সম্রাটের একান্ত আগ্রহ হইয়াছিল। তিনি সহস্র বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া তাঁহার এই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এরিয়াণ বলেন, একটা কিছু নূতন ও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবার প্রবল ইচ্ছা সেকেন্দরের সকল দ্বিধা ও আশঙ্কা ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিল,—

His ambition, however, to be always doing something new and astonishing prevailed over all his serpues."

ঝেলম, চেনব এবং সিন্ধু বাহিয়া ধীরে ধীরে গ্রীকবহর সাগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। বহু বাধা-বিঘ্নহেতু স্থলসৈন্য মন্থর গতিতে দক্ষিণমুখে চলিয়াছিল। সুতরাং নদীর পোত বাহিনীকেও বাধ্য হইয়া পথিমধ্যে বিলম্ব করিতে হইল। প্রায় ১০ মাস ক্ষেপনী চালনা করিয়া নৌবহর সিন্ধুনদের মোহানাস্থিত বদ্বীপের শীর্ষস্থলে উপনীত হইয়া পট্টল (১) নামক স্থানে কিছু দিন বিশ্রাম করিল।

কানিংহাম সাহেবের মতে গ্রীকনৃপতি বর্ত্তমান জালালপুরে ঝেলম নদীর পশ্চিম তীরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন।* সম্মুখে অপর

* Plutarch, Arrian, Diodorus, Curtius, Strabo, Justin, Ptolemy, Pliny প্রভৃতি গ্রীক লেখকগণ সেকেন্দরের ভারতাক্রমণ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

(1) পট্টল বা পাটল। Cunningham বলিয়াছেন ;—

"I would therefore suggest that the name may have been derived from Patala, the 'trumpet-flower' (Bignonia Suaveolens), in allusion to the trumpet shape of the province included between the eastern and western branches of the mouth of Indus etc." Ancient Geogr. of India.

পারে বিশ্ববিশ্রুত ভারতবীর পুরুরাজার বিপুল অনীকিনীর ঘটা দেখিয়া তিনি নদী পার হইতে সাহসী হইলেন না। অলক্ষিতভাবে কিছু উত্তরে সরিয়া যাইয়া নদী উত্তীর্ণ হইতে উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে পুরুরাজ দূত মুখে সংবাদ পাইয়া রাজকুমারকে দুই তিন সহস্র সৈন্যসহ গ্রীকদিগকে বাধা প্রদান করিতে প্রেরণ করিলেন। সেকেন্দর ঝেলমের পূর্ব্বতীরে পুরুনন্দনকে পরাভূত করিলেন। রাজকুমার যুদ্ধে নিহত হইলেন। কিন্তু মহাবীর সেকেন্দরের প্রাণসমপ্রিয় ঘোটক বুকেফালা (Bukephala) রাজপুত্র কর্ত্তৃক আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। বিক্রম-কেশরী পুরু অগ্রসর হইয়া গ্রীকদিগের সহিত নিকিয়া (Nikaea) নামক স্থানে যুদ্ধ করিলেন। সে যুদ্ধের ফলাফল ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। নিহত অশ্বের নামে সেকেন্দর বুকেফালা সহর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কানিংহাম বলেন, বর্ত্তমান মঙ্ (Mong) ই সেই মহাযুদ্ধ ক্ষেত্র নিকিয়া, এবং জালালপুরেই সেই বুকেফলা নগরের স্থান *।

অতএব নিকিয়া বা মঙ্ হইতে জলযানবাহিনী ঝেলম্ বাহিয়া দক্ষিণমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তিন দিন পর ভীরা বা ভেদা নামক স্থান। এইখানে চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান (Fa Hian) ঝেলম পার হইয়াছিলেন এবং এইখানে মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা সম্রাট্ আকবরের পিতামহ বাবর সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঝেলম ও চেনাবের সঙ্গমস্থলে নিয়ার্কসকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তৎপর চেনাব বাহিয়া শূদ্রকী ও মাল্লীদেশের ভিতর দিয়া চেনাব ও রাবীর (Hydraotes—ইরাবতী) সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে মাল্লীদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে সেকেন্দর আহত হইয়াছিলেন। কানিংহাম বর্ত্তমান শোরকোট্ (Shorkot—গ্রীক Alexandria

* A. Cunningham, Ancient Geography of India, I. p. 177.

Soriane) কেই সেই যুদ্ধস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মূলতানকে কানিংহাম প্রাচীন রাবী ও চেনবের সঙ্গমস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারই পুরাতন নাম কাষ্পাপুরস্ (Kaspapuras) কাস্পিরা (Kaspeira) বা কাশ্যপপুর। (২) ইহা মাল্লীদিগের রাজধানী ছিল। এরিয়ান বলেন, মাল্লী রাজধানী অধিকারের পর সেকেন্দর একটু সুস্থ হইলে হাইড্রাওতীস্ তীরে নীত হইলেন এবং তথা হইতে জলপথে একেসিনিস্ ও হাইড্রাওতীস মিলনস্থলে গ্রীক শিবিরে গমন করিলেন। তথায় নৌসেনা নিয়ার্কসের অধীন এবং স্থলসেনা হিফিষ্টিয়নের অধীন অপেক্ষা করিতেছিল। ইহার পর বিয়াস্ ও চেনাব সঙ্গম অতিক্রম করিয়া শতদ্রু সঙ্গমে উপনীত হইলেন। এখন বিপাশা শতদ্রুর উপনদী। তখন উহা শতদ্রু সঙ্গমের কয়েক মাইল উত্তরে স্বতন্ত্র ভাবে চেনাবের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তৎপর পঞ্চনদ সঙ্গমে গ্রীকগণ কিছু দিন বিশ্রাম করিয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী অনেক জাতি সেকেন্দরের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। পঞ্চনদ ও সিন্ধু সমাগমে গ্রীকরাজ স্বীয় নামানুসারে একটী নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। উহাই প্রাচীন আলেক্জাণ্ড্রিয়া ও বর্ত্তমান উছ (Uchh) এখন সিন্ধু উহার কতিপয় মাইল দক্ষিণ মিথুনকোটে পঞ্চনদের সহিত মিলিত হইয়াছে। তথা হইতে গ্রীকগণ সিন্ধু বাহিয়া, বামে সগ্‌দি বা সদ্রী (Sogdi or Sodrae) রাজ্য * এবং দক্ষিণে মস্বনী (Mussani—বর্ত্তমান ফাজিলপুরের নিকট শাহপুর) দেশ রাখিয়া দক্ষিণমুখে চলিতে

(২) "Kasyapapura was founded by Kasyapa &c. He was succeeded by his eldest son, the Daitya, named *Hiranya Kahipu* &c." Cunninghham's Ancient Geogr. p. 232.

* এখান হইতে কতক সৈন্য ক্রেটারসের অধীন সিন্ধু পার হইয়া বেলুচিস্থানের পথে যাত্রা করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এখন ইহা বাহাবালপুর (Bahawalpur) রাজ্যের অন্তর্গত।

লাগিল। উত্তর সিন্ধুদেশে আসিয়া সেকেন্দর প্রিষ্টি (Prœsti বর্ত্তমান শিকারপুর জিলা) রাজ্যজয় করিতে গেলেন। নিয়ার্কস জলযান বাহিনী-সহ সাগরাভিমুখে চলিলেন। মধ্য সিন্ধু প্রদেশে পশ্চিমতীরে অনতি-দূরে সম্বি (Sambi) বা সম্বুস (Sambus) রাজ্য *। ইহার রাজধানী সিন্দোমানা (Sindomana)। এই দেশে সেনাপতি (Ptolemy) টলেমি যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। নিয়ার্কস আরো কিছুদূর দক্ষিণমুখে গমন করিয়া ডেল্টার শিরোবিন্দুতে পট্টল, পাটল বা পটশীলা নগর প্রাপ্ত হইলেন। ইহার বর্ত্তমান নাম হায়দরাবাদ †।

এখান হইতে সেকেন্দর সিন্ধুর পশ্চিম শাখা অনুসরণ করিয়া সাগরে যাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নদীতে বাণ আসায় কতিপয় পোত ধ্বংশ হইয়া গেল। গ্রীকগণ পূর্ব্বে কখনও বাণ দেখিয়াছিল না, এজন্য তাহারা যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হইল। তিনি অগত্যা পট্টলে ফিরিয়া আসিয়া সিন্ধুর পূর্ব্ব শাখা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেন। এ পথ অপেক্ষাকৃত সুগম বোধ হইল। পুনর্ব্বার পট্টলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আবার পশ্চিম শাখা পথে সমস্ত বহর পরিচালন করিয়া সেকেন্দর সাগর সঙ্গমে কিল্লৌটা (Killouta) নামক এক ক্ষুদ্র দ্বীপে উপনীত হইলেন। এই স্থলে তিনি জল দেবতাদিগকে নানা উপহারে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। এখান হইতে বিজয়ীবীর আলেকজাণ্ডার স্থলপথে পারস্যাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন এবং সাময়িক বায়ুর (Etesian winds) বেগ শান্ত হইলেই নিয়ার্কসকে যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সেকেন্দরের অভি-প্রায় ছিল সমুদ্রকূলের নিকট দিয়া চলিতে থাকিবেন এবং মধ্যে মধ্যে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া নিয়ার্কসকে সাহায্য করিবেন। কিন্তু তিনি সে

* বর্ত্তমান করাচী জিলার উত্তরাংশে।
† কেহ কেহ ইহাকে বর্ত্তমান ঠটল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কানিংহাম Nirankol বা Haidarabad বলিয়াছেন।

পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং অন্তর্দ্দেশীয় বর্ত্মানুসরণ করিয়া তাঁহার মন্ত্রব্যস্থান সুসা (Sousa) অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতএব তিনি লিওন্নেটস্ (Leonnatos) কে ওরিটই (Oreitai) প্রদেশে নিয়ার্কসের সাহায্যের জন্য রাখিয়া গেলেন। সেকেন্দর প্রস্থান করিবার প্রায় এক মাস পর নিয়ার্কস আর অপেক্ষা করা যুক্তিসিদ্ধ মনে না করিয়া কিল্লোটা পরিত্যাগ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদিগের আক্রমণ ভয়ে নিয়ার্কসকে একটু তাড়াতাড়ি নঙ্গর তুলিতে হইয়াছিল। ভিন্সেণ্ট্ বলেন ৩২৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ১লা অক্টোবর নিয়ার্কস কিল্লোটা (Killouta) ছাড়িয়াছিলেন।

কিল্লোটা হইতে ১০০ ষ্টাডিয়া (stadia) দূরে (stoura-a crule) নামক স্থানে গ্রীক বহর ২ দিন অপেক্ষা করিল। স্তৌরার ৩০ ষ্টাডিয়া ভাটিতে কৌমান (Koumana—বর্ত্তমান খাউ)। তথা হইতে কোরিয়াটিস্ যাইয়া পুনরায় নোঙ্গর ফেলিল। সেখান হইতে খোলা সমুদ্রে যাইবার পথে নদীর মোহানা সলিলগর্ভস্থ পাহাড় ও বালুকাস্তর দ্বারা আবদ্ধ ছিল। * বহুকষ্টে এই স্থান উত্তীর্ণ হইয়া নিয়ার্কস উন্মুক্ত সাগরে পৌঁছিলেন এবং নদীমুখ হইতে প্রায় ১৫০ ষ্টাডিয়া দূরে ক্রোকল (Krokala) নামক দ্বীপে উপনীত হইলেন। এখানে এক দিন বিশ্রাম করিয়া দক্ষিণ দিকে ঈরস (Eiros বর্ত্তমান Manora) পর্ব্বত এবং বামে একটী ক্ষুদ্র সমতল দ্বীপ রাখিয়া এক বন্দরে প্রবেশ করিলেন। † এই বন্দরে গ্রীকগণ ২৪ দিন অবস্থান করিয়াছিল। যেহেতু মৌসুম বায়ু অতি প্রবলবেগে বহিতেছিল। বন্দরটী এত নিরাপদ এবং বিস্তৃত

* Sir Alexander Burnes says :—
"Near the mouth of the river we passed a rock stretching across the stream, which is particularly mentioned by *Neurchus*, who calls it adangerous rock, &c &c."

† "* * Which is a very accurate description of the entrance to Karachi Harbour &c." Cunningham, Ancient Geogr. of India, pp 306 307.

ছিল যে,নিয়ার্কস ইহার আলেক্জাণ্ডার বন্দর (Alexander's Haven) নামকরণ করিয়াছিলেন। একটী দ্বীপ সাগরের তরঙ্গ ও ঝটিকা হইতে এই বন্দরটীকে সুরক্ষিত করিতেছিল। এই দ্বীপকে এরিয়ান বিবক্ত (Bibakta), প্লিনি (Pliny) বিবাগা (Bibaga) এবং ফিলষ্ট্রেটস (Philostratos) বিব্লস (Biblos) বলিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সঙ্গড (Sangada) নামে খ্যাত ছিল। স্থানীয় অধিবাসিগণের আক্রমণ ও লুণ্ঠন ভয়ে নিয়ার্কস নঙ্গর স্থান প্রস্তর প্রাচীরে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। এখানে সুস্বাদু পানীয় সলিলের অভাবে গ্রীকগণকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সৈন্যগণ সমুদ্রতীরে সামুদ্রিক মৎস্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিল।

করাচী বা আলেকজাণ্ডার বন্দর হইতে পোতবাহিনী ৩রা নবেম্বর যাত্রা করিল। কিন্তু দুর্য্যোগ হেতু ও আহার্য্য অভাবে সৈন্যদিগের কষ্টের সীমা রহিল না। ক্রমে ডোমই (Domai), সারঙ্গ (Saranga), সকল (Sakal) প্রভৃতি স্থানে থামিয়া থামিয়া গ্রীকেরা মোরোণ্টবর (Morontobar) নামক একটী সুগভীর, সুবিস্তৃত ও সুরক্ষিত বন্দর প্রাপ্ত হইল। † ইহার চলিত নাম অবলাবন্দর (Women's Harbour) যেহেতু এ প্রদেশ সর্ব্বপ্রথম একজন অবলার শাসনাধীন ছিল। তথা হইতে বহুদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া গ্রীকগণ আরাবিস (Arabis) নদীর মুখে নঙ্গর ফেলিয়াছিল। * এই নদীর মোহানা হইতে প্রায় ৪০ ষ্টাডিয়া উজানে যাইয়া তাহারা পানীয় সংগ্রহ করিয়াছিল। নদীমুখে বন্দরের নিকট একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল। তাহাতে জনমানব ছিল না। কিন্তু

† "The name of Morontobara I would identify with *Muari*, which is now applied to the head land of Ras Muari or Cape Monz &c Cunningham, p 307.

* It is now called the *Purali*, the river which flows through the present district of Las into the bay of Sonmiyani.

ইহার চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ মৎস্য ও শুক্তিজীব (১) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল। আরাবিস্ অতিক্রম করিয়া ওরিটাই (Oreitai) * উপকূলে পগল (Pagal) নামক স্থানে নঙ্গর করিয়া তীর হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ইহার পর কবানা (Kabana)। এইখানে নিয়ার্কসের দুইখানা জাহাজ তুফানে ডুবিয়া গিয়াছিল। লোকেরা সন্তরণ দ্বারা বহু কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়াছিল। অতঃপর কোকলায় (Kokal) * উপনীত হইলে নিয়ার্কস তীরে অবতরণ করিয়া শিবির স্থাপন করিলেন এবং সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইল। স্থানীয় লোকদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য শিবিরস্থান সুরক্ষিত করা হইল। এখানে লিওন্নেটস্ কর্তৃক সংগৃহীত দ্রব্যাদিদ্বারা নৌসেনাগণের যথেষ্ট সাহায্য হইল। লিওন্নেটস্ যুদ্ধ করিয়া এই দেশের অধিবাসীদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে তাহাদের ৬০০০ সৈন্য ও সেনাপতি হত হইয়াছিল। গ্রীকদিগের কেবল ১৫ জন অশ্বারোহী ও কতিপয় পদাতিক মাত্র নিহত হইয়াছিল। গেড্রোসিয়ার (Gedrosia) শাসনকর্তা (Satrap) ও এই যুদ্ধে হত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে কৃতকার্য্যতার জন্য এবং নিয়ার্কসকে আহার্য্য সামগ্রী দ্বারা সাহায্য করার জন্য সেকেন্দর লিওন্নেটসকে অতঃপর স্বর্ণ কিরীট পারিতোষিক দিয়াছিলেন। নিয়ার্কস এইস্থানে ১০ দিন অবস্থান করিলেন এবং যে সকল নৌসেনা দুর্ব্বল ও অসমর্থ বিবেচিত হইল তাহাদিগকে লিওন্নেটসের সৈন্যের সঙ্গে পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন।

অনন্তর গ্রীকগণ তমারস (Tomeros) নদীর প্রশস্ত মুখে স্থগিত

(1) Mussels and oyesters.

* "I would identify the Oritae, or Horitae or Neoteritae, as they are called by Diodorus, with the people on the Aghor river, &c." Cunningham, p 3.8.

* Near Ras Katchari. অক্ষ—২৫, ২১ ; দ্রাঃ ৬৫-৩৬।

হইল। * এই সময় অনুকূল বায়ুর সাহায্য পাইয়া পোতবহর প্রত্যহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী দেশের অধিবাসিগণ সমুদ্রতীরে ছোট ছোট তাম্বুর ন্যায় ঘরে বাস করিত। ঘরগুলি চারিদিক বদ্ধ এবং হাওয়া যাইবার পথ ছিল না। সুতরাং তাহাতে প্রায় দম আটকিয়া যাইত। গ্রীকদিগের নৌবহর দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। কিন্তু তাহাদের সাহসের অভাব ছিল না। সশস্ত্র ও দলবদ্ধ হইয়া তাহারা ঘাটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের হস্তে ৬ হাত দীর্ঘ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বর্শা ছিল। বর্শার অগ্রভাগ লৌহ-নির্ম্মিত নহে—উত্তাপ দ্বারা শক্ত করা ছিল। তাহারা সংখ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬০০ হইবে। তাহাদের আক্রমণের উদ্যোগ দেখিয়া নিয়ার্কস তীর হইতে অনতিদূরে জাহাজ নঙ্গর করিলেন এবং হালকা পোষাক পরিহিত সৈন্যগণকে সাঁতরিয়া কূলে গলাজলে দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। এইরূপে একদল সৈন্য তীরে পৌছিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে শত্রুদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। অসভ্য আততায়িগণ গ্রীকদিগের কলের সাহায্যে তীরবর্ষণ, উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্র এবং ক্ষিপ্রতা দেখিয়া শঙ্কিত হইল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। অনেকে শত্রুহস্তে বন্দী হইল। ইহারা প্রায় উলঙ্গ থাকিত। সর্ব্বাঙ্গ রোমাবৃত। নখ সকল বন্য জন্তুর নখের ন্যায়। † নিয়ার্কস অনুমান করেন, ইহারা নখ দ্বারা লৌহের কাজ করিত এবং অপেক্ষাকৃত কোমল কাষ্ঠ ও মাংসাদি নখের সাহায্যেই কর্ত্তন ও ছেদন করিত। কঠিন দ্রব্যাদি প্রস্তরের সাহায্যে কর্ত্তন করিত। তাহারা লৌহের ব্যবহার জানিত না।

* Maklow or Singul R. উত্তরাক্ষ ২৫, ১৬ ; পূর্ব্ব দ্রাঃ ৬৫—১৫।

† "** Shaggy hair, not only on their head but all over their body, their nails resembled the claws of wild beasts, and were used, it would seem, instead of iron for dividing fish and splitting the Softer kinds of wood."

তাহাদের পরিচ্ছদ আরণ্য জন্তু এবং বৃহৎ বৃহৎ মৎস্তের চর্ম্মমাত্র। এখানে জাহাজ মেরামত করা হইল। পরের ষ্টেসন মালানা *। ওরিটাই উপকূলে ইহাই শেষ নগর স্থান। এতদঞ্চলে ছায়ার বর্ণনাই নিয়ার্কসের সত্যতার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ †। অধিবাসীদের পরিচ্ছদ ভারতবাসিগণের ন্যায়, অস্ত্রাদিও সেইরূপ। কিন্তু ভাষা ও রীতিনীতি বিভিন্ন। ওরিটাই পরে গেড্রোসিয়া ‡। ইহার উপকূলভাগকে ইথ্থিওফাগি (Ekhthyophagi) বলে। এই উপকূলে আহার্য্যাভাবে নাবিকগণকে পুনরায় দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। বাগিসারে (Bagisar) সুন্দর বন্দর ছিল। সমুদ্র হইতে অনতিদূরে পাশিরা নামক একটী ক্ষুদ্র সহর ছিল। এজন্য অধিবাসীদিগকে পাসিরী (Pasiree) বলিত। কূপ খনন করিয়াও গ্রীকগণ ভাল জল পাইল না। অতঃপর কোল্টা (Kolta), তথা হইতে কলমা (Kalama) (৪)। সমুদ্র তীরে গ্রামের ধারে ধারে বহু খর্জ্জুর বৃক্ষ দৃষ্ট হইল। এদেশবাসীরা সৌজন্যপূর্ব্বক নিয়ার্কসকে মৎস্য ও মেষমাংস উপঢৌকন দিতে আসিল। তৃণশস্প অভাবে মৎস্যই এখানে ভেড়ার প্রধান খাদ্য। এজন্য মেষমাংস মৎস্যগন্ধ বিশিষ্ট। তথা হইতে এক দিনের পথে কিস্সা (Kissa) গ্রাম। উপকূলভাগকে কর্ব্বিস (Karbis) কহে। তীরে কয়েকখানা জেলে-ডিঙ্গী দেখা গেল। লোকজন গ্রীকদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিল। কয়েকটী ছাগল পাইয়া গ্রীকগণ জাহাজে তুলিয়া লইল। শস্য মোটেই পাওয়া গেল না। অতঃপর একটী উন্নত অন্তরীপ ঘুরিয়া নিয়ার্কস মোসার্ণা

* বর্ত্তমান Ras Malin, Malen or Moran.

† Muller অনুমান করেন ওনেসিক্রিটস বা তৎকালবর্ত্তী অন্য কোন ভৌগোলিক কর্ত্তৃক এই অংশ নিয়ার্কসের বিবরণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেকেন্দর যুগের গ্রীক-ভৌগোলিকগণ ভারতবর্ষকে গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী মনে করিতেন।

(৩) Mekran.

(৪) বর্ত্তমান কলমী (Kalami.) নদীতটে।

(Mosarna) নামক বন্দর (haven) প্রাপ্ত হইলেন। এখানে অনেক ধীবরের বাস ছিল। এই বন্দরে পানীয় জল যথেষ্ট ছিল। এখান হইতে নিয়ার্কস গেড্রোসিয়া-নিবাসী পথ প্রদর্শক (Pilot) হাইড্রাকিসকে (Hydrakes) সঙ্গে লইলেন। তিনি কার্ম্মিনিয়া (Karmania) পর্য্যন্ত যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। তথা হইতে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত পথ অপেক্ষাকৃত সুগম।

মোসার্ণা হইতে বলোমোন (Balomon), তথা হইতে বার্ণা (Barna)। সেখানে অনেক খেজুরগাছ দৃষ্ট হইল। একটী বাগানে নানাবিধ ফুল ও সুন্দর সুন্দর পাতা দেখিয়া সৈন্যগণ মালা গাঁথিয়া গলায় পরিল এবং মুকুট প্রস্তুত করিয়া মাথায় ধারণ করিল*। এদেশের অধিবাসীরা একটু সভ্য বলিয়া বোধ হইল। ইহার পর দেনড্রোবোসা (Dendrobosa)। তৎপর কোফাস (Kophas) বন্দর (১)। অধিবাসী মৎস্যজীবী। তাহাদের ছোট ছোট ডিঙ্গী সকল হাতবৈঠা (Paddles) দ্বারা চালনা করিত, গ্রীকদিগের ন্যায় দাঁড় চালাইতে জানিতনা। এই বন্দরের পর কীজা (Kyiza) উপকূল। এই মরুকূলে পর্ব্বতের ন্যায় তরঙ্গমালা গর্জ্জন করিতেছিল। আরও কিছুদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া অদূরে একটী ক্ষুদ্রগ্রাম দৃষ্ট হইল। তথায় কৃষিচিহ্ন দেখিয়া নিয়ার্কস্ সঙ্গী আর্খিয়াস্‌কে বলিলেন, যদি গ্রামবাসিগণ স্বেচ্ছায় খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে গ্রাম দখল করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ কর। কিন্তু অকস্মাৎ আক্রমণ ও অবরোধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিপক্ষদিগকে বশীভূত করিতে দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক হইবে। এজন্য কৌশল দ্বারা কার্য্য সাধন কর। তদনুসারে আর্কিয়াস্ (Arkhias) সমস্ত পোতবহর লইয়া

* Wearing chaplets in the hair on festive occasions was a common practice with the Greeks. Cf. Anabasis (Arrian) V. 2. 8.

(1) Ras Coppa.

চলিয়া যাইবার ভাণ করিলেন এবং নিয়ার্কস্ স্বয়ং একখানা মাত্র জাহাজ তীরে রাখিয়া কেবল দেখিবার ছলে সহরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। নিয়ার্কস সহরের প্রাচীরের নিকট আসিলে নগরবাসীরা পিষ্টক খেজুর ও ভর্জিত মৎস্য লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল। তিনি সানন্দে উপহার গ্রহণ করিলেন এবং নগর দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাহারা বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করিয়া গ্রীকদিগকে নগরে লইয়া গেল। প্রাচীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই গ্রীক সেনাপতি দুইজন তিরন্দাজকে দ্বার রক্ষা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং দুইজন অনুচরসহ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া গ্রীকবহরকে তীরে আসিতে সঙ্কেত করিলেন। নিমেষমধ্যে পোত সকল তীরে আসিল, গ্রীকযোদ্ধৃগণ অবিলম্বে জলে ঝম্প প্রদান করিল এবং সন্তরণদ্বারা তীরে উঠিয়া প্রবলবেগে নগর আক্রমণ করিল। নগরবাসিগণ আতঙ্কিত হইয়া তাড়াতাড়ি যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। নিয়ার্কস্ দোভাষিদ্বারা ঘোষণা করাইলেন যে, নাগরিকেরা স্বেচ্ছায় আহার্য্য সরবরাহ করিলে তাঁহারা যুদ্ধ এবং লুণ্ঠন হইতে বিরত হইবেন। তাহাদের নিকট সঞ্চিত অন্ন নাই এই বলিয়া নগরবাসিগণ প্রাচীর আক্রমণ করিল। নিয়ার্কস্ শরবৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত ও বিতাড়িত করিলেন। অনন্তর তাহারা লুণ্ঠনের ভয়ে ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল এবং খাদ্যাদি প্রদান করিতে সম্মত হইল। খাদ্য সম্ভারের মধ্যে অধিকাংশই ভর্জ্জিত মৎস্য (Roasted Fish), কিছু গম এবং যবও ছিল। বলা বাহুল্য মৎস্যই এদেশের প্রধান খাদ্য। আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া গ্রীকগণ জাহাজে প্রত্যাগমন করিল। ইহার পর নিকটেই বাগিয়া (Bagia) অন্তরীপ। তৎপর তালমেনা (Talmena) বন্দর * ও কানাসিস্ (Kanasis) নাম্নী উৎসন্ন

* চৌবর (Chaubar) খাড়ীর উপর অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান তিজ (Tiz) সহর।

নগরী। শেষোক্তস্থানে সদ্যখাত কূপ হইতে পানীয় এবং খাদ্যস্বরূপ খেজুর মাথা সংগ্রহ করিয়া, গ্রীকগণ আবার চলিতে লাগিল। এই সময় ক্ষুৎপিপাসায় নাবিকগণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। নিয়ার্কসের আশঙ্কা হইল পাছে বুভুক্ষা-পীড়িত সৈন্তগণ হতাশ হইয়া পলায়ন করে। এইজন্ত তিনি তীরে পোত সংলগ্ন করিলেন না। কিছুদূর চলিয়া কানাতে (Kanate) (১) নামকস্থানে পৌছিলেন, তথা হইতে তাওই (Taoi) সেখানে কয়েকখানা ক্ষুদ্রগ্রাম দৃষ্ট হইল। গ্রামবাসীরা গ্রীকবহর দেখিবামাত্র ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। এখানে কিছু সামান্য খাদ্য গ্রামবাসীদিগের পরিত্যক্ত ৭টী উষ্ট্র ও কিছু খেজুর ভক্ষনার্থ সংগ্রহ করিয়া গ্রীকগণ জাহাজ ছাড়িল। পরের নঙ্গরস্থান দাগাশিয়া (Dagasia) (২)। ইহার পর ইখ্থিওফাগি উপকূল শেষ হইল। নিয়ার্কস বলেন অধিবাসীরা প্রধানতঃ মৎস্তভোজী। জোয়ারের সময় যে সকল মৎস্য তীরে উঠে, তাহাই ইহারা জাল দিয়া ঘিরিয়া ফেলে। অধিকাংশ মৎস্যই ছোট ছোট, জালে বড় বড় মাছও ধরা পড়ে। কোমল ও উপাদেয় মৎস্যগুলি ইহারা ধরিয়াই কাচা ভক্ষণ করে (৩)। বড় ও শক্ত মাছগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া জাঁতায় পিসিয়া রুটী প্রস্তুত করে। এখানে ঘাস ও শস্যাদি জন্মে না। এজন্য মানুষ গরু সকলেই শুষ্ক মৎস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে। কাঁকড়া, শুক্তি প্রভৃতি সামুদ্রিক জন্তুও তাহাদের আহার্য্য। খনিজ লবণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা তৈলও প্রস্তুত করিতে জানে। স্থানে স্থানে এক আধ টুকরা জমী চাষ করিয়া কিছু শস্য উৎপাদন করে। তাহা

(১) সম্ভবতঃ বর্তমান Kungoun। ইহা রাস Kalatএর সন্নিকটে।

(২) আধুনিক নাম Girishk.

(3) The more delicate kinds they eat raw as soon as they are taken out of the water—Arrian.

মৎস্যের সঙ্গে চাটুনির ন্যায় ব্যবহার করে। অবস্থাপন্ন লোকেরা কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে তিমি-মৎস্যের (Whale) হাড়দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। দরিদ্রেরা অন্যান্য ছোট ছোট মৎস্যের শীরদাড়া দিয়া ঘর বান্ধে *।

(ক্রমশঃ)

মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার শাসন-প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাজধানী পাটলী-পুত্রের অন্তঃশাসনের জন্য যে যে পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় যে প্রাদেশিক প্রধান সহর সমূহেও বর্ত্তমান ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

প্রাদেশিক রাজপ্রতিনিধি।

উত্তর ভারতবর্ষের প্রায় সমস্তই এবং দক্ষিণ ভারতের মান্দ্রাজের অক্ষরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত ছিল। এই বিশাল রাজ্যের শাসনের জন্য চন্দ্রগুপ্ত ইহাকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। সেই সকল প্রদেশ শাসন করিবার জন্য পাটলী-পুত্র হইতে রাজপ্রতিনিধি প্রেরিত হইতেন। সাধারণতঃ রাজপরিবার হইতে রাজ-প্রতিনিধি মনোনীত করা হইত।

অশোকের সময় ভারতবর্ষ পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। রাজা স্বয়ং পাটলী-পুত্রের শাসনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। অপর চারিটি

* "This description of the natives, with that of their mode of living and the country they inhabit, is strictly correct even to the present day." Kemp throne.

প্রদেশে রাজপ্রতিনিধিরা থাকিতেন। পঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর ও সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী রাজ্য সমূহ লইয়া যে প্রদেশ গঠিত হয়, তাহার রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। প্রাচ্য প্রদেশের রাজধানী ছিল তোসালি। তোসালি নগরটি কোথায় ছিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। কলিঙ্গ এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মালব, গুজরাট্ ও কাথিবাড় লইয়া যে প্রদেশ গঠিত হয়, উজ্জয়িনী তাহার রাজধানীত্ব প্রাপ্ত হয়। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণস্থ ভূখণ্ড লইয়া আর একটি প্রদেশ গঠিত হয়। চন্দ্র-গুপ্তের সময় কিরূপ ভাবে প্রদেশ সমূহ বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। অশোক রাজ্য-সীমা বৃদ্ধি করিলেও মূলতঃ প্রদেশগুলি যথাবৎ রাখিয়াছিলেন, ধরিয়া লইতে বোধ করি কোন ক্ষতি নাই।

পরিদর্শক।

রাজকর্ম্মচারীরা ঠিকমত প্রজাপালন করিতেছে কিনা, প্রজারা গুপ্তভাবে কোন অসৎ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে কিনা ও তাহাদের মনোগতি কিরূপ প্রভৃতি জানিবার জন্য রাজার এক দল পরিদর্শক সহচর ছিল। তাহারা দেশের সর্ব্বত্র কি হইতেছে না হইতেছে তাহার সংবাদ রাখিত ও গুপ্তভাবে সেই সব কথা রাজার গোচর করিত। মিগাস্থিনিস্ ও তৎপরবর্ত্তী লেখকেরা বলেন যে, ভারতবাসীরা সত্য-বাদিতার জন্য চির প্রসিদ্ধ। এই সকল পরিদর্শক সত্যের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। তাহারা কখনও কোন মিথ্যা সংবাদ দিয়া বা অতিরঞ্জিত বর্ণনা দ্বারা রাজমন কলুষিত করিবার চেষ্টা করিত না।

দণ্ডবিধি।

তৎকালে ভারতবাসীরা সাধারণতঃ অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতিক ছিলেন। কিন্তু মন্দলোকের অভাব কোন দেশে কোন কালেই হয় না। যখন

এই সব হতভাগ্যের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য হইয়া উঠে, তখনই দেশটাকে প্রকৃত সাধুর দেশ বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ তৎকালে বাস্তবিকই সাধুর দেশ বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। তাহার এ সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজা সময়ে যেমন কোমল হইতেন, আবার তেমনই কঠোরতা অবলম্বন করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। অপরাধী যত ক্ষুদ্রই অপরাধ করুক না, তজ্জন্য তাহাকে শাস্তিভোগ করিতে হইতই। এজন্যই ভারতবর্ষ পরিব্রাজকদিগের পক্ষে একান্তই বিঘ্নরহিত হইয়াছিল।

তৎকালীন দণ্ডবিধি সাধারণতঃই অত্যন্ত কঠোর ছিল। দেশে দুষ্টের সংখ্যা অতি অল্প ছিল বলিয়াই দণ্ড এরূপ কঠোর হইতে পারিয়াছিল। যেখানে দুষ্টের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সেখানে সাধারণতঃ দণ্ডবিধি একটু শিথিল হইয়াই থাকে ; নতুবা দেশশুদ্ধ লোককে শাস্তিভোগ করিতে হয়। ভারতবর্ষ দুষ্ট দমন করিবার জন্য কখনও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। এদেশের দণ্ড বিধি চিরকালই একটু কঠোর ছিল। এ কঠোরতা তাহার প্রাচীন সাধুতারই পরিচায়ক—নৃশংসতার নহে।

অপরের কোন অঙ্গচ্ছেদ করিলে অপরাধীর সেই অঙ্গচ্ছেদ ত' হইতই, অধিকন্তু তাহার হস্তও কাটিয়া দেওয়া হইত। বাদী যদি রাজসরকারের নিযুক্ত শিল্পী হইত, তবে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইত। মিথ্যা সাক্ষ্য-দাতার হস্তপদচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধীর মস্তক মুণ্ডনই বিধি ছিল। লঘুতর অপরাধে কখন নাসিকাচ্ছেদ, কখন বা মস্তকের অর্দ্ধাংশ মুণ্ডিত করিয়া গলদেশে একটা 'কবজ' বাঁধিয়া দেওয়া হইত। কেহ যদি কোন পবিত্র বৃক্ষের কোনরূপ অনিষ্ট করিত, অথবা বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের ন্যায্যাংশ রাজসরকারে জমা না দিয়া ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিত, কিম্বা রাজা যে পথ দিয়া শিকারে যাইতেন, সেই চিহ্নিত পথে প্রবেশ করিত, তবে মৃত্যুই তাহার অনিবার্য্য দণ্ড হইত।

ভূমিকর।

উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর ছিল। কৃষকদিগকে কখন অস্ত্র লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিতে হইত না। সে ভার ক্ষত্রিয়দের উপরই ন্যস্ত ছিল। যুদ্ধের সময়ও কৃষকেরা বেশ নিশ্চিন্ত মনে আপনাদের কৃষিকার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিত।

পূর্ত্ত বিভাগ।

প্রজারা সকলেই যাহাতে সুপেয় জল প্রাপ্ত হয়, ক্ষেত্র সকল যাহাতে জলাভাবে অমুর্ব্বরতা ধারণ না করে, এজন্য রাজা দেশের সর্ব্বত্র জলাশয় খননের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জলাশয় খননের স্থান নিরূপণ, প্রয়োজনানুসারে খাল, বিল, পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি খনন করাইবার জন্য তাঁহার একটা স্বতন্ত্র পূর্ত্তবিভাগ ছিল। রাজ্যবাসী কাহারও যাহাতে সামান্য মাত্রও জলকষ্ট না হয়, তৎপ্রতি রাজা সর্ব্বদাই তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন।

বাণিজ্য-শুল্ক।

শুল্ক সংগ্রহের সুবিধার জন্য দেশের নানাস্থানে এক একটা বাজার ছিল। বিক্রেয় দ্রব্যমাত্রই তথায় পাঠাইতে হইত। উৎপত্তিস্থলেই যাহাতে সেগুলি বিক্রীত না হয়, সেদিকে রাজকর্ম্মচারীদের কঠোর দৃষ্টি ছিল। পণ্যাদি বিক্রীত হইলে পর শুল্ক গৃহীত হইত, তৎপূর্ব্বে নহে। এই শুল্ক বিভিন্ন পণ্যের উপর বিভিন্ন হারে গৃহীত হইত। বিদেশাগত পণ্যের উপর সাত প্রকারের কর নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই সব কর একত্র করিয়া শতকরা আয়ের উপর বিশটাকা কর দাঁড়াইত। ফল-মূল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের সহজেই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তাহাদের মূল্যের ষষ্ঠাংশ বা শতকরা ১৬⅔ টাকা কররূপে গৃহীত হইত।

অপরবিধ পণ্যের উপর সাধারণতঃ শতকরা চারি হইতে দশটাকা পর্য্যন্ত কর নির্দ্দিষ্ট ছিল। মূল্যবান প্রস্তর প্রভৃতির ন্যায় বহুমূল্য দ্রব্যাদির মূল্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা নিরূপণ করিয়া দিতেন। বিক্রেয় জিনিষ মাত্রের উপরই রাজকর্ম্মচারীরা 'মোহর' মারিয়া দিতেন।

রাজপথ।

অনেকের ভুল বিশ্বাস আছে যে, তৎকালে দেশের রাস্তাঘাট আদৌ ভাল ছিল না; কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভিত্তিহীন অলীক কল্পনা মাত্র। তখন লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দেশের সর্ব্বত্রই সুন্দর পথ সমূহ বিদ্যমান ছিল। চন্দ্রগুপ্তও সেই পথের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আজকাল যেমন পথে 'মাইল ষ্টোন' দেখিতে পাওয়া যায়, তৎকালেও দূরতা নিরূপণের জন্য এক একটা চিহ্ন থাকিত। চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্র হইতে পশ্চিমোত্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত একটা বিশাল রাজপথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। দৈর্ঘ্যে তাহা দশ সহস্র ষ্টাডিয়া ছিল।

[দশ ষ্টাডিয়া=দুই হাজার সাড়ে বাইস (ইং) গজ।]

সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ।

মিগাস্থিনিস্ ভারতের সামাজিক শ্রেণী-নির্ণয়ে ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষে সাত শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিল। তিনি যেমন দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপই লিখিয়া গিয়াছিলেন। উপরি উপরি দেখিতে যাইলে এইরূপ ভুলই হইয়া থাকে। তন্নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী-গুলি এই—(১) দার্শনিক, (২) কৃষক, (৩) রাখাল, (৪) শিল্পী ও বণিক, (৫) যোদ্ধা, (৬) পরিদর্শক ও (৭) সচিব। দার্শনিক শ্রেণী-নিশ্চিতই ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। তৎকালে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেশ একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়দেরও

অনেকে যুদ্ধবিদ্যা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় পরব্রহ্মের চিন্তাই সার করিয়াছিলেন। এই দার্শনিক শ্রেণীর মধ্যে তাঁহাদেরও ফেলা যাইতে পারে। যোদ্ধা ত' স্পষ্টতঃই ক্ষত্রিয়। পরিদর্শক ও সচিবের কতক ব্রাহ্মণ বংশ ও কতক ব্রাহ্মণেতর বংশ হইতে গৃহীত হইত। কৃষক, রাখাল, শিল্পী ও বণিকদের কতক বৈশ্য ও কতক শূদ্র ছিল। মূলতঃ তখন যে চারিবর্ণই বিদ্যমান ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

রাজা প্রাদেশিক প্রতিনিধিবর্গের সাহায্যে এই বর্ণচতুষ্টয়ের নেতৃত্ব করিতেন। তাঁহাদের আদেশ সকলকেই নত মস্তকে মানিতে হইত। (১২)

যে সকল শিল্পী রণপোত নির্ম্মাণ ও বর্ম্ম প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানিত, রাজসরকার উপযুক্ত বেতন দিয়া তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন। তাহারা আর অন্য কাহারও কার্য্য করিতে পাইত না। কাঠুরে, সূত্রধর, কর্ম্মকার ও খনিওলাদের উপরও রাজার কতকটা অধিকার ছিল; কিন্তু সে অধিকার কিরূপ ধরণের ও কতটুকু ছিল, তাহা জানা যায়না।

(১২) তৎকালে রাজারা যতই উচ্ছৃঙ্খল হউন না, সামাজিক বিষয়ে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের মতানুসারে কার্য্যাদি করিতেন। তবে চন্দ্রগুপ্ত নীচবংশজাত ছিলেন বলিয়া, বোধ করি, ব্রাহ্মণেরা সামাজিক বিষয়ে তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব সহ্য করিতে পারিতেন না। বোধ হয় এজন্যই তাঁহারা তাঁহাকে 'বৃষল' আখ্যা দিয়া থাকিবেন। আর ইহাও খুব সম্ভব যে, তিনি আত্ম-শক্তিতে সাম্রাজ্যেশ্বর হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে একটু কুটিল দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছিলেন; আর বিশেষতঃ সে সময় ব্রাহ্মণেতর জাতিদের সহিত ধর্ম্মবিষয় লইয়া ব্রাহ্মণদের বেশ একটু তীব্র আন্দোলন চলিতেছিল। হয় সে সময় তিনি ব্রাহ্মণদের বিশেষ সাহায্য করেন নাই, নতুবা আন্দোলনের অবসরে আপনার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের চেষ্টা পাইয়া ছিলেন। যে কোন কারণেই হউক, তিনি ব্রাহ্মণদিগের অশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

শেষ কথা।

চন্দ্রগুপ্তের এরূপ শাসন-প্রণালী যে সর্ব্বতোভাবে ভারতীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ইহার মধ্যে গ্রীক সভ্যতার প্রভাব দেখিতে পান। কিন্তু তাঁহাদের সে দৃষ্টি যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ ও পক্ষপাত-কলুষিত, তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। গ্রীক সভ্যতা ভারতে প্রবেশের সুবিধাই তখন পায় নাই। অলেকজেন্দর যে সামান্য কাল ভারতবর্ষে ছিলেন, তাহার সমস্তই যুদ্ধ বিগ্রহে কাটাইয়াছেন। তারপর রাজ্যাধিকার তাঁহার ভারতত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়। গ্রীক সিলিউকস্ ত' ভারতশক্তির নিকট নতশির হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় ভারত যে হীনতর-বীর্য্য গ্রীকের সভ্যতা গ্রহণ করিয়া ফেলিবে, আর যদিই বা কখন তাহা সম্ভব হইত, তবু এত শীঘ্র যে আত্মস্থ করিয়া ফেলিবে, ইহা আদৌ বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

এ সম্বন্ধে বিন্‌সেন্ট্ স্মিথ, যিনি বহুদিন ধরিয়া প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতেছেন, যাঁহার প্রাচীন ভারতেতিহাস এক্ষণে একটা প্রামাণ্য গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তিনি কি বলেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধের সমাপ্তি করিব। তিনি বলেন—মৌর্য্য রাজগণের শাসনপ্রণালী কোন ক্রমেই আলেকজেন্দরের স্বল্পকালব্যাপী অভিযানের ফল হইতে পারে না। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক বীরের নিকট সাম্রাজ্য তত্ত্ব শিখিতে যান নাই। তাঁহার শাসনপ্রণালীতে যে অতি সামান্য বৈদেশিক গন্ধ আছে, তাহা গ্রীক প্রভাবের ফল নহে, পরন্তু পারসীক সভ্যতা-প্রভাবজাত। (১৩) তাঁহার যুদ্ধনীতিতে গ্রীক প্রভাবের

(১৩) বাস্তবিক পক্ষে পারসীক সভ্যতাও যে এই শাসনপ্রণালীর গঠন পক্ষে কতদূর সাহায্য করিয়াছিল, তাহাও বিচারযোগ্য।

কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না ; তাহা প্রাচীনতর ভারতীয় প্রথারই পরিনাম। ভারতীয় রাজগণ হস্তী, রথ ও পদাতিক সৈন্যের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেন। তাঁহাদের নিকট অশ্বারোহী সৈন্য সেরূপ কার্য্যকর বোধ হইতনা, কাজেই অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যাও অল্প হইত। পক্ষান্তরে আলেকজেন্দরের না ছিল হস্তী, না ছিল রথ, অশ্বারোহী সৈন্যই তাঁহার এক মাত্র সম্বল ছিল। আর তাঁহার যুদ্ধনীতি ত' কেহই অনুকরণের চেষ্টা করে নাই। এমন কি যে সকল গ্রীক এসিয়াতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা পর্য্যন্ত প্রাচ্য যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে এবং হস্তীই তাহাদের প্রধান সহায় হইয়া উঠে।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর ২৬ সংখ্যায় এই ইতিহাসের প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমখণ্ডেই রায় মহাশয় ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসন্ধানের এবং তৎসম্বন্ধে নিজের যুক্তি-তর্কবলে তথ্যনির্ণয়ের অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুরের ভৌগোলিকতত্ত্ব লইয়াও বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন মানচিত্র ও প্রাচীন জমীদারীর কাগজপত্র দেখিয়া তিনি যেরূপ গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অল্পদিনের ও অল্প পরিশ্রমের ফল নহে। এই খণ্ডে ফরিদপুরের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় তিনি সেনবংশের, পালবংশের, মুসলমান রাজত্বকালের

নবাব ও সুলতানের, বারভূঞার এবং বহু প্রাচীন জমীদার বংশের অধিকার, রাজস্ব, যুদ্ধ, বিদ্রোহ প্রভৃতির সপ্রমাণ বিবরণ এত অধিক সংগ্রহ করিয়াছেন যে, পড়িতে গেলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। তিনি পুস্তক খানিতে কৌতূহলজনক, বাঙ্গালীজাতির গৌরবজনক, দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবর্দ্ধক, আত্মসম্মানবর্দ্ধক এবং অতীতের বহু পুরাতন মধুরকথা সন্নিবেশিত করিয়া পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রার্থনা করি, ভগবৎকৃপায় রায় মহাশয় সত্বরে অপর খণ্ডগুলি প্রকাশিত করিয়া দেশের ও দশের নিকট আদর ও সম্মান লাভ করুন। আশা করি, ফরিদপুরবাসী প্রত্যেকে এবং ইতিহাসপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রই এই পুস্তকের গ্রাহক হইয়া দেশের প্রাদেশিক ইতিহাস সংকলনে কর্ত্তাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। রায় মহাশয়কে কেবল দুই একটী কথা বলিবার আছে, তাঁহার গ্রন্থে ইতিহাসের ভূরিপরিমাণ উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু সুশৃঙ্খলার সহিত সেগুলি সুবিন্যস্ত না হওয়াতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে পাঠে অগ্রসর হওয়া একটু কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। রায় মহাশয়ের ভাষায় প্রাদেশিকতা থাকিলেও তিনি যদি বিষয়গুলি সুশৃঙ্খলে সুবিন্যস্ত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পুস্তক খানি অতি মনোরম হইত।

ঐতিহাসিক চিত্র।

বিক্রমপুরে সৌর প্রভাব।

ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ। এদেশে যত বিভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতির সমাবেশ জগতের আর কোথাও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। প্রকৃতি-সুন্দরী একদিকে যেমন ইহাকে নানাবিধ নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া গঠন করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি আবার নানা বিভিন্ন শ্রেণীর জাতি ও অধিবাসীদিগের দ্বারা অধ্যুষিত করাইয়া সর্ব্বপ্রকারে ইহাকে গৌরবময় করিয়াছেন। এই পুণ্য পীঠে আর্য্য ঋষিগণের বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থের অমূল্য জ্ঞানগর্ভ বাণী একদিকে যেমন ইহার জ্ঞান ও গরিমার কথা দেশদেশান্তরে প্রেরণ করিয়াছে, তেমনি আবার কোল, ভীল, টোডা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীস্থ অনার্য্য জাতির ভূত-ভয়-বিমিশ্রিত অন্ধকার কুটীরের 'বোঙার' কাহিনী আমাদিগকে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করিতেছে। এরূপ বিভিন্ন পথে প্রধাবিত ধর্ম্ম ও জাতিকে বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিতে হইলে, রীতিমত সাধনার আবশ্যক।

সমগ্র ভারতকে প্রত্যক্ষ ভাবে, যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করিবার যে শক্তি, তাহা ত আমাদের নাই-ই পরন্তু যে শক্তি দ্বারা আপনার বাঙ্গালাদেশ, আপনার বাসগ্রামকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি, সে বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

বঙ্গদেশের সর্ব্বাপেক্ষা একটা বিশেষত্ব অধিবাসিগণের ধর্ম্মের জন্য

ব্যাকুলতা। জগতের অন্যান্য প্রান্তের নরনারীগণ যেমন পার্থিব ভোগ, সুখ ও তামসিক শক্তি-সঞ্চয়কেই সার বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ সে সকল হইতে আপনাকে এখনও বহুদূরে রাখিয়া দিয়াছে। প্রতিদিনের প্রতিকর্ম্মের মধ্য হইতে; এদেশের নর-নারীর যে ধর্ম্ম-ব্যাকুলতা দেখিতে পাই,—তাহা সত্য সত্যই একটু বিচিত্র রকমের। যুগ-পরিবর্ত্তনে, রাজ-পরিবর্ত্তনে আমরা অনেক নূতন জিনিষকে আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লইয়া নিত্য নূতন শিক্ষা-সভ্যতায় দীক্ষিত হইলেও কিন্তু সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন রীতি-নীতি ও ধর্ম্ম-সংস্কারের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারি নাই, কতার মত প্রাচীন সত্য বা সংস্কার এখনও আমাদিগকে দৃঢ়রূপে বেড়িয়া রহিয়াছে। সে সকল সত্য ও ধর্ম্মের ক্ষীণ-স্মৃতি এখনও কিন্তু আমরা দিন দিন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধিৎসা এবং মৃত্তিকা খননের সঙ্গে সঙ্গে মাতা বসুমতীর দেহাভ্যন্তরে প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতেছি। বঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও গ্রাম হইতে নানাপ্রকারের প্রস্তর মূর্ত্তি ইত্যাদি প্রাপ্তির সহিত যে সকল প্রাচীন সত্যকে আমরা নূতন করিয়া দেখিতে পাই, সে সকল কেবলি তামাসার নহে, পরন্তু মহৎ কীর্ত্তির ও ধর্ম্মের অপূর্ব্ব জীবন্ত শক্তির পরিচায়ক। ভীষণ বিপ্লব ভারতবর্ষকে পূর্ণরূপে দলিত ও মথিত করিয়া গর্ব্বান্ধতার পূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য আস্ফালন করিয়াছে, বিধর্ম্মী রাজারা মন্দিরের চূড়া ভগ্ন করিয়া মস্‌জিদ গঠন করিয়াছে, শোণিত-স্রোতে রাজপথ প্লাবিত হইয়াছে, দিকে দিকে হাহাকার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তবু কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব বিশেষত্বটুকু মুছিয়া যায় নাই। সেই সুপ্রাচীন আর্য্য প্রভাব, বৌদ্ধ প্রভাব, শৈব প্রভাব, বৈষ্ণব প্রভাব ও সৌর প্রভাবের প্রাচীনত্ব দূর হয় নাই। আমরা পরিবর্ত্তনের প্রবল তাণ্ডব নর্ত্তনের মধ্যেও আপনাদের যাহা প্রাপ্য, তাহাকে অক্ষত ভাবেই ফিরিয়া পাইতেছি।

ভারতবর্ষে সৌরপ্রভাব সেই সুদূর অতীতের অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। * বেদে সূর্য্যের মহিমাজ্ঞাপক স্তোত্র বা ধ্যানের বহুল উল্লেখ আছে। তিলক, ভাণ্ডারকার প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিত বর্গের নানাবিধ সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আর্য্যগণের আদি নিবাস উত্তরমেরুতে ছিল। সেই দারুণ শীতের দেশের লোকের নিকট সূর্য্যদেব যে কত আদরের তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? তুষার-মণ্ডিত শীতক্লিষ্ট উত্তর মেরুর অধিবাসী আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যতই পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই তেজঃদীপ্ত সূর্য্যদেবের অলৌকিক শৌর্য্য তাঁহাদিগকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাঁহারা তাঁহাদের চির অভ্যস্ত যে তেজহীন সূর্য্যের ক্ষীণ-রশ্মিতে আপনাদের শীত-ভীতি দূর করিতে পারেন নাই এত সে সূর্য্য নহে, সে নিষ্প্রভ তপনের সহিত বিরাট নীল গগন-তলে সমাসীন মহাবীর্য্যবান সূর্য্যের কত প্রভেদ! তাই তাঁহারা এই প্রত্যক্ষ দেবতা, অপূর্ব্ব দীপ্তিশালী দেবের মহিমা-গাথা রচনা করিয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে বরণ করিয়া লইলেন। বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্রও সূর্য্যদেবেরই স্তুতি-গাথা, এ বিষয়ে কাহারো কাহারো মতভেদও পরিলক্ষিত হয়। বেদে, পুরাণে, শ্লোকে, উপাখ্যানে, ব্রতে অর্থাৎ ধর্ম্মের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের মধ্যেই সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক স্তব ও স্তুতি বিদ্যমান। সূর্য্য বৈদিক দেবতা, তা বলিয়া তিনি পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্যেও কিন্তু আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে ছাড়েন নাই।

জগতের আদিম ইতিহাসের গুণ্ঠিত পত্রগুলি উন্মোচন করিতে গেলে একটী জিনিষ অতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটা প্রকৃতি পূজা। এই শ্যামল-শোভা-সম্পদশালিনী ধরিত্রী জননী, সূর্য্য-চন্দ্র-খচিত অসীম অনন্ত নীল গগনের প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্য, তরঙ্গায়িত

* Aryan Notes—by K. M. Banerjee.

সমুদ্রের আকুল লহরী-লীলা, তরঙ্গিণীর বক্রগতি, অভ্রভেদী তুষারাবৃত শুভ্র গিরিশ্রেণী জগতের আদিযুগের আদিম অধিবাসী নরনারীগণকে এক অজ্ঞেয় শক্তিতে আচ্ছন্ন করিয়া প্রকৃতির উপাসনায় উদ্বোধিত করিয়াছিল। তাই সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ যা কিছু মহান্ তাহাই আমাদের দেবতারূপে অর্চ্চনা প্রাপ্ত হন, গীতায়ও তাহার বিকাশ দেখিতে পাই।

সৃষ্টির আদিযুগে যখন বংশপরম্পরাগত জ্ঞান ও শিক্ষার দ্বারা মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্যপ্রকৃতির ভাল করিয়া সংযোগ হয় নাই, সেই যুগে যাহা কিছু জগতের কল্যাণকর, যাহা কিছু জীবনের শ্রেয়স্কর, সে সকলের মধ্য দিয়াই এক বিরাট দুর্জ্জেয়শক্তির অনুভব করা হৃদয়ের গভীর তত্ত্বানুসন্ধান-স্পৃহা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? আজ যদি একটা অলৌকিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা মঙ্গল কিংবা শুক্রগ্রহে স্থাপিত হই, তাহা হইলে সে অজ্ঞাত দেশের অতি ক্ষুদ্র জিনিষটিও কি আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন এবং অপূর্ব্ব বলিয়া প্রতীত হয় না? তেমনি জগতের আদি যুগে তাঁহারা প্রথমে যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন সে সকলের মধ্যেই অনন্ত চেতনাময় ঐশী শক্তির ধারণা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগেও কি তাঁহাদের সেই প্রাচীন সত্যকে নূতন করিয়া প্রচার করিতেছে না? অন্যদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, তাঁহারা এ সকলকে জড়ের হিসাবে দেখেন নাই। যে নদী অশেষ কল্যাণদায়িনী, যে তরু, ছায়া ও ফলদানে ক্ষুধার শান্তি ও দেহের তৃপ্তি দান করে, যে গিরি-নির্ঝরিণী দেশকে শস্য-শ্যামলা করিয়া তোলে, যে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আলোকচ্ছটায় দিবারাত্রির সামঞ্জস্য আনয়ন করে, এক কথায় যাহাদের নানাপ্রকার সাহায্য পাইয়াই জীবজন্তু জীবন ধারণ করিয়া ধরাধামে বিচরণ করিতে পারে, তাহাদের মধ্যেই ঈশ্বরকে অনুভব করা,—জড় ও

চেতনের সামঞ্জস্য বিধান, ক্ষুদ্র পুষ্পটির মনোরম সৌন্দর্য্য-গঠিত পাপ্ড়ির অভ্যন্তরে অনন্ত শক্তিময়, অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় শিব-সুন্দরকে গ্রহণ,—সে ত অতি মহৎ, অতি সুন্দর, অতি উচ্চ শিক্ষা। সমগ্র জড় প্রকৃতির মধ্যে আবার সূর্য্যদেব অতি সহজেই আদিম অধিবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, তাঁহারা জবাকুসুমসন্নিভ রক্তবর্ণ; মহাদ্যুতিশালী, জগজ্জীবন সূর্য্যকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন, কি তেজ! কোথায় অন্ধকার? ঘনঘোর অন্ধকার এক মুহূর্ত্তে ইহার উদয়ে লুকাইয়া যায়; অতএব নিশ্চয়ই ইনি জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বর, প্রত্যক্ষ দেবতা। এজন্যই সন্ধ্যামন্ত্রের মূল দেবতাকে আমরা সূর্য্যমণ্ডলে সমাসীন দেখিতে পাই।

"চিত্রং দেবনাম্ উদগাদনীকং
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং
সূর্য্য আত্মা জগত স্তস্থুষশ্চ।"

"বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু স্বরূপ (সূর্য্য) উদয় হইয়াছেন; দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করিয়াছেন; সূর্য্য জঙ্গম ও স্থাবর সকলের আত্মা-স্বরূপ।"

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের ঋগেদের অনুবাদ)

এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণের মধ্যেও সূর্য্যের পূজা প্রচলিত আছে। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যেও সূর্য্যের পূজা প্রচলিত আছে। চীন, যাভা, মলয়া প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি সূর্য্য-পূজা বিশেষরূপে প্রচলিত আছে।

ভারতবর্ষেও সূর্য্যদেবের পূজা সুদূর অতীতকাল হইতেই বিদ্যমান, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কেমন করিয়া

সূর্য্যদেবের পূজা প্রচলিত হয় সে সম্বন্ধেও নানাবিধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

'বায়ুপুরাণ', 'অগ্নিপুরাণ', 'বরাহপুরাণ,' 'মৎস্য পুরাণ,' 'ভবিষ্য পুরাণ' প্রভৃতি এক এক পৌরাণিক গ্রন্থে এক এক প্রকার উপাখ্যান বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। শাকদ্বীপবাসী সূর্য্যোপাসক মগগণের আগমণের সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্য-পূজা এদেশে বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে এদেশে সূর্য্যোপাসক কোনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সাম্ব কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হইয়া সূর্য্য-পূজা করিবার জন্য শাকদ্বীপ হইতে সৌর ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন। কেন সাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া উক্ত দেশবাসী ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমরা সে পৌরাণিক কাহিনীটির এখানে উল্লেখ করিলাম। সাম্ব—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, সুন্দর দেহ, তরুণ যুবক। এক দিবস মহর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পুত্রগণ সকলেই নারদকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া অর্চ্চনা করিলেন;—ভ্রমবশতঃ করিলেন না কেবল সাম্ব। সর্ব্বত্যাগী নারদের নিকট কিন্তু এই অপমানের জ্বালাটুকু বিশেষরূপে জাগিয়া রহিল। কেমন করিয়া রূপ-যৌবন-গর্ব্বিত সাম্বকে সেই অপমানের যথাবিহিত শাস্তি বিধান করিবেন, তাহার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে নারদ পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত, শ্রীকৃষ্ণ সে দিবস তাঁহার পত্নীগণসহ জলক্রীড়া করিতেছিলেন, নারদ জানিয়া শুনিয়াই সাম্বকে পিতা শ্রীকৃষ্ণের নিকট তদীয় আগমনবার্ত্তা জ্ঞাত করাইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তার পর কি হইল? সে কাহিনী-টুকু আমাদের দেশের এক মৃত কবি বড় সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন—"ভুল করিয়া সাম্ব সেদিন সরসী তীরে আসিয়াছিলেন—জননী জাম্ববতী জানিলে নিষেধ করিতেন, জনক শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে থাকিলে আসিতে দিতেন না—সাম্বের বিমাতৃগণ তখন

জলক্রীড়ায় মত্ত। এই পথে সাম্ব? পিতৃ-মুখ হইতে অভিশাপ বাহির হইল—কুষ্ঠরোগে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হউক।" * অভিশপ্ত সাম্ব দ্বাদশ বৎসরকাল শান্ত দান্ত নিরাহার বায়ু-ভক্ষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া চন্দ্রভাগা নদীতীরে সূর্য্যকে স্তবে সন্তুষ্ট করিলেন এবং "পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভ-সমদ্যুতিঃ" সূর্য্যের বরে রোগমুক্ত হইলেন। ওড়িষ্যার কনারকের অপূর্ব্ব কলানৈপুণ্য গঠিত বর্ত্তমানের জীর্ণ ও পরিত্যক্ত সূর্য্যমন্দির অদ্যাপি এ প্রাচীন স্মৃতি পুণ্য-কাহিনী জগতে প্রচার করিতেছে। কনারকের অনিন্দ্যসুন্দর নবগ্রহ মূর্ত্তির শিল্পকলা ও মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট জগমোহনের প্রতি প্রস্তরকণায় খোদিত সৌন্দর্য্য হইতে এখনও আমরা অনুভব করিতে পারি যে, এক সময়ে সূর্য্যোপাসনার প্রভাব এদেশে কতটা বিস্তৃত ছিল। যদি তৎকালে তাহাই না হইত, তাহা হইলে ওড়িষ্যার দ্বাদশ বৎসরের রাজস্ব, রাজকোষ হইতে কখনও এমন করিয়া পাষাণ-মন্দির গঠনে ব্যয়িত হইত না। এই পাষাণ-মন্দিরের কলা-নৈপুণ্য ও গঠন পরিকল্পনা যে কিরূপ মনোমুগ্ধকর তাহা ফারগুসন্, কানিহাম, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিজ্ঞ ভাষায় বিশেষ পরিস্ফুট।

সূর্য্যদেব কি কেবল মাত্র কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সাম্বকে রোগমুক্তি দিয়াই প্রসিদ্ধ? তাহা নহে, তিনি আর্ত্তের সহায়, সর্ব্বরোগহর এবং প্রেমিকের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারীও বটেন। নির্জ্জন গিরিপথে রাজা সম্বরণ মৃগয়ান্বেষণে বহির্গত হইয়াছেন, ঘনবিন্যস্ত তরুশ্রেণী, লতায় লতায়, পাতায় পাতায়, শাখায় শাখায় অপূর্ব্ব মিলন, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে বসন্তের অপূর্ব্ব শোভা বসুধার শ্যাম অঙ্গে পূর্ণ বিকসিত! গিরি নির্ঝরিণী উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে, তরুণ নৃপতি কি দেখিলেন? নির্নিমেষ নয়নে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন, তরু-অন্তরাল হইতে সুযোগ বুঝিয়া ঐ তাহার শিকার পলাইল, হাতের তীর হাতেই রহিয়া গেল, আর

* 'সাধনায়' কনারক শীর্ষক প্রবন্ধ—শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাহা নিষ্ফিপ্ত হইল না ;—সূর্য্যকন্যা তপতী নির্ঝর তীরে শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া নির্ঝরের স্বচ্ছ নীরে আপনার অলৌকিক দেহসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, নৃপতি সম্বরণ তাহা দেখিলেন। উভয়েই প্রাণ হারাইলেন, তারপরে দীর্ঘ বিরহের পরে সম্বরণ দীর্ঘকাল তপস্যা দ্বারা সূর্য্যদেবকে তুষ্ট করিয়া অভীপ্সিত বরপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাদের মিলন হইল। 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তৎসম্পাদিত 'ব্রজ পরিক্রমা' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মাথুর ব্রাহ্মণগণের কুলদেবতাও সূর্য্যদেব।

সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারতেও সূর্য্য পূজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এমন কি কাশীরাম দাসের বাংলা মহাভারতেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। বন পর্ব্বান্তর্গত শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান ও দ্রৌপদীর দুর্ব্বাসাকে সশিষ্য ভোজন করাইবার ঘটনা হইতেই তাহা বিশদরূপে অভিব্যক্ত। শ্রীবৎস রাজা শনির কোপে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পত্নী চিন্তামণিসহ গভীর বনে দুঃসহ মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। রাজা রাণী আজ ভিখারী ও ভিখারিণী। শ্রীবৎস এখন সামান্য কাঠুরিয়া. এক দিবস দূর বনে কাঠ কাটিতে গমন করিয়াছেন। চিন্তামণি একাকিনী কুটীরে চিন্তামগ্না। বনান্তরালবাহিনী নদীনীরে এক সাধুর নৌকা আসিয়া ঠেকিয়াছে, কিছুতেই তাহা ভাসিতেছে না, সাধু উন্মত্তবৎ, পণ্যতরী আটক, তার সব যায়! গ্রহাচার্য্য বলিলেন,—সতী স্ত্রীর স্পর্শ ব্যতীত নৌকা ভাসিবে না। সাধুর করুণ মিনতিতে একে একে বনবাসিনী সমুদয় কাঠুরিয়া পত্নীগণ তরী স্পর্শ করিলেন—তবু তরী অচল, কুটীর পরিত্যাগ করেন নাই কেবল চিন্তা—কারণ স্বামীর নিষেধ। সাধুর কাণে একথা পৌঁছিল, তিনি বুঝিলেন ;—

'সে আইলে মমতরী সর্ব্বদা চলিবে।' বিপন্ন সাধু সাধ্বীর শরণাপন্ন হইলেন, তাহার করুণ মিনতিতে মাতৃ-হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি

শরণাগতকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধে সাধুর অনুরোধে তরী স্পর্শ করিলেন, সতীর স্পর্শে এইবার তরী ভাসিল, সকলে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিল। সংসারে কৃতজ্ঞ কয়জন? সাধু ভাবিলেন ;—

'যদি মোর নৌকা কভু আটক হইবে।
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে।'

সাধু, চিন্তা দেবীকে আর তীরে অবতরণ করিতে দিলেন না, সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সতী সাধুর দুর্ব্যবহারে একান্ত মর্ম্মপীড়িতা হইলেন ও ভীত হইয়া :—

"সূর্য্যপানে চাহি দেবী যোড় করি হাত।
বহু স্তব করে চিন্তা বহু প্রণিপাত॥
দয়া কর দীননাথ অখিলের পতি।
মোর রূপ নিয়া দেব দেও কুআকৃতি॥
দেখি দেব ভাস্করের দয়া উপজিল।
ভয় নাই ভয় নাই বাণী নিঃসরিল॥
চিন্তা দেবীর রূপ দেব করিলা হরণ।
গলিত ধবল মূর্ত্তি দিলা ততক্ষণ॥"

কাম্যবনে ঋষি দুর্ব্বাসা সশিষ্যে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট ভোজন-প্রার্থী হইলে রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বিপদের বার্ত্তা জানাইলেন, কৃষ্ণা নির্ভয়ে রাজাকে বলিলেন :—

"* * * অন্ন কার্য্যে এত চিন্তা কর কি কারণ।
* * * * * *
সূর্য্যের বচনে আমি তোমার প্রসাদে।
দশ লক্ষ আইলে ভুঞ্জাব অপ্রমাদে॥"

সকলে ভোজনে বসিলে

* * * যতেক করে ব্যয়।

সূর্য্য অনুগ্রহে পুনঃ পরিপূর্ণ হয়॥"

এমনি করিয়াই সূর্য্যদেব সর্ব্বত্র তাঁহার পূজার আসনখানি মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন।

বিক্রমপুরের নিভৃত পল্লী-কুটীর-প্রাঙ্গণে কেমন করিয়া সূর্য্যদেব তাঁহার পূজার আসন খানা স্থাপন করিয়াছিলেন এতকাল পরে সে প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা সুকঠিন। অথচ তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে সূর্য্যদেব যে অতি উচ্চ শ্রেণীর দেবতা সে কথা আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। হিন্দুর প্রতি কার্য্যে প্রতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেই সূর্য্যের পূজা বা অর্ঘ্য দিতে হয়। এখন পূর্ব্বের ন্যায় সৌর প্রভাবের কোনও লক্ষণ দেখিতে না পাওয়া গেলেও এক সময়ে যে উহা বিশেষরূপে বিক্রমপুরে প্রচলিত ছিল, তাহা নানা উপায়েই আমরা জ্ঞাত হইতে পারি। ব্রতানুষ্ঠান, মৃত্তিকা খননে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তি সমূহ, গ্রহাচার্য্যগণের সংখ্যাধিক্য দৃষ্টে অতি সহজেই প্রাচীন সৌর প্রভাবের বর্ত্তমান ক্ষীণ দীপ্তি এককালে যে উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান ছিল, তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

বিক্রমপুরে নানা প্রকারে সৌর প্রভাব পরিস্ফুট। মাঘ-মণ্ডলের ব্রত, সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা, সৌরমতে প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদিই তাহার পরিচায়ক। শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতে মাঘমণ্ডলের ব্রতাবলম্বিনী বালিকাগণের সমবেত কণ্ঠের;—

"উঠ উঠ সূর্য্যদেব ঝিকি মিকি দিয়া" এবং সূর্য্যিঠাকুর জগন্নাথ" ইত্যাদি যোষিদ্‌বৃন্দের ব্রতাদি কবে কোন্ সুদূর অতীতে গ্রথিত হইয়া অদ্যাপি "সূর্য্যিদেব" ঠাকুরের প্রভাব ব্যক্ত করিতেছে! যদি প্রাচীন কালে সমাজে সূর্য্যদেবের বিশেষ কোনও শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিত এবং তিনি

অর্চ্চিত না হইতেন তাহা হইলে কখনই, এমন কি যে সকল যোষিদ্‌-ব্রতাদির সহিত শাস্ত্রোক্ত বা পুরাণোক্ত কোন সংস্রব নাই, সে সকলের মধ্যেও কখনো তিনি স্থান প্রাপ্ত হইতেন না। "সূর্য্যব্রত" নামক আর একটি ব্রত বিক্রমপুরে প্রচলিত আছে, সে ব্রতে ব্রতিনীকে সূর্য্যোদয় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যের গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে হয়, সূর্য্যাস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রতিনীর বসিবার অধিকার নাই। কোনও গুরুতর পাপানুষ্টানকারীর প্রতি সৌরমতে প্রায়শ্চিত্ত বিধি প্রচলিত আছে। ইহাও সৌর প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন।

কোন্ সময়ে এবং কিরূপে সর্ব্ব প্রথমে ভারতে মুর্ত্তি পূজা প্রবর্ত্তিত হয়, সে সিদ্ধান্ত এখন পর্য্যন্তও নির্ণীত হয় নাই, এ সম্বন্ধে নানা প্রকার বিভিন্ন মত প্রচলিত দেখা যায়, কাজেই কোন্ সময় হইতে বিক্রমপুরে সর্ব্ব প্রথমে সূর্য্যদেবের প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি-সমূহ পূজিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার প্রকৃত সময় নিরূপণ করিতে হইলে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার উপরই অধিক নির্ভর করিতে হয়, আর সে কল্পনা বা অনুমান কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দাঁড় করান যাইতে-পারে তাহাও বিবেচ্য বটে। যদি বহুকাল হইতে সৌর প্রভাব বিক্রম-পুরে আধিপত্য লাভ না করিত তাহা হইলে কখনই পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করিতে যেখানে সেখানে এত অধিক সুগঠিত প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সূর্য্যমূর্ত্তিসমূহ পাওয়া যাইত না। অদ্যাপি সোণারঙ্গ ও আবদুল্লা পুর প্রভৃতি গ্রামে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া পূজিত হইতেছে। এতদ্‌-ব্যতীত আরও অনেক সূর্য্যমূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছি, সে সকলের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। আবদুল্লাপুরের সূর্য্যমূর্ত্তিটি প্রায় পাঁচ ছয় হস্ত উচ্চ। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কথা প্রসঙ্গে একদিন এই লেখককে বলিয়াছিলেন যে "এ সকল বিরাট-

মূর্ত্তি রাজাদের প্রতিষ্ঠিত ছিল, নচেৎ এত বড় মূর্ত্তি সেকালে স্থাপন এবং কলেবরানুযায়ী নৈবেদ্য প্রদান যে সে লোকের কর্ম্ম নহে!" তাঁহার এ উক্তিটি একটু ভাবিবার বটে; যে যুগে রেল, ষ্টীমারের নাম গন্ধও ছিল না, যে যুগে ৺কাশীধাম, পুরী প্রভৃতি তীর্থে রওনা হইতে হইলে অন্তিম বিদায় লইয়া আসিতে হইত, সে যুগের লোকের পক্ষে এপ্রকার শত শত প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি গঠন ও স্থাপন সাধারণ লোকের সাধ্য বলিয়া কখনও মনে করিতে পারি না। সেন রাজগণ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং বিক্রমপুরে তাঁহাদের গৌরবময় রাজধানী ছিল—অতএব এরূপ অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত যে এ সমুদয় প্রস্তর নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি, সূর্য্যমূর্ত্তি, রজত নির্ম্মিত ও অষ্টধাতু নির্ম্মিত দেববিগ্রহাদিও তাঁহারাই স্থাপন করিয়াছেন, এবং গ্রহাচার্য্য বা সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে সঙ্গেই সৌরপ্রভাব বিক্রমপুরে বিশেষরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

যে সূর্য্য মূর্ত্তির চিত্র 'ঐতিহাসিক চিত্রে' প্রকাশিত হইল সে সূর্য্যমূর্ত্তিটি লেখকের বাসগ্রামস্থ একটি পুষ্করিণী খনন করিতে প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তিটি উচ্চে প্রায় ২॥ হাত এবং প্রস্থে প্রায় ১॥ হাত হইবে। ছিন্ননাসা;—দুই হস্তে দু'টি প্রস্ফুটিত কমল ধৃত, পরিধানে হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বস্ত্র, দক্ষিণ হস্তের নিম্নাংশে কটিদেশের সহিত নেপালি ছোরার মত ছোরা সংলগ্ন, পদে উপানৎ, এই উপানদ-যুগলের ইতিহাস একটু আলোচনার যোগ্য। বিগত সংখ্যার "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" পাণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "সূর্য্য-পদে উপানৎ" শীর্ষক প্রবন্ধে এবিষয়ে যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছেন—আমরা বাহুল্য ভয়ে আর তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। তাঁহার মতে "পুরাণ তন্ত্র ইত্যাদি কোন গ্রন্থেই জুতার কথা যখন আজ পর্য্যন্ত কোথাও উল্লেখ নাই, তখন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উহাকে জুতা না বলিয়া প্রাবরণ বিশেষই বলিলাম।" উপানৎ দেখিতে ঠিক যেন বর্ত্তমান কালের

বুট জুতা, ইহা অপেক্ষাও তিব্বতীয়দিগের পরিহিত পাদুকার সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বিনোদ বাবু "মৎস্যপুরাণ" হইতে এবিষয়ে একটী গল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন, গল্পটি এই,—"সূর্য্যের স্ত্রী সংজ্ঞা যিনি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা, সূর্য্যের তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়া নামে একটী স্ত্রীমূর্ত্তিকে আপনার স্থানে বসাইয়া দিয়া গোপনে পিত্রালয়ে পলায়ন করেন পিতা বিশ্বকর্ম্মা সংজ্ঞার এই কার্য্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি তথা হইতে মরুদেশে যাইয়া ঘোটকীর আকার ধারণ করতঃ অবস্থান করিতে থাকেন। সূর্য্য প্রথমে এসব কিছুই জানিতে পারেন নাই, ছায়াকেই সংজ্ঞা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ক্রমে যখন জানিতে পারিলেন যে সংজ্ঞা নাই, তখন একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া আমার সংজ্ঞা কোথায় বলিয়া বিশ্বকর্ম্মার বাড়ী হাজির। বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিলেন, ভগবন্! সংজ্ঞা আপনার তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া আমার বাড়ী পলাইয়া আসে ও আমার তিরস্কারে আমার গৃহও ত্যাগ করিয়া উপস্থিত মরুদেশে ঘোটকীরূপে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমার নিবেদন আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তবে আমি আপনাকে আমার শান যন্ত্রে ফেলিয়া কিছু তেজ কাটিয়া কমাইয়া দি ও আপনাকে কতক সুদর্শন করিয়া দি। সূর্য্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে বিশ্বকর্ম্মা তাহাই করিলেন। সূর্য্যের পদদ্বয় ব্যতীত অপর সমস্ত অঙ্গের তেজ কমাইয়া দিলেন, পা দু'খানি কিন্তু যেমন অসহ্য দর্শন ছিল তেমনই রহিল।" এজন্যই "মৎস্যপুরাণে" বস্ত্রযুগ্মসমোপেতং চরণৌ তেজসাবৃতৌ॥ কলিকাতার চিত্রশালায় এবং বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে এপর্য্যন্ত যতগুলা সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহার কোনটিতেই পদদ্বয় অনাবৃত নহে—এইরূপ উপানদযুগল-পরিশোভিত।—কলিকাতার চিত্রশালায় সূর্য্যের এমন শিলা-প্রতিমাও আছে যাহার পদদ্বয় স্বর্পত্তি একেবারেই খোদিত

করে নাই। এ সকল পুরাণকারগণের উদ্ভট কল্পনার পরিচায়ক বটে! *

মূর্ত্তির নিম্নদেশে সপ্তাশ্বযোজিত রথচালনে নিরত অরুণের মূর্ত্তি। সূর্য্যদেবের মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে আরও দুইটি পুরুষমূর্ত্তি—তাহারা দ্বারপাল। তাহাদের একজনের হাতে সনাল পদ্ম-কোরক ধৃত ও অপর হস্তে গদা, অপরটি লম্বোদর, শ্মশ্রুবিশিষ্ট—দক্ষিণ হস্তে পুষ্প-কোরক এবং বামহস্তে একটা ভাণ্ড ধৃত। এ মূর্ত্তি দু'টির পদযুগলও উপানৎ-পরিশোভিত। দ্বারপালদ্বয়ের দুই পার্শ্বে আবার দু'টী স্ত্রী-মূর্ত্তি—ধনুতে জ্যারোপণ করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত। মূলমূর্ত্তির শিরোবেষ্টন করিয়া দ্বাদশাদিত্য-মূর্ত্তি—ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক, কারণ হিন্দু মাত্রেরই ইহা সুপরিচিত। দু'জন দেববালা দু'দিক হইতে সূর্য্যদেবকে মালা পরাইতে আসিতেছেন, ইঁহারা কিরণকুমারী। দেব বিবস্বানের সৌম্য-শান্ত-হসিত-মূর্ত্তি। মুকুট ও কর্ণাভরণ দাক্ষিণাত্যের শিল্পানুযায়ী গঠিত।

এতদিন পর্য্যন্ত ইনি গ্রামবাসিগণের কোনো মনোযোগ আকর্ষণ করেন নাই—তাঁহারা সকলেই একবাক্যে 'ব্যাসদেবের' মূর্ত্তি বলিয়াই ইহাকে এক পোড়ো বাড়ীতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন, সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবত আমার এক আত্মীয় ইঁহাকে তদীয় মাতৃ-শ্মশান-

* উপানৎ এ নাম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদের ব্যবহৃত। ইউ-রোপীয় পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্তও কিন্তু উহা 'বুট জুতা' এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত উহার প্রকৃত নাম প্রাচীন পুরাণাদি হইতে জানিতে না পারা যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রদত্ত উপানৎ নাম গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত বোধে আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। মিউজিয়ামে তেমন বড় এবং বিশেষ কারুকার্য্যসম্পন্ন সূর্য্যমূর্ত্তি একটিও নাই—আমাদের প্রদত্ত চিত্রের মত বৃহৎ এবং সুন্দর শিল্পকাব্য সম্পন্ন মূর্ত্তি একটিও দেখিলাম না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও সৌর-প্রভাব যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল তাহা দাক্ষিণাত্যের কুম্ভকোনাম্ নামক স্থানের ব্রহ্ম মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যমূর্ত্তি এবং কাশ্মীরান্তর্গত রাজপুরাবস্থিত সূর্য্য-মন্দির হইতেই জানিতে পারা যায়।

মন্দিরে স্থাপন করিয়াছেন। এখন ইঁহার পরিত্যক্ত বন-গৃহে কখনো কখনো প্রদীপের ক্ষীণরশ্মি প্রতিভাত হয়।

সূর্য্যমূর্ত্তির সম্বন্ধে কোনো কথা বলিতে যাওয়া অনাবশ্যক, কারণ এবিষয়ে বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, বিশেষ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামেও বহু সূর্য্যমূর্ত্তি আছে। কেবল যে বিক্রমপুরেই সৌর প্রভাব প্রচলিত ছিল এবং আছে, তাহা নয়; বঙ্গের সর্ব্বত্রই সৌরপ্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল এবং আছে। তবে সূর্য্যদেবের এত শিলা প্রতিমা বঙ্গ-দেশের আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে কি না সন্দেহ।

উপসংহারে পদ্মাসনঃ পদ্মকরোঃ দ্বিবাহুঃ পদ্মদ্যুতিঃ সপ্ততুরঙ্গবাহঃ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং সর্ব্বপাপঘ্নং সূর্য্যদেবকে প্রণিপাত করিয়া বিদায় গ্রহণ করি। †

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

---

† বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আধুনিক আরবজাতি।

—:•:—

মহাত্মা মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, জাতীয় ধর্ম্মানুসারে আরবজাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। উহাদের মধ্যে, এক সম্প্রদায় রাজধানী ও নগরে যথোপযুক্ত বাসভবন প্রস্তুত করিয়া বাস করে; অপর সম্প্রদায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া প্রান্তরে বা অরণ্যে বাস করিয়া থাকে। জাতীয় ধর্ম্মগত পার্থক্য অনুসারে, প্রথমোক্ত আশ্রমী এবং শেষোক্ত নিরাশ্রমী বা অটনশীল সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত। আমরা এই দুই সম্প্রদায়ের বিবরণ যথাসাধ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আশ্রমী আরবজাতি।—এই সম্প্রদায়ের কেহ কেহ পর্ব্বতের চতুঃপার্শে; বিক্ষিপ্ত উপত্যকা মধ্যে; গ্রাম ও দুর্গরক্ষিত নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। এই দুর্গ ও নগরের চতুর্দ্দিক দ্রাক্ষাবন, ফল ও পুষ্পোদ্যান, তালীবন, শ্যামল শস্যক্ষেত্রপূর্ণ প্রান্তর, এবং প্রচুর নব তৃণ শোভিত গোষ্ঠে পরিবৃত। ইহারা একস্থানে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া ভূমিকর্ষন, পশুপালন ও চারণ করিয়া জীবনাতিবাহিত করে।

এই শ্রেণীর অবশিষ্টেরা, বাণিজ্যকার্য্য অবলম্বন করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লোহিত সাগরের উপকূল, আরবের দক্ষিণ অথবা ভারত মহাসাগরীয় উপকূল এবং পারস্য উপসাগরের উপকূলে ইহাদিগের অধিক বন্দর ও বাণিজ্যস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত বন্দরে অবস্থিতি করিয়া, উহারা অর্ণবপোত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণিক্ সম্প্রদায় সংগঠন পূর্ব্বক বহির্ব্বাণিজ্য করে। ধুনা, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য, ও মসলাজাতের আকর-ভূমি য্যামান প্রদেশ বা সুখপূর্ণ আরবক্ষেত্রের অধিবাসিগণ এবম্বিধ

জীবন অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে এইরূপ বহির্ব্বাণিজ্য নির্ব্বাহক্ষম পূর্ব্বদেশীয় সমুদ্রসকলে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অনেক সুদক্ষ নৌদক্ষ বণিক্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের অর্ণবপোত সমূহ আরবের অপর কূলস্থিত বর্ব্বরা প্রদেশে গমন করিয়া, ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকা প্রভৃতি উষ্ণপ্রধান দেশজাত স্বর্ণ, নানাবিধ মসলাদ্রব্য, এবং বহুমূল্য পণ্যজাতের বিনিময়ে, অন্যান্য সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য আনয়ন করে। এই সমুদায় পণ্য এবং স্ব স্ব দেশোৎপন্ন দ্রব্যজাত, উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণিক্ সম্প্রদায় দ্বারা, আরবের সুগভীর অরণ্য উত্তরণ করিয়া, আরবাধিষ্ঠিত আমন, মোয়াব, এবং ইদম বা ইদুমিয়া প্রদেশে এবং তথা হইতে ভূমধ্য সাগরস্থ ফিনিসীয় বন্দর সকলে এবং তথা হইতে পাশ্চাত্যখণ্ডে প্রেরণ করিয়া থাকে। জ্যাকবের সময় হইতে উহারা এইরূপ বাণিজ্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে এবং ভাস্কোডি গামা প্রভৃতি বিদেশীয় পর্য্যাটকগণের ভারতাগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত,এই আরবজাতিই জ্ঞান, ধর্ম্ম, বাণিজ্য ও বিদ্যা বিষয়ে, ইয়ুরোপ ও আফ্রিকার সহিত ভারতের সম্বন্ধসূত্র অক্ষুন্ন রাখিয়াছে এবং আজিও পাশ্চাত্য সভ্যজগতে ভারতসমৃদ্ধি ও ভারতজ্ঞানের প্রথম প্রচারকর্ত্তারূপে সম্মানিত হইতেছে।

ইহাদিগের মধ্যে য্যামান অধিবাসীগণ বিশেষতঃ কোরিশ্ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা বাণিজ্যপ্রিয়; বিশেষতঃ পৈতৃক বৃত্তির অনুসরণ করা উহাদিগের কুলগত নৈসর্গিক ধর্ম্ম। সেইজন্য মহম্মদও এই বণিক্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, উষ্ট্র 'মরুপোত' অর্থাৎ 'মরুভূমির জাহাজ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তদনুসারে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণিক্ সম্প্রদায়কে 'মরুপোত দল' বলিয়া সম্বোধন করা আবশ্যক। আবার য্যামান প্রদেশস্থ বণিক্ সম্প্রদায়ের বাণিজ্যকার্য্য অটনশীল

আরবজাতির সর্ব্ববিধ পরিশ্রম ও আনুকূল্য দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়; উহারাই অসংখ্য অসংখ্য উষ্ট্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালন করে—তাহাদিগকে বাণিজ্য কার্য্যোপযোগী করিয়া লয়—এবং তাহাদিগের কর্ত্তিত অতি সুন্দর ও সুপরিচ্ছন্ন লোমদ্বারা উষ্ট্রের বেতন পর্য্যন্ত প্রদান করে। বস্তুতঃ অটনশীল আরবজাতিই বাণিজ্যব্যবসায়ী আশ্রমী আরবজাতির দক্ষিণ হস্ত। সেইজন্য, অটনশীল আরবগণকে 'মরু-নাবিক' বলিয়া সম্বোধন করিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তাগণ, স্পষ্টাভিধানে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে. অতি প্রাচীনকালে সিরিয়া প্রদেশের সহিত দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী দেশনিচয়—ভারতবর্ষ, ইথিওপিয়া এবং য্যামান প্রদেশের বাণিজ্যকার্য্য যে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, অটনশীল আরব জাতিই তাহার একমাত্র কারণ।

আশ্রমী সম্প্রদায় অথবা কৃষিজীবি ও বাণিজ্যব্যবসায়ী আরবজাতিকে আরবের জাতীয় ধর্ম্মের চূড়ান্ত নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। উহারা নিরূপিত ও শান্তিপ্রদ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, কথঞ্চিৎ প্রশমিত এবং অপরিচিত ও বৈদেশিকগণের সহবাসে নৈসর্গিক প্রচণ্ডতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। বিশেষতঃ য্যামান প্রদেশ, আরবের অন্যান্য ভূভাগ অপেক্ষা অধিকতর অনায়াসলভ্য এবং লুণ্ঠনকারীগণের সর্ব্ববিধ প্রলোভনের আস্পদভূমি হওয়াতে, উহা বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত ও পরাভূত হইয়াছে। কিন্তু অন্য সম্প্রদায় সংখ্যায় যেমন অধিক, তেমনই নৈতিক বল ও ঔদার্য্য সহকারে জাতীয় চরিত্র সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছে—এই সম্প্রদায়ের বিবরণ আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।—

নিরাশ্রমী আরবজাতি।—আব্রাহাম তনয় ইস্মাইলের ঔরসে, জোর্হাম জাতীয় মোরাদ-তনয়ার গর্ভে, ইস্মাইলের দ্বাদশ পুত্র জন্মে। সেই দ্বাদশ পুত্র হইতে দ্বাদশটী ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের উৎপত্তি হয়।

তদনুসারে ইস্মাইলের প্রথম দুই তনয় নবাইয়োথ্ ও কেদার হইতে এই অটনশীল আরবজাতি উদ্ভূত হইয়াছে। পশুচারণ এবং কখন কখন পান্থগণের সর্ব্বস্বাপহরণ, এই সম্প্রদায়ের উপজীবিকা ছিল। ইহারা সচরাচর উষ্ট্রমাংস ভক্ষণ করে, সর্ব্বদাই বাস পরিবর্ত্তন করে; পশুদলের আহারোপযোগী তৃণজল যেখানে দেখিতে পায়, সেইস্থানে শিবির সন্নিবেশ করে; এবং যতদিন সেই তৃণজল নিঃশেষ না হয়, ততদিন অন্যত্র গমন করে না। পশুদলের আহার্য্য নিঃশেষিত হইলে, উহারা পুনরায় অন্য একটী স্থান সন্ধান করিয়া লয় এবং পুনরায় সেই স্থান পরিবর্ত্তন করে। শীতকালে উহারা সচরাচর সিরিয়া ও আইবাক্ প্রদেশে কাল যাপন করে।

এই অটনশীল আরবজাতি প্রথমে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে 'শেখ' বা 'আমির' নামে এক একজন দলপতি থাকিতেন। উহারা প্রাচীনকালের গোষ্ঠিপতিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ। আমির বা শেখের শিবিরের পার্শ্বেই, শেখের বর্শা প্রোথিত থাকিত; উহাই শাসনদণ্ডের চিহ্ন। শেখের পদ, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত একবংশের অধীন থাকিলেও, পৈতৃক নহে। উহা ব্যক্তিসাধারণের ইচ্ছানুমোদিত। একজন শেখ পদচ্যুত হইলে, অপরবংশীয় অপর একজন সেই পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। ইঁহার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ; চরিত্রগত গুণ ও বিশ্বাসের উপর ইহা নির্ভর করিত। তবে, তাঁহার বিশেষ অধিকার এই যে, তিনি নিজে কোনও যুদ্ধকার্য্যে হস্তক্ষেপ অথবা সন্ধিস্থাপন; বিপক্ষের বিরুদ্ধে সৈন্যচালন, শিবির সন্নিবেশের জন্য স্থান নির্দ্দেশ এবং গণ্যমান্য লোকগণের সম্বর্দ্ধনা ও সৎকারের জন্য, মহোৎসবের আয়োজন করিতে পারেন। কিন্তু এই সকল এবং এবম্বিধ অন্যান্য অধিকার সমূহে তিনি জাতিসাধারণের ইচ্ছাধীন ছিলেন।*

* বর্খোৎ বলিয়াছেন যে, গ্রীষ্মকালে অটনশীল আরবজাতি একস্থানে একাদিক্রমে

একটী জাতি, যতই কেন জনপূর্ণ হউক না এবং যতই কেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত থাকুক না, উহাদিগের শোণিতসম্বন্ধ সকলের মনে সর্ব্বক্ষণই জাগরূক থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের শেখগণ, আবার আপনাদিগের মধ্যে একজনকে 'শেখের শেখ' বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত শেখগণ প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় দুর্গমধ্যে রক্ষিত থাকুন, অথবা মরুস্থলে স্বকীয় পশুদলের মধ্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করুন,

তিন চারি দিনের অধিক অবস্থিতি করেনা। উহাদের পশুদল যেমন সেই স্থানের তৃণজল নিঃশেষ করিয়া ফেলে, অমনই সেই জাতি সেইস্থান পরিত্যাগ করে এবং অপর একটী স্থান অনুসন্ধান করিয়া লয়। পরিত্যক্ত স্থলে পুনরায় তৃণাদি উৎপন্ন হইলে, পুনরায় সেইস্থানে আসিয়া অবস্থিতি করে। এক এক স্থানে ৩০০ হইতে ৮০০ শিবির সন্নিবেশিত হয়। যে সময়ে শিবির সংখ্যা নিতান্ত অল্প থাকে, সেই সময়ে উহারা বৃত্তাকারে অবস্থিতি করে। কিন্তু যখন শিবির সংখ্যা অধিক থাকে, তখন সরল রেখাক্রমে শিবির সন্নিবেশিত হয়। নদীর ধারে, তিন চারি পংক্তিতে পরস্পর পশ্চাৎ পশ্চাৎভাবে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া থাকে। শীতকালে, যখন তৃণজলের কোন অভাব না হয়, তখন তিন চারি দল একত্র শিবির স্থাপন করে, কিন্তু পরস্পর পরস্পর হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পথের ব্যবধানে অবস্থিতি করে। যে দিক হইতে বিপক্ষ বা অভ্যাগত ব্যক্তিগণের আগমন করিবার সম্ভাবনা শেখের শিবির সেই দিকে স্থাপিত হয়। প্রথমোক্তের বিরুদ্ধাচরণ এবং শেষোক্তের সম্বর্দ্ধনাই শেখের প্রধান কর্ত্তব্য। প্রত্যেক পরিবারে পিতা স্বকীয় শিবিরের পার্শ্বদেশে ভূমিতলে বর্শা প্রোথিত এবং সম্মুখে অশ্ব বন্ধন করিয়া রাখে। সেই পরিবারের উষ্ট্রগণও সেইস্থানে নিদ্রা যায়।—
—*Notes on Bedouins—vol I—page 33.*

আসিরীয় দেশীয় আরবজাতির বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল। স্থানীয় হইলেও ইহা সমগ্রজাতির দৃষ্টান্ত।

যখন কোন বৃহৎ সম্প্রদায় গোষ্ঠ হইতে গোষ্ঠান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করে তখনকার দৃশ্য বর্ণনা করা অত্যন্ত দুরূহ। আমরা অতি শীঘ্রই উষ্ট্র ও মেষের বহুবিস্তৃত দল মধ্যে উপনীত হইলাম। কি দক্ষিণে, কি বামে, কি সম্মুখে, যে দিকে নেত্রপাত করি সেইদিকেই চালিত পশুপাল দেখিতে পাই। গর্দ্দভ ও বলীবর্দ্দগণ সারি বদ্ধ হইয়া কৃষ্ণাভ শিবির, বৃহৎ বৃহৎ লৌহ কটাহ এবং নানা বর্ণে চিত্রিত কার্পেট সকল পৃষ্ঠে বহন পুর্ব্বক গমন করিতেছে;—বয়োবৃদ্ধ স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ পথ পর্য্যটনে অক্ষম হইয়া, গৃহসামগ্রীর স্তূপে আবদ্ধ রহিয়াছে; শিশুগণ পর্য্যানস্থলীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; উহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তকগুলি সূক্ষ্ম স্থলীমুখে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহাদিগকে বহনকারী পশুগণের অপর পার্শ্বে ছাগ ও মেষ শাবক বন্ধন করিয়া, তার সমান করিয়া দিয়াছে; নবযুবতী রমণীগণ আরবীয় ভূমিস্পর্শিনী অঙ্গরক্ষার দেহলতা আবৃত করিয়াছে, কিন্ত

জাতিসাধারণের সুখোন্নতি অবচ্ছেদন কোনও ঘটনা উপস্থিত হইলেই, সমস্ত বিচ্ছিন্নদলকে এই প্রধান শেখের পতাকাধীনে সংগৃহীত ও সম্মিলিত করিতেন।

এই নিরাশ্রমী বহুসংখ্যক জাতির প্রত্যেকেরই এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ও এক একজন ক্ষুদ্র রাজা থাকিত। কিন্তু কোনও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় অধিনায়ক না থাকাতে, সর্ব্বদাই ইহাদিগের মধ্যে বিবাদ ও কলহ উপস্থিত হইত। ইহাদিগের মধ্যে, প্রতিহিংসা প্রায় ধর্ম্মনীতির মধ্যেই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল; হত আত্মীয় বা কুটুম্বের প্রতিহিংসাগ্রহণ পরিবারগত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত এবং উহাতে সর্ব্বদাই জাতীয় গৌরব বর্দ্ধিত হইত। এই সমস্ত রক্তের ঋণ, কখন কখন বংশানুক্রমে অমীমাংসিত থাকিয়া সাংঘাতিক বিদ্রোহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত।

মরুভূমির আরবজাতির স্বভাব এবম্বিধ। উহাদিগের আদিপুরুষ ইস্মাইল ইহাদিগের যে ভাগ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন যে, "ইহারা প্রচণ্ড লোক হইবে; ইহাদিগের হস্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে এবং প্রত্যেকের হস্ত ইহাদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হইবে।" বস্তুতঃ প্রকৃতিদেবী ভাগ্যের অনুরূপ করিয়াই ইহাদিগকে সংগঠন করিয়াছেন। ইহাদিগের আকৃতি লঘু ও দুর্ব্বল; কিন্তু দৃঢ় ও শ্রমশীল এবং সর্ব্ববিধ অবসাদ ও ক্লান্তি সহ্য করিতে সক্ষম। ইহারা অতীব মিতাহারী, অতি সামান্য প্রকারের খৎ-

সে অলোকসামান্যরূপরাশি লুকায়িত থাকিবার নহে—প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় বসনমধ্যে দেদীপ্যমান হইয়া, বরং সমধিক শোভাই বিকাশ করিতেছে;—জননী, বক্ষে সন্তান স্থাপন করিয়া মন্দপদে গমন করিতেছে; বালকেরা নৃত্য করিতে করিতে মেষ শাবকগণকে পরিচালন করিতেছে;—দ্রুতপদে গমন করিবার জন্য বালকগণ উষ্ট্রের পৃষ্ঠে কশাঘাত এবং শিক্ষিত অশ্বগণের মুখরজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে;—অশ্বশাবকগণ সেই সুগভীর জনতার মধ্যে লাফাইতে লাফাইতে ধাবিত হইতেছে; এইরূপ বিচিত্র সমারোহের মধ্য দিয়া আমাদিগকে স্বকীয় পথের অনুসরণ করিতে হইল।—*Layard's Neneveh 1.4.*

কিঞ্চিৎ খাদ্য খাইয়াও, প্রাণধারণ করিতে পারে। শরীরের ন্যায় ইহাদিগের মনও লঘু ও চঞ্চল। সেমেটিক্ জাতি, গভীর গবেষণা, উপস্থিত বুদ্ধি, সুতীক্ষ্ণ ধারণা এবং দীপ্তিমতী কল্পনা প্রভৃতি যে সকল মানসিক গুণে অলঙ্কৃত, ইহারাও প্রশংসনীয়রূপে সেই সকল গুণে বিভূষিত। ইহাদের বোধশক্তি যেমন দ্রুত-বিকাশিনী তেমনই সুতীক্ষ্ণ; কিন্তু দীর্ঘস্থায়িনী নহে। একপ্রকার দাম্ভিক ও দুঃসাহসিক তেজ ইহাদিগের দীপ্তপিঙ্গল মুখশ্রীতে অঙ্কিত থাকে এবং ঘোর কৃষ্ণ ও সমুজ্জ্বল নেত্রযুগল হইতে সর্ব্বদাই বিস্ফারিত হয়। ইহারা বক্তৃতার উদ্বোধনে সহজেই উত্তেজিত এবং কবিতার সৌন্দর্য্যে সর্ব্বদাই মোহিত হইয়া থাকে। পদপ্রাচুর্য্য-সম্পন্ন ভাষায় কথা কহিয়া, উহারা স্বভাবতঃ বাগ্মী। ইহারা প্রবাদ ও প্রচলিত নীতি পরম্পরার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী এবং পূর্ব্বদেশীয় রীতি ক্রমে উহারা নীতিপূর্ণ উপকথা দ্বারা স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশ করিতে সমুৎসুক।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যে সকল গুণের জন্য ইহারা আপনাদিগের গৌরব করিয়া থাকে, সেই সকলের মধ্যে, (১) অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োগ ও অশ্বারোহণ পটুতা; (২) বাগ্মীতা ও মাতৃভাষার উপর সম্পূর্ণ প্রাধান্য এবং (৩) আতিথেয়তা, এই তিনটি গুণ ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। (আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (পাণ্ডুয়া) ও গৌড় নগরের এনামেল করা ইষ্টক।

ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক মহাত্মাগণ গৌড় ও পাণ্ডুয়ার অরণ্যময় ভূভাগ পরিভ্রমণ করিয়া অনেক প্রাচীন শিল্প ও কীর্ত্তি অবগত হইয়া থাকেন। এই সমুদয় ধ্বংসপ্রায় ইষ্টক প্রস্তর সমাকীর্ণ ভূভাগ দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বিচিত্র বর্ণ-রাগ-রঞ্জিত সুন্দর ইষ্টকগুলিরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক সুন্দর পালিশ করা চিত্র-বিচিত্র এনামেল করা ইষ্টকখণ্ডগুলি দেখিবার উপযুক্ত বটে, কিন্তু তাঁহারা উক্ত ইষ্টকগুলি কোন সময়ে সর্ব্ব প্রথমে নির্ম্মিত, কাহারা ইহার নির্ম্মাতা এসম্বন্ধে চিন্তা করেন কি না তাহা বলিতে পারি না। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইষ্টক সমূহ বৌদ্ধ হিন্দু ও মোসলমানি ভেদে তিন শ্রেণীর দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারের ইষ্টকশ্রেণীভেদের জ্ঞান লাভ করিলে ধ্বংসপ্রায় গৃহ সমূহ কোন কোন সময়ে কাহাদের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এক রকম বুঝিবার সুবিধা হয়। ইষ্টকের আকার, গঠন, বর্ণ, ওজন ও চিত্রাদির দ্বারা আমাদিগকে ইষ্টকের শ্রেণীভেদ করিতে হয়। প্রত্যেক ইষ্টকের শ্রেণীভেদের ছায়া-চিত্র প্রদান না করিলে পাঠকগণকে ইষ্টকের জাতীয় পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। সুতরাং সময়ান্তরে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে আমরা এনামেল করা সুন্দর ইষ্টকগুলির জন্মকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

এনামেল করা গৌড়ীয় ইষ্টকের জন্মকাল।

যাঁহারা ভারতের বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান সমূহের বিবরণ অবগত আছেন অথবা হিন্দু তীর্থস্থানগুলির কতক দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ দেখিয়া থাকিবেন খুব প্রাচীন দেবালয়াদিতে গৌড়ের

এনামেল করা ইষ্টকের ন্যায় ইষ্টকের সম্পূর্ণ অভাব। দিল্লী প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থান গুলিতে কোন কোন বাদশাহী গৃহগুলিতে এনামেল ইষ্টক দৃষ্ট হয়। আমরা বলিতে পারি ১৪০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ইষ্টক গৃহে গৌড়ের এনামেল করা ইষ্টকের ন্যায় কোন ইষ্টক কোথাও নাই। এই সূত্রে আমাদের মনে হয় যে, ১৪০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই প্রকার এনামেল ইষ্টকের জন্ম এদেশে হয় নাই। চীনদেশ সর্ব্ব প্রথমে এনামেল প্রস্তুত প্রণালী ও এনামেলের ব্যবহার অবগত হন। এই প্রকার এনামেলের আবিষ্কারক এক মাত্র চীন। চীনদের নিকট এনামেল শিল্প পৃথিবীর সভ্য-জাতিগণ শিক্ষা করিয়া দেশে দেশে ঐ শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তবে চীন কতদিন হইল এই এনামেল শিল্পের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সহজে বুঝা যায় না। এ সম্বন্ধে যে সমুদায় গল্প আছে তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করাও নিরাপদ নহে।

আমাদের পুরাণাদিতে চীনের সহিত আদান প্রদান, চীনের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ এবং চীন ও ভারতের অধিবাসীগণের বাণিজ্য সূত্রে বা অন্যান্য কারণে উভয় দেশে গমনাগমন হইত জ্ঞাত হই, কিন্তু সে সময়ে ভারতে বা চীনে এনামেল শিল্পের সৃষ্টি হয় নাই।

ফা-হিয়ান, হিউ-এন-থ-সঙ্গ ও আরও বহু চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে আসিয়াছিলেন কিন্তু সে সময়েও এদেশে বা চীনে এনামেল শিল্পের বিকাশ হয় নাই।

শ্রীহর্ষ রাজার সময়ে ভারত হইতে চীনে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ মিশন প্রেরিত হইয়াছিল। চীনরাজও ভারতে চীন মিশন পাঠাইতে ছিলেন কিন্তু সে সময়ে চীন বা ভারতে এনামেলের শিল্প ছিল তাহার নিদর্শন নাই। চীন ভারতে আসিয়া ভীষণ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন তাহা শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর হইয়াছিল। তাহার পর অনেকবার চীন ভারতে আসিত, তাহা আর ইতিহাসে বড় একটা লিখিত নাই।

চীন যখন ডিস্, বাটী, পুত্তলিকা, ইত্যাদি এনামেলের আবরণ দিয়া বিবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে শিখিল তখন তাহারা ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত কিনা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই পাণ্ডুয়া নগরে চীনগণ তাঁহাদের এনামেল করা থাল, বাটী, ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য সস্তায় লইয়া আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ এদেশে সেই প্রথম চীনে বাসন আসিয়াছিল। সেকালের চীনা বাসনের ভগ্নাংশ আমাদের নিকট রক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ পাণ্ডুয়ার বাজারে চীনাগণ তাহাদের চীনা বাসনের দোকানও পাতিয়া থাকিবে।

চীনদেশের মিঙ্গশি (Ming shih) নামক ইতিহাসে মিঙ্গ (Ming) বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই—য়া—সি—টিং—(Ai—ya see—ting) নামক পাংকোলার (Pang kola) রাজা পাড়ুয়ার গয়েস উদ্দিন (Gai-ya-szu-ting) নামক পাতশাহের নিকট ১৪০৮। ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে দূত প্রেরণ করেন। দূতের সহিত যে সমুদায় চীনবাসী আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত গয়েস উদ্দিন পাতশাহকে উপ-ঢৌকন স্বরূপ অশ্ব, অশ্বের জীন, সুবর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কার শ্বেত-বর্ণের চিত্র-বিচিত্র চীনামাটির পান পাত্র এবং বহুবিধ চীনের দ্রব্যাদি প্রেরণ করেন। (J. A.S. B. Vol V No 7. P.P221) V J. R. A. S. 1895—P533, 1890—P. 204) 1909.

১৪১২ খৃষ্টাব্দে গীয়া সুটিং (গীয়াসুদ্দিন) চীনদেশে যথেষ্ট উপহার-সহ দূত প্রেরণ করেন। পরে চীনগণ অবগত হন যে, গয়েস মৃত হইয়াছেন এবং এক্ষণে সাই-ফু-টিং (Sai-fu ting) রাজা হইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই ১৪১২ খৃষ্টাব্দের পুর্ব্বে গৌড় বা পাণ্ডুয়া নগরে কোন প্রকার চিত্র করা ইষ্টকের দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মিত হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস, চীনবাসীগণ পাণ্ডুয়া ও গৌড় নগরে আগমন করিয়া চিত্র-বিচিত্র white porcelain পান পাত্রাদি প্রদান করিবার পর, ঐ প্রকারের

ইষ্টক দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ ও বিবিধ বর্ণের এনামেল করা ইষ্টকের নির্ম্মাণের শিক্ষা প্রণালী চীনগণই এদেশে সর্ব্ব প্রথমে শিখাইয়া গিয়াছিলেন। চীনবাসিগণ যে পাড়ুয়াতে অর্থাৎ মালদহে ১৪০৯—১৪১২ খৃষ্টাব্দে চীনের বাসন লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা মালদহবাসিগণ সম্ভবতঃ অবগত নহেন। দিল্লী নগরেও চীনে-কারিকরের হাতের এনামেল করা ইষ্টক দৃষ্ট হয়।

গৌড় নগরের মস্‌জেদ সমূহের নির্ম্মাণের তারিখ দেখিয়া বিবেচনা করিতে পারা যায় ১৪০৯ খৃঃ পূর্ব্বের নির্ম্মিত মস্‌জেদ গুলিতে এনামেল করা ইষ্টক নাই। গৌড়ের ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে কোন মস্‌জেদ নাই থাকিলেও তাহাতে কোন প্রকার ইষ্টক নাই। পাড়ুয়ার বড় দরগা ১৩৪২ খৃঃ নির্ম্মিত (বাহিরের দরদালান বাদে, কারণ উহা নূতন নির্ম্মিত) ইহাতে এনামেল ইষ্টক নাই। এক লাখি মস্‌জেদ অনুমান ১৪০৯ খৃঃ— ইহাতে এনামেল ইষ্টক নাই। গম্বুজের অভ্যন্তরে Fresco painting এর মত চিত্র করা ছিল বলিয়া বোধ হয়। পাচলীর দরগা ১২৪৯—ইহাতে এনামেল ইষ্টক নাই।

গৌড় চিকা মসজিদ বা জেল ১৪১৫—ইহাতে এনামেল ইষ্টক আছে।

তাঁতী পাড়া মস্‌জেদ ১৪৪৫ খৃঃ—ইহাতে এনামেল ইষ্টক আছে। লুঠন মস্‌জেদের (১৪১৫ খৃঃ) সমুদয় ইষ্টক এনামেল করা দেখিতে পাওয়া যায়। এই তালিকাদ্বারা বোধ হইবে, চীনগণ পাড়ুয়া নগরে আগমনের পূর্ব্বে এদেশে এনামেল করা ইষ্টকের প্রচলন ছিল না। চীনেরা ১৪০৯—১৪১২ মধ্যে এখানে আসিয়া এনামেল করিবার শিল্প কৌশল শিখাইয়া গিয়াছিল। তাহার পর হইতে পাড়ুয়া ও গৌড়ে ঐ প্রকার ইষ্টকের গৃহাদি, নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। এই হিসাবে আমরা বহ

প্রাচীন গৃহাদির নির্ম্মাণ কাল স্থির করিতে পারি। ক্রমশঃ বিস্তীর্ণভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীহরিদাস পালিত।

ধরমপুর জাতীয় শিক্ষা সমিতি--মালদহ।

নিয়ার্কস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই উপকূলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিমি দৃষ্ট হইত। কীজা (Kyiza) হইতে অনতিদূরে সমুদ্রে ফোয়ারার ন্যায় বৃহৎ জলের উৎস দেখিয়া গ্রীকগণ বিস্মিত হইয়াছিল। নিয়ার্কস অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন উহা তিমি মৎস্যের নিশ্বাস দ্বারা উৎক্ষিপ্ত জল। অন্যত্র নোসালা দ্বীপ সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত কিংবদন্তী ছিল। নাবিকগণ ভয়ে ঐ দ্বীপের নিকট যাইত না। নিয়ার্কস সঙ্গীয় গ্রীক্-নাবিকদিগকে তথায় অবতরণ করিতে বাধ্য করিয়া তাহাদের এই কুসংস্কার দূরীভূত করিয়াছিলেন।

গেড্রোসিয়ার তৃণশস্যাদি বিরহিত মরুস্থলীতে সেকন্দরকে খাদ্য ও পানীয় অভাবে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। কার্ম্মেনিয়া (Karmania) উপকূল অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা। ইথ্থিওফাগি উপকূলের অব্যবহিত পরেই কার্ম্মেণিয়া উপকূল (১)। ইহার অন্তর্ভাগই গেড্রোসিয়া

(1) "Karmania extended from Cape Jask to Ras Nabend, and comprehended the districts now called Moghostan, Kerman and Laristan —McCrindle.

নামে পরিচিত ছিল। কার্ম্মেণিয়ার ফুল-ফলশ্রী শোভিত হরিৎ প্রদেশ গ্রীকদিগের নয়ন-প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল। নিয়ার্কস বদিসে * (Badis) নঙ্গর করিলেন। এখানে জলপাই ও অন্যান্য নানাবিধ উদ্যান-জাত ফল পাওয়া গিয়াছিল। তথায় শস্যাদি এবং দ্রাক্ষালতাও জন্মিত। অনন্তর গ্রীকগণ মকেটা (Maketa) অন্তরীপে পৌঁছিল (১)। তথা হইতে দারুচিনি ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য আসিরীয়াতে রপ্তানি হইত। উহার সম্মুখেই অপরপারে একটা অন্তরীপের অগ্রভাগ দৃষ্ট হইতেছিল। নিয়ার্কস এই খাড়ীর পথকে লোহিত সাগরের প্রবেশ দ্বার বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। প্রধান পথ-প্রদর্শক (Chief pilot) ওনেসিক্রিটস্ মধ্যবর্ত্তী খাড়ী পার হইয়া অপর পার্শ্বের উপদ্বীপ আবিষ্কার করিবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন তাহা হইলে গ্রীকনাবিক দিগকে উপসাগর ঘুরিয়া যাইবার ক্লেশ সহ্য করিতে হইত না। নিয়ার্কস তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার বন্ধু ওনেসিক্রিটস্ সম্রাটের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। জলপথে নিরাপদে সৈন্যদিগকে গৃহে প্রেরণ করাই সেকেন্দরের সমুদ্র যাত্রার উদ্দেশ্য ছিলনা ভারত হইতে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত অর্ণবতীরের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করাই তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি ছিল। যাহা হউক, পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিয়া নিওপ্টান (Neoptana) নামক স্থানে উপনীত হইলেন, তথা হইতে আরো অগ্রসর হইয়া নিয়ার্কস পারস্যোপসাগরের প্রবেশ-দ্বারে প্রণালীর নিকটস্থ হইলেন। এইখানে তাঁহারা আনামিস্ (Anamis) (২) নদীর মোহানায় হারমোজিয়া নামক স্থানে নঙ্গর

* বর্ত্তমান Jask গ্রামের নিকটে

(1) Maketa is now called Cape Mesandum in Oman."—McCrindle.

(২) বর্ত্তমান মিনাব বা ইব্রাহিম নদী।

করিয়া নদীতীরে শিবির স্থাপন করিলেন। এই উর্ব্বর শস্য-শ্যামল দেশে আসিলে গ্রীকদিগের আনন্দের অবধি রহিল না। জলপাই ও অন্যান্য সকল পদার্থই এখানে উৎপন্ন হইত। গ্রীকগণ দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। অনেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহার্থ শিবির হইতে দূরে চলিয়া গেল। পথিমধ্যে তাহারা গ্রীক পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে গ্রীক ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইল। তাহারা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল না যে, জীবনে পুনরায় কোন স্বদেশীয় বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে, অথবা মাতৃভাষা শ্রবণ করিয়া কর্ণ সার্থক করিতে পারিবে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল সেই ব্যক্তি সম্রাট্ সেকেন্দরের অনুচর এবং সম্রাট তথা হইতে অনতিদূরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া তাহারা উল্লাস-ধ্বনি করিতে করিতে উর্দ্ধশ্বাসে নিয়ার্কসের নিকট সংবাদ লইয়া গেল। নিয়ার্কস জানিতে পারিলেন সম্রাট্ তথা হইতে প্রায় ৫ দিনের পথে রহিয়াছেন। তিনি ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার নিকট গ্রীক শিবিরে যাইবার পথ জানিয়া লইলেন। তৎপরদিন প্রাতে পোত সকল তীরে তুলিয়া যথাপ্রয়োজন জীর্ণসংস্কার করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। নিয়ার্কস নঙ্গরস্থানের সম্মুখ ভাগ গড়খাই, মৃৎপ্রাচীর ও কাষ্ঠ প্রাচীর (palisades) দ্বারা সুদৃঢ় করিলেন এবং আর্খিয়াস ও পাঁচ ছয় জন অনুচর সহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অর্ণবযানসমূহের সংবাদ প্রদান করিবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে শাসনকর্ত্তা পারিতোষিক লোভে তাড়াতাড়ি সহজপথ অবলম্বন করিয়া সেকেন্দরের নিকট উপস্থিত হইল এবং নিয়ার্কসের নিরাপদ আগমনবার্ত্তা সম্রাট্ সকাশে নিবেদন করিল। সেকেন্দর এ সংবাদে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া গেল নিয়ার্কসের

দেখা নাই। চারিদিকে লোক ছুটিল। তাহারাও সংবাদ আনিতে পারিল না। সম্রাট্ অধীর হইয়া শাসনকর্ত্তাকে মিথ্যা সংবাদ রটনা দ্বারা বঞ্চনা করার অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর একদল অন্বেষণকারীর সহিত নিয়ার্কসের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা প্রথমতঃ নিয়ার্কস বা আর্থিয়াসকে চিনিতে পারিয়াছিল না। দীর্ঘকাল নিয়মিত পানভোজন, নিদ্রা ও স্নানাভাবে তাঁহাদের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। শুষ্ক, মলিন, বিবর্ণ দেহ ও অসভ্যদিগের ন্যায় রুক্ষ, দীর্ঘ ও আলুলায়িত কেশপাশ তাঁহাদিগকে গ্রীক্ বলিয়া চিনিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়াছিল। পরে আর্থিয়াস নিয়ার্কসের সহিত পরামর্শ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং সকলে একত্র হইয়া সম্রাটের নিকট চলিলেন। কয়েকজন অশ্বারোহী অগ্রগামী হইয়া সম্রাটকে এই শুভবার্ত্তা প্রদান করিল। নিয়ার্কস মাত্র পাঁচ সাতটী সঙ্গীসহ ফিরিয়া আসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া সম্রাট হরিষে বিষাদ অনুভব করিলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল সম্ভবতঃ পোতবহর ধ্বংস হইয়াছে এবং নিয়ার্কস প্রাণেপ্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য এত আগ্রহ ও দয়া না হইলে কি মহাবীর সেকেন্দর এত বড় হইতে পারিতেন? গ্রীক্ বীর সেকেন্দর ও ফরাসীবীর নেপোলিয়নে কত অন্তর! দূতদিগের সহিত কথোপকথন শেষ হইতে না হইতে নিয়ার্কস সদলে উপনীত হইলেন। সম্রাট্ বহুক্ষণ নিরীক্ষণের পর অতিকষ্টে তাঁহার বাল্যবন্ধুকে চিনিতে পারিলেন * নিয়ার্কসের জীর্ণবাস ও মলিন দেহ দেখিতে তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে অভিযান সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি শোকে অভিভূত হইয়া কোনমতে নিয়ার্কসকে হস্ত প্রসারণ করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে একান্তে লইয়া গিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ

* "It was not without difficulty Alexander after a close scruting recognised who the hirsute, ill-clad men who stood before him were &c" —Arrian's Indika.

রোদনের পর একটু স্থির হইয়া সেকেন্দর বলিলেন, নিয়ার্কস ! তোমাকে এবং আর্থিয়াসকে যখন জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া পাইয়াছি, তখন আমি এ সর্ব্বনাশের নিদারুণ সন্তাপ কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইতে পারিব। এখন প্রকাশ করিয়া বল, কিরূপে এই সকল নাবিক ও অর্ণবযান ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।” নিয়ার্কস তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, পোতবহর ও নাবিকগণ সম্পূর্ণ নিরাপদে তীরে পৌছিয়াছে। সেকেন্দর আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন যে, এই সংবাদে তিনি যত আহ্লাদিত হইলেন সমগ্র আসিয়া-বিজয়-হর্ষও তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ। (১) তৎপর নিয়ার্কসের অনুরোধে কারাবদ্ধ শাসনকর্ত্তা মুক্তিলাভ করিল। চতুর্দ্দিক দেবপূজা, উৎসব ও আনন্দের ধূম পড়িয়া গেল। সেকেন্দর অবশিষ্ট জলপথে নিয়ার্কসকে পাঠাইতে অমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নিয়ার্কস আরব্ধ কার্য্য হইতে বিরত হইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না।* তিনি অল্প-সংখ্যক রক্ষীসহ সমুদ্রতীরে ফিরিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বহুকষ্টে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল।

নবশক্তি সঞ্চয় করিয়া নিয়ার্কসের পোতবহর পুনরায় সাগরবক্ষে ভাসমান হইল। হার্ম্মোজিয়া (২) (Harmozeia) বন্দরের পর ওরগন (Organa) নামক মরুদ্বীপ উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীকগণ ওয়ারক্ত (Oarakta) দ্বীপে উপনীত হইল। এই দ্বীপের অধিপতি মজিনিস্ (Mazenes)

(১) "Upon this Alexander, &c, declared that he felt happier at receiving these tidings than in being the conqueror of all Asia"—Arrian's Indika.

* 'Diodoros (XVII. 106) gives quite a different account of the visit of Near Khos to Alexander'—McCrindle.

(২) Ormus, এক্ষণে ইহা একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের নাম। তখন মিনাব নদীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশের এই নাম ছিল। Kempthrone বলেন এই প্রদেশকে "the paradise in Persia" বলা হইত। বর্ত্তমান Ormuz বোধ হয় তখনকার organa দ্বীপ।

স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া সুসা (Sousa) পর্য্যন্ত গ্রীকদিগের পথ প্রদর্শক হইয়া গিয়াছিলেন। দ্বীপবাসীরা বলিত তাহাদের প্রথম সম্রাট্ ইরিথ্রেসের (Erythres) নামানুসারে সমুদ্রের নাম ইরিথ্রিয়ান সাগর হইয়াছিল। তথা হইতে আরো দুই একটী দ্বীপ পথিমধ্যে অতিক্রম করিয়া গ্রীকগণ সিসিডোন (Sisidone) নামক এক ক্ষুদ্র সহরে উপনীত হইল। পরবর্ত্তী নঙ্গরস্থান টার্সিয়া (Tarsia)। ইহা একটী অন্তরীপের অগ্রভাগে অবস্থিত ছিল। অনন্তর কাটাইয়া (Kataia) (1) নামক মরুদ্বীপ। এইখানে কার্ম্মানিয়া উপকূল শেষ হইল। অতঃপর পারস্যের অধিকার।

পারস্যোপকূলে কাইকন্দর (Caikander) (2) দ্বীপের অন্তরালে ইলা (Ila) নামক বন্দরে নিয়ার্কসের প্রথম নঙ্গর স্থান। ইহার পর আর একটী ক্ষুদ্রদ্বীপে বহর লগ্ন হইল। নিয়ার্কস বলেন এখানে ভারত মহাসাগরের ন্যায় শুক্তি তুলিবার কারবার ছিল। ওখস (Okhos) নামক পাহাড়ের সন্নিকটে একটী সুরক্ষিত ধীবর বন্দরে পরে বিশ্রাম স্থান। তথা হইতে অপস্তানা (Apostana), পরে গ্রীকগণ কোন উন্নত অন্তরীপের পাদমূলে অবস্থান করিলেন। এই দেশের সহিত গ্রীসের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া নিয়ার্কস হৃষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপর গোগনা (Gogana) (3) নামকস্থানে এরিওন (Areen) নাম্নিকা স্রোতস্বিনী মুখে গ্রীকবহরের স্থিতি। অনন্তর সিটাকোস্ (Sitakos) নদীর মুখে * অতিকষ্টে নঙ্গর ফেলিয়া নিয়ার্কস্ ২১ দিন বিশ্রাম করিলেন। এখানে তিনি সম্রাটের আদেশে সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রী

(1) বর্ত্তমান Kaes বা Kenn.

(2) বর্ত্তমান নাম Inderabia অথবা Andaravia

(3) " " Konkan বা Konaun.

* এক্ষণে Kara A gach, Mand, Mend অথবা Kaku নদীকেই সিটাকোস বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজগুলির পুনরায় জীর্ণ সংস্কার করাইলেন। অতঃপর হিরাটিস্ (Hieratis) নগরে হেরাটেমিস্ (Heratemis) নামক সহরে রাত্রিযাপন করিয়া গ্রীকগণ মেসাম্বিয়া উপদ্বীপে (1) পদার্গোস (Padargos) নদীতটে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে গ্রাণীস নদীতীরস্থ তাওক (Taoke) নামক স্থানে নঙ্গর পড়িল। পথিমধ্যে নিয়ার্কস্ দেখিয়াছিলেন যে একটা ৫০ হাত দীর্ঘ প্রকাণ্ড তিমির চড়ায় আটকা পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার সর্ব্বশরীর শেওলায় আবৃত ছিল এবং ইহার এক একটা আঁইস প্রায় একহাত দীর্ঘ ছিল। ইহার সঙ্গে অসংখ্য শুশুক (dolphins) ছিল। তাওকি হইতে রোগোনিস বন্দর, তৎপর ব্রিজানা (Brizana)। এই খানে অবতীর্ণ হইয়া নিয়ার্কস্ শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী নঙ্গর স্থান আরোসিস্ (Arosis)। (2) নিয়ার্কস উপকূলে যত নদী-মুখ দেখিয়াছিলেন তন্মধ্যে এইটীই সর্ব্ববৃহৎ। আরোসিস্ বা ওরোটিস্ (Oroatis) নদী পার্সিস (Persis) ও সুসিস (Sousis) এই উভয় কূলের মধ্যসীমায় প্রবাহিত হইতেছিল। পার্সিস উপকূলে পোতচালনা বিপজ্জনক ও কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। যেহেতু এই তীর

ভারত হইতে পারস্য পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূলবর্ত্তী জনপদ আবিষ্কার করিতে গ্রীক সম্রাটের একান্ত আগ্রহ হইয়াছিল। তিনি সহস্র বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া তাঁহার এই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এরিয়ান বলেন, একটা কিছু নূতন ও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবার প্রবল ইচ্ছা সেকেন্দরের সকল দ্বিধা ও আশঙ্কা ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিল,—

"His ambition, however, to be always doing something new and astonishing prevailed over all his scruples."

(1) Bushir বা আবুসহর এই উপদ্বীপে অবস্থিত।

(2) ইহার বর্ত্তমান নাম Tale তাব।

কর্দ্দময় জটিল খাড়ী ও জলমগ্ন চড়ায় পরিপূর্ণ ছিল এবং উত্তালতরঙ্গ-ভঙ্গ তীর হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত উন্মুক্ত সাগরে বিস্তৃত হইত।

পার্সিস্ কূল অতিক্রম করিলে, নিয়ার্কস্ সু'সস উপকূল প্রাপ্ত হইলেন। এই তীরও পূর্ব্ববৎ বিপজ্জনক ও অসুবিধাকর ছিল। এজন্য বহরকে তীর হইতে দূরে দূরে চ'লতে হইয়াছিল। সু'সয়ানদিগের উত্তরে উর্কসিয়ান রাজ্য। তাহারা দস্যুবৃত্তি করিত। পার্সের তিন প্রকার জল বায়ু বর্ণিত হইয়াছে। ইরিথ্রিয়ান সমুদ্রকুলে বালুকাময় অনুর্ব্বর দেশে দারুণ গ্রীষ্ম। মধ্যভাগ নাতিশীতোষ্ণ—নদ-নদী-হ্রদ-কানন বৃক্ষ লতা তৃণ পুষ্প পরিশোভিত অত্যুত্তম দেশ। উত্তরাংশ চিরনীহার দেশ। এরিয়ান বলেন উক্সিয়ান ও মর্দ্দিয়ান (Murdian) প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খল দস্যুজাতিদিগকে বশীভূত করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে সেকেন্দর যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নিয়ার্কস্ সুসিয়ান উপকূলের যথাযথ বিবরণ প্রদান করিতে অসমর্থ, নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পাঁচ দিনের ভক্ষ্য সঙ্গে লইয়া নিয়ার্কস্ যাত্রা করিলেন এবং কিছুদূর যাইয়া মার্গস্তান (Margastana) দ্বীপের পুরোভাগে কাটাডের্ব্বিস (Katadarbis) নামক মৎস্যপূর্ণ খাড়ী প্রাপ্ত হইলেন *। তথা হইতে লিউকাডিয়া ও অকর্ণানিয়া দ্বীপের মধ্য দিয়া চ'লিলেন। বহুদূর যাইয়া ইউফ্রেটিস (Euphrates) নদীর মুখে ব্যাবিলোনিয়া (Babylonia) প্রদেশের ডিরিডোটিস (Diridotis) নামক নগরে উপনীত হইলেন। (১) উপসাগরের শিরোভাগে সুসিয়া-কূল বক্রভাবে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এই স্থানেই টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মোহানা অবস্থিত।

* "The bay of Kataderbis is that which receives the streams of the Mensurch and Dorak, at its entrance lie two islands, Bunah and Deri, one of which is the Margastana of Arrian."

(1) অপর নাম Teredon। কেহ কেহ বর্ত্তমান Bubion দ্বীপে, কেহ বা বর্ত্তমান Jebel Sanamএ ইহার স্থান নির্দ্দেশ করেন।

তখন বোধ হয় এই দুই নদী পৃথক্‌ভাবে সাগরে পতিত হইত। টাই-গ্রিস্ নদী উজাইয়া স্থল দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে নিয়ার্কসের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি বুঝিতে না পারিয়া নদীর মোহানা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমাগত চলিয়া চলিয়া অবশেষে তিনি পূর্ব্বোক্ত দিরিদোডিস্ বা তেরিদনে (Teredon) পৌছিলেন। ইহা ইউফ্রেটিসের শাখা পাল্লাকোপাস তীরে (Pullacopas) অবস্থিত ছিল। এই সহরকে নিয়ার্কস অতি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র (emporium of the sea-borne trade) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে তিনি সংবাদ পাইলেন যে সম্রাট্ সুসিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। অতএব তিনি দিরিদোডিস হইতে প্রত্যাগত হইয়া টাইগ্রিস্ নদীর মোহানায় প্রবেশ করিলেন * এবং নদীপথে উপর দিকে ক্রমাগত চলিয়া একটি হ্রদের দক্ষিণ প্রান্ত প্রাপ্ত হইলেন। এই হ্রদের ভিতর দিয়া তাইগ্রিস্ প্রবাহিত হইতেছিল। এবং ইহার অপর প্রান্তে এগিনিস (Aginis) গ্রাম অবস্থিত ছিল। এই হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে পাসিটিগ্রিস্ (pasitigris) নদী পতিত হইত। এই নদীই ঋষি দানিয়েলের উলাই (ulai) এবং বর্ত্তমান করুণ (Karun) নদী। বহর এই নদী পথে অগ্রসর হইয়া পারস্য হইতে সুসা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ-বর্ত্মে এই নদীর উপরিস্থ সেতুর নিম্নে নঙ্গর ফেলিল। এখান হইতে নিয়ার্কস্ সম্রাটের গতিবিধির সন্ধান লইলেন এবং তাঁহার পথ আগুলিয়া সেতুর নিম্নে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইস্থানে দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দরের জলপথ ও স্থলপথবাহী সৈন্যগণের পুনর্মিলন হইল। সেকে-ন্দর আনন্দে অধীর হইয়া নিয়ার্কসকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিলেন

* তাইগ্রিস আর্ম্মেনিয়া হইতে আসিতেছিল এবং সুবিখ্যাত প্রাচীনা নগরী নিনেভা (Ninevah) ইহার তীরে অবস্থিত ছিল। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্ত্তী দোয়াবকে মেসোপেটামিয়া বলে।

এবং এই মহৎকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে যথোচিতরূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিলেন। সম্রাট্ স্বহস্তে নিয়ার্কস ও লিওন্নেটসের মস্তক স্বর্ণমুকুটে ভূষিত করিলেন। পূজা-অর্চ্চনা, নৃত্যগীত ও ক্রীড়া-কৌতুক কিছুকাল মহা ধূমধামে চলিতে লাগিল। নিয়ার্কসকে দেখিলেই সৈন্যগণ তাঁহার উপর পুষ্প স্তবক বর্ষণ করিত এবং তাঁহার গলদেশ কুসুমমালায় বিভূষিত করিত।

ভিন্সেণ্ট বলেন ৩২৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সাগরাভিযান শেষ হইয়াছিল। অতএব নিয়ার্কসের সমুদ্রযাত্রা ১৪৬ দিনে অথবা কিঞ্চিন্যূন ৫ মাসে সমাধা হইয়াছিল।

নিয়ার্কসের জলপথ প্রধানতঃ ৮ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

১ম, ঝেলম তীরে গ্রীক শিবির নিকট (বর্ত্তমান মঙ্গ উত্তরাক্ষ ৩২½, পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৭৩½) হইতে সিন্ধুতীরে কিল্লৌটা পর্য্যন্ত। অভিযানের এই অংশে নিয়ার্কসের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব ছিল না। সেকেন্দর স্বয়ং পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতে নিয়ার্কস নেতৃত্ব করিতেন।

২য়, কিল্লৌটা (বর্ত্তমান লরিবন্দরের সান্নিধ্য, উত্তরাক্ষ ২৪—৩০, পূঃ দ্রাঃ ৬৭-২৮) হইতে আলেকজাণ্ডার বন্দর বা করাচী পর্য্যন্ত।

৩য়, আরাবিস বা সিন্ধু উপকূল—আলেকজাণ্ডার বন্দর (উঃ ২৪—৫৩, পূঃ দ্রাঃ ৬৬-৫৭) হইতে আরাবিস নদী (বর্ত্তমান পূরালী নদী, উঃ ২৫-২৮ পূঃ দ্রাঃ ৬৬-৩৫) পর্য্যন্ত। দৈর্ঘ ১০০০ ষ্টাডিয়া বা ৮০ মাইল, অতিক্রম করিবার সময় ৩৮ দিন।

৪র্থ, ওরিটাই বা লস উপকূল—পগল (উঃ ২৫-৩০, পূঃ ৬৬-১৫) হইতে মলন (বর্ত্তমান রাস মলন, উঃ ২৫-১৪, পূঃ ৬৫-৭) পর্য্যন্ত। দৈর্ঘ্য ১৬০০ ষ্টাডিয়া বা ১০০ মাইল, সময় ১৮ দিন।

৫ম, ইথথিওফাগি (মেকরাণ বা বেলুচিস্থান) উপকূল—বাগিসর

(উঃ ২৫-১২, পূঃ ৬৪-৩১) হইতে বাগসীয়া (উঃ ২৫-৩৪, পূঃ ৫৮-২৭) পর্য্যন্ত। বিস্তৃতি ১০০০০ ষ্টাঃ, বা ৪৮০ মাইল, সময় ২০ দিন।

৬ষ্ঠ, কার্ম্মানিয়া (মঘিস্তান এবং লরিস্তান) উপকূল—বোম্বেক অন্তরীপের পূর্ব্ব হইতে কইটয়া (বর্ত্তমান কেন্ন—Kenn উঃ ২৬-৩২, পূঃ ৫৪) দ্বীপ পর্য্যন্ত। দৈর্ঘ্য ৩৭০০ ষ্টাঃ বা ২৯৬ মাঃ, সময় ১৯ দিন।

৭ম, পার্সিস (ফার্সিস্তান) উপকূল—ইলা এবং কইকন্দর দ্বীপ (বর্ত্তমান ইন্দেরাবিয়া দ্বীপ উঃ ২৬—৩৮, পূঃ ৫৩—৩৫) হইতে আরোসিস বা ওরোটিস নদী (বর্ত্তমান তাব নদী উঃ ৩০—৪, পূঃ ৪৯—৩০) পর্য্যন্ত। দৈঃ ৪৪০০ ষ্টাঃ বা ৩৫২ মাঃ সময় ৩১ দিন।

৮ম, সুসস (খুজিস্তান) উপকূল—কাটাডেবিস নদী (উঃ ৩০—১৬ পূঃ ৫১°) হইতে দিরিদোতিস (জেবেল সনামের নিকট, উঃ ৩০—১২, পূঃ ৪৭—৩৫) পর্য্যন্ত। সমুদ্র যাত্রার শেষ। দৈঃ ২০০০ ষ্টাঃ, সময় তিন দিন

নিয়ার্কসের প্রথম ও শেষ জীবন কুহেলিকাময়। তাঁহার বংশ-পরিচয় ও বাসস্থান সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় পূর্ব্বেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বাল্যজীবনে রাজকুমার আলেকজাণ্ডারের অত্যন্ত অনুগত বন্ধু ছিলেন। এই অপরাধে সন্দিগ্ধচেতা গ্রীকভূপতি ফিলিপ তাঁহাকে * কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেকেন্দর পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলে নিয়ার্কস মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। নিয়ার্কস স্বার্থপর ছিলেন না। তিনি সম্রাটের সেবা করিয়া যশ, পদ, সম্মান ক্ষমতা বা ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখিতেন না। এইজন্য সেকেন্দরের জীবনান্ত হইলে তাঁহার অনুগৃহীত ও বন্ধুদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র রাজ্যের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিয়ার্কস গ্রীকরাজ এণ্টিগোনাসের (Antigonus) অধীনে একটি

* এই কারণে Ptolemy ও কারাগারে বন্দী হইয়াছিলেন।

সামান্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদ লইয়া নীরবে সন্তুষ্টচিত্তে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় নির্লোভ, অনাড়ম্বর, কর্ত্তব্যপরায়ণ, দৃঢ়সঙ্কল্প, বীরহৃদয়, বিশ্বাসী ও অনুরক্ত বন্ধু যে দেশে এবং যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য এবং সে জাতি জগতের নমস্য! আর ধন্য সেই মহাবীর সেকেন্দর যাঁহার মধুরাকর্ষণে নিয়ার্কসের ন্যায় অসাধারণ বীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া বন্ধু সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

শ্রীরসিকলাল রায়।

ইতিহাস-হত্যা।

—০•০—

বাঙ্গলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে ও রঙ্গমঞ্চে দিন দিন ইতিহাসের আদর দেখিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দ লাভ ক'রতেছি। ইতিহাসালোচনায় জাতীয় জীবনকে উন্নত করিয়া তুলে। জাতির পুরাবৃত্তে ও ইতিবৃত্তে জাতীয় মহাপুরুষগণের চরিতানুশীলনে স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি যে শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়, একথা অকপটে বলা যাইতে পারে। তাই আমরা ইতি-হাসালোচনার প্রসার বৃদ্ধি দেখিলে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। সুতরাং ঐতিহাসিক কাব্য, উপন্যাস ও নাটকে লোকের যে, ইতিহাসের প্রতি আদর বাড়িতেছে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় কালে রঙ্গমঞ্চে লোক পরিপূর্ণ দেখিয়া ও বাঙ্গলার গৃহে গৃহে ঐতিহাসিক কাব্য ও উপন্যাসের পাঠন দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা আশান্বিত হইয়া উঠি। কিন্তু আমরা যদি ইহার

অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমান কবি, ঔপন্যাসিক ও নাটককারগণ ইতিহাসকে হত্যা করিয়া তাহার আবরণখানিকে নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া লোকের নিকট উপস্থাপিত করিতেছেন; এবং সাধারণে সেই আবরণখানিকে প্রকৃত ইতিহাস মনে করিয়া আপনাদের হৃদয়ে নানারূপ ভ্রান্ত মতের আশ্রয় দিতেছে। ইতিহাসের আদর দেখিয়া আমরা যেরূপ আনন্দিত, তাহার নির্দ্দয়রূপ হত্যার জন্যও আবার সেইরূপ ব্যথিত। বাস্তবিক ইতিহাসের এরূপ অপমৃত্যু যে দুঃখের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখকগণ ইচ্ছা করিলে ইতিহাসকে স্বশরীরে লোকের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা তাহার হত্যার জন্যই বিশেষরূপ লালায়িত ও তাহার আবরণখানিকে চিত্র-বিচিত্র করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। ইতিহাসের এইরূপ নির্দ্দয় হত্যার জন্য তদীয় প্রেতাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থিত হয় ও তাঁহাদিগকে ন্যায়-মর্ম্মকথা প্রচারের জন্য সর্ব্বদা অনুনয়-বিনয় করিয়া থাকে। ইতিহাসের মর্ম্মকথা প্রচার করিতে গেলে অনেক লেখককে বিচারকের নিকট টানিয়া আনিতে হয়। বাস্তবিক নাটক ও উপন্যাস লেখকদিগের ইতিহাসহত্যার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। একমাত্র লোকের চিত্ত বিনোদন ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমরা কিন্তু কল্পনা অপেক্ষা সত্যে লোকের চিত্ত বিনোদন অধিক পরিমাণে হয় বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। যাহা সত্য তাহাই মানব-মনে বদ্ধমূল হয়। কল্পনা যদিও নানারূপ লীলাখেলা করিয়া অনেকের মনে তরঙ্গ তুলিয়া থাকে, কিন্তু তাহা দুদিনের অধিক স্থায়ী হয় না।

আর যদি কল্পনার লীলাখেলা দেখাইবার জন্য লেখকদিগের নিতান্ত আগ্রহ হয়, তাহা হইলে ঐতিহাসিক কল্পনা অবলম্বন না করিয়া তাঁহারা অন্যান্য অনেক বিষয়ে আপনাদের কল্পনাকে পরিচালিত করিতে পারেন।

ইতিহাসের এরূপ নির্দ্দয় হত্যায় তাঁহারা যে সত্যনাশে প্রবৃত্ত হন, তাহা কি তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না? কল্পনার কুহকে সত্যনাশে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা একবার তাঁহারা বুঝিয়া দেখিবেন কি?

বাস্তবিক কল্পনাই যদি তাঁহাদের আরাধ্য বস্তু হয়, তাহা হইলে ইতিহাসকে লইয়া টানাটানি না করিয়া তাঁহারা আরও নানাবিধ উপায়ে তাহার পূজা করিতে পারেন। ইতিহাস আপনার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া চিরদিন জগতে সত্যের প্রচার করিয়া থাকে, কল্পনা তাহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে না। সত্যের প্রচারের জন্য যাহার জন্ম, তাহাকে কল্পনার আবরণে ভূষিত করিয়া জগতে প্রচার করিলে, কল্পিত সত্যেরই প্রচার করা হয়। প্রকৃত সত্য তাহা হইতে দূরে অবস্থান করে। কিন্তু আমাদের কবি, ঔপন্যাসিক ও নাটককারগণ না জানি, কি এক মোহে পড়িয়াছেন। তাই তাঁহারা কল্পনার অতিরঞ্জনে ঐতিহাসিক তথ্যকে চিত্রিত করিয়া, লোক-সমক্ষে সত্যের মর্য্যাদা-হানি করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের এই মোহ দূর করিতে না পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত লোকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বুঝিতে কোনরূপেই সক্ষম হইবে না।

তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, যদিও আমরা ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তির উপর কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের সুচিত্রিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছি বটে,—কিন্তু সে ভিত্তি যখন ভূগর্ভস্থ ও নানাবর্ণে আবৃত, তখন তাহাকে ঐতিহাসিক ভিত্তি ধরিয়া না লইলে, আর কোনও গোলযোগ থাকে না। তাঁহাদের উক্তির সমর্থন করিলেও সাধারণে যে তাহাকেই প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, তাহার সদুত্তর তাহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা ভূমিকায় ও মুখবন্ধে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া

প্রকাশ না করিলেও যেখানে ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তির সামান্যরূপ নির্দ্দেশও থাকে, সাধারণে তাহাকেই প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। যখন সাধারণের হৃদয় হইতে সে ভাব দূর করার বিশেষ কোন উপায় দেখা যায় না, তখন ঐতিহাসিক তথ্যকে যথাসম্ভব সত্যের তুলিকায় চিত্রিত করিয়া, লোক-সমক্ষে প্রচার করিলে কি ক্ষতি হয়, তাহা আমরা বুঁঝিতে পারিনা। কবি, ঔপন্যাসিক ও নাটককারগণ যদি স্ব স্ব গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের যথাসম্ভব সন্নিবেশের চেষ্টা করেন, তাহাতে তাঁহাদের গ্রন্থ যে অনাদৃত হয়, একথা আমরা মনে করিনা। বঙ্গ-সাহিত্যের এইরূপ দুই এক খানি গ্রন্থ যে লোক-সমাজে বিশেষরূপ আদৃত হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত আছি। ফলতঃ লেখকগণ কল্পনার কুহকে না ভুলিয়া সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইলেই এই সমস্যার মীমাংসা অনায়াসেই হইয়া যায়। তাঁহারা সকলেই শক্তিশালী লেখক। শক্তিশালী ব্যক্তিগণ কল্পনাকে যখন সত্যে পরিণত করিতে পারেন, তখন সত্যকে প্রকৃত আকারে দেখাইতে যে অনায়াসে সমর্থ হইবেন, তাহা বোধ হয় বলা বাহুল্য মাত্র। আশা করি, বঙ্গ-সাহিত্যের কবি, ঔপন্যাসিক ও নাটককারগণ সত্যেরই আদর করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

আজ কাল যেরূপ ইতিহাসালোচনার প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে জন-সমাজে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য প্রচারের চেষ্টা করিলে লোকে যে তাহা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিবে, একথা আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি। উপকথা যত মধুর হউক না কেন, সত্য ঘটনার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা চিরদিনই থাকিবে। সেই সত্য ঘটনাকে মধুর ভাবে চিত্রিত করিলে লোকের চিত্তবিনোদনও যথেষ্ট পরিমাণে হইবে। তজ্জন্য কল্পনার সাহায্য লওয়া নিষ্প্রয়োজন। সত্য স্বয়ং-প্রকাশ, তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই। যদি আমা-

দের কবি, ঔপন্যাসিক ও নাটককারগণ প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনাকে সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়া, মহাপুরুষগণের চরিত্র ও কার্য্য-পরম্পরা লোক-সমাজে প্রচারে উদ্যত হন, তাহা হইলে দেশ-মধ্যে যে, জাতীয় উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। মহাপুরুষগণ প্রকৃত যে পথে বিচরণ করিয়াছেন, সেইপথ অনুসরণ করিলে জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। কল্পিত পথের সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাদিগকে সেইপথে পরিচালিত করিয়া দেখাইলে, লোকে তাহাতে বিচরণে সক্ষম হয় না। আদর্শ-সত্যের আলোকে উজ্জ্বল হইলে, লোকে তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। তাহাকে কল্পনার চিত্রে চিত্রিত করিলে তাহা সুদৃশ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রতিবিম্ব ধারণের তাহা সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠে। তাই আমরা ইতিহাসের প্রকৃত চিত্র দেখিতে চাই। তাহার সেই চিত্র সত্যের আলোকে চিত্রিত হইয়া আমাদের রঙ্গমঞ্চে ও সাহিত্যক্ষেত্রে চিরবিরাজ করিতে থাকুক, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। মহাপুরুষগণের কীর্ত্তি-কলাপ অঙ্কে অঙ্কে অভিনীত হউক, অধ্যায়ে অধ্যায়ে রচিত হউক। তাঁহাদের দেবোপম চরিত্র, আমাদের অধঃপতিত জীবনকে উন্নতির উচ্চতম সোপানে লইয়া যাউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক অভিলাষ। আশা করি আমাদের শক্তিশালী লেখকগণ আমাদের এই অভিলাষ-পূরণের জন্য মুক্তহস্ত হইবেন।

উপসংহারকালে তাঁহাদের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা যে, তাঁহারা আর যেন ইতিহাস-হত্যায় প্রবৃত্ত না হন, তাহার নিদয় হত্যায় আমরা বাস্তবিকই ব্যথিত। অনেকবার তাহার হত্যা হইয়াছে, কিন্তু সে আবার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার বারম্বার হত্যায় তাহার আর অস্তিত্ব থাকিবে বলিয়া বোধ হয়না। তাই আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের লৌহাস্ত্র সম্বরণ করুন।

আমরা ইতিহাসকে স্বশরীরে বিদ্যমান দেখিয়া সুখী হই। সর্ব্বমঙ্গলময় জগদীশ্বরের কৃপায় এই সুখ নিয়ত বর্ত্তমান থাকে।

সমালোচনা।

চাকমাজাতির ইতিবৃত্ত—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। চাকমা পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের একটি অর্দ্ধ সভ্যজাতি। পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্তের ইতিহাসের সহিত এই জাতি স্মরণীয় কাল হইতে বিজড়িত। ইহাদের দ্বারা অনেক সময় ত্রিপুরা চট্টগ্রামে বিপ্লব, বিদ্রোহ, রাজ-পরিবর্ত্তন ইত্যাদি শত শত ঘটনা ঘটিয়াছে। আমরা ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া ইহাদিগের সন্ধানও রাখি না। কবিবর নবীনচন্দ্র জুমিয়া-জীবনের যে অপূর্ব্ব দাম্পত্য-ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন, আমরা এতদিন তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলাম, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় সতীশবাবু আজ ইহাদের যে অপূর্ব্ব ইতিহাসখানি সাধারণের হস্তে দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, কেবল আর্য্য ও আর্য্য-সভ্যতার অনুকরণে যে সকল জাতি আর্য্যসমাজে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস জানিলেই আমাদের দেশের ইতিহাস জানা হইবে না। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী সাঁওতাল, মগ, গারো, নাগা, খন, কুকি, টিপ্রা, খন্দ, গোঁড় ইত্যাদি জাতিগুলির ইতিহাসও জানিতে হইবে। সতীশবাবু চাকমা জাতির ইতিবৃত্তখানি বঙ্গভাষার সাহিত্য-ভাণ্ডারে যেমন একখানি অতি উপাদেয়, অতি মনোজ্ঞ এবং অতি কৌতূহলবর্দ্ধক গ্রন্থ হইয়াছে, তেমনি তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় পরিশ্রম এবং অনুসন্ধিৎসারও পরিচায়ক হইয়াছে। চাকমার জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক,—তাহাদের উৎপত্তি,

তাহাদের দেশান্তরাদিতে বসবাস, তাহাদের সামাজিক শৃঙ্খলা, তাহাদের রাজনীতি, তাহাদের বাসগৃহ, তাহাদের কৃষিকার্য্য, তাহাদের আমোদ-উৎসব, তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের জাতীয় রাজ্য, তাহাদের যুদ্ধ-বিগ্রহাদি, তাহাদের ভাষার প্রত্যেক বিভাগ ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ ধরণের গ্রন্থ ভাষায় এই প্রথম। পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহিত করায় পরিষৎও ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সতীশ বাবুকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। লোকে এই বন্য জাতির ইতিহাস-খানি উপন্যাসের ন্যায় আগ্রহ করিয়া পড়িবে ও তৃপ্তিলাভ করিবে এখানিও পরিষৎ-গ্রন্থাবলীর ২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।